সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
শ্রীচুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
সিল্ক স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিঃ ৬ হইতে
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

॥ এক ॥

সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা। উত্তর কলকাতার এক কলেজে সুবহ্-শাম চেঁচাতাম অর্থাৎ সকাল দশটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত আই. এ. বি এ. বি. কম. ক্লাসে পড়াতাম। সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব তখন পাটনা বেতারকেন্দ্রের একজন কেষ্টুবিষ্টু। ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষ বার্ষিক এক্‌সটেনশন-লেকচার-এর ব্যবস্থা করলেন। সে বছরের বক্তৃতা দেবেন আলি সাহেব। তিনদিনের বক্তৃতা, দক্ষিণা মন্দ নয়। বিষয়—বাংলাসাহিত্যে মানবিকতা। আলি সাহেব পাটনা থেকে এসে উঠলেন তাঁর পুরনো ডেরায়—পার্ক সার্কাসের পার্ল রোডের বাড়িতে। আমার সঙ্গে পূর্ব থেকেই চেনা ছিল বলে কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রোজ দুপুরে ট্যাক্সি নিয়ে তাঁকে আনতে যেতাম। রোজই গিয়ে দেখতাম, লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরিহিত আলি সাহেব সারাঘরে পায়চারি করছেন।

—এ কি, এখনো আপনি তৈরী হননি ?

—বোসো বৎস। অত তাড়া দিও না।

—ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

—থাকুক, ব্যাটাদের দু পয়সা খর্চা হোক। অত তাড়া দিও না। দাঁড়াও পান-জর্দা খাই, তবে তো যাব।

বলে নানা গল্প ফাঁদতেন। বার বার ঘড়ি দেখি, আর তাঁকে তাগাদা দিই। তিনি হাসিমুখে ইচ্ছে করে দেরি করতেন।

আলি সাহেব তিনদিনের বক্তৃতায় দেখিয়েছিলেন, বাংলাসাহিত্যে মানবিকতা বরাবরই ছিল ও আছে। ধর্মের প্রভাবে যে উচ্চকোটির সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে, তার বাইরে লোকসাহিত্য জনজীবনের সুখদুঃখের মালা গত হাজার বছরে গাঁথা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা পেয়েছে অপরূপ বাণীরূপ।

প্রতিদিন এক ঘণ্টা বক্তৃতা। শ্রোতারা ষাট মিনিট ধরেই হেসে গড়িয়ে পড়তেন। আর আলি সাহেব গম্ভীর মুখে বক্তৃতা করতেন। একদিন বললেন, 'শ্রীহট্ট থেকে অনেক গ্রেট ম্যানের আবির্ভাব হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আদি বাড়ি শ্রীহট্টে। লালন ফকির, হাসনরাজার বাড়ি সিলেটে। অবশ্য আমার কথা এখানে তুলছি না।' (আলি সাহেবের বাড়ি সিলেটে সুরমা নদীর তীরে।)

এই কথা বলেই লালন ফকিরের গানের শ্লোক ঝাড়লেন—

মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জান্ গে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়॥

রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে বলেন, গুরুদেব মর্তের কবি। তিনি এক মুহূর্তে আমাদের "নীলাম্বরের মর্মমাঝে" নিয়ে গেছেন, সেখানে "তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে নিদ্রাবিহীন গগনতলে"। পরমুহূর্তেই মর্তে ফিরিয়ে এনেছেন, গেয়েছেন—

হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিঙ্গন
বনের পথে আঁধার-আলোর আলিম্পন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি, আলি সাহেব তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, তবু আমরা যেন না ভুলি তিনি বাংলার কবি। বুয়োনোস এইরেস থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন 'চিঠি'—

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানি।
প্রকাশ্যে তার থাক না যতই সাদা মুখের ঢঙ,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।

প্রবাসী কবি ব্যাকুল হয়ে দিনুর কাছে দেশের খবর চেয়ে ঐ 'চিঠি'তে লিখেছিলেন—

ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস কোথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়ে ছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যাঁরা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।······
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।

দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,…
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সজল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে, আমিই সত্য, দেবতা মিথ্যা মায়া ;
সেদিন যেন কৃপা করেন আমায় ভগবান,
মেশীন-গান-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান।

আজো স্পষ্ট মনে পড়ে বিশ বছর আগের সেই সভায় বক্তা আলি সাহেবের রূপ। ফর্সা লাল টকটকে মুখ, মুহূর্তমাত্র না থেমে স্মৃতি থেকে তুলে আনছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উপরের রেখাচিত্র থেকে পাই—মানবিকতা আর রবীন্দ্রানুগত্য। দুয়ে মিলে সৈয়দ সাহেব। তাঁর জীবনরসিকতা ও সদাজাগ্রত কৌতূহল সম্প্রদায়নিরপেক্ষ উদার মনোভাব ও বৈদগ্ধ্য, মানসিক আভিজাত্য ও নির্মলতা, গদ্যভাষার দীপ্তি ও শব্দসচেতনতা, বৈষ্ণবপদাবলীপ্রীতি ও সহজমানুষ প্রীতি. লঘুরসিকতা প্রবণতা আর হৃদয়-গভীরস্পর্শী অশ্রুমিশ্রিত হাসি ঃ সব কিছুরই হদিস পাওয়া যায় ঐ দুটি বৈশিষ্ট্যে। তিনি আড্ডাবাজ, মজলিশী মানুষ—একথা যেমন সত্য, হৃদয়ের গভীরে ডুবুরি, একথা তেমনি সত্য। তাঁর রম্যরচনায় হয়ত সব সময় আসল মানুষটা ধরা পড়েনি, কিন্তু উপন্যাসে ধরা পড়েই। জীবনের গভীরে ডুব মেরে তিনি দুয়েকটি রত্ন তুলে আনেন, প্রতি ক্ষেত্রেই সেটি কান্না-মেশানো। 'শবনম্,' 'অবিশ্বাস্য', 'শহর্-ইয়ার', 'তুলনাহীনা' তার পরিচয়স্থল।

বর্তমান খণ্ডে গৃহীত দুটি উপন্যাস—'শহর্-ইয়ার' (১৯৬৯) ও 'তুলনাহীনা' (১৯৭৪) লেখকের সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বের রচনা। দুটি উপন্যাসেরই অবলম্বন মানবজীবনের অন্তহীন দুঃখবেদনা। 'দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি'—রবীন্দ্র-প্রদত্ত এই সূত্রকে মুজতবা আলী মান্য করেন। তাঁর উপন্যাস এই সূত্রের সব চেয়ে বড় প্রমাণ। জর্মান সাহিত্যিক জিগিসমুণ্ট ফন্ রাডেকি সংকলিত 'আ বে ৎসে ডেস্ লাখেনস্' (হাসির অ-আ, ক-খ) হাসির গল্পগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে (টুনি মেম' পশ্য) আলী সাহেব লিখেছেন,

> রাডেকি এ-অনুচ্ছেদ শেষ করেছেন এই বলে—'হাস্যরস মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করে।' আমি সম্পূর্ণ একমত নই। হাসির চেয়ে কান্না, আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাদের একে অন্যকে কাছে

টানে বেশী। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এস্থলে একটি সামান্য উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। বৈঠকখানায় বসে শুনতে পেলুম, বাড়ির বউ-ঝিরা রান্নাঘরে কাজ করতে করতে হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসির হিস্যাদার হতে কিংবা কারণ অনুসন্ধান করতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতর ছুটে যাই নে। কিন্তু সবাই যদি একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে অবশ্যই যাই।

[সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী ৩]

পরিহাসের তলায় অনেক বেদনাকে লুকিয়ে রাখার বা বহন করবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল, 'দেশে-বিদেশে' বা 'চাচা-কাহিনী' গ্রন্থ দুটি তার প্রমাণ।

॥ দুই ॥

'শহর্-ইয়ার' উপন্যাসের মুখপাতে লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

আমার আপন ভাগ্নী পর্যন্ত ফরিয়াদ করে, আমার লয়েল্টি-বোধ নেই ; মুসলমান হয়েও মুসলমানদের নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখি নে। এবারে সে বুঝতে পারবে কেন লিখি নে।

মুসলমান মেয়েকে নিয়ে আলি সাহেব দুটি উপন্যাস লিখেছেন—'শবনম্' আর 'শহর্-ইয়ার'। দুয়ের মধ্যে মিল আছে। দুয়েরই নায়িকা অসামান্যা, দুয়েরই নায়ক লেখক স্বয়ং, দুয়েতেই প্রেমের, বেদনাময় কাহিনীর প্রাধান্য, দুয়েতেই রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য, রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-সঙ্গীতে জীবনের ব্যর্থ সাধনার তাৎপর্য আর সান্ত্বনা অন্বেষণ ; দুয়েতেই তত্ত্বালোচনার প্রাধান্য —ঈশ্বরবিশ্বাসীর সত্যান্বেষণের পরিচয়দানের প্রয়াস, দুয়েতেই শিথিল-গ্রথিত কাহিনীতে নায়কের (ওরফে লেখকের) কথার নেশা মাত্রা ছাড়ায়।

তুলনা আর বেশি দূর টেনে লাভ নেই। ফিরে যাই 'শহর্-ইয়ার' উপন্যাসে। নায়িকা শহর্-ইয়ার আধুনিকা মুসলমান রমণী, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ লেখক রাখেননি। তাঁর সৌন্দর্য, বুদ্ধির দীপ্তি, আতিথ্য-পরায়ণতা ও কোমল সেবাপরায়ণতা নারীচরিত্রের ভূয়োভূয় প্রশংসাসূচক বর্ণনা করেছেন লেখক। শহর্-ইয়ার-এর দাম্পত্যজীবনের, তার সুভদ্র বিনয়ী ডাক্তার-স্বামীর নানা ছবি তিনি এঁকেছেন। শহর্-ইয়ার-এর সঙ্গে লেখক-নায়কের সম্পর্ক কী? নায়কের কথায়—'আমার' বোনের চেয়েও বোন, প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়া। তার সঙ্গে নায়কের হার্দিক সম্পর্ক যখন জমে উঠেছে, তখনি ভৃত্য জমীলের কাছ থেকে নায়ক জানতে পারল শহর্-ইয়ার পীর ধরেছে!

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শহর্-ইয়ার-এর ডাক্তার-স্বামী মৃতপ্রায় আর লেখক-নায়ক হতভম্ব। সে কিছুতেই এই অবিশ্বাস্য কথা মানতে চায় না, মনে নিতে চায় না।

> সাধারণতম মুসলমান মেয়েরও নামাজ-রোজার প্রতি যেটুকু টান থাকে সেটুকুকেও ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিলেও যেটুকু থাকার সম্ভাবনা তাও তো আমি শহর্-ইয়ারের কথাবার্তা চালচলনে কখনও দেখি নি। সে নিজেই আমাকে একাধিকবার বলেছে, তার দিল্ তার জান্, তার সবকিছুর এমারৎ দাঁড়িয়ে আছে—চৌষট খাম্বার উপর না—রবীন্দ্রনাথের গানের তিন হাজার গানের তিন হাজার স্তম্ভের উপর। সেখানে গুরুবাদই বা কোথায়, আর পীর সাহেব তো সেই হাজারো স্তম্ভের কোনো একটার পলস্তরা পর্যন্ত নন।

সেটাই তো রহস্য! এই উপন্যাসের রহস্য! এই রমণীর মণি, মমতার খনির রহস্য! বাউলের দেহতত্ত্বগীতে, লালন ফকীরের মারফতী গানে, কি রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতে—কোনোটাতেই শহর্-ইয়ার-এর বিশেষ কোনো মোহ নেই, আর সে কি না পীর ধরেছে!

লেখক এই অসামান্য নায়িকার জীবনের চারটি স্তর দেখিয়েছেন। প্রথম স্তরে বাঙালী মুসলমান ঘরের মেয়ে অবরোধ ভেঙে কলেজে লেখাপড়া শিখেছে। দ্বিতীয় স্তরে সুগৃহিণী, মমতাময়ী সেবাপরায়ণা সঙ্গিনী, রবীন্দ্র-রসিকা; স্বামী থাকলেও সঙ্গিহীনা। তৃতীয় স্তরে পীরশরণাশ্রিতা। পরিণতি চতুর্থ স্তরে—বিদেশযাত্রিণী অন্তঃসত্ত্বা নারী।

শহর্-ইয়ার-এর ডাক্তার-স্বামী থাকে তার গবেষণা নিয়ে। বিশাল নির্জন গৃহে সঙ্গিহীনা সন্তানহীনা স্বামীসঙ্গবিচ্যুতা, শহর্-ইয়ার-এর দিন কাটে কি করে! সে আশ্রয় নিয়েছিল সাহিত্যে সঙ্গীতে—বিশেষ করে রবীন্দ্রলোকে। ঠিক সেই সময়ে নায়কের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়। দিনে দিনে এই আলাপ গাঢ়তর হয়েছে—নায়ক অনুভব করেছে নায়িকার নিঃসঙ্গতা। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অবলম্বন করে নায়ক দিনে দিনে আবিষ্কার করেছে এই অসামান্যা নায়িকাকে। 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ-কুসুম চয়নে' গানের রেকর্ডখানি পরস্পরকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। শহর্-ইয়ার কেবল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরাগিণী নয়, সুগায়িকাও। তার নিজের কথায়—'আমার জীবন-রস রবীন্দ্রসঙ্গীত। ঐ একটি-মাত্র জিনিস।' পর পর যে-সব রেকর্ড শহর্-ইয়ার বাজিয়েছে আর গেয়েছে, তার থেকে এই পরিচয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি', 'আমার নয়ন', 'ঐ মরণের সাগর পারে, চুপে চুপে তুমি এলে', 'কেন চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম না রে', 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না', 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা', 'তোমায়

সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে', 'হাটের ধুলা সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ', 'হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান', 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'—এই সব গান নায়িকার আনন্দ আর বেদনা, নিঃসঙ্গতা আর সজনতা, জীবনানুরাগ আর আত্মখণ্ডনপ্রবণতাকে একই সঙ্গে প্রকাশ করে।

পরমবান্ধবী আর পীর-ভক্ত—শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর দুটি রূপ নায়ককে করেছে বিভ্রান্ত।

> পীর-ভক্ত হওয়ার পূর্বে 'শহ্‌র্‌-ইয়ারের হার্দিক ও দৈহিক সৌন্দর্য একদিনে আমার কাছে স্বপ্রকাশ হয় নি। তার হাসি তার গান, দূর থেকে দেখা তার আপন মনে মনে একা একা তালসারির গা ঘেঁষে ভ্রমণ, আমার বাড়ির দোতলাতে তার আবাস নির্মাণ, মুসলমান রমণীর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তার অভিমান—তার আরো কত শত আহার শয্যাসন-ভোজন, কত কিছুর ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। দিনে দিনে সে আমার কাছে সুন্দরের চেয়ে সুন্দর, মধুরের চেয়ে মধুর হয়ে বিভাসিত হয়েছে। আর আজ? আজ থেকে আবার তাকে নূতন করে চিনতে হবে!

পীর-ভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে দেখে নায়কের বেদনা আর ধন্ধ যায় না। এ যদি নতুন মানুষ হত তবে কোন ভাবনাই ছিল না। পুরনো মানুষকে নতুন করে চেনা বড় বেদনাদায়ী। আর এ-রমণীর সঙ্গে যদি নায়কের সম্পর্ক প্রণয়ের হত তবে তার আজকের অবহেলা অন্যদিনে পুষিয়ে যেত। প্রেম তো পূর্ণচন্দ্র। তাই তার চন্দ্র-গ্রহণও হয়। কিন্তু বন্ধুত্বও শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার মত রাতে রাতে বাড়ে আর চতুর্দশীতে এসে থামে। পূর্ণিমাতে পেঁছিয় না। তাই তার গ্রহণ নেই ক্ষয়ও নেই, কৃষ্ণপক্ষও নেই। তবু—তবু এ বন্ধুত্বের উপর এ কিসের করাল ছায়া? এই চিন্তার অংকুশ নায়ককে বিদ্ধ করেছে। পীর-ভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নায়ক রবীন্দ্র-রেকর্ড বাজাতে বলেছে—'তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।' নায়িকা বাজিয়েছে কিন্তু তার কোন প্রতীক্রিয়া দেখা যায়নি। সে তো আজ রবীন্দ্রগীতলোকে নেই, সে চলে গেছে সুফীপীরের দরবারে! রাতের আঁধারে নায়ক শুনেছে শহ্‌র্‌-ইয়ার অতি মধুর কণ্ঠে গাইছে জপগীতি—আরবী দোহাঁ -'ইয়া লতীফুল্‌। তুফ্‌বি না। নাহ্‌নু' বিদক্‌/কুল্লি না।' (হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য আমাদেরকে দাও। আমরা তোমার পূজারী, আমরা সকলেই।)

পীর-ভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নায়ক যতই দেখে ততই অবাক মানে। তাকে সে যতটা জানে, তার ডাক্তার স্বামী যতটা জানে, ততটাই সম্পূর্ণ জানা নয়। অনাত্মীয় অপরিচিত মানুষের (ভূতনাথ খান) চোখে শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর যে পরিচয় পেল তাতে সে বিস্মিত হয়! শেষোক্তজনের কথায়—শহ্‌র্‌-ইয়ার

'অগ্নিশিখা'। পীর-ভক্ত শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নায়ক বার বার রবীন্দ্র-ধর্মসঙ্গীতের আনন্দ অনুধাবন করাতে চেয়েছে, সে ম্লান হেসে জানিয়েছে—ঐসব গানের রেকর্ড তার বুকের ভিতর আর সাড়া জাগায় না।

উপন্যাসের অন্তিম অধ্যায়ে শহ্‌র্‌-ইয়ার দীর্ঘ পত্র মারফৎ জানিয়েছে তার মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাস—তার দাম্পত্যজীবনের ট্রাজেডি—তার নিঃসঙ্গ নারীজীবনের বেদনাজীর্ণ কাহিনী। রবীন্দ্র-ধর্মসঙ্গীত আর তাকে টানে না, একথা স্বীকার করেও শহ্‌র্‌-ইয়ার রবীন্দ্রনাথেরই শরণ নিয়ে তার সমস্যার বিবরণ দিয়েছে—'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম'। জানিয়েছে, সে ঠিক ঠিক জানে না তার কিসের ব্যথা, অভাব কোন্‌খানে, যার ফলে বিলাসবৈভবের মাঝখানেও যেন কোনো এক অসম্পূর্ণতার নিপীড়ন তাকে অশান্ত করে তুলেছিল। শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর সমস্যাটা কী? তা হল—পুরুষমানুষ কি কখনো নারীর মন বুঝতে পারে, চিনতে পারে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে? শহ্‌র্‌-ইয়ার তার জীবনে শূন্যতার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছে অতি নিপুণভাবে। পুনর্বার রবীন্দ্রনাথেরই শরণ নিয়ে জানিয়েছে তার পরিস্থিতি—'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার / সম্মুখে ঘন আঁধার / পার আছে কোন্‌ দেশে। /··· হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা / চলেছে নিরুদ্দেশে। / পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায় / কী আছে শেষে!' শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর তীক্ষ্ম আর্ত জিজ্ঞাসা—মেয়েদের এই শূন্যতা, দীনতা, ফ্রস্‌ট্রেশনের জন্য দায়ী কে! অন্ধ ঐতিহ্য-আনুগত্য নষ্ট করে দিয়েছে তার দাম্পত্য-জীবন, তার ব্যক্তি-জীবন। মুক্তি তবে কোন্‌ পথে? পীরের শরণ নিয়েছে সে। এ তার পরিবর্তন নয় নবজাগরণ। সে নিরাশাবাদী নয়—জীবনকে ঢেলে সাজতে হবে নতুন করে—এ বিশ্বাস তার আছে। 'রূপনারাণের কূলে/জেগে উঠিলাম/জানিলাম এ জগৎ/স্বপ্ন নয়': রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কবিতা এই অসামান্যা নায়িকার কাছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে, কেবল একটিমাত্র শব্দ সে বদলে নিয়েছে—রূপনারায়ণের 'কোলে'।

শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর এই বিশ্লেষণমূলক দীর্ঘ পত্র তার জীবনের টেস্টামেণ্ট। লেখক-নায়ক ধীরে ধীরে নিপুণতার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন এই নায়িকার জীবনের তিনটি স্তর। আর—তারপর চতুর্থ স্তর—ওস্তাদের মার অন্তিমে—শহ্‌র্‌-ইয়ার-এর সঙ্গে ডাক্তার-স্বামীর ভুল ভেঙেছে—আগুনে পুড়েছে ট্রাডিশনে মোড়া পাষাণদুর্গ (স্বামীগৃহ)—শেষ হয়েছে স্বামীসঙ্গ বিচ্যুতার জীবন—স্বামীর সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা শহ্‌র্‌-ইয়ার এসেছে, চলেছে নবজীবনের সন্ধানে—সুইডেনে। সেখানে গিয়ে সে কি পাবে নির্জনতা? আবার দেখা হবে তো? নায়কের দুটি প্রশ্নের উত্তরে শহ্‌র্‌-ইয়ার ক্ষীণ কণ্ঠে জানিয়েছে—'কী জানি, কী হবে।'

জীবন অনন্ত রহস্যময়—কে জানে কী হবে?—'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার/

সম্মুখে ঘন আঁধার/পরে আছে কোন্ দেশে।/……হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা/ চলেছে নিরুদ্দেশে। /পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায় / কী আছে শেষে!' উপন্যাসের নায়িকার জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এতো সার্থক ব্যবহার আমার আর জানা নেই।

॥ তিন ॥

লেখকের সর্বশেষ উপন্যাস 'তুলনাহীনা'র পটভূমি খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েকটি মাস, পটভূমি—প্রত্যক্ষে কলকাতা, আগরতলা, শিলং; অপ্রত্যক্ষে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান—ইয়েহিয়ার বুটের তলায় নিষ্পেষিত পূর্ব-পাকিস্তান—আজাদীর জন্য অপেক্ষারত রক্তস্নাত বদ্ধমুষ্টি পূর্ব-পাকিস্তান। সম্প্রতিকালের চড়াসুরে-বাঁধা সাংবাদিকতাশ্রয়ী উত্তেজক ঘটনাবলীর বিবরণ নয়, সাহিত্যের সৃষ্টিরূপে হাজির হয়েছে 'তুলনাহীনা'। এ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হিন্দু—কীর্তি চৌধুরী আর শিপ্রা রায়। সৈয়দ সাহেবের চারটে উপন্যাসই নায়িকা-প্রধান। 'তুলনাহীনা'র নায়িকা আর এক অসামান্যা নারী, যার ব্যক্তিত্বের প্রভায় সবাই মুগ্ধ, আলোকিত, ত্রস্ত, বিমূঢ়। শিপ্রা কলকাতার খানদানী উঁচু মহলের সোসাইটি-লেডি, বেয়ারাদের কথায়—'খাঁটি মিসিবাবা'। পবিত্র মহরম মাসে ইয়েহিয়া খুনখারাবী করতে ইতস্তত করতে পারে: এই ভুল ধারণার উপর কলকাতা-আগরতলা-শিলঙের অনেক হিন্দু-মুসলমান নির্ভর করেছিল। সকলেরই শিকড় আছে পূর্ব-পাকিস্তানে। কিন্তু সব ধর্মভীরু মুসলমান আর হিন্দুদের সব আশাভরসা নির্মূল করে বজ্রের মতো নেমে এল পঁচিশে মার্চের 'ক্র্যাক-ডাউন'। এই রক্তাক্ত পটভূমিটি এখানে প্রত্যক্ষে নেই, তবু দূর থেকেই তার প্রভাব পড়েছে ভারতের সর্বস্তরে সকল মানুষের উপর।

আলি সাহেবের সব লেখার মতই এ উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ হাজির। বস্তুত তাঁর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বগ, সর্বশক্তিমান। প্রেমিক কীর্তি চৌধুরীর (শিপ্রার সিলেটী ভাষায় আদরের ডাকে 'কিতা') সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিতা শিপ্রা অপেক্ষা করছে শিলঙে। অপেক্ষা করে করে শিপ্রা যখন ধৈর্যের শেষ সীমানায় তখনি এল কীর্তি আগমন-সংবাদের 'তার'। আর তখনই লেখক পেয়ে গেলেন মোকা—এসে গেলেন রবীন্দ্রনাথ—শিলঙ আর দার্জিলিঙের তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে—'দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে। একটা খদ্দর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।' রবীন্দ্র-কবিতায় বর্ণিত শিলঙকে প্রতীক্ষার অবসান' শেষে নায়িকা লাইনে লাইনে মিলিয়ে নেয়—'এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়', এখানে 'বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে'। মেঘ আর রোদের, আলো আর ছায়ার

লুকোচুরির খেলা দেখছিল শিপ্রা শান্ত প্রতীক্ষায়—পাইনের শীর্ষ পল্লবের মৃদু আন্দোলন আর টুকরো নীলাকাশ।

'তুলনাহীনা' প্রেমের উপন্যাস। রবীন্দ্র-নিষ্ণাত লেখকের কলমে সৃষ্ট উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কথা। কেবল রঙ্গস্থলের আকস্মিক সাদৃশ্য দেখে একথা লিখছি নে, প্রেমালাপনেও ও বন্যা-মিতার (লাবণ্যঅমিত রায়) কথা মনে পড়ে যায়। কীর্তিকে শিপ্রা আদর করে কখনো ডাকে 'কিতা', কখনও-বা 'মিত্তা'। শিপ্রা কীর্তিকে সেই অধরা প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছে যে বাঁধনে অমিত রায় বাঁধতে চেয়েছিল লাবণ্যকে, তফাৎ এইখানে, লাবণ্য অমিতের প্রেমে শেষ ভরসা রাখেনি, কীর্তি শিপ্রার প্রেমে তা রাখতে চেয়েছে। রবীন্দ্র কাব্য আর উপন্যাসের ভাষার স্বাদ পাই মুজতবা আলির উপন্যাসে—

> আলিঙ্গন ঘনতর করে বাষ্পভরা কণ্ঠে কীর্তি বললে, 'এই তো আমার অক্ষয় সম্পদ। তোমার প্রেমই আমাকে দেখিয়ে দেবে পথ, ভরে দেবে আমার বুক সাহস দিয়ে, আর সবচেয়ে বড় কথা—আমার মত অপদার্থকে করে দেবে কর্মনিষ্ঠ। যেখানেই যাই না কেন, যেতে যেতে যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ি না কেন, তোমার কথা ভাবলেই পাবো নবীন উৎসাহ।' (তুলনাহীনা, দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ অধ্যায়)

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! শহর্-ইয়ার তার শেষ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের যে প্রেমগীতির শরণ নিয়েছে, শিপ্রা রায়ও বিদায়বেলায় সেই গানেরই শরণ নিয়েছে (তুলনাহীনা, দ্বিতীয় খণ্ড, একাদশ অধ্যায় পশ্য)। অথচ দুজনের সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতিতে কত ব্যবধান! আর এই ব্যবধান সত্ত্বেও দুজনে একই ধাতুতে গড়া। দুই নায়িকার বক্তব্য উপস্থাপন-রীতি কত আলাদা, তবু একই গানেরই ব্যবহার।

শহর্-ইয়ার-এর উক্তি :

> আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশ ভাল করেই চিনি।···তাঁর শেষের দিকের গানের একটিতে হুট্-স্টাফের কিঞ্চিৎ পরশ আছে : 'বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন্ হল। /করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো॥' আর বার বার বলছেন 'পিয়ো হে পিয়ো।' সর্বশেষে বলছেন, আমার এই তুলে-ধরা পানপাত্র চুম্বনের সময় তোমার নিশ্বাস যেন (আমার) নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যায়। এই যে প্রিয়ার 'নবীন উষার পুষ্পসুবাসে'র মত নিশ্বাস, একে নিঃশেষে শোষণ করার মত সাব্লাইম কাম আর কী হতে পারে?'

অন্যদিকে অফুরন্ত আদরে কীর্তিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে যে নায়িকা, সে-ও শরণ নিয়েছে একই গানের—

> কীর্তির ঠোঁটের কাছে এনে তার নিশ্বাস শিপ্রা আপন নাক দিয়ে নিঃশেষে শুষে নিয়ে গুনগুন করে গাইলে, 'আমাতে মিশাক্ তব নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্প সুবাস—' বার বার। তারপর আবার বার বার 'বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হ'ল, হে প্রিয়/ করুণ মম অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো।' তারপর কীর্তনিয়া রীতিতে বার বার আখর দিলে, 'অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো।' মাঝে মাঝে থেমে থেমে কীর্তির নিশ্বাস নিঃশেষে শুষে নিয়ে আপন বুক ভরে নেয়—তার শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই।

'তুলনাহীনা' উপন্যাসের শেষে ইয়েহিয়ার বর্বর আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াবেই, দাঁড়াবে, এই আশ্বাস উচ্চারিত হয়েছে, শিপ্রার রোমান্টিক প্রেম কীর্তিকে পেয়ে ধন্য হবে, সুখদ পরিণামেরও ইঙ্গিত আছে। শহর্-ইয়ার-এর ইন্‌টেলেকচুয়াল বিশ্লেষণ প্রবণতা শিপ্রার নেই, কিন্তু কীর্তির কথায়—"তুমি সত্যি শিপ্রা—শব্দটি এসেছে ক্ষিপ্রা থেকে, অর্থাৎ যে দ্রুতগতিতে চলে। তুমি প্রথম যেদিন আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি—কেউ-দেখলো-কেউ-না—প্রসন্ন স্মিত হাস্যের আভাস দিয়েছিলে"—সেদিনই শিপ্রা জেনে নিয়েছে কীর্তিকে। বাংলাদেশের শেষ বিজয়ের আশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে কীর্তির জন্য শিপ্রার ভালবাসা। 'শিশুর মত সরল চোখে তাই (কীর্তি) দেখতে পেল, সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি।'

দুটি অসামান্যা নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন আলি সাহেব 'শহর্-ইয়ার' আর 'তুলনাহীনা' উপন্যাসে। এ দুটি উপন্যাস পড়ে কোন পাঠক বা পাঠিকা যদি ঠোঁট উল্টে বলেন, 'বড্ড বেশী রবীন্দ্রনাথ', তাহলে অনুমান করি, সৈয়দ মুজতবা আলি, শহর্-ইয়ার-এর মতই কবুল করবেন, "ঐ তো আমার দোষ! কোনো কিছু বলতে গেলেই আমার রসনায় এসে আসেন নেয় রবি ঠাকুর, কালিদাসের রসনায় যে-রকম বীণাপাণি আসর জমিয়ে মধুচক্র গড়তেন।"

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তুলনাহীনা

খান সেনাদের হাতে নিহত
আমার পরম স্নেহের ভাগ্নে
ওয়ালীর স্মরণে…

"লে, চ', ঝপ্ করে আরেকটা গিলে ফেল্।"

"না, দাদা। আমার আর সইছে না।"

"ঐ তো তোদের দোষ। হুইস্কি, হুইস্কি আর হুইস্কি। স্কচ্ হুইস্কি। ভগবানের যেন খেয়ে-দেয়ে অন্য কোন কর্ম ছিল না। তাঁর কুল্লে রস ঢেলে দিলেন ঐ ধেধেবড়ে পাহাড়ে স্কটল্যাণ্ডের খাজাদের মধ্যিখানে। আরে ব্যাটা ঐটেই যদি দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা মাল হত তবে ঐ খেয়ে ওদেশের লোকগুলো দুনিয়ার সেরা সেরা কেষ্টবিষ্টু হল না কেন? বাবুরা তো এখনো ইংরেজের গোলাম। ওদিকে দেখ্, ফরাসীদের। গুণীনদের জাত। খায় দুনিয়ার সব চেয়ে সেরা মাল,—বর্দো, বর্গাণ্ডি, শ্যাম্পেন্। নাচে, গানে, প্রেমে—"

কীর্তি বাধা দিয়ে বললে, "বাঁচালে, সুদিনদা, তুমি তো জানো, আমি হপ্তা দু'তিন ধরে—"

"একটি জান্-খুশ, দিল-তরুর্ পরীতে মজেছিস। তা বেশ, তা বেশ, তা বেশ। অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে কি না আস্ত একটা আস্ত ভলকানো। তা বেশ, তা বেশ!"

এই আমাদেরই গানে গন্ধের চেয়ে গণগন্ধে ভরা কলকাতারই একটি অতি বিখ্যাত বার্-এর সুমুখে দুটো দেড় গজী স্টেনলেস্ চোঙার লাল মুণ্ডুর উপর বসে দুই ইয়ার পঞ্চ মকারের শ্রেষ্ঠতম যে "ম"টি সর্ব বার্-এ খুশ্বায়ে ম ম করেন তারই সেবা করতে করতে মধ্যমণি তৃতীয় "ম"-এর আলোচনা-চরে নৌকো ভিড়িয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ করে দুজনাই ক্ষণতরে বার্-এর গর্ভদেশের প্রতি প্রীতিপ্রসন্ন নড্ করলেন। কারণ বার্-এর বারাঙ্গনা কও আর বরাঙ্গনাই কও, বার্-মেড্ শ্রীমতী বেয়াত্রিচে ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন, দুনো ইয়ারের গেলাস তলানিতে এসে ঠেকেছে এবং সেটা যে তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন তারই স্বীকৃতিস্বরূপ মোলায়েম মৃদুহাস্য মুখে মাখলেন। হেস্টিংস্ হার্ডিঞ্জের লীলাভূমি মহানগরীর মহা-বার্-এর মহারানীর এতখানি দূরদৃষ্টি ও পরাভাব-কাতরতা অবশ্যই আছে যে, এই খানদানি বার্-এ কোনো মেহমানকে কোনো কিছু নিজের থেকে চাইতে হয় না—তা সে "আই সে মিস্" বলে তাঁকে ডাক দিয়ে কিংবা শূন্য গেলাসের উপর ঠংঠাং করে জলতরঙ্গ বাজিয়ে;—এমন কি উচ্চ মঞ্চাসনের সামান্যতম উস্খুস দ্বারা আপন অস্বস্তিটা প্রকাশ করে কোনো মেহমানকে কস্মিনকালেও সিন্নোরীনা বেয়াত্রিচের নেকনজর আকর্ষণ করতে হয় নি। সে-পরিস্থিতি, সে-ইন্কিলাব্ ঘটবার বহুপূর্বেই বেয়াত্রিচে নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা করবেন। সে আত্মনাশ জাপানী হারাকিরি প্রতিষ্ঠানের চেয়েও স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংভূ।...কবে, কবে সেই ফির্পো পেলিত্তি, তার পূর্বেকার স্পেনসার-এর আমলে এ দেশে এসেছিলেন বেয়াত্রিচে গোষ্ঠীর প্রথম মহিলা। বসন্তসেনাশ্রেণীয়া মনোরঞ্জনী, চিত্তহারিণী এ-পরিবার—বংশানুক্রমে।

এখনো আমাদের এই সমসাময়িক বেয়াত্রিচে বিপদে-আপদে উৎসবে-ব্যসনে সুদিনদা এবং তার পাঁচো ইয়ারের সম্মানরক্ষার্থে তাঁদের পার্টির মক্ষিরানীর রূপে সেখানে ত্রিযামা যামিনী যাপন করে আসেন। তাঁর এখন বয়ঃসন্ধিকাল, অবশ্য কিঞ্চিৎ ভিন্নার্থে; তিনি যৌবন আর ভরা যৌবনের মাঝখানে। আমাদের ইতিহাসে তিনি পরিপূর্ণ "স্টার" না হলেও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুল্লেখার মত বার বার আমাদের সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে যাবেন।...তাই এই বেলাই তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা বলে নিতে হল।

"আবার দেব?" কিংবা "ইয়েস্ প্লীজ?" বাঁধা গতে বেয়াত্রিচে ফ্যালনা বার্-মেডের মত খদ্দেরদের সম্মুখীন হন না। সামান্যতম মৃদুহাস্য দিয়ে জানালেন, "এই যে?" অর্থাৎ "জানি। কি চাই, কখন চাই, জানি। আসছে।"

দুই ইহারও মানানসই স্মিতহাস্য না-বলা থ্যাংকু জানালেন।

ছিঁড়ে যাওয়া রসালাপের রিপুকর্মটি করতে করতে কীর্তিনাশ চৌধুরী ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে, "সুদিনদা, তুমি মাইরি আমার চেয়ে আর ক' বছরের সিনিয়ার? আমাকে যা বলতে চাও সোজাসুজি কইলেই পারো। 'আস্ত একটা ভলকানো' কথাটার মানে কি? মিস্ শিপ্রা ভোরের শিশির-ভেজা শিউলিটি নন সে তো তুমি জানো আমার চেয়েও বেশী। আর পাঁচজনের তুলনায় তুমি তাঁকে কতখানি বেশী জানো—" কিঞ্চিৎ গলা খাঁকারির পর—"মানে, ইয়ে, কত দিক দিয়ে সেটা অবশ্য আমার অজানা, কিন্তু অশ্রাব্য হবে না, ভরসা আছে। তুমিই তো, বাপু, আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে তাঁর সঙ্গে।"

সুদিন চৌধুরী: "অপরাধ করেছিলুম কি? চুপ করে রইলি যে? এবং এই চুপ করে থাকাটাই সদুত্তর। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে গভীরতম সত্য লুকনো আছে। এই যে তোদের পোয়েট রবিবাবু গেয়েছে,

'দেখা হয়েছিল, তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে—'

কেন বাপু, 'শুভ লগনে' বললে অপরাধটা কি হত? অ। তা হলে তেনার অরিজিনালিটি থাকতো কোথায়?—তাই না? যেদো-মেদো, এস্তেক মুসলমান-দের গাঁইয়া পোয়েট বসিরুদ্দী মৃদম খাঁ তক 'শুভ লগন'টা এ্যাসন জাবড়ে ধরে আছে যে ঠাকুর-বাড়ির তেতলার কবি, রাজপুত্তুর দ্বারকানাথের নাতি, আগাপাস্তলা একটা নয়া ধর্মের ভগীরথী দেবেনঠাকুরের নন্দন নোবেল ঘোড়ার রেসে পয়লা নম্বরী সওয়ার তিনি ঐ হাজাপচা 'শুভলগন'টা এস্তেমাল করেন কি প্রকারে? না? কিন্তু তা নয়। এ-উত্তরটা অতি রদ্দি মার্কা প্রোলেতারিয়ার যা-তা উত্তর। আসলে ঐ যে যেতে যেতে পথে দেখাটা হয়ে গিয়েছিল তার ফলে হল প্রেম,—পূর্বরাগ, অনুরাগ, চুম্বন, আলিঙ্গন-এটসেটরা-গয়রহ-ইত্যাদি,

কিন্তু সে-সব থাক্। ওসবের কথা তুললে কফি হৌসের তরুণরা তেড়ে আসে। প্রেমের এসব বস্তাপচা প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতি এখন যাদুঘরের মাল—মুাজিয়াম পিস্। হক্ কথা। কিন্তু দাদা, তার সঙ্গে সঙ্গে যে-বিরহ, হুস্ করে বিবিজান তোমাকে ঠাঠা রোদ্দুরের রাঁদেভুতে ছিবড়েটার মত ফেলে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলেন লেকচারারটার সঙ্গে সিনেমায়—আরো কত কী, সেগুলো কি "শুভলগনে" দেখা হওয়ার সিম্‌টম্? মোটেই না। মিলনের চুম্বন = শুভ-লগন + রাঁদেভুতে কর্ণমর্দন = অশুভ লগন। একুনে, মহালগন।

তোকে যে ম্যাডাম শিপ্রার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম সেটা মহালগন। শিপ্রাপারে পেঁৗছে গেছিস, আর তোর মাথাব্যথা কিসের। শিপ্রা তো মধ্য-প্রদেশে? না? ঝেড়ে দে না একখানা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম ঐ প্রভিনসের টুরিস্ট ব্যুরোকে। ব্যস্। তবে হ্যাঁ, ওদের প্লেজার ট্রিপ লাঞ্চে আকছারই যাত্রী থাকে দেদার।

তা সে যাক্ গে। কথা হচ্ছিল,—"

আখ্-খ্-খ্। শাস্ত্রালোচনায় অহরহ বিঘ্নবিপত্তি!

কি ব্যাপার?

বারু-টার পাশেই ডাইনিং-ডান্‌সিং-কাবারে এই তিন প্রকারের আনন্দভবন মিলিয়ে ঢাউস এক জলসা-দরবার। বারু-এ তো মেয়েমদ্দে গিসগিস করছিল, সে তো প্রায় উদয়াস্ত লেগেই আছে। কিন্তু নবাব খাঞ্জা খাঁর আসল রঙ-মহল পাশের সেই পঞ্চরঙ্গের শ্রীরঙ্গমে একবার কেউ সম্মুখ সংগ্রাম লড়ে সে-ভিড়ে প্রবেশ করতে পারলে সে-ব্যক্তি আর কস্মিনকালেও বলবে না, কলকাতার বাস্‌গুলো বড্ড ক্রাউডেড। আপনি শক্তসমর্থ জোয়ান মদ্দ মানুষ—আপনার নিতম্ব নিমর্দিত হবে মুহুর্মুহু। আপনি ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানেন—আপন রিজার্ভড টেবিলে পেঁৗছতে না পেঁৗছতে আপনি দলিত মর্দিত পিষ্টিত এবং আলিঙ্গিত হবেন কেরালার তন্বী শ্যামা থেকে আরম্ভ করে, নর্ডিক ব্লন্ডিনীগণের অকৃপণ সহযোগিতা পেরিয়ে সর্বশেষে পুঞ্জীভূত মাংসাধিকারিণী মার্কিনীদের সঙ্গে অগুন্তি কলিশন লাগিয়ে লাগিয়ে নব নব রেকর্ড নির্মাণ করে করে।

সেখানে লেগেছে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়া এক ধুন্ধুমার।

আমাদের দুই ইয়ার এসব ব্যাপারে সচরাচর নির্বিকার। বলতে গেলে এরা এবং এদের গণ্ডা দুই দোস্ত মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাঁটতে শিখেছেন এই জলসাঘরেরই মার্বেল পাথরের মেঝের উপরে।

কিন্তু আজ ভিন্ন গীত।

কাইরো না বেইরুৎ কোথা থেকে এসেছেন সদলবল এক বিশ্ববিজয়িনী নর্তকী। উর্বশী মেনকা থেকে আরম্ভ করে ইজাডরা ডান্‌কান্ আনা

পাভলোভা তক আবহমান কাল থেকে আর সবাই নেচেছেন দু-খানা পা দিয়ে, কিন্তু এই দিগ্বিজয়িনী নাচবেন পেট দিয়ে। সোনার পাথর বাটিও বুঝি কিন্তু, কিন্তু—পেট দিয়ে নাচ!

সাপ হাঁটে পেটের উপর দিয়ে কিন্তু সেও তো দেখি নাচের সময় পেটের তোয়াক্কা না করে নাচে কাঁধ দিয়ে, ফণা দিয়ে, কোমর দিয়ে, ল্যাজ দিয়ে, যদিও সাপের পেটটা তার দেহের আগাপাস্তলা জুড়ে। আর যদি ভাবার্থে নেন তবে এই সেই উদরসর্বস্ব ফিরিঙ্গি জাত, সেও তো পাক্কা দু'শটি বচ্ছর এ দেশের চাষাভুষোর অন্ন মেরে আপন পেট ফাটিয়ে দিলে, কিন্তু কই, তাকেও তো কখনো ঐ দুনিয়া-খেকো পেট দিয়ে নৃত্যের তালে তালে মা মহারানীর বন্দনা করতে দেখি নি!

যে কলকাতার তাবল্লোক পাঁচপেয়ে বাছুর দেখার তরে রিস্টওয়াচ গচ্ছা দিয়ে রেস্ত যোগাড় করে তারা আসবে না হন্দমুদ্দ হয়ে এই বেলি-ডান্স্, ঔদরিক নৃত্য পেটভরে দেখতে!

দুই ইয়ার ঐ উত্তাল জনসমুদ্র উল্লঙ্ঘন অসমীচীন বিবেচনা করে যোগাড় করলেন একখানা উচ্চপদী চেয়ার। তার উপর দাঁড়াতেই স্পষ্ট দেখা গেল নাতিবিস্তীর্ণ নটমঞ্চ।

তখনো উচ্ছেভাজার পয়লাপদ শেষ হয় নি। অর্থাৎ নটরাজ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নন্দীভৃঙ্গী দু কদম আনাড়ি নৃত্য নেচে নিচ্ছেন। তখন বোঝা গেল, হট্টগোলটা উঠেছিল বিরক্তি এবং কথঞ্চিৎ উষ্মা বশতও বটে—এসব হাবিজাবির ঠেলায় মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গেল, আসল মাল বের করবে কখন? এরা কি পিত্তি না চটিয়ে খেতে জানে না?

হঠাৎ সব আলো ক্ষণতরে নিভে গেল। পাঁচ নাগর তার ফায়দাটা ওঠাবার পূর্বেই নন্দনকানন থেকে নেমে এল এক শ্যাফ্ট্ নীল আলো। আবছা আবছা দেখা গেল যেন সমুদ্র থেকে ভেসে উঠছেন মরুভূমির স্ফিন্ক্স্, কিন্তু, তন্বঙ্গী নারীরূপিণী এবং দেখা-না-দেখার আলোছায়ার ইন্দ্রপুরীর যেন ইন্দ্রধনু।

সে আবেশ কাটতে না কাটতেই আরো অকস্মাৎ কি হতে কি যেন হয়ে গেল। হলসুদ্ধু তাবজ্জন যেন বানের জলে হাবুডুবু খেতে লাগল। নাঃ! তেমন কিছু একটা প্রলয়ঙ্করী ব্যাপার নয়। মাত্র গণ্ডা দশেক সূর্য যেন জলসাঘরের মধ্যিখানে যেন একটা এটম বমের মত ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তারই আচমকা ধাক্কায় তাবৎ পেট্রন-পেট্রনীদের চোখের মণি গেছে উল্টে—সেঁধিয়ে গেছে ভেতর বাগে।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে নটরানী—সেই বন্যার উপরে স্টেজের মাঝখানে।

সম্পূর্ণ নিশ্চল। চোখের পাতাটিতে পর্যন্ত কম্পন শিহরণ স্পন্দন কিছু

না, কিচ্ছুটি নেই। কিন্তু ঐ নিশ্চলতা থেকে সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন্ এক চুম্বন সঙ্কলের দৃষ্টি টেনে নিয়ে গেল নটরানীর নাভিকুণ্ডলীর দিকে।

টগর ফুলের পাপড়ি কোমর বেঁকিয়ে যেন সর্বাঙ্গে পাক খেয়ে ঢলে পড়ে পাশের পাপড়িটির উপর, তিনি ফের তাঁর সখীর উপর এবং এই করে করে মাঝখানের স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে সব কটি সখী যেন নেচেই যাচ্ছেন, নেচেই যাচ্ছেন একে অন্যের পিছনে—আমৃত্যু সে রাসনৃত্য!

নটরানীর নাভিকুণ্ডলীটি যেন টগরিনীদের রানী।

ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র নটরানীর নাভিটি; কেন্দ্র বিন্দুটি। আর সেই বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে হুবহু টগরের পাপড়ির মত মাংস বলুন, পেশী বলুন একের পিছনে আরেকটি যেন নেচে চলেছে চক্রাকারে। নাভিকুণ্ডলীর দ'য়ে যেন ক্রমাগত পাকের পর পাক খেয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগঠিত পেশী-পাপড়ি।

টগরের পাপড়ি নাচে এক জায়গায় ধীরস্থির দাঁড়িয়ে। এ-স্থলে তা নয়। এ-নারীর কুণ্ডলী-পাপড়ি পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত। এরা একে অন্যের পশ্চাতে কভু দ্রুত কভু মন্দ লয়ে যেন চটুল পদক্ষেপে পটীয়সী রাশান বাল্-এ নর্তকীর মত নৃত্যে নৃত্যে চক্র রক্ষা করে।

নাভিকুণ্ডলী নিয়ে এ-হেন ভেলিকবাজী দেখানো যে সুকঠিন, সুকঠিন কেন, অসম্ভব সে তত্ত্ব যে-কোনো মাস্‌ল্-ডান্‌সার কসম খেয়ে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু এহ বাহ্য, আগে গিয়ে পূর্ণ সত্য অনুভব হয় তখন, যখন রাত-কানা জনও হঠাৎ লক্ষ্য করে যে নটরানীর বাদবাকি সর্বাঙ্গ নিশ্চল, নিষ্কম্প প্রদীপশিখাবৎ। বস্তুত ঐ যে ওটা গতিশীলা নির্ঝরিণী নয়, নিতান্তই সীমাবদ্ধ নিস্তরঙ্গ নিষ্প্রাণ সরোবর, অর্থাৎ দ'য়ের পাকচক্রে না থাকলে মনে কোনো দ্বিধারই উদয় হত না—'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, প্রতিমা নিশ্চয়।'

কীর্তিনাশ ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, "হুঃ। এ তো স্রেফ হুনুরির একটা কৌশল! এতে আর্ট কোথায় জানেন শুধু কুবের কুল মেড়ো গুষ্টি। পেরেকের বিছানার উপর শুয়ে শুয়ে কাটান যাঁরা বর্ষা-বসন্ত তেনারা তা হলে এ মহাপ্রাসাদের বিজয়িনী মিশরিনীর চেয়ে হাজার দফে গুনীন পাভলোভা-শঙ্করের গুরুর গুরু। হবেও বা। নইলে এ-মহফিলের চাঁইসব মেড়োরা এখানকার নাভিকুণ্ডে স্নান সেরে নাক বরাবর ধাওয়া করবেন কেন পেরেক শয্যাশায়ী গুরু মহারাজকে ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম জানাতে? ধন্যি, বাবা, তোমাদের আর্ট, নৃত্যকলা,—উর্বশীমার্গে মোক্ষলাভের চতুর্থ মার্গ!"

ইয়ার সুদিনদা ঢের ঢের উঁচু দরের খলিফে। কীর্তিনাশের পাঁজরে কনুই দিয়ে একখানা সরেস গুত্তা মেরে বললেন, "ওরে আচাভুয়ো' চাটচিস হুইস্কির বোতলটা, আর শুধোচ্ছিস এতে আবার নেশা কোথায়? সবুর কর এক লহমা। এখখুনি তেড়ে আসবে উড়ের হাত থেকে হোজের জলের তোড়ের মত রসের

মুগুর। কালবোশেখীর ঝড়ের আগে, দেখেছিস তো থমথমে ভাবখানা? তার পর লাগে বটগাছের মগডালে এ্যাট্টুনটুন কাঁপন। উপস্থিত শুরু হয়েছে তারই যেন দোহার। দাঁড়া না, হুড়মুড়িয়ে ঝড় নামলো বলে।"

একদম করেক্‌ট্‌ আবহাওয়ার পূর্বাভাস। বেতারকে টিট দিয়ে।

তবে হ্যাঁ, আলবৎ, ঝড়টা হুড়মুড়িয়ে নামে নি। নামলো ধীরে মন্থরে। কিন্তু দিগ্‌বলয় আচ্ছাদন করে।

পুকুরের মাঝখানে ঢিল ছুঁড়লে যেমন সেখান থেকে চক্রটি চতুর্দিকে চক্রাকারে ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হতে থাকে এ-ক্ষেত্রেও হুবহু তাই। নাভিকুণ্ডলীর নৃত্য ডাইনে বাঁয়ে সম্পূর্ণ নীবিবন্ধকে উদ্বেলিত করে তুললো। এদেশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যে-রসকে "বাজুবন্ধ খুল খুল যাওত" রূপে সূত্রে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এস্থলে সে-রসই বাজুচক্র ত্যাগ করে কটিচক্রে সঞ্চারিত হল। নাভিচক্র থেকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হয়ে কম্পন আন্দোলন হল উধর্বমুখী অধোগামী। সর্বদেহে কী আবেগ, কী আবেশ। হৃৎপিণ্ড মুহ্যমান।

পঞ্চেন্দ্রিয়, সর্বচৈতন্যের বিলুপ্তি আসন্ন।

বেয়ারা কীর্তিনাশের কানে কানে বললে, "হুজুর, আপকে লিয়ে বহুত জরুরী ফোন।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

"হ্যালো?"

"হ্যালো। কীর্তি? শোনো—"

এ যে এক্কেবারে নয়া ব্যাপার। কীর্তির হৃদয় দুয়ারে লিলি ডলি বুজু নরগিস মাঝে মাঝে টোকা দিয়েছে বটে কিন্তু সে নিতান্ত হলে হল, না হলে না গোছ—কিংবা অগত্যা ইংরিজিতে যাকে বলে অন্ এ রেনি ডে; আর এ হল ঠিক তার উল্টো, এখানে রেন্ নামলো খা খা খটখটে শুকনো মাঠে।

"তুমি আধঘণ্টাটাক পরে এখানে আসতে পারো?"

"কেন? ব্যাপার কি?"

"মানে? তুমি কি কিছুই বুঝতে পারো না? তোমার কি কখনো বয়স হবে না? কেন, কেন, কেন? মিস্ত্রিকে বুঝিয়ে বলতে হয় কেন তাকে ডাকছি, দর্জিকে ডাকার কারণটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হয়। তুমি কোন্‌টা যে তোমাকে কারণ দেখাতে হবে?"

বেচারা কীর্তিনাশ। এই অবেলায় অকস্মাৎ অযাচিত অনুগ্রহ। এখন কি আর তার সে বোধশক্তি আছে যে কোন্‌টা ঘটে সকারণে আর কোন্‌টা ঘটে দেবতাদের যখন নিতান্তই কোনো-কিছু করবার থাকে না বলে মানৎলি

রিটার্নে "নাম্বার অব্ এ্যাক্শন্ টেকেন" দেখাবার তরে। শিপ্রা তখন দেবতাদের একজন। মূর্খ কীর্তির বোঝা উচিত ছিল, অকারণ অনুগ্রহই অনুগ্রহ।

হঠাৎ অতিশয় মধুরা নিস্তেজ গলায় "কীর্তি, আমার বড্ড লোনলি লাগছে যে। তুমি এসো।"

খুট!

কে বলে কীর্তির নাম কীর্তিনাশ। কীর্তিমান পুরুষ সে। কীর্তিনাশা নদী যখন ঐ বংশের সর্বশেষ সন্তানের সর্বশেষ পুকুরটি (!) পর্যন্ত গ্রাস করে ঢেউয়ের ডাকে ডাকে ঢেকুর তুলছেন তখন জন্ম নেয় এই সন্তান। বংশটা লোপ পেলেই করালী কীর্তিনাশা নদী আপন কৃতিত্বের পরিপূর্ণ সাফল্যলাভের আত্মপ্রসাদ প্রসাদাৎ অবশ্যই একটা কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করতেন যে ভূমি গ্রাস করেছেন তারই কোনো এক ভেসে-ওঠা অংশের বালুচরে। সেটা যখন নিতান্তই হল না তখন শেষ সন্তান কীর্তিনাশ নামের স্কন্ধে পীঠ স্থাপনা করে একাই চৌষট্টি-যোগিনী রূপে উচাটন নৃত্য নেচে যেতে লাগলেন।

ফোন ছেড়ে ভরাপাল তুলে বার-এ ফেরার সময় কীর্তিনাশ আপন পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে মনে মনে বললে, "ছোঃ, আমার নাম কীর্তিনাশ না কচুনাশ। শিপ্রাপুলিন-বিহারী নাগরদের এক ফু মেরে পাঠিয়ে দিলুম পদ্মার হে-পারে। সুদিনদাটা একদম বুড়বক্! বলে কি না, ছুঁড়িবুড়ির দোআঁশলা না কি যেন। যে রমণীর চতুর্দিকে অষ্টপ্রহর কবি সাহিত্যিক ফিলিমস্টাররা ঘুর ঘুর করছে, যার জিরোবার তরে একলহমা ফুরসৎ নেই সে-মেয়ে ফীল করছে লোনলি। তার হৃদয়টা অত সহজে ভরে না। সুদিনের কথার কোন মানে হয় না।

বার বার কীর্তিনাশের বুকের রক্তে রিনিরিনি করে বেজে উঠছে "আমি লোনলি"—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বচৈতন্যে ছড়িয়ে পড়ছে গভীর এক প্রশান্তি।

আবার তার মন ভরে জেগে উঠলো, "আমি লোনলি।" কেমন যেন মনের ভিতর হঠাৎ কে যেন একটা ইয়া লম্বা বিজয়-পতাকা খাড়া করে খটাস করে মিলিটারি কায়দায় তাকে একটা সেলুট ঠুকে জানালে সে বীর, সে বিজয়ী; শিপ্রা মহারানী ভিক্টরিয়ার স্বয়ংবরে সে প্রিন্স্ এলবার্ট। কে না জানে ইয়োরোপের সর্বদেশের রাজপুত্রেরা তখন জমায়েত হয়েছিলেন লণ্ডনে যে যার রাজাড়ম্বর নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে কীর্তিনাশের বুকের ভিতর কে যেন বলে উঠলো, "ছিঃ! এ কি কথা! এটা কি আলিপুরের ঘোড়দৌড় যে তুমি পয়লা নম্বরী হয়েছ বলে দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না—ফারাক শুধু এইটুকু, ঘোড়ার চারটে পা, তোমার দুটো।"

কে বোঝে এই সামান্য সত্যটুকু? ইহ সংসারের সুদূরতম প্রান্তে একটি রমণী—হোক সে সুন্দরী সদাচার, হোক সে উপেক্ষিতা কদাকার—তার জীবন

যেন হঠাৎ অর্থহীন হয়ে গিয়েছে, মহাশূন্যে সে যেন হঠাৎ একা, সে লোনলি। সে তখন স্মরণ করলো তোমাকে। "তোমাকে স্মরণ করেছে"—এর পর তো আর কোনো চরমতর সত্য নেই। এর থেকেই তো প্রতিষ্ঠিত হল যা জীবের কাছে চরমতম উপলব্ধি—সে আছে, তার অস্তিত্ব তার নিজের কাছে এই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করলো।

* * *

"ওরে ইডিয়ট এদিকে আয়। কেটে পড়ছিস যে বড় !"

হ্যাঁ, আধ ঘণ্টা পরে যেতে বলেছে। ততক্ষণে ঝপ করে আরেকটা—

বার-এ তখন পুরো দমে যা তর্কাতর্কি চলেছে কোথায় লাগে তার কাছে উভয় ভিয়েৎনামের লড়াই। যদিও তর্কের বিষয়বস্তু কবে—সেই প্লাতো না লাওৎসের আমল থেকে।

ডান্স্—বেলি ডান্স্—সেক্স্।

সরকার পক্ষের প্রধান বক্তা কিউ সি শ্রীযুত সুদিনের মুখে এক বুলি। আর্ট ফর আর্টস সেক্। সঙ্গীত হোক, কাব্য হোক, নৃত্য হোক—তার একমাত্র উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি করা। "বিদ্রোহী" কবিতা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে দেশের স্বাধীনতা আড়াই মিনিট আগে এল না পরে এল, মোনা লিজার ছবি দেখে তাবৎ ফরাসিনী পুত্রশোকে কাতর অবস্থায়ও আ লা মোনা লিজা মুচকি মুচকি হেসেছিলেন কি না, কিংবা বিলকুল শব্দার্থে কান-কাটা ভান গগের ছবি দেখে চিত্রামোদীগণ আপন আপন কান কাটাবার জন্য সার্জনদের কসাইখানায় কিউ কেটেছিলেন কিনা সেটা সম্পূর্ণ অবান্তর। বেলি-ডান্স্ ইজ বেলি ডান্স্। আসল দ্রষ্টব্য, উদরমণি নাভিসরোবরে রূপসাগরের যে তুফান জেগে উঠলো সেইটে দেখে তোমার চিত্তরাজ্য কি আকুল হয়ে ওঠে নি ঐ সরোবরে অবগাহন করে হৃদয়জ্বালা জুড়োতে ? তুমি কি ভুলে যাও নি ক্ষণতরে ক্ষুদ্র ঐ নাভি-কুণ্ড বিশাল চিল্কা কুণ্ড নয়, তুমি—"

কীর্তির মনে অন্য ভাবনা। শিপ্রার কাছে যাবো কোন্ ড্রিংক খেয়ে ? হুইস্কি মুইস্কি চলবে না। বে-এক্তেয়ার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। একদম সাদা চোখেও যাওয়া যায় না। পুরুষের যে তেজস্ বিচ্ছুরিত হয় তার ব্যক্তিত্ব থেকে, তার পৌরুষ সত্তা থেকে সেইটেই তো রমণীকে মুগ্ধ করে বিহ্বল করে, সেটাকে কোনো একটা ড্রিংক মারফৎ কিঞ্চিৎ মরাল সাপর্ট তো দিতেই হয়। নাঃ— ওসব বিচার-বিবেচনা করা বেকার। কলকাতার কুল্লে নটবর, কড়ির কুবের, কালো-বাজারের নম্বরী নম্বরী ঘড়েল যাঁরা চালাকি আর মিষ্টি হাসির বঁড়শি দিয়ে চীফ ডিটেকটিভের নাড়িভুঁড়ি থেকে গোপন কথার এপেন্ডিক্স্ টেনে বার করতে পারে তাঁদের সব্বাই হার মেনেছেন শিপ্রাদেবীর টেনিস-লনের ওয়াটারলুতে। তিনি মোহাতুর হন, তাঁর সর্বাঙ্গে আবেশ লাগে, তাঁর বক্ষে অরণ্যমর্মর জেগে

ওঠে—সবই। ওদিকে কিন্তু বিচার-বুদ্ধির মেবদার জ্ঞান অন্তঃপুর ঝাঁঝালো বাঙাল কাসুন্দির মত। তাই তোমার মাথাটি রাখতে হবে ফ্রিজের আইস বক্সে। তাঁর গড়া ট্রাফিক আইনের রেড লাইটটাকে পিংক মনে করে মাত্রা ছাড়িয়েছো তো গেছো। পক্ষান্তরে তিনি যে ভাগ্যবানকে গ্রীন লাইট দেখান তার ট্রাফিক রেগুলেশন সম্বন্ধে, কীর্তিনাশের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আজকের এই ভর রাতের ফোনে যেন কাঁচা সবুজের আবছা আবছা আভাস দেখতে পেল। সুতরাং বহু আত্মচিন্তা ততোধিক পরকীয়া কিংবদন্তি সুবিবেচনা করে কীর্তি স্থির নিশ্চয় হলেন এহেন পরিস্থিতিতে ড্রিংকরূপে ক্রেম দ্য মাঁৎ-ই প্রশস্ততম এবং তদনুযায়ী ড্রিংক শেলফের দ্বিতীয় স্তরের পূর্বতম প্রান্তে ক্ষণতরে কটাক্ষ হানলো। বেয়ারিচের বরদাপাণি সেদিকে প্রসারিত হল।

ড্রিংক সমস্যা সমাধান করার পর কীর্তির কান গেল বেলি-ডান্স্ তর্কাতর্কির দিকে।

সুদিন বৈরী শঙ্কর বলছে "রেখে দাও আর্ট ফর আর্টস সেক। নাইট ক্লাব, কাবারে ললিতকলা একাডেমি নাকি যে এখানে সেই কাইরো না মরক্কো থেকে আসবেন খাপসুরৎ খাপসুরৎ ডপকীরা প্যোর আর্ট আর এপলাইড আর্ট বাবদে আমাদের তালিম দিতে? উইদ্ ডেমোনস্ট্রেশন। সেইটেই হল আসল তত্ত্ব। আর আর্টের কথাই যদি উঠলো তবে বলি, প্রকৃত আর্ট আদ্যন্ত সবকিছু প্রকাশ করে না—ইঙ্গিত দেয় বহু না-বলা, অ-চাখা রসের প্রতি। আজকের নাচে নাভিকুণ্ডলী থেকে নৃত্যরস বহির্গত হয়ে ঊর্ধ্বলোকে শিহরণ কম্পন জাগিয়ে তুললো এবং নিম্নগামী হয়ে যে রূপে প্রকাশ দিল তার ইঙ্গিতটা ছিল কোন্ দিকে? সেটা অশ্লীল।"

এক ঠোঁটকাটা সদ্য বিলেতফের্তা হাবা সেজে শুধালো, "ইঙ্গিতটা কোন্ দিকে ছিল সেটা আগিয়ে বুঝিয়ে বলুন, তবে তো করা যাবে শ্লীল অশ্লীলের বিবেচনা।"

"আখ্! তুমি কি সেখানে ছিলে না? যৌনসঙ্গম।"

সুদিন অত্যন্ত বিরক্তি এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, "যৌনসঙ্গম আবার কবে থেকে অশ্লীল হল?"

তৃতীয় অধ্যায়

"এসো।"

"আমাকে যে স্মরণ করেছ তাতে আমি ভারি খুশী হয়েছি। আসলে বলা উচিত ছিল, গর্ব অনুভব করেছি—"

"না আনন্দটাই বড়। কে কাকে কতখানি আনন্দ দিতে পারে বলো।"

"তোমার কথাই সই। কিন্তু হঠাৎ তুমি এ রকম লোনলি ফীল করলে কেন বলতো? কলকাতার কোন্ ক্লাব, কোন্ পার্টি, কোন্ শো থেকে তুমি প্রতিদিন নিমন্ত্রণ পাও না? অবারিত দ্বার একটা কথার কথা। তোমাকে তো সবাই লুফে নেয়। আর তুমি কি না লোনলি!"

কিছুমাত্র ছলনা বা ভান না করে শিপ্রা বললে, "কীর্তি, তোমার প্রাণরস অফুরন্ত, তোমার মত অহরহ সজীব আমি খুবই কম দেখেছি। তাই তুমি সহজে বুঝবে না, জনতার মাঝখানে একটা মানুষ কতখানি নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত হতে পারে। আমার কথা বাদ দাও—এক্কেবারে পয়লা নম্বরিনীদের কথা চিন্তা করো তোঃ দিনের পর দিন তাঁরা পার্টি পরব ফান্‌কশনে যাচ্ছেন, তাঁদের চতুর্দিকে সমাজের সব চেয়ে উঁচু কাতারের পয়সাওলা, খ্যাতিমান শক্তিমান সব রকমের প্রভুরা। আর রয়েছে স্মার্ট সেট্। তারা স্মার্ট উইটি কথা বলে, টিপ্পনী কাটে আর সুন্দরী গরবিনীর স্মার্ট উত্তর দেন, যাঁরা পারেন না তাঁরা অন্তত মৃদু হাস্যের তারতম্য দিয়ে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মাঝারি তার সার্টিফিকেট দেন। আচ্ছা, তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ, এই সমস্ত ব্যাপারটার উদ্দেশ্য কি, অর্থ কি?

"না। তুমি ভালো করেই জানো, আমি খুব চিন্তাশীল প্রাণী নই।"

শিপ্রা তাঁর সুডৌল ঘাড়টি আরেকটু উঁচু করে কীর্তির চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, "ওটা আর কিচ্ছু না। ওটা বর্তমান সমাজের একটা প্যাটার্ন মাত্র। চলছে, চলবে হয়তো বহুদিন ধরে, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে আগাপাস্তলা বদলে যেতে পারে।"

„মানে?"

"অতি সহজ। লণ্ডনে এ-প্যাটার্ন অনেক দিন ধরে গড়ে উঠেছিল। এবং তার গোড়াপত্তন করেছিল সে-দেশের খানদানী লোক। অথচ যেই লাগল লড়াই অমনি তার বড় ভাগটা হয়ে গেল উধাও। বাকিটুকুও ভোল পাল্টে নিলে রাতারাতি। কোথায় গেল হাওয়ায় হাওয়ায় মিলে-যাওয়া সিল্কের বুক-কাটা, কোমর-ছঁ্যাচা গাউন, অদৃশ্য সিল্কের ফ্লেশ কালার মোজা আর ত্রিভঙ্গ গোড়ালির জুতো! সবাই পরে নিল কাঠখোট্টা চামড়ার চেয়ে পুরো কাঁথার য়ুনিফার্ম—প্রাইম মিনিস্টারের বেগম গিয়ে দাঁড়ালেন কিউয়ের ন্যাজে—রেশন শপের সামনে।

আর আমাদের এই কলকাতার প্যাটার্নটা—"

হঠাৎ থেমে গিয়ে শিপ্রাদেবী বললেন, "ওঃ! আই এম ফ্রাইটফুলি সরি। তুমি এখানে এসেছ বার ছেড়ে নাক বরাবর। আর তোমাকে একটা ড্রিংক অফার করি নি। কি খাবে বলো।"

কীর্তি আমতা আমতা করে বললে, "না—তা—"

শিপ্রা খিলখিল করে হেসে বললে, "পচ্ট গন্ধ পাচ্ছি খেয়ে এসেছ ক্রেম দ্য মাঁৎ—আরো কাছে এসে বসো দিকিনি।" যে-সোফাটাতে সে আধশোয়া অবস্থায় পা দুখানি গুটিয়ে রেখেছিল তারই একটুখানি একপাশে সরে গিয়ে একটান মেরে বসিয়ে বললে, "ঠিক ধরেছি। তা এই অবেলায় ক্রেম দ্য মাঁৎ কেন? জব্বর একটা ব্যানকুয়েট খাওয়ার পর ক্রেম দ্য মাঁৎ দিয়ে মুখশুদ্ধি করেছ বুঝি?"

কীর্তি আকাশ থেকে পড়ে বললে, "ব্যানকুয়েট! আজ আবার কিসের পরব যে ব্যানক্যুয়েট হবে। মানথলি ডিনারও তো পরশু দিন। অবাক করলে বাছা তুমি।"

"কিসের পরব? আজ তো পরবস্য পরব। গ্রেট বেলি ডানসের গ্রেটার ব্যানকুয়েট। বেলি-ডানস দেখবে বুঝি একাদশীর ফাঁকা পেট নিয়ে? বেলি-ডানস দেখতে হয় ফুল বেলি নিয়ে। লিকউইড সলিডে হাফাহাফি। তা সে যাক গে। এসো আমরা দুজনাতে সেলিব্রেট করি ঐ মারাত্মক অমিশনটা। শ্যাম্পেন খাবে? বলতে গেলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যাম্পেন গোত্রের কয়েকজন আমার কাছে আছেন। তোমার জন্য বাকেটে বরফ দিয়ে রেখেছি। ঐ সেই ঘরটায় পাবে।"

শিপ্রার বেশভূষা, তার মোটরগাড়ি দেখলে যে-কোনো লোক ভাববে এ মহিলার যা রুচি, প্রতিটি আইটেম এমনই মানানসই যে তাঁর বাড়ি, ড্রইংরুম ডাইনিংরুম নিশ্চয়ই অতিশয় নিখুঁত কায়দায় সাজানো—কোনো প্রকারে কোনো জায়গায় ছন্দপতন হওয়া অসম্ভব। অথচ প্রথম দর্শনে স্মার্ট সেটের যে-কোনো ব্যক্তি বিস্মিত হবে। ঘরের একপ্রান্ত থেকে যে কালারস্কীম আরম্ভ হয়ে শেষ প্রান্ত অবধি ঢেউয়ে ঢেউয়ে বয়ে যাবে, আর আসবাবপত্র কার্পেট কার্টেন ছাত দেয়াল, মাথার উপরের এবং চারদিকের আলো সেই স্কীমের সঙ্গে মিল খাইয়ে যেন একটা হারমনি গড়ে তুলবে এখানে সে কম্পজিশন একেবারে নেই সে-কথা বলা চলে না, আবার আছেও বলা চলে না। এ-কথা তো শিপ্রা-দেবীর বুদোওয়ার না দেখেও বলা চলে সেখানে দৃষ্টিকটু কিছুই থাকতে পারে না কিন্তু সেই অনিন্দ্যসুন্দর সামঞ্জস্যটা তো চোখে পড়ে না।

কিন্তু দুতিন দিন ধরে সে ঘরে বসলে, চা খেলে তখন বোঝা যায় শিপ্রা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঘরটি গুছিয়েছে। উদ্দেশ্য দুটি: আরাম এবং একবার এক জায়গায় আসন নিলে যেন ফের উঠতে না হয়। কোচ সোফার হাতার ভিতর থেকে অ্যাশট্রে, ড্রিংকের গেলাস রাখার রিং ইত্যাদি ছোটখাটো জিনিস তো বেরুবেই, ছোটখাটো ব্রেকফাস্ট খাবার মত ফোল্ড করা একটা ফ্রেমও ঠিক ফিট করে যায় যার উপর বেয়ারা খাবারের ট্রে চায়ের সরঞ্জাম অনায়াসে রেখে যেতে পারে। আর পাঁচটা অতিশয় ফ্যাশানেবল ড্রইংরুমে বেয়ারা স্ন্যাকস

নিয়ে ঢুকলেই যে কী তুলকালাম কাণ্ড আরম্ভ হয় ভুক্তভোগী মাত্রই সেটা জানেন। পেগ টেবিলে স্ন্যাক্‌স্‌ ধরছে না, সেণ্টার টেবিলটা অনেক দূরে—লে আও আওর একঠো টেবিল ইত্যাদির মহা ঝামেলা। তারই ধাক্কায় ইতিমধ্যে গালগল্প টুকরো টুকরো খান খান।

শিপ্রার বক্তব্য ঃ মানুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদান, রসের দান ও গ্রহণ, অভিজ্ঞতার বিনিময়, একে অন্যের সঙ্গসুখ—এসব নিয়েই তো মানুষের সত্তা, তার অস্তিত্ব। ড্রইংরুম তো তারই কেন্দ্রভূমি। সেখানে যদি ড্রিংক স্ন্যাক পদে পদে বাধা দেয় তবে সেটা ব্যর্থ। নাই বা হল আমার বুদোওয়ার আল্‌ট্রা মর্ডান।

জর্মন সিলভারের বালতিতে করে কীর্তি শ্যাম্পেন নিয়ে এসেই শুধলো, "বল তো, ভাই, এই দু-দিনে যখন এক ফোঁটা বিয়ারের জন্য অর্জুনের মত পাতাল ভেদ করতে হয় তখন তুমি এই জাত শ্যাম্পেন পাও কোথা থেকে?"

শিপ্রা আদর করে কীর্তিকে কাছে টেনে এনে বললে, "তোমার এত ভয় কিসের? তোমার বেলা দেখি, 'ভয় করে তুই বিজয়ারে হারাবি?' শ্যাম্পেন? সে-কাহিনী সরল, আর এক মিনিটে ফুরিয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে আমি কিছু-কাল প্যারিসে ছিলুম। তখন এক গরীব ছোকরা ফরাসি আর্ট স্টুডেণ্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়—প্রায় প্রেমের কাছাকাছি। আমি সামান্য যেটুকু পকেট মানি পেতুম তাই দিয়ে তাকে প্রায় জোর করে এক দিন অতি সস্তা দরের এক বোতল শ্যাম্পেন খাইয়েছিলুম। আমরা দেশে ফিরে এলুম। তার পর দশ বছরের ভিতরই সে হুশ হুশ করে আর্টের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে একদম হলিউডে পৌঁছে গেল। ওদিকে মিলিয়নেরদের পোর্ট্রেট এঁকে পয়সা যা কামায় সে প্রায় পিকাসোর সঙ্গে নেক্‌ টু নেক্‌। শ্যাম্পেনের পাইকিরি বিক্রির সময় তার এজেণ্ট শ্যাম্পেন ডিস্‌ট্রিক্টে এসে হুজুরের জন্য যা কেন তার একটা হিস্যে সে পাঠিয়ে দেয় দার্জিলিঙের ঠিকানায়—ঠাণ্ডায় মোলায়েম থাকবে বলে।"

"তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়?"

শিপ্রা হেসে কুটিকুটি! কীর্তির গালে মোলায়েম একটা ঠোনা মেরে বলে, "ওরে মূর্খ, লণ্ডনে পাকা দু দুটো বচ্ছর কি হাইড পার্কে ঘাস খেয়েছিস শুধু? সে যাচ্ছে ভেসে ভেসে দেশ থেকে দেশান্তরে, আমিও উধাও হচ্ছি কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। এক দিন কোন্‌ খেয়ালের মোহে এজেণ্টকে বলেছিল আমার যেন শ্যাম্পেনের অভাব না হয়; তার পর এতদিন সে হয়তো সে-কথা বেবাক ভুলে গিয়েছে—তা সে যাক্‌। বেলি-ডান্‌স্‌ কি রকম লাগলো সেই কথা কও।"

কীর্তির অল্প অল্প নেশা হয়ে আসছে। গোড়ার দিকের জড়ত্ব অনেকখানি কেটে গিয়েছে। ওদিকে শিপ্রারও মুখের রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যুবতী

রমণীর প্রস্ফুটিতা চোখ দুটিতে যেন ক্রমে ক্রমে কিশোরীর সদ্য বিকশিত ভাব ফুটে উঠছে।

কীর্তির মুখে কথা ফুটছে। আকস্মিক আমন্ত্রণের বিহ্বলতা কেটে যাওয়ায় ওজন করে কথা কইবার ধরন অনেক পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, "আমি আর নাচটা দেখলুম কই? বরঞ্চ স্মার্ট মাস্টার সুদিনকে সুধিয়ো। আমি বার ছাড়ার সময় সেখানেতে নাচের টপিক নৃত্য করছে—তাণ্ডব নৃত্য।"

"মানে?"

সংক্ষেপে বলতে গেলে হিং টিং ছট্। সুদিন বৈরীরা তারস্বরে ঘোষণা করছেন, "ঐ বেলি ডান্সে আছে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস এবং ভালগার ইঙ্গিত—সর্বোপরি বেলি ডান্সে না আছে বেলি না আছে ডান্স্। এর বেশী আমি তোমাকে বলতে পারবো না। এটুকুও বলতুম না; খানিকক্ষণ আগে তুমি বলছিলে না, এটা একটা সোসাইটির প্যাটার্ন, তাই এটার উল্লেখ করলুম।"

শিপ্রা সিগারেট খায় কালে ভদ্রে। এবারে একটা ধরিয়ে ধীরে ধীরে বললে, "আমার একটি বিশিষ্ট বন্ধু আছেন। তুমি তাঁকে বোধ হয় চেন না—কারণ তিনি একদা ছিলেন কাইরো শহরের স্মার্ট সেটের ফ্রণ্ট বেঞ্চার। উত্তর আফ্রিকার—মরক্কো থেকে কাইরো অবধি—সবরকম নাচ তাঁর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা আছে। তিনি একদিন আমাকে—বলছিলেন, খাঁটি বেলি-ডান্স্ শিখতে হলে অন্তত বারোটি বছর একটানা রেওয়াজ করে যেতে হয়। আজ রাতে যে-মেয়েটি নাচলো সেও তো শুনেছি বারো বছর ধরে ট্রেনিং নিয়েছে। তাই আশ্চর্য লাগে, সুদ্দুমাত্র ভালগার সাজেশন দেওয়ার জন্য বারো বছর ধরে ট্রেনিং!"

সব কথা কীর্তির কানে তখন আর ঢুকছিল না।

সেটা শ্যাম্পেনের প্রসাদে নয়। বরঞ্চ তার খনে মনে হচ্ছিল নেশা কেটে যাচ্ছে, খনে মনে হচ্ছিল নেশাটা যেন চড়াৎ করে তালুর ব্রহ্মদেশের চাড়ে বসছে। এবং এটাও তার জানা ছিল, দু' পাত্র রস-সেবনের সময় স্রেফ ফুর্তি ছাড়া কোনো দুশ্চিন্তা বা অন্য কোনো সমস্যাকে আমল দিলে এ-রকম ধারা হবেই। সর্বোপরি তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছিল একটা ক্রিকেটের মাঠ।

কীর্তি একদা ভালো ক্রিকেট খেলতো।

কীর্তি মনের চোখে দেখছিল, পুরো একবছর ধরে বিপক্ষ ব্যাটিং করছে আর তাকে ফীলডিং করতে দেওয়া হয়েছে আউট ফীল্ডে, একদম কানট্রি সাইডে। অথচ তার দৃষ্টিশক্তি সুতীক্ষ্ণ, ফাস্ট্ বোলিঙের বেলা সে আগেভাগেই ঠাহর করে নিতে পারে ব্যাটের কোণে লেগে বল স্নিক করে'ল কোন্ এঙ্গেলে আসবে, বাং মাছের মত সর্বাঙ্গে মোচড় খেয়ে প্রায় মাটি থেকে বল কুড়োতে পারে।

তথাপি ক্যাপটেন শিপ্রা তাকে পুরো একটি বছর ধরে তার পার্টিচক্রের

বঙ্গভূমিতে তাকে যেন এপ্রেণ্টিস করালেন এক যুগ ধরে।

আর আজ? বড় বড় চাঁইদের উপেক্ষা করে, বলা নেই কওয়া নেই, একমাত্র তাকেই নিয়ে তিনি চলেছেন পিচ পরিদর্শনে!

চতুর্থ অধ্যায়

সর্ব বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণ একমত, মানুষ যে সভ্যতার যাত্রাপথে এতখানি এগিয়ে গিয়েছে তার প্রধানতম কারণ মানুষ বংশানুক্রমে, পিতা পুত্রকে, এক পুরুষ পরের পুরুষকে তার অভিজ্ঞতা বিশদভাবে বর্ণনা করে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে। তদুপরি প্রতি যুগের প্রতি পুরুষই পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতাকে উচ্চতর পর্যায়ে তুলবে বলে তার সংস্কার করেছে, নূতন অভিজ্ঞতা পূর্বতর ভাণ্ডারে যোগ দিয়ে সম্পূর্ণ সঞ্চয়কে পূর্ণতর করে তুলেছে।

শুধু একটি মারাত্মক, জীবন মরণ সমস্যার ব্যাপারে, সৃষ্টির সেই আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত এক ইঞ্চিও এগোতে পারে নি।

"তুমি কি আমায় ভালোবাসো?" এ প্রশ্নটি শুধোবার বেলা পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য কোনো প্রাণীরই রত্তিভর কাজে লাগে না, এমন কি সমসাময়িক প্রতিবেশী, অন্তরঙ্গ ইয়ারদোস্তের উদাহরণ দিকনির্দেশ সম্পূর্ণ বেকার, বেফায়দা। বাবা আদমের আমল থেকে আজ পর্যন্ত—তথা ভুবনবিখ্যাত মহাপুরুষরাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, মহাপ্রলয়ের পর নবসৃষ্টির প্রারম্ভেও—মানুষ ঐ প্রাচীনতম প্রশ্নটি শুধোবার সময় সেই প্রথম দিনের মত বিলকুল হাবা বনে যাবে, কাৎরাতে কাৎরাতে যে-সব ধ্বনি প্রকাশ করবে সেগুলো একদম সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কনফার্মড রাম-ইডিয়টের গোঙরানোর মত।

ওদিকে আবার শিপ্রার চরিত্র বিচিত্র। এমনিতে মনে হয় সে আর পাঁচটা টপ ক্লাস সোসাইটি গার্লেরই মত—গার্ল বললে স্বল্পোক্তি হয়, লেডি বললে আবার অতিশয়োক্তি হয়ে যায়। আজ চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন, কাল প্রধানমন্ত্রীকে মাল্যদান এ-সব কোনো প্রকারের সামাজিক, রাজনৈতিক "কর্তব্য কর্ম" করতে সে সম্পূর্ণ বিমুখ—যদিও দেশে এবং বিদেশে লেখাপড়াতে সে অসাধারণ না হলেও ডিবেটে ছিল অত্যুত্তম, উচ্চারণ ন্যাকামি বর্জিত। "দোষে"র মধ্যে ছিল স্মার্ট সেটের মত সে ট্যারচা ট্যারচা বাঙলা বলতে পারতো না।

তার আসল বৈশিষ্ট্য ছিল আলাপ আলোচনার সময় মারাত্মক সব অভিমত প্রকাশ করে স্মার্টেস্ট সেটকেও হাজার ভল্টের শক্ দেওয়া। পবিত্র, শাস্ত্রীয়, আচারসম্মত এ ধরনের শব্দ তার অভিধানে ছিল না, কারণ তার পিতাই স্বহস্তে সেগুলো ধুয়ে মুছে সাফ্ করে দিয়েছিলেন।

তদুপরি তার সঙ্গে প্যারিস লণ্ডন করার পর কোনো জিনিস বা "লজি" আঁকড়ে ধরার মত মনোবৃত্তি তার আর ছিল না। সামাজিক আচরণে কাউকেই খুব বেশী কাছে ঘেঁষতে দিত না, আবার হট যাও হট যাও সায়েবিয়ানা সে ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে কখনো দেখে নি বলে সে-গন্ধ তার গায়ে ছিল না। কৈশোরে পুরো একটি বছরের অধিকাংশ সময় কেটেছে প্যারিসের "লক্ষ্মীছাড়া" লঝঝড়ে গরীব পেণ্টারদের সঙ্গে। সাম্যবাদ ফ্রানসের পার্লিমেণ্টে মূলমন্ত্র বটে কিন্তু তার পরিপূর্ণ সপ্রকাশ দেখতে হলে যেতে হয় লাতিন কোয়ার্টারের মা সরস্বতীর সর্ব কলার—চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, নৃত্য, আরো কতো কী যে নিত্য নিত্য সৃষ্টি হয়—ঐ-সব কলার পাগলা চেলাদের মাঝখানে, যারা তিন-দিন ধরে একটা লোফ খায়।

কীর্তি এসব ডীটেল জানতো না কারণ শিপ্রা ঘড়ি ঘড়ি তার প্যারিস ভিয়েনার জেল্লাই নিয়ে কথা কওয়া দূরে থাক, ইংরিজি সাহিত্যের কথা উঠলেও সার্ত্র বা মারলোকে টেনে এনে নিজের বক্তব্য জোরদার করবার চেষ্টা দিত না। কীর্তি শুধু জানতো শিপ্রা প্যারিসে ছবি আঁকা আরম্ভ করে এবং এখনো চিলকোঠায় ঐ নিয়ে মাঝে মাঝে মশগুল হয়।

অতীতের ঐ সব নানা পরিবর্তনের ফলে শিপ্রার চতুর্দিকে এমন একটি আবহাওয়া বিরাজ করতো যে ঘনিষ্ঠতার বাড়াবাড়ি না করেও সরল জন তাকে মনের কথা বলতে পারতো। আর আমাদের শ্রীমান কীর্তিনাশকে নির্মাণকালে সৃষ্টিকর্তা যে প্যাঁচালো বুদ্ধির সংমিশ্রণ একদম করেন নি সেটা ক্লাবের অগারাজ বেয়ারাটি পর্যন্ত জানতো।

শ্যাম্পেনটাও পেটের ভিতর বুজ্ বুজ্ করছে।

কি করে যে হঠাৎ শিপ্রাকে শুধিয়ে বসলো, সেই জানে না: "আচ্ছা শিপ্রা, তুমি আমাকে অন্যদের চেয়ে বেশী পছন্দ করো?···আই, মীন, আই মীন আমাকে ভালোবাসো?" তার পর আবার গবেটের মত হুট্ করে বলে ফেললে, "হাও সিলি!"

গেলাসটা ছিল কানায় কানায় ভর্তি। চোঁ করে এক হ্যাঁচকায় খতম করে খট করে সেটা টেবিলের উপর রেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো।

কীর্তি ধরে নিয়েছিল, যে-মেয়ে এতদিন ধরে কারো ফাঁদে ধরা দেয় নি—যদিও মাঝে মধ্যে এর ওর নামের সঙ্গে জড়িয়ে ওর বদনাম রটেছে আবার আপনার থেকেই সেটা কেটেও গিয়েছে—সে বুঝি এহেন অবস্থায় স্মার্ট সমাজের সুপ্রচলিত পদ্ধতিতে খিলখিল করে হেসে উঠবে।

হল একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া।

ধীরে ধীরে আধা শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে কীর্তিকে কাছে টেনে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গনে বেঁধে খেল চুমো। তার পর তার গালে মুখে চোখে হাত

বুলিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। কীর্তি নির্বাক, অসাড়। এমন কি চুম্বন আলিঙ্গনের সময় সে সাড়াটুকু দিতে হয় তার বিহ্বল অবস্থায় সেটুকুও সে দিতে পারে নি।

রুদ্র তপস্যার বনে বহু ত্রাসে অত্যল্প আশে ভীরু অপ্সরা যে রকম প্রবেশ করে কীর্তির প্রশ্নটা বেরিয়ে এসেছিল সেই ভাবে।

উত্তরে সপ্তর্ষি মণ্ডলের উজ্জ্বলতম তারকারাজি উভয় হস্তে সপ্ত গ্রহের আকাশকুসুম বর্ষণ করে আচ্ছাদিত করে দিলেন এই ধূলির অতি সামান্য প্রাণী কীর্তিকে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিপ্রারই বাড়িতে পার্টি। তার এক বান্ধবী ফিরেছেন হাওয়াই থেকে হনিমুন যাপন করে। তাদেরই অনারে সুন্দমাত্র পরিচিত জনকে নিয়ে মাঝারি গোছের শো। সবাই হেথাহোথা ঘোরাঘুরি করছেন গেলাস হাতে করে। বেয়ারাদের হাতের ট্রেতে আছে হুইস্কি, কন্যাক, ভোদকা আর বিয়ার। বর্দো বার্গেণ্ডি রাইন মজেলের রেওয়াজ এ-দেশে নেই বললেই চলে। যোগাড় করাও কঠিন, বিগড়ে যায় বড্ড তাড়াতাড়ি। কিন্তু শিপ্রার ওয়াইন-সেলার দার্জিলিঙের মোলায়েম আবহাওয়ায়। নিজেরও যেটুকু মোহ তা ঐ-সব কণ্টিনেনটাল দ্রব্যের প্রতি। সে-সবের জন্য ব্যবস্থা ড্রইংরুমের ভিতর। সেখানে যে দু'পাঁচজন চিঁড়িয়া আসন নিয়েছেন তাদের প্রায় সবাই ফরাসী জর্মন। তারা বিলক্ষণ অবগত আছে এই কলকাতা-সাহারায় শিপ্রাই একমাত্র ওয়েসিস্। সঠিক কোন টেম্পারেচারে এ-সব পানীয় ফুল্ল বিকশিত হয়ে এই ভিন্‌দেশে স্ব-দেশের রস সুবাস বিতরণ করবে সে তত্ত্বটিতে শিপ্রা স্পেশালিস্ট।

লনের এক প্রান্তে আসন নিয়েছেন সুদিনাদি স্মার্ট কোম্পানি। কীর্তি প্রাচীন রীতি অনুযায়ী প্রত্যন্ত প্রদেশে। আজ বসেছে সানন্দে। আজ গারাজে বসতেও তার কণামাত্র ক্ষোভ নেই। এ-উৎসবের হৃদয় পদ্মাসনে যে রাজার রাজা, বাইরের ভুবনে সে কোথায় কোন্ ধূলির ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হল সে সম্বন্ধে কোন মূর্খ হয় সচেতন!

তদারকির রোঁদে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় শিপ্রা ক্ষণতরে কীর্তিকে উদ্দেশ করে বললে শুধু "হ্যালো"! ঠোঁটে সেই একবছরের পুরানো মৃদু হাস্য। কিন্তু সুদিন জানে আজকের এ কণ্ঠস্বর এ মৃদু হাস্য এক ভিন্নবাসিনী ভানুমতীর মদনরসে মন্ত্রপূত।

ইতিমধ্যে বধূ এসেছেন সুদিনাদির সামনে।

সুদিন এক গাল হেসে শুধলো, "কি গো সুন্দরী, হাওয়াই দ্বীপের হুলা

হুলা ডানস্ রপ্ত করে এসেছ তো? এক চক্কর দেখিয়ে দাও না পাঁচজন রস-পিপাসুকে।"

বধূ বললেন, "নিশ্চয়, কিন্তু হাওয়াইয়ের সেই ঘাস পাবো কোথায়, নাচের ঘাগরা বানাবার তরে?"

সুদিন বললে, "সে আর এমন কি বিপত্তি। রাজকুমারী জাহানারা যে মসলিন পরে ঔরঙ্গজেবের সামনে সগর্বে উপস্থিত হয়েছিলেন সেটা যোগাড় করতে কতক্ষণ! সেইটে ফালি ফালি করে ঘাগরা বানিয়ে যদি পরেন—"

শঙ্কর বললে, "কী বেরসিক রে, বাবা। চাঁদের আলোর টানা আর রামধনুর পোড়েন দিয়ে বোনা হবে সে ঘাগরা। মিল্‌কি উইয়ের দুধ দিয়ে সেটি থাকবে ভেজানো—তবে না সেটি লেপটে থাকবে সর্বাঙ্গে। তবে না দেখা যাবে নৃত্যের তালে তালে প্রতিটি পেশীর আন্দোলন, সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ।"

ইতিমধ্যে বর কনে এগিয়ে গেছেন আরেক দলকে "হেঁ হেঁ" করার জন্য।

চৌধুরী আখতর হুসেন শঙ্কর মিত্রকে ফিসফিসিয়ে বললেন, "বুড়ো ধেড়ে কাক। সাতান্ন ঘাটের পানি খেয়ে শেষটায় বিয়ে করলে নাত্নীর বয়সী মেয়েটাকে!"

মিত্তির বললে, "চৌধুরী, আমাদের সোশাল সিসটেমটা তুমি আদৌ বুঝতে পারো নি। পুরুষগুলো তো যায় গোল্লায়—ঐ যে বললে সাতান্ন ঘাটের ঘোলা জল খেয়ে খেয়ে। বিয়েও যদি করে ঐ ঢপের হাফ-বাইজীগুলোকে তবে জাতটা যাবে উচ্ছন্নে। অন্তত একটা সাইড তো ক্লীন রাখা দরকার।

নৃতত্ত্ব আর এগলো না। কারণ ইতিমধ্যে একটি তরুণী লাভার সহ উপস্থিত। ইনি সদ্য উনিশে পা দিয়েছেন বলে ক্লাবের প্রাচীন মেম্বার তার পিতা তাকে সোসাইটি করতে অনুমতি দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রসালাপ বন্ধ হয়ে গেল।

এদের এই একটা মহৎ গুণ এক লহমায় ভোল পালটাতে জানে। এই ছিল জল-বিছুটি আর এই হয়ে গেল ধোয়া তুলসী পাতা। চৌধুরী বললে, "কি গো মিস্ ডাট্, বিলেত যাওয়ার কদ্দুর?"

ঠোঁট বেঁকিয়ে সুভা বললে, "ফরেন এক্‌শ্চেঞ্জ পাবো কোথা?"

মিত্তির বললেন, "লাও! আম্বালাল কস্তুরভাই আছে কি করতে? তার তো দেদার ফরেন টাকা? তোমার পিতৃদেবের লীগেল এডভাইস ভিন্ন দু'বাণ্ডিল বিড়ি কেনে না। সে তোমাকে লণ্ডন অক্সফোর্ড যেখানে প্রাণ যায় সর্বত্র পাউণ্ডের দরিয়ায় ডুবিয়ে রাখবে। তোমার আবার ভাবনা কি?"

সুভা একটা মামুলী উত্তর দিয়ে কেটে পড়লো। এ সব হচ্ছে কথার কথা—নিতান্ত কিছু একটা বলতে হয় বলে প্রসঙ্গটা উঠেছিল। নইলে আমাদের এ-গোষ্ঠীর কোনো এক্‌শ্চেঞ্জেরই কোনো ভাবনা নেই।

সর্বশেষে চৌধুরী ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি কথা ওজন করে বললে, "ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে হয়ে আসছে। ফরেন টাকার কুমীর তো শেঠ চন্দ্রবদন। ইংলণ্ডে আছে প্রায় লাখ খানেক পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী। তারা প্রতি বছর দেশে পাঠায় কয়েক কোটি টাকা। শেঠজীও তাদের কামানো পাউণ্ড কিনে নেয় সরকার যে রেটে টাকা দেয় তার চেয়ে বেশ কিছু বেশী মুনাফা দিয়ে। ওদিকে শেঠজী খবর পাঠায় নারায়ণগঞ্জে তার আমিনকে—সিলেটের অমুক শেখকে অত টাকা পাঠিয়ে দাও। এতে করে—"

এক হাফ-আনাড়ি বাধা দিয়ে বললে, "নারায়ণগঞ্জে শেঠজী পাকিস্তানী টাকা পায় কোথায়? সেখানকার মিল কারখানা তো সব আদমজী ফান্সি পশ্চিম পাকিস্তানীদের। সেখানে শেঠজীর কোন্ 'ধান্দা' যে তহবিল গড়বে?"

চৌধুরী মিষ্টি হেসে বললে, "তুমিও যেমন! আদমজীর টাকা খাটে অমৃতসরে শেঠজী মারফৎ এ্যাণ্ড ভাইস ভারসা। আচ্ছা, না হয় মেনেই নিলুম তোমার আজগুবী গুল। এই কলকাতার শহরে ইণ্ডিয়ান টাকা দিয়ে কিনতে চাও কত লক্ষ পাকিস্তানী টাকা—খাসা সস্তা ভাওয়ে? সিলেটের মোকামে পাকিস্তানী টাকাটা পাঠিয়ে দেবার জিম্মাদারী তো ঐ পাকিস্তানীর—শেঠজীর কি?"

কীর্তি এতক্ষণ চুপচাপ বসে একটা গেলাসও শেষ করতে পারে নি। আসলে তার শরীরে পাঁড় মাতালের রক্ত নেই। সে নয়া নয়া করে দেখছিল, গত রাতের স্বপ্ন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উল্টে পাল্টে। আর দেখছিল, শিপ্রার দ্রুতপদে আসা-যাওয়া ছোট্ট দুটি পা ঘিরে শাড়ির পাড়ের খেলা। মেমসায়েবদের ফ্রক হয় শতেক ধরনের। প্রতি বচ্ছরে আবার মরসুম-মাফিক বার তিন চার কাট্ বদলায়, ভোল পালটায়। সব-কটাই যে এক্কেবারে ফেলনা সে-কথা বলা চলে না কিন্তু এত চেষ্টা এত জিনিয়াস খাটিয়েও প্যারিস এমন একটা ফ্রক বানাতে পারে নি যেটা দুটি পা ঘিরে ঘিরে শাড়ির পাড়ের যে নৃত্য তার কাছে আসতে পারে। তার উপর শিপ্রার চলনভঙ্গীটি তার কোমরের বাঁকা-সোজা নড়াচড়া, কাঁধের ডাইনে বাঁয়ে হেলে-পড়াটার সঙ্গে এমনই মিল রেখে নিয়েছে যে তার হেথা হোথা আসা-যাওয়াটাই পাঁচ জনের চোখ ভরে দেয়। পাড়টি যেন আল্পনা এঁকে এঁকে সমস্ত লনটা ছেয়ে ফেলল।

কে কান দেয় তখন আদমজীর ফরেন টাকার দিকে? আমাদের কীর্তিবাবু না জানেন পলিটিক্স, না বোঝেন ইকনমিক্স্। তবু তার কানে গেল শেষ কথাটা চৌধুরীর :—

"এবার কিন্তু সব-কিছু আবার হয়তো ঢেলে সাজাতে হবে। আওয়ামী লীগ জিতেছে ইলেকশানে উইদ্ এ থাণ্ডারিং মেজরিটি। দরিয়ার বাকিটুকু ভালোয় ভালোয় পেরুতে পারলে লীগওলারা আদমজী ফান্সির থাউজেণ্ড পার্সেণ্ট মুনাফা বরদাস্ত করবে না।"

সুদিন বললে, "সে তো শুধু কেচ্ছা। আখেরে হয়তো বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একদম কেটে পড়বে। কে জানে, হয়তো বা পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যাবে।"

"এ্যাঁ ?" হঠাৎ যেন কীর্তির কানে জল গেল। ঐ স্বাধীনতা শব্দটার সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। ছেলেবেলা থেকেই সে যা খুশী তাই করেছে। কালেভদ্রে যখন নিতান্ত বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় কোনো কিছু সয়ে নিতে হয়েছে তখনই পেয়েছে দারুণ পীড়া।

একবার শিপ্রাকে কথায় কথায় বলেও ছিল, "বিবেক নামক ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার পরিচয় বড়ই কম। কিন্তু তিনিও মাঝে মাঝে মোকা পেয়ে যখন চাপ দিয়ে আমাকে বাধ্য করেন অপ্রিয় সব কাজ করতে তখন আমার জান্‌টা যেন ঠোঁটের কাছে এসে খাবি খেতে থাকে। বিবেকের চাপ কর্তব্য বাবুর চাপ—বাপ্‌রে বাপ। এর উপর আবার বাইরের চাপ। গোলামী !"

সুদিন বললে, "ওহে কীর্তিবাবু, চুপচাপ বসে বসে ঢুকুস ঢুকুস করছো যে বড়। এ্যাদ্দিন তুমিই তো, বাবা, ছিলে শিপ্রাদেবীর প্রতি পার্টিতে এ্যাডিকং ! আজ সব ঝক্কি ওরই উপর ছেড়ে দিলে কেন বলো তো।"

"তা নয় সুদিনদা ! আজ যাদের অনারে পার্টি ওদের ইয়ার দোস্তও এসেছেন জনা কয়েক। ওঁরা তো নিত্যি নিত্যি এখানে আসেন না। আমার মত পাকা নন—ওরা ঠিকে। আজ ওদের একটা চান্‌স্ দিতে হয়। দেখছো না, ম্যাডামকে হেল্প করার ছলে থার্ড ক্লাস বেয়ারার চেয়েও আনাড়ি সার্ভিস দিচ্ছে। কিন্তু শ্রীমতীর সঙ্গে দু' এক দফে রসালাপ করার সুযোগ পাচ্ছে তো।"

"সার্ভিসের কথা তুলছো কেন ? ওদের বাপ-ঠাকুরদা বাটলার ছিল না কি ?"

"লণ্ডনের ক্ল্যারিজে চীফ ওয়েটারও সার্ভিসে তোমার কাছে হার মানবে। তোমার ঠাকুদ্দা তো ছিলেন কোম্পানির মুৎসুদ্দী। তবে—"

"চোক্কর ছোকরা।"

ঘণ্টা দুই হয়ে গেল পার্টি আরম্ভ হয়েছিল। এখন একা, জোড়া জোড়া, একসঙ্গে জনা তিনা বিদায় নিতে আরম্ভ করলেন। কোন এক সংস্কৃতের কবি বলেছেন, যেন পরাজিত বাহিনীর সৈন্যরা এক্কা দুক্কা হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে। আরেকটা ছোটখাটো দল চললো এক সঙ্গে—ওদের অন্য একটা পার্টি-ডিনারে নেমন্তন্ন। শিপ্রা আগের থেকেই মাফ চেয়ে নিয়েছিলো। এ-পার্টির দু'একজন বানচাল হয়ে যাওয়াতে সুদিন আর কীর্তি তাদের যেন আদর করতে করতে ড্রাইভারদের জিম্মায় মোটরে তুলে দিল। দু'একজন সুপ্ত এবং অর্ধ সুপ্ত। তাদেরও তুলে দেওয়া হল তদ্বৎ।

সুদিন বললে, "কীর্তি ভায়া, এবারে আরামসে একটা শেষ ড্রিংক খাই তোমার সঙ্গে। এ-সব পার্টিতে এত সব রকমারি চিড়িয়া আসে যে প্রাণখুলে

কথা বলা যায় না, আর প্রাণ খুলে কথা কইতে না পারলে গলা খুলে রস পান করবে কি করে?"

লনের সুদূরতম প্রান্তে দুজনাতে বসে চুপ করে রইল।

শিপ্রা শেষ গেস্টকে বিদায় দিয়ে ধীর পদক্ষেপে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

সুদিন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বসুন।"

এরা আপনজন। তাই শিপ্রা বললে, "না, ভাই, আমি নাইতে চললুম।"

ড্রিংক শেষ করে সুদিন উঠলো। বললে, "আমি 'ব্ল্যাক ক্যাট'-এ যাচ্ছি। তুই আসবি, এখানকার কাজ শেষ হলে?"

বেয়ারাদের বিদায় দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আরো পাঁচটা কাজ "রাউণ্ড আপ" করার ভার প্রতি পার্টিতেই পড়ে কীর্তির ঘাড়ে।

সুদিন বললে, "তোর অনারারি নোকরিটাতে কি কোনো কালে প্রমোশন পাবি নে?"

কীর্তি হেসে বললে, "কড়া কনট্রাক্ট করা আছে, অনারারি—ঠিক হৈ। কিন্তু, দাদা, পার্মানেণ্ট।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

কীর্তি?

শিপ্রা?

হ্যাঁ। শোনো। বেড়াতে যাবে? মোটরে। পুরো দিনটা। ফিরতে রাত দশটাও হয়ে যেতে পারে। কোথায় যাব? সে তো তুমি ঠিক করবে। আমি মেয়েছেলে, একটা শখ জানালুম। তুমি পুরুষমানুষ। শেষ ডিসিশান তো তোমার হাতে? হ্যাঁ একটা সুটকেস নিয়ে এসো—যদি ব্রেকডাউন-টাউন হয়ে যায়। আর সব আমি নিচ্ছি। শিগগির এসো!

কীর্তি ভাবলো, হুঁ সে পুরুষমানুষ, কুল্লে ডিসিশন তার হাতে। দু রাত্তির যেতে না যেতেই যে-শিপ্রাচক্রের প্রত্যন্ত প্রদেশে সে লিকলিক করতো হঠাৎ হয়ে গেল সে-চক্রের চক্রবর্তী। নিজেকে সাতিশয় মহিমান্বিত পদে উন্নীত দেখেও তার থেকে অবিমিশ্র আনন্দ আহরণ করতে পারলো না। সে বহুদিন বার বার অনুভব করেছে, শিপ্রার কমন সেন্স্, সাংসারিক বুদ্ধি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। যাকে বলে কালচার—সেখানে তো কোনো তুলনাই হয় না। সর্বোপরি কী স্ত্রীলোক কী পুরুষ কস্মিনকালেও কেউ কড়ে আঙুলটি তক্ তুলে ইঙ্গিত মাত্র দেয় নি তার ব্যক্তিত্বে রয়েছে বিকট একটা পৌরুষ ভাব।

সে ড্যুক অব এডিনবরা হতে রাজী আছে সানন্দে। কিন্তু রানী এলিজাবেথের সিংহাসনে বসতে যাবে কোন্ দুঃখে ?

ভরসাও অবশ্য আছে শিপ্রা বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাকে যে অযথা অকূল দরিয়ায় ডোবাবে সেটা একেবারেই অসম্ভব। যে মেয়ে কি না ইহজন্মে কোনো বেয়াড়া বয়কে ডিসমিস করে নি। কলকাতা শহরে রীতিমত "লজ্জাস্কর" রেকর্ড।

তা সে যাক্‌গে। অত ভেবে কি হবে ? কিন্তু ভাবনাটা সুখ দিচ্ছে যে।

যাত্রারম্ভের শেষ ফিনিশিং টাচ্ সমাপন করে শিপ্রা শুধোলে, "তুমি চালাবে ? ড্রাইভার ছুটি নিয়েছে।"

আঁৎকে উঠে কীর্তিনাশ বললে, "সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। তোমাকে কেউ বলে নি, আমি নিজে যখন গাড়ি চালাই তখন সেটাতে মড়া লাশকেও লিফ্‌ট দিতে রাজী হই নে। করবো অ্যাকসিডেণ্ট, পুলিস বলবে তারই ফলে লোকটা মারা গেছে।"

স্টিয়ারিঙে বসে শিপ্রা বললে, "ফাজলামো রাখো। সোভানী মোটরের জউরী। তার মুখে নিদেন একশ' বার শুনেছি তোমার মত মোটর মেরামতির হুনুরি এ-দেশে তো নেইই জর্মনিতেও মেলা ভার।"

"কে বলেছে ? সোভানী ? তা তো বলবেই। আহা, কালকের পার্টিতে যদি দেখতে তার নৃত্যকলা। তুমি তখন লনের অন্য কোণে, কোন্ এক কন্‌সাল না কি যেন—মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মোলায়েম করছিলে। এদিকে সোভানী তার ইয়া আড়াইমণী লাশটাকে লনের উপর বিন ঠেকনা দাঁড় করাতে পারছেন না, ওদিকে সে অন্ধর ফিল্ম স্টার গোলাবাম্মাকে ভরত নাট্যমের কি একটা দারুণ জিগ্‌জাগ্ স্টেপ দেখাবেই দেখাবে। দু পাত্তর টেনেই মগজটি গোবলেট। ভরত নৃত্য সশরীরে দেখাতে গিয়ে দু হাতের চেটো উল্টো করে কোমরে রাখলো লখনৌয়ের বাইজী স্টাইলে। তার পর সে হাতীর পায়ের সাইজের এক একখানা থাবা দিয়ে দেখাতে লাগল হরেক রকম মুদ্রা। কি একটা গানও ধরেছিলো বুঝি "বাজত ঘুঙুরিয়া" না কি যেন। শেষটায় জড়ানো গলায় গোলাবাম্মার দিকে সাতিশয় বিনয়নম্র লাজুক নয়নে তাকিয়ে বললে, "আপনার মতো গুণিনকে বুঝিয়ে বলতে হবে না—সেটা হবে কেরিইং কোল টু এ বার্ড ইন দি হ্যাণ্ড—এ নৃত্যটার মূল বক্তব্য হচ্ছে তন্বঙ্গী শ্রীরাধা রসরাজ কেষ্ট ঠাকুরকে তাঁর পূর্বরাগ নিবেদন করছেন।"

শিপ্রা খুশী হয়ে বললে, "পার্টিটা তো তাহলে দারুণ সাকসেসফুল হয়েছিল। আর কি দেখলে ?"

"সেটা ঘটে নি তাই দেখেছি বলি কি প্রকারে ?"

"যথা—"

"বাসন্তী আর সুশান্ত তো চিরন্তনী মানিক জোড়। পার্টি পরবের কথা বাদ দাও, তাঁরা হাঁচেন এক সঙ্গে, কাশেন এক সুরে। কাল দুজনা বসেছিলেন পার্টি নদীর দু'পারে—চখাচখীর মিলন হয় না, জানো তো। এ তারো বাড়া। যেন চির বিরহের সতীদাহে দু'পারে দু'জন দগ্ধ হবেন! মাঝে মাঝে আবার একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন। বাপস্। তখন চোখ থেকে আগুনের যা হল্কা বেরুচ্ছিল, আমি তো ভয়ে মরি, তোমার সাধের বাড়িটাতে না আগুন লেগে যায়।"

"আরো বিস্তর দেখবার ছিল, শোনবারও ছিল। হ্যাঁ, পূব বাঙলার পলিটিক্স্ নিয়ে দেখলুম দু'একজন চিন্তিত।"

শিপ্রা বললে, "তুমি তো খবরের কাগজের হেড লাইনগুলোও পড়ো না, সে আমি জানি। আর আমি পড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ব্যাপারটা সত্যি বড্ড খারাপ মোড় নিচ্ছে।"

কীর্তি বুঝলো, শিপ্রা পূব বাংলার পলিটিক্স্টা খুবই সিরিয়াসলি নিয়েছে। তাই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শুধলো, "আমাদের কি বিশেষ গন্তব্যস্থল আছে?"

শিপ্রা বললে, "বসো গঙ্গা পেরোই। তারপর তুমি স্থির করবে। বোলপুর যাবে? শান্তিনিকেতন?"

কীর্তি বললে, "বোলপুর—হ্যাঁ।" তারপর ঈষৎ কাতর কণ্ঠে বললে, "শান্তিনিকেতনে যেতে কিন্তু আমার সঙ্কোচ বোধ হয়, এমন কি ভয় করে।"

শিপ্রা আশ্চর্য হয়ে শুধলো, "কেন?"

"ওখানে সঙ্গীত নৃত্য এসব তো আছেই তার উপর সেখানে হয় নানা-প্রকারের বিস্তর রিসার্চ। এ-সব তো আমি জানি নে, বুঝি নে। কারো না কারো সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। তখন তিনি যদি কোনো প্রশ্ন শোধান বা আলোচনা পাড়েন তখন আমি মুখ খুললেই তো চিত্তির। আবার একদম চুপ করে থাকাটাও অভদ্রতা।"

"এ তোমার বাড়াবাড়ি, আমি ভালো করে জানি, তুমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বহু বৎসর ধরে মন দিয়ে পড়ছো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কালেকশন তোমার যা আছে সেটা রীতিমত বিরল।"

কীর্তি করুণতর কণ্ঠে বললে, "ভাই, সে আমার নিতান্ত আপন আনন্দ। কিন্তু আটঘাট বেঁধে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় ঐ দিয়ে কিছু বলতে যাওয়া তো সম্পূর্ণ ভিন্ন শিরঃপীড়া।"

শিপ্রা বাঁ হাত দিয়ে কীর্তির উরু চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "থাক্ না তা হলে আশ্রম দর্শন। এগোই তো উপস্থিত পশ্চিমদিকে। তারপর দেখা যাবে।"

কীর্তি বললে, "তুমি আমাকে ভুল বুঝলে আমার দুঃখের অবধি থাকবে না। যাকে বলে রবীন্দ্রদর্শন তার সঙ্গে আমার পরিচয় অতিশয় নগণ্য। তবু আমার একটা অন্ধবিশ্বাস—বরঞ্চ বললে ভালো হয় আমার ইনসটিন্‌ক্‌ট বলে—রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ এই দুটি লোক যা করে গেছেন সেটা পরিপূর্ণভাবে আপন বুকের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে, ঐ দিয়ে মগজের সেলগুলোর গঠন পাল্‌টে নিতে আমাদের আরো একশ' বছর লাগবে।"

শিপ্রা বললে, "জর্মনরাও বলে গ্যোটেকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে তাদের আরো একশ' বছর লাগবে। একাধিক চিন্তাশীল লোক বলেছেন, গ্যোটের নির্দেশ যদি সত্যিই আমরা আমাদের চিন্তাধারায়, আদর্শ নির্মাণে মেনে নিয়ে থাকতুম তা হলে হিটলারের আবির্ভাব হত না।"

শীতকালে পশ্চিম বাঙলার বিশেষ করে বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি থাকে না। তবে লক্ষ্য করলে প্রকৃতির একটা দিক মাঝে মাঝে বড়ই চমক লাগায়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো। শার্সি দিয়ে তাকিয়ে ঠাহর করা গেল না দেবতা আকাশে উদয় হয়েছেন কি না। তারপর হঠাৎ এক ঝটকায় সব দুনিয়া সাফ, আসমান জমীন এমন কি হাওয়াটাও যেন আলোয় আলোময় হয়ে গেল। রাজা অনেক আগেই আকাশের বেশ উঁচ জায়গায় সিংহাসনে আসন নিয়ে বসেছিলেন। সামনে ছিল যবনিকা। লগ্নকাল প্রত্যাসন্ন হওয়া মাত্রই বাজাদেশে দ্বারী চক্ষের পলকে সে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছে।

আজ কুয়াশা কাটলো ধীরে ধীরে। মোটরও এগিয়েছিল সাবধানে। শ্রীরামপুর পেরনোর পর শিপ্রা বললে, "এরই কাছেপিঠে ডাইনে মোড় নিলে একটা পুকুর আছে। উঁচু পাড়িতে ছোট বড় গাছ-গাছালি রোদ্দুরটা পিঠ তাতালে সতরঞ্চি একটু সরিয়ে নিলেই হল। কিংবা বর্ধমান পেরিয়ে বাবার বন্ধুর বাগানবাড়ি। দশ বছর ধরে ফাঁকা। একটা মালী আছে মাত্র। কোন্‌টা পছন্দ? আমার কোনো চয়েস নেই।"

"এই শীতের সকালে চলাটাই লাগছে বেশ, বসাটার চেয়ে।"

যদিও ফ্লাস্কে বিস্তর চা কফি ছিল তবু একটা পেট্রল স্টেশনের পাশে দরমার দোকানের বেঞ্চিতে দু'জনাতে চা খেতে বসল।

কীর্তি দোকানীকে শুধলো, "ব্যবসা-বাণিজ্য কি রকম চলছে?"

অত্যন্ত সবিনয়ে বললে, "আমাদের খদ্দের তো গোরুর গাড়ি। এখন বাবুরা হুশ করে মোটরে চলে যান। বাস্‌ দাঁড়ালে সেও বা কতক্ষণ। গোরুর গাড়ি কমে যাচ্ছে। দোকানটাকে তাই খাড়া করতে পারছি নে।"

শুকনো দরদ শোনাবার মত এদের দু'জনার কেউ নয়।

কীর্তি বললে, "এটা বাঙলাদেশ, আবার ঢাকা সিলেটও বাংলাদেশ। কিন্তু আমার মনে হয় বাস্‌, মোটর বোধহয় বাঙালদেশের নৌকোকে এতখানি ঘায়েল

করতে পারে নি। তুমি কখনো বাঙালদেশে গেছ ?"

হেসে বললে, "খাঁটি বাঙালদেশের মাটিতে কখনো পা ফেলি নি, কিন্তু বাঙালাদেশে গিয়েছি। কোন্ এক স্টীমার কোম্পানির কি যেন এক পরবে কলকাতা থেকে সোঁদরবন হয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাট না কি যেন। কী সুন্দর দেশ, কি বলবো। পরে আরো বলবো এখন চল।"

মোটর চালাতে চালাতে কিন্তু শিপ্রা বলে যেতে লাগলো প্যারিসের গল্প। কথায় কথায় শুধলো, "তুমিও তো প্যারিসে ছিলে ?"

"আমি একটা অপদার্থ। মোকামে পেঁছাই। সব বলবো।"

সপ্তম অধ্যায়

বাগানবাড়িটি শৌখিন নয় বটে কিন্তু মালীটাও আলসে নয়।

বাড়িটার প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার তিন দিকের প্রান্তর পরিমাণ বারান্দাগুলো। বাগান, রাস্তা পেরিয়েই কাটা ধানে খোঁচা খোঁচা শূন্য ক্ষেত। দিগন্তে গ্রামের সবুজ আভা। মালী প্রাচীন দিনের, অধুনা লুপ্তপ্রায় আরামদায়ক দু'খানা ডেক-চেয়ার পেতে দিয়েছে। মোটর থেকে বের করে সতরঞ্চি কুশনও।

শিপ্রা বললে, "রবীন্দ্রনাথের গানে আছে, 'সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা', আর তোমাদের গানে আছে, 'দুপুরবেলার পিন্‌জিন্ গো সন্ধেবেলার উ-ই-স্কি।' কি খাবে বলো।"

বিলিতি পিন্‌ক্ জিন্ এদেশের বেয়ারা-বুলিতে পিন্‌জিন্। ছোট্ট গেলাসে প্রথমে কয়েক ফোঁটা বিটার্‌স্ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেলাসে জিন্ ঢালা হয়। এটাকে জিন এণ্ড বিটার্‌স্ও বলেন কেউ কেউ। তবে এদেশে, বিশেষ করে গরমের দিনে, জিনের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা পাতি লেবুর রস দিয়ে গিমলেট্‌টাই পছন্দ করেন স্মার্ট সেটের অধিকাংশ মেম্বার।

কীর্তি সঙ্গে সঙ্গে বললে, "না, আমি সাদা চোখে কথা কইব।"

শিপ্রা আতঙ্কের ভান করে বললো, "আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন গো ? তুমি কি জর্মন আর আমি ফ্রান্‌স যে যুদ্ধশেষে সন্ধির শর্ত নিয়ে দর কষাকষি করতে এসেছি ?"

প্রথমটায় সামান্য একটু হকচকিয়ে কীর্তি হেসে বললো, "ধরো তাই। কিন্তু আমার কোনোই শর্ত নেই। এতটা কাল আমি তোমার ভিতরে গণ্ডিতে ছিলুম না। তবু জানতুম, তুমি যে-ধরনের মানুষ—আমি কিছু চাইলে এ ধরনের লোক 'না' বলতে পারে না। তবে এখন, আমি বলছি এখন, তোমার কাছে আমি কোনো-কিছু চাইব কেন ? যদিও আমি আমার সর্বাঙ্গে গৌরবের কাঁথা জড়িয়ে

তোমার কাছে ভিখিরির মত দু'হাত এক জোড় করে এক কণা খুদের তরে উচ্চকণ্ঠে আবেদন আর দাবী দুইই জানাতে পারি।"

শিপ্রা বললে, "আমি যখন নিজের থেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তোমার বুকের কাছে এসেছি তার সরল অর্থ, এবং আমার অধিকার তুমি আমাকে তোমার ডানার ভিতরে গুঁজে নিয়ে সর্ব বিপদ সর্ব আঘাত থেকে রক্ষা করবে। যেখানে কনের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো কথাই ওঠে না সেখানেও পিতা যখন সম্প্রদান করে তখনো তো বর জানে তার ঘাড়ে কি দায়িত্ব চাপানো হল। আর—"

বাধা দিয়ে অবিমিশ্র সরল এবং অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে কীর্তি বললে, "অপদার্থ। আমি যে কত বড় অপদার্থ সেইটে আমি জানি এবং সেটা তুমি আমাকে আজ এখানে না আনলে আজ দুপুরে তোমার বাড়িতে গিয়ে সেইটে ভালো করে বুঝিয়ে আসতুম। আমার মাত্র ঐ একটি বক্তব্য আছেঃ সেটা— আমি অপদার্থ।"

তথ্যটা যাতে করে শিপ্রার চৈতন্যে গভীর দাগ কাটে তাই কীর্তি 'অপদার্থ' শব্দটার উপর পুরো জোর দিয়ে চুপ করে রইল।

তত্ত্বটা সত্য হোক মিথ্যে হোক, একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কীর্তিকে যারাই চিনতো তারাই জানতো, ওর ভিতরে রত্তিভর ভড়ং নেই এবং সে যে অপদার্থ সেটা তার সরল, স্বাভাবিক অকৃত্রিম বিশ্বাস।

পক্ষান্তরে স্মার্ট, নন্-স্মার্ট সব চক্রই আপন আপন অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসন্দেহে সোৎসাহে হলপ নিতে এগিয়ে আসতো যে শিপ্রার মত স্থির বুদ্ধি-ধারিণী কন্যার মাথায় হাত বুলোতে পারে এহেন ধুরন্ধর মহানগরীতে বিরল— সর্বসমক্ষে বুলোয় একমাত্র তার চাকর বেয়ারা ঝি আয়া।

তা হলে প্রশ্ন, জেনে বুঝে এই শিপ্রা "অপদার্থ" কীর্তিকে তার পার্টি রাউণ্ডে ইন্‌কাম ট্যাক্‌স্ অফিসারের সঙ্গে বচসা করার জন্য—অবশ্য ব্রীফিংটা পুরোপুরি শিপ্রারই—পাঠায় কেন? অবশ্য সেটা যে খুব একটা চোখে ঠেকত তা নয়। আর পাঁচজনকেও সে এ-কাজ ও-কাজের ভার দিত। তারাও সানন্দে কর্ম সমাপন করে দিত। তার কারণটাও জলের মত পরিষ্কার। এই জটিল কলকাতার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক করপরেশনিক যুক্তফ্রণ্টিক গোলক ধাঁধার ভিতরে বাইরে বহুজনকে নিত্য নিত্য এমন সব ব্যক্তিগত লজ্জাবতী-লতার মত সাতিশয় ডেলিকেট সংকটের সম্মুখীন হতে হয় স্থলে বুদ্ধিমতী যে রমণী তার মৃদুহাস্য, তার দরদিয়া অনুরোধ তার মোহনিয়া ছল-কাতরতা দিয়ে গ্রন্থিমোচন করে দিতে পারে অধিকাংশ সমস্যাতেই।

অবশ্য নিঃসন্দেহে বলতে হয়, শিপ্রার চাণক্যদত্ত এই কূটনৈতিক দক্ষতার খবর জানতো অতি অল্প লোকই। সর্বসমক্ষে সে তাবৎ পার্টির প্রাণ, তাবৎ ক্লাবের জান্।

সেই শিপ্রা এই "অপদার্থ" কীর্তিটাকে কি তবে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে?—যদিও সে যে শিপ্রার প্রসাদ পেয়েছে সেটা মাত্র দু' দিনের ভিতর কারোরই জানার কথা নয়। কাল যে পার্টি হয়ে গেল সেখানেও কীর্তিবাবু ছিলেন ঐতিহ্য অনুযায়ী পূর্ববৎ পার্টিফীল্ডের লাইনসম্যান। কোথায় ভুবন-ভাগানের ক্যাপটেন শিপ্রা, আর কোথায় সে!

কিন্তু বাঁদর নাচ নাচানো মেয়ে শিপ্রা নয়।

শিপ্রা তাকিয়ে আছে অলস নয়নে রাস্তার দিকে। সাঁওতাল মেয়েরা জোড়া জোড়ায় একে অন্যের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে নিচু গলায় কোরাস গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে হাট থেকে কেনাকাটা সেরে। সাঁওতাল পুরুষের চিহ্নমাত্র নেই। একটি সাঁওতাল মেয়ে শুধু চলেছে জোড় না মিলিয়ে। হাতে একটা কঞ্চি। সেটা দিয়ে কখনো বা আস্ফালন করে, কখনো বা দু'কদম নেচে নেয়, কখনো বা কঞ্চি দিয়ে অন্য মেয়েগুলোকে শাসায় আর তারা খিলখিল করে হাসে। আসলে সাঁওতাল মেয়েরা হাটে বাজারে তাড়িফাড়ি খায় না। এ মেয়েটা ব্যত্যয়—এবং সাতিশয় ব্যত্যয়। বেশ খানিকটে গিলেছে। তাই তার এই ফুর্তি।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি কীর্তিকে দৃশ্যটা দেখিয়ে বললে, "দেখো, দেখো এই মেয়েটা হচ্ছে আমার সাঁওতাল সংস্করণ—ওদের সোসাইটি গার্ল।"

কীর্তি প্রথমটায় আদৌ বুঝতে পারে নি, ব্যাপারটা কি। বললে, "ছিঃ! এ-মেয়েটা তো রীতিমত বে-এক্তেয়ার।"

শিপ্রা বললে, "আহা, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। ভিন্ন ভিন্ন সোসাইটির ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্নের বে-এক্তেয়ারির রকম-ফের হয়। আমাদের অজ পাড়াগাঁয়েও দু'একটি মেয়ের উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব থাকে—তোমরা যাকে বলো, 'ফ্লাইটি গার্ল', একেবারে যেন শব্দে শব্দে অনুবাদ। তার ফষ্টিনষ্টি আর প্যারিবাসিনীর অর্ধোন্মত্ত তাণ্ডব লম্ফঝম্প কি একই প্যাটার্নের? তবে হ্যাঁ, যেখানে মদের প্রচলন নেই সেখানে এসব ব্যাপারে মাত্রাধিক্য হয় না।" তারপর বেশ কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে বললে, "জানো কীর্তি, আমি অনেক দেশ দেখেছি; আমার জানা মতে পূব বাঙলার একটা বৈশিষ্ট্য যে ওরা মদ খায় না। চাষাভুষো তাড়ি খায় না, মধ্যবিত্তদের তো কথাই নেই আর পার্টিশনের আগে পর্যন্ত বড় বড় বেশ কিছু জমিদার কলকাতায় বাড়ি বানাতো ফুর্তিফার্তি এবং মদ্যপানের জন্য। ছোট্ট কুর্দিস্তানে কি হয় জানি নে কিন্তু পূব বাঙলার মত একটা মাঝারি রকমের দেশে মদের প্রচলন নেই, এটা সত্যই বিচিত্র ঠেকে আমার কাছে। ওদের কালচারটাই যেন বর্ধমান বীরভূম—এক কথায় রাঢ়ের থেকে স্বতন্ত্র।"

কীর্তি বললে, "হুঁ। কিন্তু ঢাকা বেতার যা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় সেটা কলকাতার চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নয়। তবে পিণ্ডির রাজারা সেটা প্রায়

বন্ধ করে দিয়েছেন।"

শিপ্রা বাঁকা হাসি হেসে বললে, "তুমি অতশত খবর রাখো কি করে। তুমি না অপদার্থ।"

অষ্টম অধ্যায়

"কীর্তি।"

"ইয়েস, ম্যাডাম।"

"ঠাট্টা নয়। তোমাকে গুটিকয়েক কথা বলতে চাই।"

"দোহাই তোমার। আমি বড় আনন্দে ডুবে আছি। দয়া করে সেটাকে থাকতে দাও।"

"তুমি যদি আমার কথাগুলো ঠিক মত গ্রহণ করো, তোমার ভিতর যে স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে তারই সাহায্য নিয়ে আমার কথাগুলো বুঝে নাও তবে তোমার আনন্দ কিছু মাত্র কমবে না। কলকাতায় আমার ঘরে শুয়ে শুয়ে তোমাকে যে এ-কথাগুলো বলা যেত না তা নয়। কিন্তু তুমি একাধিক বার বলেছ, আমার স্বরটি বড় রোমাণ্টিক। সেখানে যে আবহাওয়ায় তুমি কি বুঝতে কি বুঝবে, কি বলতে কি বলবে তার জন্যে পরে হয়তো পস্তাবে। তাই তোমাকে এখানে টেনে এনেছি। এখানে চতুর্দিকে লোকজন রয়েছে। হঠাৎ হৃদয়াবেগে আমার হাঁটু জড়িয়ে হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়তে পারবে না, আমিও তখন সর্ব সংকল্প ভুলে গিয়ে তোমার কান্নায় গলে যাবো না।"

বেচারা কীর্তি কোন্ দিকে যে হাওয়া বইছে কিছুই অনুমান করতে পারছিল না। স্তব্ধ হয়ে শুধু শিপ্রার দিকে তাকিয়ে রইল।

শিপ্রাও সোজা স্থির পূর্ণ দৃষ্টিতে কীর্তির দু'চোখে আপন দু'চোখ রেখে তার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, "আমি তোমার চেয়ে ছ'বছরের বড়, কিংবা বেশী, কম নিশ্চয়ই নয়। আমাদের বিয়ে হতে পারে না।" শিপ্রা সজ্ঞানে কথা বন্ধ করলো। হয়তো বা কীর্তির মুখ থেকে কোনো মন্তব্য প্রত্যাশা করছিল। হয়তো বা তার প্রত্যেকটি বক্তব্য যেন অক্ষরে অক্ষরে, তার সম্পূর্ণ অর্থ নিয়ে কীর্তির বোধগম্য হয় তার জন্য আপন নীরবতা দিয়ে তাকে সুযোগ দিচ্ছিল।

কিন্তু কোনো উত্তরই দিল না। কিন্তু সে যে বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছে সেটা তার মুখের ভাব পরিবর্তন থেকেই বোঝা গেল।

শিপ্রা ঠিক আগেরই মত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, "কিন্তু তারই ফলে আমাদের ভালোবাসাতে সামান্যতম আঁচড়টুকু লাগবে না, আমাদের ভালোবাসাতে কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রকারের অসম্পূর্ণতা থাকবে না। কারণ আমি স্থির নিশ্চয় জানি, আমার সর্ব সত্তা দিয়ে অনুভব করেছি, তোমার ভালোবাসা একাগ্র

ভালোবাসা, তুমি আর তোমার প্রেম অভিন্ন সত্তা ; আর আমার প্রেম তুমি দিনে দিনে চিনে নিয়ো, আমি আশা ধরি, তুমি কোনো দিন তার শেষ অতলে পেঁছিতে পারবে না। এবং তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলি, এই কলকাতার শহরে শত শত গতানুগতিক যে-সব বিয়ে হচ্ছে সেখানে বর যা পায় তার চেয়ে তুমি পাবে এত বেশী যে দুটোর কোনো তুলনাই হয় না। সে-সব আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি বাস্তবে পাবে। আর আমি তোমার কাছ থেকে কি পাবো, কি নেব সেটাও আমি ভালো করেই জানি।

তুমি যে আনন্দসাগরে ডুবে আছো সেটাতেই তুমি থাকবে—শুধু আমাকে পাবে পাশাপাশি।"

হায়রে কলকাতার রোমাণ্টিক সুখনীড় থেকে দূরে এসে পথপার্শ্বে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যুগ্ম ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সর্বপ্রকার কবিত্ব বর্জিত সাদামাটা ভাষায় আলোচনা করার নিষ্ফল প্রচেষ্টা !

এ বিশ্বাস অবশ্য শিপ্রার পরিচিত জনের ছিল যে, সে যদি কখনো প্রেমে পড়ে তার স্যাঁতসেঁতে-হৃদয় বাঙালীর মত রস-সায়রে হাবুডুবু খাবে না, তার প্রেম হবে পাক্কা ইংরিজি কায়দায়—বিজনেস ইজ বিজনেস—হোক না লেনদেনের বস্তু ওক কাঠের তক্তার স্থলে যুবক যুবতীর প্রেম।

কিন্তু এর পরই কৌতূহল জাগার কথা, শিপ্রার বক্তব্য শুনে—তা সে রোমাণ্টিক ভাষাতেই হোক কিংবা কাঠখোট্টা কাঠের ভাষাতেই হোক—আমাদের অপদার্থ কীর্তি ঠাকুরের হৃদয়মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো।

এ-কাহিনী যদি প্রেমের মোলায়েম গদ্য কাব্য হত তবে তারই সরস বর্ণনা দিয়ে হেসে খেলে দু'দশ অধ্যায় জুড়ে বিরাট রসসৌধ নির্মাণ করলে যুবজন উল্লসিত হতেন। কিন্তু এ-স্থলে এই যুবক যুবতী অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেচে, সে পথে প্রেম-রস মুখ্য নয় গৌণও নয়—সেটি তাদের পাথেয়।

আত্মম্ভরিতার গ্যাসে ভর্তি বেলুনমুণ্ড অকালকুষ্মাণ্ড ভিন্ন অন্য যে-কোনে সাদামাটা বাঙালী প্রেমমুগ্ধজন তার প্রতিদান পেলে এতই আত্মহারা হয় যে সে আর তখন প্রিয়ার অন্য কথা শুনতে পায় না। অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার সাবধান বাণী, দু'জনার শান্তিময় জীবন যাপনের জন্য সামান্য দু'একটি বোঝা-পড়ার কথা কিছুই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। হারানো ছেলে ফিরে পেলে দুখিনী-মায়ের চতুর্দিকময় ঘন অন্ধকার যে রকম এক-মুহূর্তে অন্তর্ধান করে, কীর্তির বেলা হল তাই।

তার চেতনায় মাত্র একটি অনুভূতি—পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি।

এই আনন্দলোককে লণ্ডভণ্ড করবে কোন্ পাষণ্ড !

শিপ্রা তার মধুরতম হাসি দিয়ে কীর্তিকে নিরঙ্কুশ আত্মহারা করে দিয়ে বললে, "কীর্তি, তুমি যে আনন্দ সায়রে অবগাহন করছো সেটাতে আমি ঝড়

তুফান তুলতে চাই নে। আমার যা বলার সেটা বলা হয়ে গিয়েছে। তুমি রস-সায়র থেকে ওঠার পর তাই নিয়ে চিন্তা করে যদি কিছু বলার থাকে, কাল বলো। উপস্থিত তোমার সায়র থেকে যে দু'চারটি মুক্তো আহরণ করেছ সেগুলো দেখাও।"

সে-যাত্রা আর বোলপুর হল না। সামনে ময়ূর সিংহাসন। সেটা ছেড়ে কোন মূর্খ ধায় কাবুল কান্দাহার পানে সেখানে মোড়ার উপর বসবে বলে।

নবম অধ্যায়

কীর্তি আসামাত্রই শিপ্রা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "পড়েছো কাগজে পাজির পা-ঝাড়াদের ছুঁচোমোটা?"

কীর্তি হাবার মত তাকিয়ে রইলো।

শিপ্রা বললে, "বাবার সঙ্গে যখন প্যারিসে ছিলুম তখন ফরাসীদের মিলিটারি একাডেমি স্যাঁ সীরের কয়েকটি অফিসার বাবার সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুনিয়ার যত রকমের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো। একদিন কি একটা মিলিটারি প্রশ্ন উঠলে তারই খেই ধরে যে চারটি কথাবার্তা হল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল আর পাঁচটা বাঙালীর মত বাবা মিলিটারির কিছুই জানে না—এস্তেক মিলিটারির ইতিহাস—যা কিনা সহজ পাঠ্য—তাও পাল্টে দেখে নি। অফিসারগুষ্টি তো বিস্ময়ে নির্বাক। শেষটায় এক জাঁদরেল বললে, 'মঁসিয়ো, এ কী অদ্ভুত ঠাসবুনোট-জড়োয়া কাশ্মীরী শালের মাঝখানে একটা বিরাট ফুটো। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য চিত্রকলা—বিশেষ করে জুরিস প্রুডেনস থেকে আরম্ভ করে হেন বিষয় নেই যেটা আপনি হজম করে আপন সিস্টেমে বেমালুম মিশিয়ে নেন, আর মিলিটারি সায়েন্সের কিছুই জানেন না, এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য!'

বাবা একটু সলজ্জ ভাষায় বললেন, 'ইংরেজ দু'শ' বচ্ছর ধরে বিশেষ করে বাঙালীদের ঐ জিনিসটার দিকে ঘেঁষতে দেয় নি। পাখি মারার সামান্য একটা শট্‌গান যোগাড় করতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। মিলিটারি সায়েন্স তো প্যোর ফিজিক্‌স্ নয় যে পুরোনো খামের উল্টো পিঠে তার ফরমুলা লিখে কর্ম খতম করা যায়।'

তারা তখন উঠে পড়ে লেগে গেলো বাবাকে ঐ বিষয়টি শেখাবেই শেখাবে। কাঁহা কাঁহা মোকামে নিয়ে গিয়ে কি সব দেখাতো বোঝাতো খোদায় মালুম। ফরাসীদের যে সব চেয়ে বিরাট কলেবর বন্দুক কামানের কারখানা শ্লাইডার সেটা পর্যন্ত দেখিয়েছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। শামিয়ানা সাইজের বৃহৎ বৃহৎ বাণ্ডিল বাণ্ডিল ম্যাপ

পাতা হত কার্পেটের উপর, এবং সব্বাই তারই উপর উপু হয়ে স্টাডি করতেন ইতিহাসের নামজাদা সব ক্যাম্পেন—নেপোলিয়নের আউস্টার্‌লিৎস থেকে আরম্ভ করে এদানির ডি ডে নরমাঁদি ল্যান্ডিং। একদিন কোত্থেকে যোগাড় করে এনেছিল বাবুর বাদশার পানিপথ লড়াইয়ের স্ট্রাটেজি। সেটার অধ্যয়ন শেষ হলে ফরাসীরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বার বার বলছিল, 'ফাঁতাসতিক, ফরামিদাবল—নে' স পা ?' অর্থাৎ ফ্যানটাসটিক্, ফরমিডেবল—নয় কি ? কিন্তু এহ বাহ্য।"

একটু দম নিয়ে তারপর শিপ্রা বললে, "কিন্তু যে-কথা বলতে চাইছিলুম সেটা এ-সবের বিচিত্র স্মৃতির চাপে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলুম। সব চেয়ে আমাকে মুগ্ধ—মুগ্ধ কেন আত্মহারা করেছিল এদের আদব-কায়দা এদের অপারিসীম সৌজন্য ভদ্রতা। এবং সর্বোপরি তাদের তীব্রতম আত্মসম্মানবোধ কাউকে কোনো কথা দিলে সেটা রাখবেই রাখবে—যায় যাক্ তাতে তার শেষ ফ্রাঁ। এবং সেটা দিয়েও যদি শেষ শোধবোধ না হয় তবে সোজা রাস্তা রয়েছে নাক বরাবর। কপালে পিস্তলটি রেখে গুড়ুম!...

"তাই বলছিলুম, এ-ছুঁচোমোটা কেন ? তুই ইয়েহিয়া, তুই বাবা প্রেসিডেন্ট ডিক্‌টেটর যা-খুশী তাই নিবি তো নে। পূব বাঙলার লোক যদি তোর আদেশ অমান্য করে তবে চালা তোর বন্দুক কামান। আজকের দুনিয়া পরশুর ইতিহাস বিচার করবে ধর্মাধর্ম।

ডিকটেটর হ' আর যাই হ' তোর আসল স্বত্বটা কি ? এবাভ্ অল তুই আর্মি ম্যান, অফিসার। তোর শরীরের রক্ত, বাইরের চামড়া অফিসারের ধাতু দিয়ে তৈরী। তোর ধর্ম, আত্মগৌরব আত্মসম্মানবোধ। অনার। কথা দিবি নি, দিস্ নি। কিন্তু একবার দিলে জান কবুল। কী দরকার ছিল তোর গণতন্ত্র ফের চালু করার তরে ওয়ার্ড অব অনার দেবার ? কি দায় পড়েছিল ইলেকশন করার ? আর এখন হল কি ? সোলজার, অফিসার হয়ে তুই তোর শপথ ভঙ্গ করলি, তোর স্বধর্ম ত্যাগ করলি। ভদ্র দেশ হলে অফিসারস ক্লাব থেকে তোর নাম কেটে দিত। ছ্যাঃ!"

এতক্ষণে আসমানের বেপরওয়া চিঁড়িয়া কীর্তিবাবুর কানে জল গেল। তাও যেত না যদি না পরশু রাতে তার দেবীর প্রসন্ন বয়ান নির্গত তাপহরা বিন্দু বিন্দু অমৃতবারি তার ব্যথাভরা হিয়াটাকে সদ্য ফোটা বেলফুলের মত বিকশিত করে দিত। সে-রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে পশথ নিয়েছিল, দেবীর পথ তার পথ। পরের দিন ভোরবেলা ইংরিজি কাগজটা তো পড়লই, একটা নেটিভ বাঙলা কাগজের খদ্দের খাঁ ভী হয়ে গেল। কিন্তু দুদিন ধরে অনভ্যাসে ফোঁটা চড়চড় করছিল বড্ডই। দুনিয়ার বেকার হাবিজাবি না দিয়ে কাগজ ভর্তি করা যায় না ? অধিকাংশ খবরের অর্থ কি উদ্দেশ্য কি তার কোনো হদিসই পাচ্ছিল না

সে। আজ যদি কোনো নিরীহ বাঙালী হঠাৎ নটিংহামের একটা লোক্যাল ডেলি পড়তে বসে তবে তার যা অবস্থা হবে কীর্তির হল তাই। কিন্তু তার কপাল ভালো, কালকের বাঙলা কাগজে আওয়ামী লীগের একটি সমসাময়িক ইতিহাস-মূলক প্রবন্ধ ছিল। যাই বলো, যাই কও, কীর্তির বাপঠাকুন্দা স্রেফ মাথা খাটিয়ে এন্তের টাকাকড়ি কামিয়েছিলেন। ম্যান-ইটার বাঘের বাচ্চা তো আর ভেড়ার ছানা হয় না—কীর্তির খুলিটাতে বেশ খানিকটে বংশলব্ধ মদ্যসিক্ত অর্ধসুপ্ত প্যাঁচালো ঘিলু বাবুর খোঁচাতে জেগে ওঠবার তরে তৈরী ছিল। পাকা নায়েব যে রকম শহুরে কাঁচা বাবুকে জমিদারির হালটা দু'দিনেই বেশ খানিকটে বুঝিয়ে দেয় এ ক্ষেত্রেও হল তাই।

সদ্যলব্ধ বিদ্যে ফলিয়ে বললে, "ঐ ইয়েহিয়া ঘুঘুর পেছনে রয়েছেন আস্ত একটা খাটাশ মিলিটারি ক্লিক্।"

শিপ্রার চোখের পাতা স্তব্ধ—যেন অর্ধাঙ্গে অবশ। "এ কি কথা শুনি আজি ?" দুনিয়ার তাবৎ বাবদে বেহদ্দ বেখেয়াল বেকুব "নীচ কুলোদ্ভবা দাসীর" মুখে "সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার" তবে "কি সম্ভবে ?" কীর্তির মুখে মোস্ট আপ্ টু ডেট ইনসাইড স্টোরি।

বিমূঢ় ভাব কেটে যাওয়ার পর শিপ্রা শুধু বললে "তুমি না অপদার্থ কীর্তি ?"

প্রশ্নটা যেন অদৃশ্য ফু মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "ছোঃ, এ-খবরটা আবার পদার্থ ! খবরের কাগজ থেকে যে তত্ত্ব আধঘণ্টার ভিতর যোগাড় করা যায়।"

শিপ্রা আরও সাত বাঁও পানিমে। বললে, "খবরের কাগজ ? ও-সব বদ্ অভ্যাস হল তোমার কবের থেকে ?"

কীর্তি সবিনয়ঃ "সে অনেক কথা পরে হবে।"

শিপ্রাঃ "তাই সই তুমি যখন এ-সব বুঝতে আরম্ভ করেছো তখন তোমাকে আর একটা খবর জানাই। সেই যে বাবার দোস্ত বুড়ো ফরাসী জাঁদরেল বাঙলাদেশের মিলিটারি হিস্ট্রি যোগাড় করার চেষ্টা দিয়েছিলেন—নিছক আমরা ঐ দেশের লোক বলে। এটাও এক রকম দরদী হিয়ার আচরণ বলতে পারো। একদিন বাবাকে কথায় কথায় বললেন, ব্লাঙ্কো, ব্লাঙ্কো ! প্রায় কিছুই যোগাড় করতে পারি নি। তবে দিল্লীতে লেখা এন্তের রাজনৈতিক ইতিহাস পেয়েছি বেশ কিছুটা। তার থেকে স্পষ্ট ধরা পড়ে দিল্লীর হুজুররা বেঙ্গলে মার খেয়েছেন বিস্তর। তাই সে-সম্বন্ধে নীরবতাটাই সমধিক। গ্রেট মোগল আকবরের নাম এ-দেশের লোকও শুনেছে। তিনিও দেখলুম বাঙলাদেশের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র জয় করতে পেরেছিলেন। জয় করেছিলেন তার ছেলে জাঁহাগির। মন্দ কপাল আমার, তার স্ট্র্যাটেজি খুঁজে পেলুম না।

কিন্তু যা পেয়েছি তার থেকে আমি বুঝেছি, এবং জোর গলায় বলতে

পারি—

তেরাঁ, তেরাঁ, পুনরপি তেরাঁ
মল্লভূমি, মল্লভূমি, মল্লভূমি—

এই বিরাট পৃথিবীতে আদ্যন্ত অদ্বিতীয়। বিরাট বিরাট নদী আর পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি যেখানে হয় সেই চেরাপুঞ্জি থেকে নেমে আকাশের জল। দুয়ে মিলে এমন সব ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির জলো ভূমি তৈরী করে যে সেগুলোর নাম ইয়োরোপীয় কোনো ভাষায় নেই। দেশী শব্দের একটা সুর মনে আছে "হাওর" না কি যেন। এমন কি মস্কো যেতে পথে যে জলোজমি সেটাও হিটলার পেরিয়ে যেতে পেরেছিল কিঞ্চিৎ লোকক্ষয় স্বীকার করে। কিন্তু তোমাদের দেশে আমাদের সনাতন সংগ্রাম পদ্ধতি চলবে না।"

শিপ্রা বললে, "আমি এ-সব আলোচনায় যোগ দিতুম না। তখন সেই প্রথম বললুম, 'কিন্তু, মঁসিয়ো ল্যা জেনারেল, আকাশে থেকে বমিং ?' জেনারেল তো গডড্যাম প্ল্যাড। আপন চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কাছে এসে ফরাসীরা ভাবাবেগে, আনন্দোল্লাসে উত্তেজিত হলে যা করে তাই করলেন। সর্বপ্রথম আমার গালে খেলেন গুম্ফকণ্টকিত কিন্তু অতিশয় মিঠে মিঠে একটি চুম্বন, তার পর আমার চুলের উপর বুলোলেন তাঁর হাত, এবং সর্বশেষে রাজপ্রাসাদীয় কায়দায় দিলেন আমার বাঁ হাতটি তুলে ধরে একটি অতিশয় রিফাইনড চুম্বন।

প্রায় নৃত্য করতে করতে বার বার বলেন, "মাদ্‌মোয়াজেল, মাদ্‌মোয়া-জেল্‌।" অর্থাৎ, "কল্যাণী, কল্যাণী।"

সে তো বুঝলুম—ফরাসীরা ঐ ভাবে বে-এক্তেয়ার হয়। তারপর কি বলতে চান তিনি ? আর আমিই বা এমন কোন্ গূঢ় গুহ্য মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিক ট্যাকটিকাল প্রশ্ন শুধিয়েছি যে ঝানু জাঁদরেল আত্মহারা হবেন !

আমার পাশে আসন নিয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর বললেন, 'আমি বড্ড ভুল করেছি, মাদ্‌মোয়াজেল্‌, বড্ড ভুল বুঝেছি এতদিন ধরে। আমি মনে করেছিলাম, তুমি লণ্ডন প্যারিস সমাজে বাস করে করে দেশাত্মবোধ হারিয়ে ফেলেছ, কিন্তু এখন আমি দেখছি তুমি দেশের স্বার্থ, দেশের বিপদ সম্বন্ধে বেশ সচেতন। প্রশ্নটা তো অতিশয় সাদাসিধে, কিন্তু তারই ভিতর দিয়ে আমি তোমার অন্তরের অন্তস্তল অবধি দেখতে পেয়েছি।

শোনো, মাদমোয়াজেল, স্ত্রী হোক পুরুষ হোক সবচেয়ে মূল্যবান ধন মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস সেটাতে মানুষ পৌঁছয় দেশাত্মবোধ, ন্যাশনালিজম, পেট্রিয়টিজমের ভিতর দিয়ে এবং তার দৃঢ় ভূমি'—"

শিপ্রা বললে, "অবাক মানবে, কীর্তি, তার পর সেই বৃদ্ধ জেনারেল এক লাফে কোচ ছেড়ে, যেন অদৃশ্য এক পতাকা এক হাতে উঁচু করে ধরে, রাস্তার ছোকরাদের মত ঘরময় নাচতে নাচতে চেঁচাতে লাগলেন,

লিবের্‌তে, লিবের্‌তে, তুজ্‌র লা লিবের্‌তে
লিবার্টি, লিবার্টি, অলওয়েজ লিবার্টি
স্বাধীনতা স্বাধীনতা, স্বাধীনতা চিরদিনের।

দশম অধ্যায়

"উপরে চল। আমার কোনো বান্ধবী, বন্ধু দূরে থাক, কেউ কখনো দোতলায় ওঠে নি। বাবা কাউকে উপরে আনতেন না বলে আমি সে রীতিটা এখনো মেনে চলি। কিন্তু তোমাকে এখন সব-কিছু দেখে-চিনে নিতে হবে। তুমিই মালিক। যদি চাও, বাড়ি-ঘর যা-কিছু আছে, উইল করে তোমার হাতে সঁপে দেব—"

কীর্তি আঘাত পেল; বললে, "তুমি কি আমাকে এখনো চিনতে পারো নি?"

শিপ্রা তাড়াতাড়ি বললে, "সরি, আমি দুঃখিত। এই হল বাবার স্টাডি। এখানে বসে তিনি বৈষয়িক কাজকর্ম করতেন। আমার খেয়াল খুশীমত ঐ কোণের কোচটাতে বসে খবরের কাগজ, বইটই, মাঝে-মাঝে শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট পড়তুম। আমি জানতুম তিনি তাতে খুশী হতেন। কাজ করতে করতে কখনো গুনগুন করতেন, খুশী হলে শিস্ দিতেন। কোনো কারবার ঠিক তাঁর পছন্দমত না এগোলে গর্‌গর্ করে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। আর প্রায়ই মাথা তুলে বেশ উঁচু গলায় বলতেন, 'দীজ আর লুকিং আপ,' আমাকে শুধোতেন, তোর জন্য শ'খানেক চা-বাগানের শেয়ার কিনবো?" আমি শুধু একটু মুচ্‌কি হাসতুম—আমি ও-সবের কীই বা বুঝতুম তখন? কিন্তু আমাকে কখনো ব্যবসা-বাণিজ্য শেখান নি। বলতেন, 'এসব শুকনো জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করলে মানুষের প্রাণরস শুকিয়ে যায়'—আমি অবশ্য কখনো তাঁর প্রাণরসে ভাটার টান পড়তে দেখি নি। শেষটায় বলতেন, 'তোকে কিচ্ছুটি শেখাতে হবে না। তুই পেয়েছিস আমার ঠাকুমার বুদ্ধি এবং বিশেষ করে বিচক্ষণতা। বাবা পেয়েছিল তার বুদ্ধির বারো আনা, আমি পেলুম আট আনা, তোতে ফের একেবারে ফুল হাউস ন' সিকে। যেদিন দরকার হবে পুরো হপ্তাটাও লাগবে না, তুই হয়ে যাবি "শেয়ার মার্কেট কুইন," কিংবা মফৎ লাগল এবং দেওকরণ নানজীর সমন্বয়।' এবারে চলো এগিয়ে।"

বিরাট জোড়া খাটের বেড রুম। একশ' বছরের পুরনো স্টাইলের।

শিপ্রা বললে, "এখানে বাবার আর একটা ড্রইংরুম আর গেস্ট রুম আছে। তবে এগুলো কখনো ব্যবহার হয় নি। এইখানে বাবার হিস্যে শেষ। এই আমার বেড রুম।"

ছবিতে কীর্তি ফরাসী ধনী কুমারী কন্যার বেডরুম দেখেছে। এবারে আপন চোখে দেখল।

দেওয়ালে ওয়াল পেপারের বদলে খুব দামী সিল্কের ওয়ালকাভার। তার উপর আবার ভিন্ন ভিন্ন রঙিন সিল্ক দিয়ে বেহালাতে জড়ানো ফুলের মালার ডিজাইন। ছাতের চার কোণে চারটি দেবশিশুর বা-রিলীফ। তাদের হাত থেকে ঠিক মাঝখানে এসেছে চারটে ফুলের মালা। সেগুলো যেন ঝুলিয়ে রেখেছে একটা ফোয়ারার পাদপীঠচক্র। পায়ের নিচে ফরাসী কার্পেট।

আর খাটটি ছোট এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা। খাঁটি ফরাসী পালঙ্ক। এমন কি তিনদিকে ফরাসী কায়দায় সিল্কের কার্টেন ঝুলছে। বেড-কাভার ভারী কিন্তু সুতোগুলো অতি মিহিন। কার্টেন আর বেড-কাভারের ডিজাইন দেয়ালের সিল্কের সঙ্গে ম্যাচ কিন্তু মতীফ ভিন্ন—এখানে জলে চালিত ময়দা পেশার ওয়াটার মিল ডিজাইন। ঘরের এক কোণে ড্রেসিং টেবল—তার উপর বিচিত্র ঢপ ঢঙের বিস্তর শিশি বোতল, এক সারি কৌটো—অথচ কীর্তি খুব ভালো করেই লক্ষ্য করে বুঝেছিল শিপ্রা প্রসাধন করে সামান্যতম। সমস্ত ঘরটার কালার স্কীম মভ রঙের।

শিপ্রা বললে, "আমার অত বাহার সয় না। বাবা করিয়েছিলেন টপ টু বটম।"

পাশে শিপ্রার একান্তে বসার বুদওয়ার। তার মধ্যে দ্রষ্টব্য, মাঝারি সাইজের সেক্রেটারিয়েট এবং প্রায় সম্পূর্ণ একটা প্রান্ত জুড়ে বিরাট দৈত্যপ্রমাণ গ্রাণ্ড পিয়ানো।

কীর্তি বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, "তোমাকে তো কখনো পিয়ানো বাজাতে শুনি নি।"

শিপ্রা বললে, "আমার বাজনা শোনাবার মত নয়। মাত্র দশ বছরের ছেঁড়া ছেঁড়া রেওয়াজে শোনাবার মত হাত পাকা হয় না। আমি বাজাই রাত ঘনালে আর অতি ভোরে। এবারে চলো বেলকনিতে।"

একাদশ অধ্যায়

"ভেবে নিয়েছ? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেছ? এখনো ব্যাক-আউট করার সময় আছে?"

কাতর কণ্ঠে কীর্তি বললে, "সমস্ত রাত ভেবেছি। কিন্তু কথাগুলো গুছিয়ে উঠতে পারি নি। আর ভয়ও করছে।"

শিপ্রা একটা কুশনওলা লম্বা হেলান চেয়ারে আধ-শোওয়া হয়ে সামনের

পার্কের দিকে তাকিয়েছিল। বললে, "ট্যারচা হয়ে বসো আর আমার দিকে না তাকিয়ে তাকাও পার্কের দিকে। সবুজ দিয়ে চোখ ভরে নাও। আর ভয়টা কিসের, শুনি।"

যেন প্রাণপণ সিংহের কেশর ধরে, মরি বাঁচি ভাব মুখে মেখে বললে, "মাত্র একটি কথা নিয়ে আমি সমস্ত রাত ভেবেছি। আমাদের যদি বিয়ে না হয় তবে তোমার যে নিন্দে হবে, সে-কথাটা কি ভেবে দেখেছ।"

শিপ্রা অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে সহজ গলায় বললে, "আমি জানতুম তুমি এ-কথাটা তুলবে কিন্তু তুমি না অপদার্থ? তাহলে এ দুশ্চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকলো কি করে? কলকাতা-বোম্বায়ের স্মার্ট সেটের যে-কোনো বিবাহিত অবিবাহিত জোয়ান বুড়ো ক্ষণতরে চিন্তা না করে উল্লাসে নৃত্য করতো আমার মত মেয়েকে মিসট্রেস রূপে পেলে।"

কীর্তি লাফ দিয়ে উঠে শিপ্রার মুখ চেপে ধরে বললে, "মাথার দিব্যি দিচ্ছি, শিপ্রা, তুমি যদি ঐ শব্দটা আর কখনো ব্যবহার করো তবে ঐ তোমার পায়ের সামনে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।"

কীর্তির হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "আচ্ছা আর বলবো না। তোমাকে তো দিব্যি কেটে বলেছি, আমি তোমার সব আদেশ মানবো।"

কীর্তি বললে, "সমস্ত রাত ঐ দুশ্চিন্তাটার সঙ্গে মাখানো ছিল 'আমি পেয়েছি, আমি তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছি'। এবং আমি জানি আমার যে তিনটি সত্যকার খাঁটি বন্ধু, সুদিনদা, শঙ্কর আর খান সায়েব এরাও ঠিক এইভাবেই আমার অনুগ্রহ লাভের কথা ভাববে।"

শিপ্রা উঠে বসে বলল, "আমার যে লোকনিন্দাটা হবে সেকথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পাই নে। লোকনিন্দার প্রাপকরূপে আমি ভেটারন্। আমার বয়স যখন ষোল পেরুল সেদিন বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে তুই এ-বাড়ির মিসট্রেস আর আমি যে-সব পার্টি দিই তাতে হোস্টেস্। বুঝলি? আর আমি আমার ইয়ারদের যে-রকম পার্টি দি তুই যেদিন দিবি সেদিন আমাকে ডাকতে পারিস, নাও ডাকতে পারিস। বুঝলি তো?' সেদিন দুপুরবেলা বাবা আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ডস্, ইস্কুলের সব টীচার এবং অন্যান্য যাদের কাছে পড়েছি আর আমার ফ্রেণ্ডস—ছেলে এবং মেয়ে দুইই—সবাইকে দিলেন জব্বর একটা ভোজ। সেটাতে হোস্টেস হতে আমার কোনো অসুবিধে হয় নি যদিও বাবা নিচের তলায় নেমে আগের মত একবারও তদারকি করেন নি। শুধু খাবার সময় আমাদের হেডমিস্ট্রেসের পাশে বসে তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করতে করতে আহারাদি করেছিলেন।

তোমরা আবার পার্টি করো! আর আমার পার্টিই বা কি? কে এক সোভানী একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে ভরত নৃত্যের নামে হস্তীনৃত্য নেচেছিল!

ঐখানেই তো ফুল স্টপ। বাবার পার্টিতে অন্তত জনা পাঁচেক বেহুঁশকে স্ট্রেচারে করে গাড়িতে তুলতে হত। জনা দশেককে দুজন তাগড়া জোয়ান বেয়ারা দু'দিক থেকে স্যাণ্ডউইচ করে মোটরে তুলে দিত।

অবশ্য বাবা আমাকে বিস্তর টিপস আগের থেকেই দিয়ে রেখেছিল। একটা এখনো মনে আছে। 'যদি লক্ষ্য করিস কেউ একটু বে-এক্তেয়ার হয়ে যাচ্ছে তার পাশে গিয়ে বসবি। তাকে আদর-সোহাগ করে বলবি, "আনকল, তুমি তো জানো, আজ থেকে আমি হোস্টেস। আমার ভারি ইচ্ছে আমি নিজে তোমাকে ড্রিংক দি। তুমি কোনো বেয়ারার ট্রে থেকে ড্রিংক তুলবে না। কথা দাও।" কথা নিজেই দেবে। খাস হোস্টেসের কোনো অনুরোধ কোনো লোক উপেক্ষা করে না। তারপর বার টেবিলে গিয়ে যে ড্রিংকই হোক না সেটা বেয়ারাকে পাতলা করে দিতে বলবি। তাকে বোঝাতে হবে না। তারপর খামকা টালবাহানা করে, এর ওর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বেশ দেরি করে এসে তোর সেই আনকলকে গেলাসটা আপন হাতে রেখে প্রথম তো হাজার দফা মাফ চাইবি তারপর জুড়ে দিবি লম্বা এক কাহিনী—গেলাসটা কিন্তু হাতে। গল্প শেষে গেলাস দিবি। তোর "আনকলটি" ও চক্ষুলজ্জায় তোর কাছে ঘন ঘন ড্রিংক চাইবে না। আর কেউ যদি নিতান্তই বেহেড টালমাটাল হয়ে যায় তবে মজুমদার, কাঞ্জিলাল, ভবতোষ এদের কাউকে একটু হিন্ট দিয়ে আসবি। ওদের মাথা ঠাণ্ডা। সব সংকটে মুশকিল-আসান।'

পার্টি শেষ হল। বাবা ভারি খুশি। বললেন, 'একদিন তুই যে-শহরেই যাস না কেন, নামজাদা হোস্টেস হবি। দু'চারটে পার্টি করার পর মজুমদার, কাঞ্জিলালকেও তোর দরকার হবে না।'

কিন্তু সেই দিন থেকেই আমার বদনাম শুরু। বিস্তর লোকের মুখে ছ্যা ছ্যা। বিশেষ করে মেয়েদের। এমন কি বাবার স্কুলফ্রেন্ড চৌধুরী সাহেব বাবাকে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এটা ঠিক হল না। বাবা বলেছিলেন, 'দেখো, চৌধুরী, তুমি খানদানী মুসলমান ঘরের ছেলে। তোমার চতুর্দশ পুরুষে কেউ মদ খায় নি, তবু তুমি মদ ধরেছ। শুনেছি অভ্যাসটা নাকি মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। আর হিন্দুদের তো কথাই নেই। নিত্যি নিত্যি নূতন নূতন বার খুলছে এবং সেগুলো ভর্তি। বেশীর ভাগ ক্লাবে আসে সুদ্দুমাত্র মদ খেতে। আর ড্রিংক পার্টির কথাই নেই। আমার মেয়ে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, সে আমি জানি তার ছোট্ট বয়স থেকে। তদুপরি তার হিউম্যান ইনট্রেস্ট অফুরন্ত। চাকরবাকররা তাদের বাড়ীতে তাদের সমাজে কি করে, না করে তার থেকে আরম্ভ করে সে কুইন ভিক্টোরিয়ার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছে। এ-মেয়ে পার্টিতে যাবে না, সেটা প্রায় অসম্ভব। তাই পার্টিতে, ক্লাবে বার্-এ একটা ভদ্রমেয়ের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত,

সে-সব জায়গার এটিকেট মেনে নিয়ে ভদ্রতা শালীনতা সহ কিভাবে মেলামেশা করবে, সেটা আমার কাছ থেকে শিখবে, না শিখবে ঐ সব পাঁড় মাতাল ডেঁপো ছোঁড়াদের কাছ থেকে? কোনো ক্লাবে বা পার্টিতে কেউ যদি অশালীন আচরণ করে তখন কি ভাবে চতুরতা এবং ডিপ্লোমেসির সঙ্গে নিজের ভদ্রতা নিজের ডিগনিটি বাঁচিয়ে তাকে ট্যাক্‌ল্‌ করতে সে-সব শেখাবে ঐ-সব ছোঁড়ারা? আর শুধু কি তাই? আজ তাকে বলে রেখেছিলুম সে যেন কর্নেল সরকারের টেবিলে দু'এক সিপ চাখে। আস্তে আস্তে তাকে ভোদকা আবসাঁতেরও দ্রব্যগুণ শেখাব। কোন্‌টা কতখানি ক্ষতি করে ও জেনে নেবে। তারপর কারো পাল্লায় পড়ে যা তা গিলে নিজের অনিষ্ট করবে না, বানচালও হবে না, কাকে কতখানি কি ঢেলে দিতে হবে সেটাও জেনে যাবে—হবে আইডিয়াল হোস্টেস। বাপের চেয়ে ভালো গুরু সে পাবে কোথায়?"

শিপ্রা বললে, "কথাটা অতি সত্য। আমার হাতেখড়ি হয়েছিল বাবার কাছে—পাশে এক গুরুমশাই বসেছিলেন মাত্র। ইস্কুল না-যাওয়া অবধি তাঁরই কাছে সব শিখেছিঃ প্রাইভেট ট্যুটার বাবা ককখনো রাখেন নি। কলেজে পড়ার সময়ও বাবার ঘরের এক কোণে বসে অধিকাংশ সময় পড়াশুনো করতুম। মাঝে মাঝে তাঁকে প্রশ্ন শুধোতুম। জানা থাকলে সুন্দর বুঝিয়ে দিতেন—আর কী অসীম ধৈর্য। না জানা থাকলে একগাল হেসে বলতেন, 'ওরে শিপি, তুই যে বাপ-মরা বিদ্যে রপ্ত করে নিচ্ছিস।' তারপর তাঁর কোনো এক বন্ধু বা পরিচিত স্কলারের কাছে পাঠিয়ে দেবার সময় বলতেন, শিখে এসে আমায় বাত্‌লে দিস্‌।' তাঁর আর একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'গুরুকে আপন বাড়িতে টেনে আনলে সত্য বিদ্যার্জন হয় না। গুরুগৃহে বসে থাকবে বারান্দার বেঞ্চিতে—গুরুর কখন কৃপা হয়'।"

কীর্তি মুগ্ধ হয়ে বললে, "শিপি, তুমি সত্যি ভাগ্যবতী।"

শিপ্রা বললে, "আমার নামে কি-সব বদনাম রটে তার খবর আমি রাখি নে—আমরা যারা পার্টি-ফার্টি করি তাদের মধ্যে কার না বদনাম হয়! কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিবাহিতা রমণী বলে নি, আমার বাড়ি থেকে তার স্বামী বেএক্তেয়ার হয়ে ফিরেছে। বাবা বলতেন, 'তুমি লেডি। এ-আইনটা বিশেষভাবে তোমার বেলা প্রযোজ্য।' আর আমি নিজে যে সব চেয়ে মোলায়েম ড্রিংকে সীমাবদ্ধ করে নিজেকে সংযত রাখবো সে-বিষয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না।"

কীর্তি হাবা ছেলের মত গদ্‌গদ সুরে বললে, "সে কি আমরা জানি নে? কিন্তু ড্রিংক কেন, কোন্‌ ব্যাপারে তোমার সংযম সৌজন্যের অভাব। সুদিনদা যে জালা জালা খায়, ক্লাবের প্রেসিডেণ্টকে পর্যন্ত ডোণ্টো কেয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায় সেও তোমাকে রীতিমত সমীহ করে চলে। আমাকে বলে, 'ওরে মূর্খ!

তোরা ভাবিস শিপ্রা বুঝি বেখেয়ালে আমাদের এটা ওটা দেখতে পায় নি। ও-মেয়ে না দেখেও সব দেখে, না শুনেও সব শুনতে পায়। আর আসল গেরো কি জানিস, তার আচরণ বা কথায় প্রকাশ পাবে না, সে অপরাধ নিয়েছে। তাহলে তো গেরোটা ফস্ করে খুলে যেত—হাত পা ধরে মাপ চেয়ে নেওয়া যেত।' বলে এটাই নাকি তোমার ব্রহ্মাস্ত্র।"

শিপ্রা বললে, "যাঃ! বিশ্বভুবনটা রিফর্ম করার ভারটা কি আমার স্কন্ধে!"

"কিন্তু—"

শিপ্রা বললে, "আজ এ-সব অপ্রিয় আলোচনা এখানেই থাক। ইরানীরা যে-রকম বলে, 'তখন আলোচনার কার্পেটটা রোল করে গুটিয়ে এক কোণে খাড়া করে রাখা হল।' পরে না হয় আমরা ওটা আবার ঘরময় বিছিয়ে পুরনো আলোচনার শেষ রেশ ধরে নূতন করে ঢেলে সাজবো। আরেকটা কথা তোমায় বলি, কীর্তি। আমাকে যতশত গুণের গুদোম মনে করো না কেন, আমি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি দৈবে, অদৃষ্টে—আমি ফেটালিস্ট্, অনেকটা খৈয়ামের মত। তাঁর প্রত্যাদেশ, তারই ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলে পেয়ালা অধরে ধরো। অর্থাৎ আনন্দ করো। সেটা তো মোটামুটি মানিই, কিন্তু সবচেয়ে সেই ফরাসী বৃদ্ধ জেনরেল আমাকে যে ধর্মে দীক্ষা দেন ঃ

লিবের্তে লিবের্তে, তুজুর লা লিবের্তে।"

দ্বাদশ অধ্যায়

খান সাহেবের সঙ্গে কীর্তির হঠাৎ মোলাকাৎ। খান সোৎসাহে বলে, "হ্যারে, কিতে, এদানির তুই শিপ্রা বেগমকে দেখেছিস? আরে, ভাই, বয়েস যেন দশটা বচ্ছর কমে গেছে। মোটরে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে হাত নেড়ে নেড়ে যা প্যারটা জানালে, মাইরি, যেন আমি বহু বচ্ছরের লঙ লস্ট ব্রাদার। মেয়েদের ব্যাপারটাই ভানুমতীর খেল। আমি তো জানতুম বিয়ের জল পড়লে তবে না মেয়েদের জেল্লাই বাড়ে। কালা পেঁচিটা হয়ে যায় সোনালী ক্যানারি!"

কীর্তি ভদ্রতার মৃদু হাসি হেসে বললে, "শিপ্রা তো চিরকালের সুন্দরী।"

খানের মাথায় অন্য চিন্তা। ব্যবসার। সে-কথা কি শুক্‌নো মুখে পাড়া যায়! বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ যা বলেছিস। তা চ, ঝপ করে একটা খেয়ে নিবি। ফাস্ট ক্লাস গর্ডনস্।"

"এই অবেলায়?"

"বলিস কি রে? বেলা তিনটে অবেলা। চ চ।"

গুণীরা বলেন, অন্ধকার গুহায় আলো জ্বালালে সে-অন্ধকার হাজার বছরের

পুরনো হোক, আর দশ মিনিট পূর্বে কারো মশাল নিভে গিয়ে থাকার অন্ধকার হোক, দেশলাই দুটোকেই দূর করবে এক সময়েই, এক মুহূর্তেই। কিন্তু খান প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু কীর্তির। "না যাবো না" বলে এক লহমায় সে-বন্ধুতে আগুন ধরানো যায় না। আসলে কীর্তির ইচ্ছা ছিল পানের মাত্রাটা আস্তে আস্তে কমানো।

আরাম করে বসে খান ঢক করে পয়লা গেলাস বটম্ আপ করে কীর্তিকে বললে, "হ্যাঁরে তুই তো কোথাও যাস নে। তবু একবার যাবি আমার সঙ্গে আগরতলায়? তুই থাকলে কুচক্রীরা সমঝে যাবে, তোর শেয়ারসুদ্ধ, তুই আছিস আমার পিছনে। দু'দিন আগে এরই ধাক্কায় আমাকে যেতে হল করাচী লাহোরে।"

কীর্তি হতভম্ব। তোৎলাতে তোৎলাতে বললে, "তোর কি মাথা খারাপ? সেই হাই-জ্যাকিঙের পর থেকে ওসব জায়গায় ইণ্ডিয়ান্ হয়ে গেলি কোন্ সাহসে?"

কীর্তির পিঠ চাপড়ে দিয়ে খান্ বললে, "বেশ বাওয়া, বেশ। চতুর্দিকে নজর ফেলে ওকীবহাল হয়ে উঠছিস। এবারে ব্যবসার দিকে একটু মন দে না।"

"তা সেখানে কি দেখলি, কি শুনলি?"

"আর বলিস নি। ওদের কাগজগুলোর ক্রুড ছুঁচোর মত ফিচেল মিথ্যে কথা বলার ধরন আর বহর দেখলে তোর মত অগাও তাজ্জব মানবে। বলে কি না, আওয়ামী লীগ গুণ্ডা ভাড়া করে ইলেকশন জিতেছে। বিদেশী রিপোর্টার-গুলো মিটমিট করে হাসে। আরে, ঝুট যদি বলবিই তবে বল্ হিটলারি স্টাইলে, গ্যোবেলসের সুপারফাইন সুতো দিয়ে বোন্ একটা মিহিন জাল। পূব বাঙলার পোনরো আনা লোক নাকি ইয়েহিয়াকে ফাদার মাদার রূপে দেখে—মসজিদে মসজিদে তাঁর জিন্দেগী আর ভালাই-এর জন্য দোয়া দরূদ পড়ে।

এর ফলে কি হবে জানিস? হিটলারী রাজের আখেরী ওক্তে যা হয়েছিল, ঠিক তাই। এরা হয়ে যাবে আপন প্রপাগাণ্ডার ভিকটিম! একদম টপ্-এ যারা আছে—ইয়েহিয়াকে ঘিরে—তারা জানে এসব মিথ্যে প্রপাগাণ্ডা। কিন্তু যদি আখেরে বাঙলাদেশ রুখে দাঁড়ায় তবে সেটাকে দমন করার প্রস্তুতির ভার যে শত শত অফিসারের কাঁধে পড়ছে, তারা তো জানে না এসব ডাহা মিথ্যে, তারা ভাববে এসব বাড়াবাড়ি, মশা মারার জন্য খামোখা সেই কোন সুদূর পূব পাকিস্তানে পাঠাতে হবে কামান ট্যাঙ্ক। কাজে আসবে গাফিলী। পানি কাদা সাপ জোঁকের দেশে এমনিতেই পশ্চিম পাকী সেপাই যেতে চায় না, এখন সেখানে যেতে হবে বিদ্রোহ দমন করতে? কিসের বিদ্রোহ? এ্যাদ্দিন ধরে তোমরা গাইলে ভিন্ন গীত। সাধারণ সেপাই যদি অফিসারকে অন্ধভাবে বিশ্বাস

না করে তবে আর্মির 'মরাল'টি হয়ে যায় ঝরঝরে।

আখেরে মামেলাটা এ-শেপ্ নেবে কি, না, সে জানেন আল্লা। কিন্তু লাহোর পিণ্ডির ক্লাবে ক্লাবে কী অন্ধ আত্মপ্রসাদ, কী কাণ্ডজ্ঞানহীন বড়-ফাট্টাই।

আর মদের কথা যদি তুলিস তো আমরা কলকত্তাইয়ারা ওদের তুলনায় শিশু, শিশু, শিশু। আমাদের সব চেয়ে বড় ক্লাবে সম্বৎসরে যে-পরিমাণ খাওয়া হয় তাই দিয়ে ওদের ছোটাসে ছোটা ক্লাবের কপালে তিলকটি কাটা যাবে না। জালা জালা মদের সঙ্গে সঙ্গে সব্বাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে গালি-গালাজে ভর্তি অশ্লীলতম ভাষায় যে সব নোংরা নর্দমায় তারা গড়াগড়ি দেয়, গল্পের নামে মোস্ট পয়েণ্টলেস যে-সব মলকুণ্ডের বর্ণনা দেয় সে-সব না শুনলে কোনো দেশের গাটারস্নাইপও বিশ্বাস করবে না যে নগরের সব চেয়ে সম্মানিত ক্লাবে ভদ্রসন্তানরা এসব বলে, শোনে আর চতুর্দিকে কী অট্টহাস্যের গমগমানি।

আমাকে এক্কেবারে চাটনি বানিয়ে ছিল সর্বশেষে এক জমিদার—ব্যারন বললেই ঠিক হয়—বাড়ির একটা বিরাট হলঘরে। ব্লু ফিলম কখনো দেখেছিস ? তার বাস্তব—থাক্। তুই যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু যার সামনে আমি হর হামেশা প্রাণ খুলে সব কথা বলেছি, তোকেও ভাই বলতে পারবো না।"

কীর্তি বললে, "বলারই বা কি দরকার ?"

খান বললে, "না ভাই, শুধু বলার জন্যই বলছি নে। আমি শুধু ভাবি এই সব আত্মপ্রসাদমত্ত দিবান্ধ, মিথ্যা ভাষণ যাদের হাড়ে হাড়ে এমনই ঢুকে গেছে যে পবিত্র শপথগ্রহণের সময়ও কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, যৌন ব্যাপারে যারা পশুর চেয়েও অধম—এরা ভাবে এরা সভ্য, এদের তুলনায় পূব বাঙলার লোক জংলী, বর্বর। এ সব ব্রুটগুলো শাসন করতে চায় সরল, বিশ্বাসী, ভদ্র পূব বাঙলার লোককে !"

খান ভালোভাবেই জানতো, কীর্তির মত মাত্রা রক্ষায় অভ্যস্ত বনেদি ঘরের ছেলের কাছে এ-সব অবিশ্বাস্য, এ-সব তার কল্পনার বাইরে, তার দৃষ্টিচক্রের বহু বহু দূরে। পাকেচক্রে যদি বা সে এ-জাতীয় পশ্বাচারের কাছে-পিঠে এসে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে তার ইনসটিনক্টই তার লাগাম ধরে উল্টো পথে ডার্বি স্পীডে তাকে ছুটিয়ে দেবে। কিন্তু সে নিজে এ-যাত্রায়, বিশেষ করে ব্যারনের বাড়িতে যে পাইকিরি পাপাচার যে সামান্য অংশটুকু দেখেছিল, এবং পরে শুনেছে আর সব জমিদার বাড়িতেও এ-সব ডাল-ভাত, পুরুষানুক্রমে চলে আসছে তাই নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করছিল এক একটা জাত এ-রকম পথে চলে কি কারণে ? আর পাঁচটা জাতের সঙ্গে মেলামেশার পরও নিজেদের সভ্যতর মনে করে কোন্ যুক্তি দিয়ে ? দুজনাই চুপ।

খানই শেষটায় বললে, "তুই তো জানিস আমাকে পুরো দুটি বৎসর লণ্ডনে

কাটাতে হয়েছিল, বাবার হুকুমে। ইংরেজের সঙ্গে আমার যে খুব-একটা দহরম-মহরম হয়েছিল তা নয় তবু তাদের চরিত্র, সামাজিক আচরণ খানিকটে আমার নজরে আসে। অবশ্য যে-সব বিশেষ বিশেষ সীমাবদ্ধ সম্প্রদায় থেকে ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজত্ব করার জন্য লোক সংগ্রহ করতো তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। কিন্তু সব চেয়ে বৃহৎ অভিজ্ঞতা আমি যেটা অনিচ্ছায় সঞ্চয় করেছি সেটা তাদের অজ্ঞতা, সর্বগ্রাসী অজ্ঞতা। শিক্ষিত অশিক্ষিত—তা তারা খবরের কাগজ পড়ুক আর নাই পড়ুক—শতকরা ৯৯ জন বাইরের দুনিয়ার কোনো খবর তারা রাখে না। ফ্রান্সে, শুনেছি, অজ্ঞতাটা তারো বাড়া।

পাঞ্জাবী সেপাইয়ের জনপদবধূ কি জানে, পূব বাঙলা কোথায়?—এবং সেখানকার বধূর বুকে তারই মত একটা সুখ দুঃখ, দুমুঠো অন্নের যেন অনটন না হয় তার তরে তারো জীবনভর একই দুশ্চিন্তা!

তুই শুনলে হাসবি, আমি লাহোর ক্লাবের মেম্বার, ইংরেজ ও গাঁইয়া মেয়ের অজ্ঞতার ভিতর বিশেষ কোনো তফাত দেখি নে। লাহোরের মেম্বার ভ্যাট্‌ভুট করে ইংরিজি বলতে পারে বলে আমরা ভুল ধারণা করে বসি তারা বুঝি আপ টু ডেট।

এই সর্বব্যাপী অজ্ঞতার মাঝখানে ইংরেজ শাসকের অজ্ঞতা তাকে দিয়েছিল ভারতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা আর পাঞ্জাবী করে ঘৃণা পূব বাঙলার লোককে। তুই তো ঘটি, তবু নিশ্চয় জানিস ওরা বড় 'টাচি', বাঙলাকে অবহেলা করলে সে তার উত্তর দেয় তিন ডবল অবহেলা দিয়ে। ইংরেজের অবহেলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে তাই তার একটু সময় লেগেছিল। কিন্তু ব্যাটা যেদিন ঠিক ঠিক বুঝে যাবে, পাঞ্জাবী শুয়োরটা তাকে ঘৃণা করে, তখন শুরু হবে আতসবাজি।"

খান খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললে, "সবই ঠিক, কিন্তু জানিস তো 'জোর যার মুল্লুক তার'। ব্যাটাদের শুধু বন্দুক নয়, আছে ট্যাঙ্ক প্লেন।"

কীর্তি বললে, "ইংরেজের কি ট্যাঙ্ক প্লেন ছিল না? তত্ত্ব কথার মূল তত্ত্ব কি জানিস? আজ যদি ক্লেসিয়াস ক্লে আলী তোকে রাস্তায় পেয়ে এক ঘুষিতেই লম্বা করে দেয় সেটাতে তো তোর লজ্জা পাবার কিছু নেই, কিন্তু তার পর যদি তুই তার দাসত্ব স্বীকার করে নিস, সেখানে লজ্জা। ট্যাঙ্ক প্লেনের শক্তি দিয়ে কাল যদি পাঞ্জাবী ব্রুটের পাল পূব বাঙলাকে ছারখার করে দেয় তাতে বাঙাল লজ্জা পাবে কেন? শক্তিশালী হামেশাই দুর্বলকে পরাজিত করে।

কিন্তু তারপর যদি বাঙালরা পাঞ্জাবীর দাসত্ব স্বীকার করে নেয় তবে সেখানে বাঙালের লজ্জা। তুই আমি বাঙালী—আমাদেরও লজ্জা।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিপ্রা অভিমানের সুরে বললে, "এত দেরি করে এলে? এরই মধ্যে আমাকে অবহেলা?"

কীর্তি অবাক। সামলে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "রবি ঠাকুর ছাড়া দেখছি আমাদের গতি নেই:

'তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।'

আমি এসেছি তোমার দেওয়া সময়ের দশ মিনিট আগে—এবং অতি ভয়ে ভয়ে। কারণ তোমাকে ঘরসংসার দেখতে হয়, তার উপর পুরো তদারকি করতে হয় ব্যবসা-সম্পত্তির। এবং সর্বোপরি কয়েকটা চ্যারিটির হিসাবপত্র দেখা। ইক্‌জ্যাক্‌ট টাইমের এক মিনিট পূর্বে এলে হয়তো বারান্দায় মোক্ষম এক ধাক্কা, কোন্ এক ঝুনঝুনিয়া বা ঠুনঠুনিয়ার সঙ্গে। আর তিনি হন যদি সিস্টার তেরেসা বা ক্লারা তা হলে তো কেলেঙ্কারি ব্যাপার। যাকে বলে, আমি মরমে মরে যাবো, তাঁর শরমে 'শেম্ শেম্'।"

শিপ্রা বললে, "উপরে চল।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে, "চ্যারিটির কাজ যৎসামান্য। আমি নিজে সে-সব স্থলে যাই। সিস্টারদের পক্ষে এখানে আসা সহজ নয়। এবং শুনেছি ক্যাথলিক নান্‌দের অন্তত দুজন না হলে রাস্তায় বেরনো বারণ। সে-কথা থাক। আসল কথাটা শোনো। মনে কর কেউ যদি স্থির করে তার সাংসারিক সব অভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত কোনো ভিখিরিকে ভিক্ষে দেবে না, কেউ যদি ভাবে বৈষয়িক সর্ব ব্যাপার গোছগাছ না করে বৃন্দাবন যাবো না, তা হলে এঁরও আজীবন ভিক্ষে দেওয়া হবে না ওঁরও কস্মিনকালে তীর্থদর্শন হবে না। প্রত্যেক দানকর্মে থাকে আত্মবিসর্জন, ক্ষতিস্বীকার তা সে যত সামান্যই হোক। এই যে তুমি ক্ষুদ্রতম এটিকেট রক্ষার্থে বন্ধুর সিগারেট আগে ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা পরে ধরাচ্ছো তাতেও আছে পাঁচ সেকেণ্ডের সেক্রিফাইস।"

কীর্তি সোৎসাহে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে, তুর্গেনিয়েফও বলেছেন, রকফেলারের লক্ষ লক্ষ ডলার দানের কথা যখন মনে আসে তখন আমার হৃদয়ে তার প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা, কিন্তু যেদিন দেখলুম, আমাদের গ্রামে আটটি কাচ্চা-বাচ্চার বাপ এক অতি গরীব চাষা একটি অনাথ বাচ্চাকে বাড়িতে এনে আশ্রয় দিল তখন তার স্মরণে আমার মাথা গভীর, গভীরতম শ্রদ্ধায় নত হয়। চাষার ভয় ছিল তার বউ সংসার চালাবার জন্য প্রতিটি কোপেক গোনে, সে দারুণ চটে যাবে। সে শুধু রান্না করতে করতে শুধু আপন মনে মন্তব্য করেছিল, 'এখন থেকে আমরা সপ্তাহে যে একটা দিন পরবের রোববারে চীজ খেতুম সেটা ছাড়তে হবে।' আমার ঠিক ঠিক মনে নেই—"

"কিছু দরকার নেই এ ঘটনাটির বর্ণনা তুর্গেনিয়েফের ভাষায় দেবার। ছ'বছরের বাচ্চাও যদি এটি আধো আধো কথায় প্রকাশ করে তবু তার মূল্য এক কানাকড়ি কমবে না। লক্ষ টাকা দামের ফুলদানিতে একটি গোলাপ রাখো, আর চার আনার কাঁচের গেলাসে রাখো, গোলাপের সৌন্দর্য কি তখন আসমান জমীন ফারাক হয়ে যাবে?

কিন্তু তোমার উদাহরণ সত্যি ক্লাসিক পর্যায়ের। রকফেলার বিশ লক্ষ ডলার দান করে কি ক্ষতিটা স্বীকার করলেন? ব্যাঙ্কের খাতাতে কয়েকটা শূন্য কাটা পড়লো মাত্র। বস্তুত তন্মুহূর্তেই তিনি পাইকিরিতে আরো বিশখানা রোলস্ কিনতে পারেন।"

তার নিভৃত বুদওয়ারে কীর্তিকে নিয়ে গিয়ে শিপ্রা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল তার ডিভানের উপর। কীর্তিকে বললে:, "বসো আমার পায়ের কাছটায়—আমি কেষ্টঠাকুর না হলেও তুমি তো অর্জুন। তিনি বুদ্ধিমান; ঠাকুরের পায়ের কাছে আসন নিয়েছিলেন। নিছক বিনয় বশত নয়; তাঁর কুটিল স্বার্থ ছিল। আমারও তাই। তোমার মুখ দেখতে পাবো বলে।"

বলতে বলতে তার খোঁপা খুলে চুলে বিলি দিতে দিতে মাথার পাশের গোটা তিনেক কুশন ঢেকে দিল। কীর্তি লম্বায়, পরিমাণে এ-রকম রাশি রাশি চুলের স্তূপ আগে দেখে নি। বিস্ময়ে সেটার প্রশংসা করতে ভুলে গিয়ে বললে, "তোমার খোঁপা দেখে তো আমার কখনো মনে হয় নি, তোমার এত চুল।"

"কোঁকড়া চুলের ঐ একটিমাত্র সুবিধে। কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ হয় নি।

"নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা পূর্বে কিংবা হঠাৎ বিনা-নোটিশে এলে তুমি। তোমাকে তখন বসিয়ে রেখে টাকাকড়ির টানা-হ্যাঁচড়া করবো ঐ ঠুনঠুনিয়া না ঝুনঝুনিয়ার সঙ্গে—ঈভন ফাইভ মিনিটস্? নো, এ হানড্রেড টাইম নো। তাকে তদ্দণ্ডেই বিদায় দিলে কি হবে। একটা ডীল হয় তো হবে না। ঝুনঝুনিয়াও বিরক্ত হবেন।

ওরে হাবা, শোন্, এইটুকু যদি আমি ত্যাগ স্বীকার না করতে পারি তোর সঙ্গ পাবার তরে তবে তোর মূল্যটা কত? ডীলটাতে হয়তো আমার দশ হাজার টাকার মুনাফা হত। তা-হলে যে কোনো মুদি তোকে বলতে পারবে তোর দাম নিশ্চয়ই দশ হাজার টাকার চেয়ে কম—এ তো সোজা হিসেব। আর স্বয়ং যীশুখৃষ্টের মূল্য কত? মাত্র ত্রিশটি মুদ্রা। অবশ্য তাঁর যে-শিষ্য তাকে বেচে দিয়েছিল দুশমনদের কাছে সে ছিল গ্যালিলির জেলে। আজকের দিনেও সেখানে ত্রিশ মুদ্রা পর্বতপ্রমাণ। আর আমার কাছে দশ হাজার কি! ওদিকে দু'হাজার বছর ধরে দুনিয়ার ভদ্র ইতর সক্কলের কাছ থেকে জুডাস পাচ্ছে অভিসম্পাত। আমাকে দেবে ক'হাজার বছর ধরে ঝুনঝুনিয়ার কাছে তোমাকে বেচে দেওয়ার জন্য।"

তারপর আরামসে চোখ বন্ধ করে বললে, "ভাগ্যিস, মা কালীর আশীর্বাদে তুমি আমি কেউই যীশুখৃষ্ট নই।"

এমন সময় কোনো নোটিশ না দিয়ে কীর্তি হঠাৎ মাথা নিচু করে শিপ্রার একটা পায়ে চট করে চুমো খেয়ে অন্য পায়ে মুখ চেপে দিতে লাগলো দীর্ঘতর চুম্বন।

ধড়মড়িয়ে শিপ্রা উঠে বসে কীর্তির মাথা চেপে ধরে বলল, "ছি ছি! এ তুমি করছ কি?"

কীর্তি কোনো উত্তর দিল না। নিরাশ হয়ে শিপ্রা বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে কীর্তির চুল ধরে তার মাথা টেনে তুললো তখন বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ ভাব না দেখিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো, "কেন? পদচুম্বন সমাসটা কি তোমার একেবারে অজানা। মানুষ গুরুর পদচুম্বন করে। কিন্তু আমি তো কখনো কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার মত পাত্র নই। তুমিই তো আমার গুরু।"

বিস্মিত হয়ে শিপ্রা শুধলো, "সে কি?"

"শোনো নি, চণ্ডীদাস তাঁর রজকিনীকে গুরু আখ্যা দিয়েছেন তাঁর গীতে?"

"সে তো তিনি তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে রামীকে অনেক রূপেই দেখেছেন, অনেক নামেই ডেকেছেন। তুমি তো অপদার্থ—অবশ্য তোমার আত্মোপলব্ধির ভাষায়।"

"অবাক করলে, গুরু, অপদার্থের তো গুরুর প্রয়োজন সর্বাধিক। খাঁটি সোনাতে কেউ কখনো পরশ পাথর ছোঁয়ায় নাকি। আচ্ছা, তর্কস্থানে না হয় গুরুর প্রসঙ্গ বাদই দিলুম। কিন্তু প্রিয়ার পদচুম্বন কি তার প্রসাদলব্ধ জন করে না। তুমি যাঁকে গুরুদেব বলে প্রায়ই উল্লেখ করো তিনি গেয়েছেন ঃ

'অমল কোমল চরণকমলে চুমিনু বেদনাভরে—'

শিপ্রা বাধা দিয়ে বললে, "সে তো তাঁর জীবনদেবতার পদচুম্বন করেছেন তিনি।"

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে কীর্তি বললে, "বা রে। এর কয়েক লাইন আগেই তো ওর সঙ্গে তার মহা সাড়ম্বরে, আনুষ্ঠানিকভাবে অনেক চক্র ততোধিক রেখার জাল এঁকে শুভলগ্ন স্থির করে, শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পুরোহিত বৃদ্ধ বিপ্রের হাতে ধান্য দূর্বা তীর্থবারি এবং মন্ত্রসহ বিয়ে হল এবং সখীদল ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পর সামাজিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করলো।

দোঁহাকার সাথে ফুলদল-সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।

এবং এই যে একটা অভূতপূর্ব, ইতিহাসের সর্ব স্বয়ংবর বিবাহকে আপাদমস্তক লজ্জিত বিড়ম্বিত করি পাণিগ্রহণ—আমি এই পাণিগ্রহণ সমাসটির দিকে তোমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, শিপি—এই পাণিগ্রহণ মহোৎসবটি সমাধান হল এটির নির্যাস, এটির মধুরতম মধুমন্ত্র পাচ্ছি ঃ

'অজানিত বধু নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমল কর।'

বধু, বধু, বধু—আবার বলি বঁধু নয়, বধু।

সেই বধুর পদচুম্বন করেছিলেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ যার ভিতর সকল রসের ধারা সর্বদেশ সর্বকাল থেকে বয়ে এসে সম্মিলিত হয়েছিল।" দম নিয়ে কীর্তি বললে,

"তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার কাছে বধু যা জীবনদেবতাও তা।

এর পর দেখ, কবিতাটি তোমার আমার অতি কাছে চলে এল। কবিতার সখী পথ দেখিয়ে বরবধুকে বাসরঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে স্বয়ং তুমি। তারপর—

পাদপীঠ 'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধু—

তুমি যদি সে-ভাবে চরণ প্রসারিত করতে তবে আমি ছুটে গিয়ে পাদপীঠ সংগ্রহ করে আনতুম না। তুমি যে শয়নে চরণ প্রসারিত করলে। তাই তো আমাকে ঐ অবস্থাতেই পদচুম্বন করতে হল।"

ইতিমধ্যে শিপ্রা তার দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে বসে কীর্তির কবিতা আবৃত্তি, তার আপন টিকা কিছুটা শুনছিল। কিছুটা আপন মনে ভাবছিল। তার রাশি রাশি চুল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কীর্তি মাত্র দুদিন ধরে দরদী হিয়ার আহ্বান পেয়ে বক্ বক্ করতে শুরু করেছে। কিন্তু অতদিনের নীরব স্বভাব চট করে যায় না বলে চুপ করে শিপ্রার চুলের ভিতর এদিক ওদিক আঙুল চালাচ্ছে।

হঠাৎ শিপ্রা মাথা তুলে কীর্তির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্বরে বললো, "এ-সব প্রাণের কথা কার না শুনতে ভালো লাগে? কিন্তু, কীতা, আমার মন বার বার ঘুরে ফিরে ঐ পাদপীঠ কথাটির দিকে যাচ্ছে। পাদপীঠ, সোজা বাঙলায় চৌকি, ইংরিজিতে পেডেস্টেল। তোমার হৃদয়ে দুদিনেই আমার যা মূর্তি গড়ে তুলছো তার পাদপীঠটা উঁচু হতে হতে এখন সেটা ময়দানের বিরাট বিরাট মূর্তির দশহাত উঁচু পাদপীঠ, স্ট্যাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।" একটু চিন্তা করে নিয়ে বললে, "না তুমি আরম্ভ করেছ পাদপীঠ দিয়ে। সেটাকে গড়েছো তোমার চেয়ে তিন মাথা উঁচু। তার উপর খাড়া করবে বা বসাবে নিশ্চয়ই কোনো দেবীপ্রতিমা—অন্য কিছু মানাবে কেন? এবং স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি সে দেবী আমি। নয় কি?"

কীর্তি মুগ্ধ হয়ে ভাবছিল, আহা, এই তো শিপ্রা। রবি-কাব্যের কত না অতলে ডুবেছে সে। অথচ প্রয়োজন মত আমার মত এমেচারের সঙ্গেও সে কদম কদম মিলিয়ে চলতে পারে। ঐ তো তার মহৎ গুণ। পার্টিতে, ব্যবসাতে বিয়েবাড়িতে সর্বত্রই সে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সক্কলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

শিপ্রার প্রশ্নের উত্তরে কীর্তি, যেন সমের শেষে মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, "অবান্তর, অবান্তর এ-প্রশ্নটা। প্রশ্নটাই স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ !"

হায় রে কীর্তিঠাকুর ! তুমি এখনো তোমার শিপ্রা চতুরাকে চিনতে পারো নি। সে যেন সন্দেহের ধন্দে দোটানা হয়ে বললে, "তোমার ঐ কবিতাতেই আছে, "বিয়ে বাড়িতে" ছিল।

'সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ !'

বাঙ্গালোরী শাড়ি, বেনারসী ব্লাউজ আর ছেরামপুরী খোঁপা—ঐ তো আমার সাজ। এ কি মানাবে সিংগির ঘাড়ের উপর বসলে ?

তার চেয়ে ওখানে বসে যদি আমি হীরা-পান্না বসানো সোনার চিরুনি দিয়ে কুহকিনী মায়াবিনীর মত চুল আঁচড়াই তবু না হয় ডেঁপো ছোঁড়ারা ওদিকে তাকিয়ে দু'একটা রসাল টিপ্পনী কাটবে !"

কীর্তির রোমান্সে এই পয়লা খোঁচা। এবারে আসছে কু দ্য গ্রাস, ক্লে'র মোক্ষম মুষ্ট্যাঘাতে রোমান্স্-বেলুনের শেষ সর্বনাশ।

অতি গুরুগম্ভীর হাস্যহীন আস্যে শিপ্রা বললে, "সবচেয়ে খাসা মানায়, যদি আমি সেখানে কোমরে আঁচল বেঁধে, টাটা স্টিলের কড়াইয়ের খাগড়াই কাঁসার খুন্তি দিয়ে তোমার জন্য পুঁই শাকের চচ্চড়ি ঘ্যাঁটাই।"

আহা, যেন একটি সার্থক কবিতা ! এই একটি বাক্যকেই তিন অসমান হিস্যেয় ভাগ করে তিন লাইনে ছাপলেই কোথায় পাউন্ড, কোথায় বন্ধু সমর সেন ?

ডাস্ট বিন্-এ পচা ইঁদুর
রিকশায় চীনা গণিকা

এগুলো মহাকাব্য রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এবারে জুড়ে দিলে ময়দানের মিনারশিখরে ইস্টিলের কড়াই।

কীর্তি যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। হার মানতে মানতে তবু শেষ বাণ ছাড়লে—

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

অতি সোহাগভরে দু'হাত দিয়ে কীর্তির মাথা বুকে গুঁজে নিয়ে তার মধুরতম কণ্ঠে বললে,—সে কণ্ঠস্বর তার পিতা বড় ভালোবাসতেন—"ওরে ক্ষ্যাপা, প্রিয়াকে দেবতা করার জন্য প্রেমিক প্রেমিকা, উভয়েরই শাস্ত্রাধিকার অর্থাৎ প্রেমাধিকার চাই। তোমার কিছুটা আছে—বিধিদত্ত—কিন্তু দিনে দিনে সেটা বাড়বে না কমবে সেটাও জানেন একমাত্র বিধিই।

তুমি বার বার বলেছো, তুমি অপদার্থ, তাই তোমার ভিতর আমি কি দেখলুম যে তোমাকে ভালোবাসলুম ? উত্তর দি নি। আজ বলি, ঐ প্রেমাধিকার। যাকে আমি নাম দি 'ধাতু'।"

কীর্তি শুধোলে, "ধাতু? বুঝিয়ে বলো।"

শিপ্রা বললে, "তোমাকে নির্মাণ করার সময় বিধাতা একটা বিশেষ ধাতুও মিশিয়ে ছিলেন। সেটা আমি চিনতে পেরেছি। এর বেশী বুঝিয়ে বলা যায় না। ওটা বোঝার জিনিস নয়, উপলব্ধির ধাতু। হয়তো নিজেই একদিন উপলব্ধি করতে পারবে। ব্যাস! এখন চুপ করো।"

চতুর্দশ অধ্যায়

কীর্তিদের ক্লাব-বারের উচ্চ উচ্চ দণ্ডাসনে বসে ডাইনে-বাঁয়ে স্টিয়ার করাটা যারা সব সময় পছন্দ করতেন না, তারা আসন নিতেন ছোট ছোট টেবিলের চতুর্দিকে। আবদার ড্রিংক এনে দিত টেবিলে টেবিলে। আবদার কথাটা ফার্সী থেকে এসেছে প্রাচীনতর যুগে, জোর চালু হয় কোম্পানির আমলে এবং ইদানীং মুমূর্ষু। যদিও আব শব্দের অর্থ জল, প্লেন ওয়াটার—যেমন আবহাওয়া—ও দার কথাটার অর্থ, যে ধরে, যেমন জিম্মেদার তথাপি রূঢ়ার্থে সে মদ্যাদি তরল দ্রব্যের রক্ষক ও পরিবেশক। ইরান দেশে এই ব্যক্তিই যদি ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত তরুণ বা তরুণী হয় এবং বন্ধু বা বান্ধবী রূপে কাব্যালোচনা, সঙ্গীতাদির দ্বারা বিশেষ একজনকে আপ্যায়িত করে বা আসর জমিয়ে তোলে তবে তার নাম সাকী।

দণ্ডাসীনদের ভিতর কথাবার্তা হয় ছেঁড়া-ছেঁড়া। টেবিলওলাদের ভিতর মাঝে-মিশেলে দু'একটি বিষয় নিয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী আলোচনাও হয় কিন্তু আমাদের রক বা পাড়ার চায়ের দোকানে—সেখানে প্রাগুক্ত ক্লাবের মত একে অন্যকে চেনে এবং প্রায় সব খদ্দেরই বেনামী একটা ক্লাবের অনারারি মেম্বার—যে রকম তর্কাতর্কির সাইক্লোন টর্নাডো বয়ে যায়, এই খানদানী ক্লাবে সেরকম হয় না। কারণ কেউই কোনো বিষয়ে সিরিয়াসলি নেয় না, কারোরই বিশেষ কোনো মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাস নেই। তাঁরা শুধু একটি বিষয়ে অচঞ্চল দৃঢ়মত পোষণ করেন—পানের দ্রব্যটি যেন যে লোক যা নিত্যি নিত্যি খায় আজও যেন নির্ভেজাল তাই হয়। এবং যেহেতু সাধারণ মানুষ যদি কোনো বিশেষ একটা জিনিসের প্রতি তার সর্ব চৈতন্য সর্ব ধ্যান পরিপূর্ণ নিয়োগ করে দেয় তবে সে অন্য সর্ববাবদে অল্পাধিক উদাসীন হতে বাধ্য—অর্জুন যে-রকম পাখির চোখের দিকে তাগ করার সময় গুরু, ভ্রাতা এমন কি বৃক্ষটাকেও দেখতে পান নি। বাইবেলও বলেছেন, "দুই প্রভুর সেবা করা যায় না।"

আজ কিন্তু তর্কটা জমে উঠেছে। ইয়েহিয়া খান এসেছেন ঢাকায়। শেখ মুজীবের সঙ্গে একটা আপোস করতে। কীর্তি এসে দলে ভিড়লো আলোচনা যখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে—বসলো তার সুনন্দা ও ইয়ার খানের

পাশে। যে সমস্যা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হচ্ছে সেটা: ইয়েহিয়া কি সত্যই আওয়ামী লীগের হাতে পূর্ব বাংলার চোদ্দ আনা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত?

মিত্তির যদিও প্রায় প্রতি রাত্রেই কিঞ্চিৎ বে-এক্তেয়ার হয়ে বাড়ি ফেরে তবু সবাই জানে যে বদ্ধ মাতাল অবস্থায়ও সে যদি কাউকে কোনো কথা দেয় তবে পরের দিন সে-কথা তুললে, যদিও সে সে-কড়ার বিলকুল স্মরণে না আনতে পারে তবু ক্ষয়ক্ষতির পরোয়া না করে সত্য রক্ষা করবে। অতএব তার দৃষ্টি-বিন্দু এক্ষেত্রেও সেই ঐতিহ্যাগত। বললে,

"তোমরা ভুলে যাচ্ছো ইয়েহিয়া সেপাই, অফিসার। সে পলিটিশিয়ান নয় যে ঘড়ি ঘড়ি ভোল পালটাবে। ইংরেজ জাতটা পলিটিকস করে। আমাদের হোমরুল, অটনমি, হাফ-স্বরাজ, স্বরাজ দেবার হোলি প্রতিজ্ঞা করে সেটা ভঙ্গ করেছে। কতবার হিসেব নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঠিক একই সময়ে গোপনে আরবদের কাছে কসম খেল যুদ্ধ শেষে প্যালেস্টাইন ওদের হাতে সঁপে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকার কুমীর মার্কিনদের হুবহু ঐ একই প্রতিজ্ঞা করলে। যুদ্ধ শেষে চেষ্টা করলে, নিজেই সেটা হজম করার। শেষটায় যখন নিতান্তই বদহজমে যায় যায়, তখন আরব আর ইহুদিদের লড়িয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। এবং দুই পক্ষকেই আগুনের দরে আউট অব ডেট পুর্না পুর্না বন্দুক কামান বিক্রি করলে। ওদিকে দেখ দ্য গল। সেপাই। রাজ্য চালনার সময় আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার আত্মসম্মান বজায় রাখতে গিয়ে পদে পদে মার খেয়েছে। ইয়েহিয়াও সেপাই।"

সুদিন বললে, "ইয়েহিয়া যদি সত্যিকার সেপাই হয় তবে পাক্কা সাড়ে তিনটি মাস ধরে ন্যাজ খেলানো কেন, বাবা? ইলেকশন হয়েছে সেই ডিসেম্বরের প্রথম হপ্তায় আর আজ মার্চের মাঝামাঝি। এখনো ডেট স্থির হয় নি, এসেমব্লি কবে বসবে?—বল্‌ না শঙ্কর, তোর মামা না এসেমব্লিতে কি যেন কোন্‌ ডাঙর নোকরি করে—এসেমব্লি ডাকতে কত দিন সময় লাগে? আসলে সুদিনের মতলব শঙ্করকে তাতানো। কারণ শঙ্করজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তর্কে সুদিনের বিপক্ষ মত তারস্বরে প্রচার করা। অন্য সর্ব বাবদে হরিহরাত্মা। আজ সব্বাইকে অবাক করে বললে, "মেরে-কেটে উইদ এ ভেরি লিবরেল মার্জিন—সাত দিন। কিন্তু সে প্রশ্নটা তোলার পূর্বে ভুলে যাচ্ছিস কেন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ইয়েহিয়া তো মার্চের প্রথম সপ্তাহে এসেমব্লি সেশন ডিক্লেয়ার করে ফের সেটা নাকচ করে দিলে। কি বলো, মিত্তির? ইয়েহিয়া না সোলজার।"

ইউনুস্ মির্জা মেদিনীপুর না কোথাকার খাঁটি পাতি। রংটিও বান্নস প্রায়। দেমাক করেন তিনি মোগল না পাঠান কি যেন? বলতে ভালোবাসেন উর্দু—যদিও সেটা তালতলার স্ল্যাং। বেহারের নেটিভ আবদাররা পর্যন্ত সে বত্রিশ ভাজা শুনলে মুখ টিপে হাসে। উড়ে ঘেঁষা বাংলা শুনলে মারওয়াড়ি তক্ আপন

বাংলার পিঠে হাত চাপড়ায়। যেন মিত্তিরকে নিয়ে মিত্রপক্ষ রচনা করার জন্য অর্থাৎ ইয়েহিয়ার পক্ষ নিয়ে বললে, "কিন্তু ইয়েহিয়া যথেষ্ট কারণও দেখিয়েছেন।"

কীর্তিসখা খান ফ্যাকচুরিয়াস। "কারণ না কচু! লেম এক্স্‌কিউজ এবং তার কারণ—ঘোড়াটার চারটে পা-ই আগা-পাস্তলা লেম।"

মিত্তির কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু খান বাধা দিয়ে বললে, "লীগে ইয়েহিয়ার যদি একটা সমঝোতা হয়ে যায় তবে তো ল্যাঠা চুকে গেল। সে-নিয়ে তর্কাতর্কি হাওয়ার কোমরে রাশি বাঁধার মত বিলকুল বেকার। আর যদি না হয় এবং ফলে পূব বাঙলা বিদ্রোহ করে—লীগ কুল্লে দেশের ভোট পেয়েছে তাই বিদ্রোহটা হবে তামাম দেশ জুড়ে—আর স্বভাবতই ইয়েহিয়া চালাবে খুন-খারাবীর দমননীতি। তখন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জন আর ভারত সরকার রি-এ্যাক্ট করবে কি ভাবে?"

শঙ্কর তার পূর্বমত কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে চিন্তিত চিত্তে বললে, "পাঞ্জাবী পাঠান সেপাইরা তাদের প্রতিবেশী, জাত-ভাই কাশ্মীরী মুসলমানদের সাহায্য দেবার নামে এসে তাদের ঘরবাড়ি কি রকম লুঠপাট করেছিল সেটা অন্তত আমার অজানা নয়। আর এই বহুদূরের বাঙালদেশে তারা নরম চামড়ার দস্তানা পরে পিউনিটিভ এ্যাকশন নেবে, সেটা দুরাশা।"

মির্জা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, "যা-ই করুক না কেন, ওটা তো পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার।"

খান তো রেগে টং। "ঘরোয়া ব্যাপার! খাসা ডিপ্লোমেটিক ভাষা। যেটা ডাহা সত্য বিকৃতির ভদ্র বা ভণ্ড নাম। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মেলা নিকট আত্মীয় রয়েছে পূব বাঙলায়, আর এখানে যে-সব হিন্দু রেফুজি পূব বাঙলা থেকে এসেছে তাদের সে দেশে মা-ভাই রয়েছে ঢের ঢের বেশী। তাদের গায়ে বুঝি রক্ত নেই? তাদের বেলা এটা শব্দার্থে সত্যার্থে ঘরোয়া ব্যাপার। তোমার বেলা ওটা ডাহা নির্জলা ফন্দী—মানুষ মারার অজুহাত।"

সুদিন বললে, "ফ্রান্স্‌ জর্মনির লড়াই ছিল ওদের দুজনার "ঘরোয়া ব্যাপার"। তবে কেন শতাধিক বৎসরের নিরপেক্ষ সুইটজারল্যাণ্ড হিটলার-লাঞ্ছিত কি ইহুদি, কি জর্মন পলাতক সবাইকে আশ্রয় দিল? এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বে-আইনীভাবে। এদের প্রায় কারোরই সরকারী পাসপোর্ট, সুইস ভিসা ছিল না।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী উচিত যে সুইস ফ্রণ্টিয়ারে সে-দেশে ঢোকার সময় যে ধরা পড়েছে তাকে ধাক্কা মেরে যে-দেশ থেকে সে বেরিয়ে এসেছে সে-দেশের পুলিসের হাতে সমর্পণ করা। অর্থাৎ পলাতক পুত্রকে ফের ডাইনীর

হাতে সমর্পণ করা? ওরা সবাই ছিল জর্মন সিটিজেন। হিটলার তাদের নিয়ে কি করবে, না করবে, সেটা তার নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। তবে সুইটজার ল্যাণ্ডের মত ভদ্র দেশ, ভদ্রতর সরকার দিনের পর দিন এ রকম বে-আইনী কর্ম করে ওদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলো কেন? তদুপরি সুইস সরকার বেশ জানতো, হিটলার যখন হলাণ্ড, বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা চুক্তি উপেক্ষা করে দুটো দেশ দখল করে বসে আছে তখন প্রয়োজন বোধ হলে কিংবা নিতান্তই খামখেয়ালির ঝোঁকে সুইটজারল্যাণ্ডকেও আক্রমণ করতে পারে। বেআইনিভাবে পলাতক জর্মনদের আশ্রয় দেবার বিগলিতার্থ: সুইটজারল্যাণ্ড আক্রমণ বাবদে অর্ধসুপ্ত মেন-ঈটার হিটলার বাঘার ন্যাজ ধরে হ্যাঁচকা টান মারা।"

সোমেন চাটুয্যে বললে, "অত সাত সমুন্দুর পাড়ি দিচ্ছো কেন বাওয়া? ঐ যে তোমার পূব পাকিস্তান থেকে তেইশটি বচ্ছর ধরে কখনো বানের জলের মত হুড়মুড়িয়ে, কখনো ঢেউয়ে ঢেউয়ে, আর ছিটেফোঁটায় তো অহরহ রেফুজি আসছে, তাদের ঢুকতে দিচ্ছো কোন্ আইনে। ওহে মির্জা সাহেব, ওদের ঠেলায় তোমার আমার প্রাণ যায়। তুমি, দাদা, যাও না বর্ডারে। তোমার গভীরতম পলিটিকাল ডক্ট্রিন ঘরোরা ব্যাপারটা প্রীচ করো না ওদের সামনে— সবিস্তর সালঙ্কার। একটি কাজের মত কাজ হয়।"

শঙ্কর বললে, "ছিঃ চাটুয্যে! মির্জা সাহেব উচ্চাঙ্গের সমাজসেবক এবং ভারতপ্রেমী। তাঁর অকাল মৃত্যু কামনা করাটা কি ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে গৌরবের বিষয়!"

এমন সময় বেয়ারা মিস্টার মির্জার হাতে একখানা ভিজিটিং কার্ড এনে দিল। সেটার উপর চোখ প্রায় না বুলিয়েই মির্জা সক্কলের দিকে চোখের দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, "জেণ্টলমেন, আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন। আপনারা যদি সদয় অনুমতি দেন তবে তাঁকে এখানে নিয়ে আসি, নইলে অন্য টেবিলে—"

তার সেই বিগলিত অনুরোধ শেষ হবার পূর্বেই সমস্বরে কোরাস গান উঠলো:

কোরাস {
নিশ্চয়, নিশ্চয়
সানন্দে, সানন্দে
মেহেরবানী কীজীয়ে,
সার্টেনলি, সার্টেনলি

ক্লাবটা ইণ্টারনেশনাল, মেম্বাররা কসমপলিটান। এ-হেন অভ্যর্থনা সাতিশয় স্বাভাবিক। গ্রাম্য কবির আপ্তবাক্য এই ফ্যাশান-ক্লাবে বেশভূষায় ঠিক ফিট করবে না কিন্তু ভিতরের রস একই। শহুরে শেমপেন আর গাঁইয়া তাড়ির

ধর্ম এক, বর্ণ ভিন্ন ঃ—

"যে রসে মগন
তাহাতে তখন
হোক না কুজন
হল মহাজন।"

শুধু খান আর কীর্তি উদ্বাহু হয়ে পাঞ্চজন্য আমন্ত্রণে যোগ দিল না।

মির্জা সেটা বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাতেই বা কি? ওভার-হুয়েলমিং মেজরিটি তাঁর পক্ষে। যদিও জানা কথা, আজ স্পষ্টতর হল যে আওয়ামি লীগের থান্ডারিং মেজরিটির চেয়ে ঢের ঢের বেশী কবুল করেন ভুট্টোর হুইসপারিং মাইনরিটিকে।

চাটুয্যে ফিসফিসিয়ে খানের কানে কানে বললে, "ব্যাটার হাড় কিপটেমি তার লোমে লোমে খাটাশের দুর্গন্ধ ছাড়ে। কখনো কোনো বন্ধুজনকে সঙ্গে আনতে দেখেছিস? তার সামনে চিচিং ফাঁক হয়ে যাবে যে। আজ শালাকে দু'তিন রোঁদ খাওয়াতে হবে অন্তত। বেটা উড়ে স্নবস্য স্নব। ওদিকে দোস্তটি খানদানী লখনওয়ী মির্নাষ্য। জাতে ওঠবার তরে কোন্ না তিন পাত্তর খাওয়াবে? তুই অত মুখ গুমড়ো করেছিলি কেন রে, উল্লুক?"

"দ্যাখ, ও ব্যাটার দেওয়া শেমপেন আমার কাছে বিষ্ঠে। সত্যি বলতে কি, আল্লার কুদরতে ঐ মির্জা সম্বন্ধী যদি কোনো দিন দরাজ দিল হয়ে যায়, তবে তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আর্সেনিক খেয়ে মরতে রাজী আছি আমি একশ' বার।"

"তুই বড্ড সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিস। আর আজকের এই পূব বাঙলা নিয়ে ফ্যাশনেবল কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ এ রকম সিরিয়াস হয়ে গেলিই বা কেন? এই দ্যাখ না তোর এক লেঙোটার ইয়ার শ্রীমান কীর্তিকে। চাঁদপারা মুখ করে কখনো কান দিলে, কখনো দিলে না।"

কীর্তি উঠে দাঁড়ালো। বললো, "আমি এক্ষুনি আসছি।" বলে এমন এক বিশেষ স্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল যেখানে রাজাও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না, লক্ষ মোটরের মালিক ফোর্ডকেও পায়ে হেঁটে যেতে হয়।

টয়লেট থেকে ফেরার সময় বারের পাশে আসতেই বেয়াত্রিচের চোখে চোখ পড়ল। ইঙ্গিতটা অস্পষ্টতমের চেয়েও এক বাঁও নিচে। তবু কীর্তি বারের সর্বশেষ দণ্ডাসনে বসতেই বেয়াত্রিচে কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললে, "তোমার সঙ্গে কথা আছে, মনামি।

"ডিউটির সময় খাওয়াটা আমার পছন্দ নয়। তবু তোমার সম্মানে—। কিন্তু দুটো ড্রিংকই অনুমী।"

"আস্তে বলো। নইলে বার-এর বোতলগুলো হাসতে হাসতে ফেটে পড়বে।

একে তুমি লেডি, তদুপরি অবিবাহিতা লেডি। তোমার আপন কেতাদুরস্ত দেশে কখনো কোনো সিন্নরীনা নোংরা লীরা হাতে তুলে একটা হুনোর জন্য পে করে ?"

"না, কিন্তু আমি তোমার বন্ধু, সেইটে আমার পরিচয় নম্বর এক। সিন্নোরা না সিন্নোরীনা—সেটাকে ঘোড়ার রেসে বলে 'অলসো র‍্যান'—মানে থার্ড প্লেসও পায় নি। এবারে মন দিয়ে শোনো। এখন ঘাড় ফিরিয়ে ডান দিকে তাকিয়ো না। পরে এক ঝলকে দেখে নিয়ো, কিন্তু ভালো করে চিনে নিয়ো ঃ তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বসে ঐ যে রামছাগল মির্জাটা, তার পাশে বসেছে তার এক ইয়ার-জান্ দিলের ইহার—একটা শয়তান ছাগল।

কেন যে তোমাকে বলছি, জানি নে। না, জানি।

তোমরা পাঁচো ইয়ারে বার-এর, টেবিলের পাশে বসে কত না আজেবাজে কথা বলো—কে বা শোনে কে বা দ্যায় কান ? কালেকস্মিনে অবশ্যি দু'একটা সিরিয়াস আলোচনা করো বটে, কিন্তু কেউই সিরিয়াসলি ও-সব গায়ে মাখো না। তোমাদের আলোচনা পিন টু এলিফেণ্ট।

তিন দিন ধরে দেখছি, ঐ মির্জেটা রোজ রোজ আসছে, সাঁঝের পয়লা ঝোঁকেই। রোজই কানে আসছে পূব পাকিস্তান নিয়ে আলোচনা এবং রীতি-মত সিরিয়াস। তিনদিন ধরে। কেমন যেন খটকা লাগলো। কাল সন্ধ্যায় লক্ষ্য করলুম, তোমাদের অভ্যাসমত এক ব্যাপার থেকে অন্য ঘটনায় তোমাদের কথাবার্তা চলে গেলে ঐ মির্জেটা আবার সন্তর্পণে আলোচনাটার মোড় ফেরায় পাকিস্তানের দিকে। আমি তো বার-এর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি চৌকিদারি করি, সব কথা কানে যায় না, তবু আমার মনে হল মির্জা যত না নিজের কথা কয়, তার চেয়ে প্রশ্ন শুধিয়ে শুধিয়ে সব্বাইকে ওসকায়।"

কীর্তি অবিশ্বাসের সুরে কিন্তু দরদী গলায় বললে, "ও-সব তোমার কল্পনা, বেয়াত্রিচে ডার্লিং।"

বেয়াত্রিচে বললে, "কাল বেলা তিনটে অবধি তোমার মন্তব্যটা মেনে নিতে আমার বিশেষ আপত্তি হত না।

কাল বেলা তিনটেয় মির্জা বারে এলেন ঐ ইয়ারকে নিয়ে। বার তখন শূন্য। আমিও দুপুরের মিনি নিদ্রায় এক কোণে ঢুলছি। ঐ দূরের কোণটায় বারের উঁচু টুলে বসে নিচু গলায় গুজুর গুজুর আরম্ভ করলেন, মির্জা কখনো ভাঙা ভাঙা উর্দু বলে—সে উর্দু আমাদের এলিয়েট রোডের যমজ—ওটা আমার সড়গড়। কখনো বলে ইংরেজি—সেটা বুঝতে আমাকে বেগ পেতে হয় অবশ্য। কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা ওরা ভেবেছে আমি অতদূরে থেকে তাদের কথা শুনতে পাবো না, বুঝতে পারবো না। আর আমি তো সামান্য বার্-মেড্। 'বুওনো দিও'—গুড্ লর্ড—তোমাদের চোখের একটি চুলের কাঁপন

থেকে এক শ' গজ দূরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, কেউ এখন কন্যাকের বদলে উইস্কি চায়, কে একটা নোভালজিনের বড়ি চায়। আর দশ হাত দূরের থেকে ওদের ঠোঁটের করতাল বাজানো থেকে বুঝতে পারবো না, ওদের খুলির ভিতর কি সব বদামি আবজার করছে? জানো, শার্লক হোমস অন্ধকারে বেরালের চেয়ে দেখতো বেশী!

সর্বক্ষণ তারা কথা কইছিলো পূব আর পশ্চিম বাঙলার বাঙালীদের নিয়ে। দোস্তকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল মির্জা উভয় বাঙলার বাঙালীদের মধ্যে কোনো দোস্তী নেই। বললে, 'জানেন না, ১৯৬৫-র লড়াইয়ের সময় যে-সব পাঞ্জাবী পাঠান সেপাই বর্ডারে পাহারা দিচ্ছিল তাদের দিন কেটেছে বাদশাহী খানা খেয়ে, নবাবের হালে। গাঁয়ের বাঙালী মেয়েরা বিরয়ানী কোর্মা রেঁধেছে আর পুরুষগুলো বাঁকে করে সেগুলো ডেগ-ডেগচিতে নাকে নাকে ভ'রে নিয়ে গিয়েছে ওদের কাছে, আর—' "

হঠাৎ থেমে গিয়ে বেয়াত্রিচে বললে, "বাকিটা এখন না। আমার মনে হল ঐ বিদেশী ঘুঘুটি আমার দিকে একবার আড়নয়নে তাকালে যেন। তুমি এখন একটা চোটা পেগ পরিমাণ হেসে আমার গালে একটি মিষ্টিমধুর ঠোনা মারো। ভাবটা, যেন আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলে।"

কীর্তি কিন্তু অকৃত্রিম হাসি হেসেই ঠোনা মেরে বললে, "দান্তে তো তাঁর প্রিয়া বেয়াত্রিচের সঙ্গে কদাপি রসালাপ করে নি।"

দণ্ডাবতরণ করে চলেছে মৃদুপদে কীর্তি পার্টির দিকে। বিদেশী ঘুঘুকে যেন শুনিয়ে দিয়ে একটুখানি উঁচু গলায় বললে, "টেক কেয়ার! খান চটবে।"

কীর্তি ঘাড়টা একটু পেছনবাগে বেঁকিয়ে আরেক গাল হেসে বললে, "ও আমার আণ্ডার স্টাডি।"

"তোমার হাফ্ ড্রিংকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি! বাব্বা! রসে টৈটম্বুর। প্রেমের বন্যা যেন। পেটে আর এক ফোঁটাও ধরবে না।"

কীর্তি চেয়ারে বসতে না বসতে শুনতে পেল বিদেশী ইয়ার যেন যৎসামান্য ব্যঙ্গের সুরে টিপ্পনী কেটে বললেন, "কোনো কোনো বার-এর ভিতরে বাইরে দুদিকেই স্বরাজ। বন্দোবস্ত্ আচ্ছা হ্যায়।"

সুদিন বেশ কঠিন গলায় বললে, "সিন্নরীনা বেয়াত্রিচের পরিবার বহু ক্লাবের বহু মেম্বারের চেয়ে প্রাচীনতর। আমাদের কলকাত্তাই কায়দা—শিখতে অনেকেরই সময় লাগে, মিস্টার লারী।"

মির্জার মুখ একটু বেগনী হল। যদিও তার চামড়াটা গণ্ডারের—বাটা কোম্পানী কিনতে চেয়েছিল দক্ষিণ মেরু অভিযানের বুট বানাবার তরে।

লারী কিন্তু সত্যই বেয়াত্রিচের ঘুঘুবর। যেন বিরাট প্রশংসা শুনে আনন্দের হাসিতে খান খান।

ইতিমধ্যে মির্জা দাঁড়িয়ে উঠে কীর্তির সঙ্গে লারীর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, ইনি আমাদের চৌধুরী কীর্তি সাহেব, আর ইনি মিঃ লারী।"

মিঃ লারী যে হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়েছেন সেটা না-দেখার ভাব। ভান করে কীর্তি ওর দিকে ভালো করে না তাকিয়ে ছোটাসে ছোটা একটা "নমস্কার" বলে ঝপ করে বসে পড়লো।

চাটুয্যে গুনগুন করে খানকে শুনিয়ে বললে, "ব্যাটাচ্ছেলে মির্জাটা এ্যাদ্দিন ধরে আমাদের সঙ্গে ওঠবস করছে অথচ এটিকেটের 'এ' অক্ষরটিও তার রপ্ত হল না। পরিচয় করিয়ে দেবার সময় কার নাম আগে আর কার নাম পরে বলতে হয় এ্যাট্টুকুন হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান হল না।

চাটুয্যের জ্যাঠামশাই তাঁর কচ্ছপের খোল ড্রেস শার্ট বিলেত থেকে স্টার্চ করিয়ে আনতেন, আর আইনের বই বাঁধিয়ে আনাতেন প্যারিস থেকে। চাটুয্যের মামা রসাল ঘোষালকুল যে পরিবারের গুরু তাঁরই একজন ইণ্ডিয়ার প্রথম লর্ড। কায়দাকেতায় কেতাদুরস্ত।

কীর্তি দরদী কণ্ঠে বললে, "মিঃ মির্জা, আমার নাম কীর্তি চৌধুরী। পাঞ্জাবী মহাখানদানীদের মত চৌধুরী কীর্তি নই। আমি অতিশয় সাদামাটা বাঙালী—আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মিঃ লারী বড়ই অমায়িক ব্যক্তি। মৃদুহাস্যে শুধোলেন, "পাঞ্জাবী হতে কি আপনার ঘোরতর আপত্তি?"

কীর্তি বুড়বকের মত মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "পাঞ্জাবী—পাঞ্জাব —পঞ্চ+আব—পাঁচ রকমের জল। ওরে বাবা!"

লারী কীর্তির চেয়ে অধিক বুড়বকের মত প্রশ্নভরা মুখে এর ওর দিকে তাকালেন।

"আমাদের ক্লাব-মেম্বার চাটুয্যেরই পূর্বপুরুষগণ অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্ররাজির ভূরি ভূরি টীকাটিপ্পনী রচনা করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। বক্ষ্যমাণ চাটুয্যের কাছে সংস্কৃত গোমাংস বরাহমাংসবৎ বলা চলে না, কারণ উভয় মাংসেই তার ঔদরিক নীতি উদার, তবে সেটাকে সে মহামাংস অর্থাৎ মানুষের মাংস হিসাবে গণ্য করে। তাই এস্থলে টীকাকারের রক্ত কার গায়ে তার চেয়ে বেশী।"

লারীর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জ্ঞানদান করে বললে, "শব্দার্থে অর্থহীন, ভাবার্থে মহা মূল্যবান। 'পাঁচ ঘাটের জল খাই নে' এ-ইডিয়ামের অর্থ আমি যত্রতত্র সর্বত্র থেকে আমার পানীয় সঞ্চয় করি নে। আমার রুচি আছে। অর্থাৎ কীর্তিবাবু ফেস্টিডিয়াস, বাছেন চুস্ করেন, অর্থাৎ ভেরি choosy।"

লারীকে ঘায়েল করা কঠিন কর্ম।

বললেন, "বাঙালী আর্যের পূর্বপুরুষ তো পাঞ্জাব থেকে এসেছেন। তাঁরা

তো পাঞ্জাবী।"

অতিশয় মৃদুকণ্ঠে সুদিন বললে, "এবং তাদের পূর্বপুরুষ বাঁদর—ডারউইন বলেছে।" বলেই একটা কৃত্রিম হাই চাপতে চাপতে বললে, "ভেরি সরি, মিস্টার লারী। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, গুড নাইট।" সকলের দিকে তাকিয়ে আরেকটা হাই চেপে, আরেকটা "গুড নাইট" হেঁকে বারের দিকে চলল।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। লারী আর মির্জা ছাড়া।

কীর্তি মনে মনে বললে, "বেয়াত্রিচের সন্দটা বোধ হয় ঠিক। বাবুদের সব প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায় নি বলে সভা ভঙ্গে ক্ষুণ্নমনা।"

তার সঙ্গে চললো মাদ্রাজী রঙ্গনাথন। সমস্ত সন্ধ্যা মুখ খোলে নি।

কীর্তি তাকে শুধোলো, "তুমি আর লারী যখন একসঙ্গে টয়লেট যাচ্ছিলে তখন আসতে যেতে কি গুজুর গুজুর করছিলে?"

"বলছিল, 'পূব পশ্চিম উভয় পাকিস্তান অভিন্ন অচ্ছেদ্য রাষ্ট্র। এক রাষ্ট্রাংশ যদি কেটে পড়ে তবে দ্রাবিড়রা যে উত্তর ভারত থেকে কেটে পড়তে চায় সে আন্দোলন কি বলবান হবে না? "সেপারেটিস্ট মুভমেন্ট" আরো আবোল-তাবোল কী সব। সে মুভমেণ্ট ভারতকে দুর্বল করে দেবে। পূব বাংলার আন্দোলন দৃষ্টান্ত হয়ে, অপরোক্ষে ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।" সদানন্দ, সদানীরব রঙ্গনাথন শেষটায় বললে, "নোজি চ্যাপ, শুঁক শুঁক করছে সর্বক্ষণ!"

বেরুবার সময় বেয়ারা কীর্তির হাতে একখানা চিরকুট দিলে। তাতে লেখা ঃ

"ডার্লিং কে,

কাল আমার অফ্ফ ডে। পাঁচটায় খানের ওখানে যাবো। তুমি আসতে পারবে? বাকি সব-কথা ওর সামনে হবে। তোমার

বী।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিপ্রা বেলকনির উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়ে আছে পার্কের সবুজ ঘাসের দিকে। এ-সময়টায় কলকাতার ঘাস তার সবুজিমা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যে-জন অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে, অল্পের ভিতর বৃহতের সন্ধান পায় সে যৎসামান্য উপাদান থেকে তার রসের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। কলকাতায় থাকার মধ্যে আছে কি? নিচে ঘাস, উপরে আকাশ। রসগ্রাহীর কাছে দুটোই সজীব। ঘাস তার রঙ বদলায় ঋতুতে ঋতুতে। গ্রীষ্মের প্রতাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ পরী তার ডানা দুটির উপর যে ক্রীম আপন হাতে তৈরী

করে মাখেন তাতে নীলের পরিমাণ দিতে থাকেন কম—রং প্রতিদিন হলদের দিকে চলতে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ হয়তো একদিন অকাল বৃষ্টি হল। সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনের প্রসাধনকালে সবুজ পরী আবার তার নাম সার্থক করার কথা স্মরণে ক্রীমে নীলের মেকদার বাড়িয়ে দেন।

কিন্তু যে-জন প্রতিদিন ঐ ঘাসের দিকে না তাকায়, সবুজের ধ্যানে অন্তত ক্ষণতরে নিমগ্ন না হয় সে এই প্রাণবন্ত পরিবর্তনের রস থেকে হয় বঞ্চিত। শিপ্রা যাব থেকে প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে সেই থেকে সে এ-রস চেখে আসছে। বিলেতে দুটো শীতকালে যখন মাঠ-বাট বরফে ঢেকে শ্বেতে শ্বেতে শ্বেতময়, তখন সে সেটার সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় কিন্তু কলকাতার সে-সময়কার হলদে-ঘেঁষা সবুজ ঘাসের বিরহ-বেদনা অনুভব করেছে।

কলকাতার আকাশ অতিশয় সজীব। তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয় কৈশোরে—যখন জ্বর সর্দির ভয় কম—ছাতে শুয়ে। শহরের প্রদীপ যেমন যেমন নিভতে থাকে লাজুক আকাশবধূ তারই সঙ্গে সঙ্গে তারার মালা, অলঙ্কার একটির পর একটি পরতে থাকেন। হয়তো সে ঋতুতে প্রথমেই দেখতে পাবেন কেসিয়োপিয়া, কৃত্তিকা—সাতভাই চম্পা—কিংবা হয়তো বধূ প্রথমেই পরবেন কালপুরুষের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রমণিটি তারপরই সপ্তর্ষি। চক্ষু যদি নিদ্রাহীন হয় তবে স্পষ্ট দেখতে পাবেন অরুন্ধতী, তার স্বামী বশিষ্ঠের পাশে বসে ক্ষণতম মৃদুহাস্য করছেন মিটমিটিয়ে। হয়তো সে রাত্রে আকাশে তাঁর রঙ বদলাতে বদলাতে পরে নেবেন তাঁর মেখলা, নীবিবন্ধ আকাশ-গঙ্গা দিয়ে, দিগ্বলয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত জুড়ে। সেই কটিবন্ধ থেকে ঝুলবে কত না অত্যুজ্জ্বল ক্ষীণ-জ্যোতি, মধ্যজ্যোতির মণিমাণিক্য। আর অভিসারিকার গতিবেগ এতই মৃদুমন্দ যে সেটা চোখেই পড়ে না। হঠাৎ দেখতে পাবেন পশ্চিমাকাশের একটি গয়না নেই—তার বদলে পূর্বাকাশে আর একটি উজ্জ্বলতর মণির স্তবক।

মর্ত্যের কোন্ রাজ-রাজ্যেশ্বরী অভিসারে যেতে যেতে এই ইন্দ্রপুরীর মণির মত ক্ষণে ক্ষণে অলঙ্কার পরিবর্তন করতে পেরেছেন।

কিন্তু হায়, এ-বধূ রাত্রি শেষে হয়ে যাবে বিধবা। উষস দেবীর আশীর্বাদ তার তরে নয়। তাঁর আগমনের আভাস পাওয়া মাত্রই বধূ সর্ব অলঙ্কার ধীরে ধীরে বর্জন করবেন। সর্বশেষে সর্বোজ্জ্বল শুকতারা মণিটি।

শিপ্রা এ-সৌন্দর্য উপভোগ করেছে বহুবার। আর সব বিষয়ে সে ইংরেজের মত কাঁটায় কাঁটায় চলে। নিত্যদিনের রুটিন কাজকর্মে কোনো কামাই দেয় না। শুধু ডাইরি লেখার বেলায় সে আর সর্ব বাঙালীর মত গাফিলীতে পরিপক্ক। সেই অনিয়মের ডাইরিতে, যেখানে শূন্যতারই রাজত্ব বেশী—

লেখা-পাতার ওয়েসিস সামান্য। সে কটির অধিকাংশে আছে আকাশের অভিসার যাত্রা।

হঠাৎ শিপ্রার মনে নূতন ভাবোদয় হল, হৃদয় মনের এই নবজাতক, এর কথা ডাইরিতে বলতে হবে।

ইতিমধ্যে অকালবৃষ্টি নেমে শিপ্রার পায়ের উপর সে-রাতের এবং প্রতি রাতের কীর্তির মত চুমো খেতে লাগলো। শিপ্রা চোখ দুটি বন্ধ করলো—"আহ!" পা সরাল না।

আর কীই বা দরকার! সে নেল্-পালিশ ব্যবহার করে না। আলতা মাখে কালেভদ্রে—নিতান্ত বুড়ী নাপতেনিটাকে নিরাশ না করার জন্য।

যেখানে মানুষ জানে, তার প্রিয়জন আসবেই আসবে, ঠিক সময়েই আসবে, এমন কি তার কিছু পূর্বেও আসতে পারে, সেখানে প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত মধুময়। কিন্তু যে স্থলে স্থিরতা থাকে না, আসবে কি আসবে না, সেখানে সন্দেহের দোলা হৃদয় মন অশান্ত বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই আরবী প্রবাদ বলে, "আল-ইন্তিজারু আশাদ্দু মিনা'ল মউৎ"—মৃত্যুর চেয়েও অধিক শক্তি ধারণ করে প্রতীক্ষা। কিন্তু মৃত্যু বা প্রতীক্ষা শিপ্রা-হৃদয়ের চেয়ে বলবান নয়।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো। বুকটা ধক্ করে উঠলো শিপ্রার। এ তো অসম্ভব। কীর্তি এখনো এল না!

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। আশ্চর্য!

কিন্তু ঐ তো হেড্-লাইটের জোর আলো গেটের উপরে পড়েছে। ছুটে গিয়ে গেট খুলে দেয় না কেন? দারওয়ানটা অতি নিষ্কর্মা। বৃথা পাঁচ মিনিটের উপর অযথা আরো আধ মিনিট। নাঃ! ঐত্তো।

শিপ্রা বেলকনি ছেড়ে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালো।

স্বভাবতই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলে যে-উপরে দাঁড়িয়েছে তার পায়ের দিকে চোখ পড়ে। কীর্তি চেঁচিয়ে বললে, "এ কি? তোমার পা-ভেজা, শাড়ির অনেকখানি ভেজা। যাও, যাও। এখ্খুনি পা মুছে ফেলো—না আমি ভালো করে আচ্ছাসে রগড়ে রগড়ে বোন্ড্রাই করে দেব?"

শিপ্রা শান্ত কণ্ঠে বললে, "তুমি যখন রয়েছ—"

বুদওয়ারে ঢুকে শিপ্রা ডিভানে বসে পা-দুটি প্রসারিত করলো। বললে, "বাথরুমে বড় টাওয়েল আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে দেখ তো না দেখ তো কীর্তি গেল আর এল।

পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললে, "যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। পেয়েছি একটি জলচৌকি—এই নাও। সেই মধুর চিন্ময় কবিতাটিকে এবারে সম্পূর্ণ মৃন্ময়

করা যাবে, এই সেই পাদপীঠ।

'পাদপীঠ 'পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিলা বধূ।'

কিন্তু কাপড় ছাড়ো, আগে কাপড় ছাড়ো। নইলে পা যে বার বার ভিজে যাবে।"

"কাপড় ছাড়ি কখন? তুমি যে রকম ক্ষিপ্র বেগে ঢুকলে আর ক্ষিপ্রগতিতে বেরুলে তাতে করে দোরের গোড়ার সঙ্গে তোমার কলিশন লাগলো জোর। ফলে ছিটকে এসে পেঁছিলে আরো স্প্লিট সেকেন্ড পূর্বে। কাপড় ছাড়ি কখন? নিয়ে আসছি শাড়ি—কোনটা আনবো? এখানেই ছাড়ি।" সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের উপর দুষ্টু হাসির আবেশ।

কীর্তির মুখের রঙ একটু বদলালো বোধ হয়।

শিপ্রা হাঁটু গেড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "তুমি কি ভুলে গেলে, কীতা, মিতা আমি মমারত্রের মত রন্দি পাড়ার বন্ধ পাগল মুক্ত পাগল আর্টিস্টদের পাঁচতলা ছ'তলার উপরকার স্টুডিওতে আনাগোনা করেছি পুরো একটি বছর। ঐ সব আকাশ-ছোঁয়া চিলকুটুরির থেকে বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে মুক্ত-প্রকৃতি. নগ্ন আকাশ। কুটুরির ভিতরেও তাই। তারা "প্রকৃতাবস্থায়" প্রকৃতিদত্ত রূপে কেউ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পোজ দিচ্ছে, কেউ পড়ি পড়ি সোফাটার উপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কেউ এক কোণে কফি বানাচ্ছে। আমি যে শেষ পর্যন্ত 'অপ্রকৃতাবস্থায়ই' রয়ে গেলুম তার একমাত্র কারণ, মডেল হয়ে পোজ দিতে গিয়ে ওরা সর্বপ্রথম ন্যুড হয়। দি রেস্ট ফলোজ। আমি কখনো পোজ দি নি।...আচ্ছা কোন্ শাড়িটা পরে আসবো।"

তন্মুহূর্তেই অচিন্ত্য উত্তর "সেই জরি পাড়ের নীলাম্বরী।"

শিপ্রা চিন্তার ভান করে বললে, "সেটা তো ভেজা নয়।"

? ? ?

শিপ্রা বললে, "ওহো, তুমি তো পদাবলী রসের সোয়াদ জানো না, তবু তোমার সহজিয়া রসানুসন্ধানবৃত্তি তোমাকে ঠিক পথেই নিয়ে গিয়েছে। বুঝিয়ে বলি; আমি যদি নীলাম্বরীই পরি, তবে তার মূল রসটি অপূর্ণ থাকবে কেন। সে-শাড়ি ভেজা না হলে তুমি গাইতে শিখবে কি করে,

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর

এই আটটি মাত্র শব্দের মাধুর্যবৈভব প্রথম শ্রবণে কে না বিচলিত হয়েছে!

শিপ্রা বৃথা বিনয়াসক্ত নয়। নীলাম্বরী পরে নিয়ে তবু বললে, নীলাম্বরী পরতে হলে যতখানি শ্বেতাম্বরী হতে হয় আমি ততখানি ফর্সা নই।

কীর্তি চোখ বন্ধ করে আটটি শব্দে মেশানো রসের ককটেল চুক চুক করে চাখছে।

ওরে কীর্তিনাশ, বুদ্ধিনাশ, এ আটটি শব্দের রস গ্রহণ করার তরে একটা মানুষের একটা যৌবন যথেষ্ট নয়। ক'বার ক'টা যৌবন-জ্বালা সইতে হয় কে জানে?

শিপ্রা বললে, "মডেল হয়ে পোজ দি নি, ভেবো না তাই আমি গঙ্গোত্রীর জলে ধোয়া তুলসী পাতাটি।···সেটা বোধ হয় তুমি ইতিমধ্যে খানিকটে হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছ। নইলে আজ তুমি পাকী পাঁচ মিনিট লেটে আসতে না। কিংবা আমি এরি মধ্যে বাসি ফুল।"

কীর্তি চুপ করে শুনলো। অভিযোগের জবাবে কোনো সাফাই গাইলে না। হয় তো ভেবেছে, খুদ কোতোয়ালই যখন জানে তার মগজ গড়া ফরিয়াদ বিলকুল ঝুটমুট ঝুটা তখন বেকার তাবৎ বাৎ বজ্রসেনের।

শিপ্রা বললে, "বেয়াত্রিচে কি জানালো।"

"অনেক কথা। খান আর আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এই ঘুঘু লারীটা ইয়েহিয়ার গুপ্তচর। মোটামুটি যে কটা তথ্য জানতে এসেছে তার প্রথম, ইয়েহিয়া মুজীবে যদি সমঝোতা না হয়, এবং ইয়েহিয়া দমননীতি চালায় তবে পশ্চিম বাঙলার হিন্দু মুসলমান পূব বাঙলার বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থন জানাবে কি? জানালে কতখানি? নকশাল পন্থীদের বন্দুক বোমা আছে? তারা সেগুলো পূব বাঙলায় পাঠাবে কি? আর কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের অস্ত্রশস্ত্র আছে? পশ্চিম বাঙলা জনগণ কিংবা/এবং সরকার ভারত সরকারের উপর চাপ দেবে কি—পূব বাঙলাকে 'অল্ আউট' সাহায্য দেবার জন্য? দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান মতিগতি কি সে সম্বন্ধে লারী অলরেডি ওকীবহাল। লারী নাকি বিদ্রূপ করে মির্জাকে বলেছে, 'বুদ্দুর পাল রাজত্ব করে দিল্লীতে। পূব পাকে বিদ্রোহ দেখা দিলে ঐ তো তাদের আল্লার পাঠানো বেহেস্তী মোকা—পূব বাঙলাকে পুরো মদদ দিয়ে বিদ্রোহ সফল করা, সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিম পাককে চিরতরে দুবলা কমজোর করে দেওয়া। এই সামান্য তত্ত্বটি তারা এখনো সমঝে উঠতে পারে নি। তবে এ-কথাও সত্য, অবসরপ্রাপ্ত জেনরেল কল-এর মত কিছু জঙ্গী আদমী বলছেন, পূব বাঙলার বিদ্রোহ একটুখানি ছড়িয়ে পড়লেই সেখানে বিনা বাক্যব্যয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ো। পূব বাঙলাকে স্বাধীন করে দাও। পশ্চিম পাক প্রান্তে আক্রমণ করবে না। সেখানে ডিফেনসিভ স্ট্রাটেজি।

দ্বিতীয় বৃহৎ প্রশ্ন, মির্জার মত যথেষ্ট বাঙালী মুসলমান পশ্চিম বাঙলায় আছে কি, যারা দিল-জান্ দিয়ে 'অখণ্ড পাকিস্তান'কে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিরুদ্ধে জোর প্রপাগাণ্ডা চালাবে? তারা সন্তর্পণে অর্ধপ্রকাশ্যে হুইসপারিং প্রপাগাণ্ডা চালাবে তো, যে ভারতের স্বার্থ পূব বাঙলাকে সাহায্য না করা। পূব বাঙলা পাকিস্তান থেকে কেটে পড়লে দক্ষিণ ভারত ঠিক ঐ নজীর দেখিয়েই উত্তর

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কেটে পড়বে।"

শিপ্রা চুপ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব-কথা শুনে যাচ্ছিল। তার মনে পড়ল ফ্রান্সের সেই বুড়ো জেনারেল তার পিতাকে বলেছিলেন, "রাজনীতি যখন দেউলে হয়ে যায় তখন সে-রাজনীতির উদ্দেশ্য সফল করতে হয় অন্য মাধ্যমে, অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে, অর্থাৎ পুরোপুরি সংগ্রাম চালিয়ে।" তার মনে চিন্তা এল, ইয়েহিয়া ঢাকায় যে রাজনীতির চাল চালছে তাতে লীগ কিস্তিমাত হবে না। অতএব দমননীতি অনিবার্য। কীর্তিকে শুধলো, "তোমাদের পকেট-ক্লাবে তোমাদের সঙ্গে বসে তো মাত্র একটি মাদ্রাজী—রঙ্গনাথন। সে কি বললে ?"

কীর্তি উৎসাহিত হয়ে বললে, "তুমি সত্যি সত্যি অদ্ভুত একটা সিক্‌স্থ সেন্‌সের মালিক। নানা প্রকারের ইঙ্গিত সত্ত্বেও যখন সদানীরব তামিল সন্তান রাম-গঙ্গা কিছুই বললে না, তখন সে যখন টয়লেট যাচ্ছে তখন লারী তার সঙ্গ নিয়ে তাকে করলে ফ্রন্টেল্‌ এটাক্‌ কিন্তু ওর জিভের আর্তরাইটিস সারাবে, লারী! আমাকে অবশ্য লারী সম্বন্ধে তার মন্তব্য প্রকাশ করলো দুটি শব্দে 'নোজী পার্কার'।"

শিপ্রা বললে, "তার মানে টিকটিকি বিভীষণ, রঙ্গনাথন সেভেনথ্‌ সেন্‌স্‌ ধরে। তোমার সম্বন্ধে তার কি ধারণা জানো ? মাস তিনেক পূর্বে আমারই এক পার্টিতে ওর পাশে গিয়ে বসেছি এমন সময় তুমি লন ক্রস করছিলে তখন, অব্‌ অল থিংস, বলে কি না, 'আমি যদি মেয়েছেলে হতুম তবে ঐ চ্যাপিটাকে নিশ্চয়ই বিয়ে করতুম'।"

কীর্তি বললে, "শূর্পণখার দেশে মেয়েরাই পুরুষকে তাড়া লাগায়। আর্য রামচন্দ্র, আদি কবি বাল্মীকি এ তত্ত্বটা জানতেন না বলে মেয়েটাকে নির্লজ্জা, বেহায়া ঠাউরে তাকে নিয়ে মস্করা করেছেন। দাঁড়াও, আমি বেয়াত্রিচেকে একবার ফোন করি। আজ তার অফ্‌ফ্‌ ডে বটে, বাড়ি ফেরার পথে তবু একবার ঢুঁ মেরে যাবে বলেছিল। আমাদের দুই ইয়েহিয়া-দাসের হালটা কি।"

ফরাসী কেতার বেডরুমে রোমানসের মৃদু সুবাস। সেখানে ফোন।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি জলচৌকিটা সরালে এ ঘর থেকে। পাতল একখানা ডবল সাইজের শেতল-পাটি, করডুরয়ের ওড়ওলা কুশন—ওগুলো অতটা পিছলোয় না—এক প্রান্তে ছোট্ট শ্বেত পাথরের রেকাবিতে দুটি চাঁপা ফুল, অন্য প্রান্তে মুরাদাবাদী পানদান। নিজে শুয়ে পড়ল ঠিক মাঝখানে। বাঁ হাতে লম্বা হ্যান্ডিলওলা আন্ডাশেপের মসৃণতম রুপোর হাত-আয়না—ফরাসী স্টাইলের, অন্য হাতে বাজু সোনার পাতে মোড়া হাতির দাঁতের সিলেটী চিরুনি।

কীর্তি ফিরে এক নজরে সব দেখে বললে, "আহ্‌! এই তো দিল-আরাম গুলিস্তান, আর তুমি পরী—"

"নীলবসনা সুন্দরী—"

"বলো কি? ও-বই তো ছেলে-ছোকরারা পড়ে। মেয়েরাও?"

"অন্তত আমি। আর মনে হচ্ছে, তোমার ঐ ভিন্-দেশী টিকটিকিটি পাঁচকড়ির অরিন্দম—না কি যেন নাম—তার শাকরেদি করতে পারেন পাকা চুলে পৌঁছনো অব্দি।"

"ক্লাবে আমাদের পকেট-ক্লাব কেটে পড়েছে। ওদের সঙ্গ দিচ্ছে একমাত্র খান।"

"খান! বলো কি?"

"সে আজই স্থির করেছে, সুপার টিকটিকির পার্ট নিয়ে দুই ঘুঘুকে পাম্প করবে। মুখে 'জানি নে জানি নে' বললেও সে ইসলাম ও তার ইতিহাসের অনেক গভীরে ডুব মেরেছে। সেইটে ভাঙিয়ে বলবে কনফিডেন্‌স্ ট্রিকস্টার!" তারপর অতিশয় গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে বললে, "আজ সন্ধ্যায় কিন্তু বেয়াত্রিচে একটা মারাত্মক খবর দিয়েছে। সে নিজেই নাকি প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারে নি—ঘুঘু যখন মির্জাকে তার 'মরাল' চড়াবার জন্য তাকে বললে, ইয়েহিয়া এসেছে লীগকে স্রেফ ধাপ্পা মারতে। সমঝোতার কথাবার্তার বাহানায় ইয়েহিয়া শুধু সময় নিচ্চে, পাঞ্জাব-পাঠান সৈন্য আনতে। এবং শুধু তাই নয়, লীগ যদিবা স্ট্রাটেজি হিসেবে কিংবা মঙ্গলের জন্য ইয়েহিয়ার সর্ব শর্ত মেনে নেয়, তবুও ইয়েহিয়ার জুন্টা স্থির সমস্ত পূব বাংলার উপর দিয়ে মিলিটারি স্টীম রোলার চালাবে।"

"তার অর্থ?"

"সরল। যে-পরিমাণে ট্যাঙ্ক, আর্মাড কার আনা হচ্ছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে তামাম দেশটাকে খাকছার করে দেবে। অবশ্য অতখানি সবিস্তার লারী বলে নি। তাই বেয়াত্রিচের মনে ধোঁকা, সে ঠিক ঠিক শুনতে পেয়েছে কি না, বুঝতে পেরেছে কি না।"

শিপ্রা বহুক্ষণ হল আরশি চিরুনি এক পাশে রেখে দিয়ে পুরো মন দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ গ্রহণ করছিল।

উভয়ই অনেকক্ষণ ধরে আপন আপন মনে চিন্তা করছিল।

শেষটায় শিপ্রা বললে, 'ওখানে আন্দোলন হলে পশ্চিম বাঙলা নির্লিপ্ত থাকতে পারবে না।" তারপর শুধোলে, "আচ্ছা, বেয়াত্রিচে এ-ব্যাপারে অত উৎসাহী আর কৌতূহলী কেন?"

"ঠিক ঐ প্রশ্নটাই আমি ওকে শুধিয়েছিলুম। বললে, সে তার মার কাছে ক্লাস টেনু অবধি পড়েছিল। তখন তাদের ইতালিয়ান রচনা সঙ্কলনে ছিল মাদসীনির বক্তৃতা—স্বাধীনতা সংগ্রামের যুবাদের উদ্দেশে। সেগুলো তার মনে এমনই গভীর দাগ কেটেছে যে সেই সময় থেকে পৃথিবীর যেখানেই যে

জাতই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেয় তখনই তার প্রতিটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। রাত্রে নাকি আবার মাদসীনির ভাষণ পড়ে তাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়।"

"খানদানী রক্ত আছে তার শরীরে। ও ক্লাব-বার-এর রানী, কিন্তু তোমাদের বার-এট-ল'র বারের চেয়ে আভিজাত্যে কোনো অংশে কম নয়।··· কিন্তু আজ এ-আলোচনা এখানেই থাক। আমাকে চিন্তিত তো করেই, পীড়াও দেয়।"

কীর্তি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল। হঠাৎ পানদানটার দিকে আঙুল তুলে শুধলো, "ঐ মুরাদাবাদী-তাজমহলটি পেলে কোথায়?"

"উনি ছিলেন বাবার ঠাকুমার নিত্যসহচরী। তুমি মাঝে মাঝে পান চিবোও বলে তোমার অনারে ওঁকে আলমারির উচ্চাসন থেকে নামিয়ে আমাদের সমাসনে বসিয়েছি।"

"তুমিও তো—"

"সে অতি কালে কস্মিনে। নেমন্তন্নের ভোজে বড্ড বেশী ঘি চর্বি থাকলে মুখটাকে পরিষ্কার করার জন্য? বাড়িতে একা একজনের জন্য পান রে, সুপুরি রে অত বায়নাক্কা সয় কে? হ্যাঁ, আগরতলা যাচ্ছো কবে?"

"বাইশ কিংবা তেইশে।"

"আমাকে ঠিক ঠিক জানিয়ো অন্তত একদিন আগে। তুমি আমাকে পিক আপ করবে, না আমি নিজে সোজা দমদমা যাবো। উয়েদার খারাপ হলে কিন্তু আমার গা গুলোয়।"

কীর্তি নির্বাক, স্তম্ভিত। সে তার প্রেমনিবেদন ভিন্ন অন্ন সব অনুভূতি—ভয়, বিস্ময় ঘৃণা কোনো অনুভূতিই তার চোখে মুখে প্রকাশ করে না। কিন্তু আজ এখন তার বিস্ময় তাকে এমনি অভিভূত করলো যে সে-বিস্ময় যেন তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো।

শিপ্রা তো লক্ষ্য করবেই। তবু সহজ সুরে বললে, "কেন, কি হল?"

কীর্তি সহজ সুরের অন্য দিক-প্রান্তের শেষ সীমানায়। জাত ইডিয়টের মত চি চিঁ শব্দ করলে, "তুমি, তুমি যাবে?"

শিপ্রা যথেষ্ট সচেতন—কীর্তির মগজে তখন কোন্ ভূতের নৃত্য আরম্ভ হয়েছে। তবু সুন্দ্মাত্র বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, "বা, রে! তুমি ওটা ধরে নাও নি? অবশ্য তোমার সব ট্রিপে তোমার সঙ্গে সর্বত্র যাব তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এবারের যাত্রায় রয়েছে খান। এ রকম হোস্ট্ কোথায় পাবো আমরা? একবার একটা ছোট স্টেশন থেকে গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে এমন সময় ধরা পড়লো হুইস্কির ন্যাজ সোডা ফুরিয়ে গিয়েছে। অমনি হোস্ট্ খান লম্ফ দিয়ে এলার্ম চেনের দিকে। সবাই চেঁচালো 'করো কি করো কি?

সামনেই সিলেটের সব চেয়ে বড় জংশন কুলাউড়া। ততক্ষণ জল দিয়েই হবে।' খান গাড়ি থামালো, চাকরকে ছোটালো স্টেশনে সোডার জন্য। গার্ডের হাতে ক'শ টাকা জমা দিয়েছিল সে নিয়ে মতভেদ আছে। বলেছিল, 'এই নাও, জরিমানার পঞ্চাশ টাকা, বাকিটা রইলো আরো জরিমানার জন্য। যতক্ষণ না বেয়ারা সোডা নিয়ে ফেরে ততক্ষণের ভিতর তুমি গাড়ি চালালেই ফের চেন টানবো।' গেস্টদের মধ্যে ছিলেন, আসামের আই. জি একজন ডাঙর সেক্রেটারি, ল' এ্যাণ্ড অর্ডারের হর্তাকর্তা। এরা গার্ডকে মুখ দেখান কি করে? সবাই নাকি উল্টো দিকের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারে মুখ ঢেকে ছিলেন।"

হঠাৎ শিপ্রা টানটান সোজা হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে কীর্তির দিকে তাকিয়ে এবারে যেন—ইংরিজিতে যাকে বলে 'থিক্ অব্ দি ব্যাট্‌ল্', বিরাট রণক্ষেত্রের যে-অংশে লড়াই চলছে প্রচণ্ডতম প্রতিযোগিতায় এবং ঐখানেই খুব সম্ভব জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হবে—সে-জায়গায় পৌঁছে বললে, "শোনো শ্রীযুত কীর্তিমান রায়চৌধুরী, তুমি ভাবছো এ-মেয়েটা এগিয়ে গিয়ে স্বেচ্ছায় লোক-নিন্দা গায়ে মাখতে যাচ্ছে কেন? তবে শোনো। এক নম্বর—" বলে ফরাসী কায়দায় ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের উপর রেখে বললে, "আমি প্রথম দিনই তোমাকে স্পষ্ট বলেছি, সমাজের কুৎসা—আই কেয়ার এ ফিগ্, এ পিন, এ জট্, এ টিটল—"

বলে মারলে তুড়ি। ফের তর্জনীটি অনামিকার উপর রেখে বললে, "দুই নম্বর: আমরা যেমন যেমন ঘনিষ্ঠতর হব, কুৎসার নানা রকম বেরকমের ধ্বনি জেগে উঠবে চতুর্দিক থেকে যে-রকম ফিলারমনিক অর্কেস্ট্রায় হয়। বেজে উঠবে আরো যন্ত্র, আরো ধ্বনি, বাড়তে থাকবে ধ্বনির বৈচিত্র্য, ভলুম, উচ্চতা এবং শেষটায় পৌঁছবে ক্রেসেণ্ডো-তে—সর্বোচ্চস্তরে—যখন একসঙ্গে সব-কটা যন্ত্র তীব্রতম তুমুল নাদে হল্ ভরে দেবে।

আমি আগরতলা গেলে ফিরে এসেই শুনবো কনসার্ট ক্রেসেণ্ডোতে।" ফের মারলে তাচ্ছিল্যের তুড়ি।

এবারে মধ্যমা। "তোমার কি লোকনিন্দা হবে—"

এতক্ষণে কীর্তির কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হয়েছে। বাধা দিয়ে বললে, "সেটা আমাকে বলতে দাও, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

বিনীত কণ্ঠে আবার যেন শিপ্রা নিবেদন করলো, "তাহলে তোমার কোনো ইচ্ছা, কোনো নির্দেশে আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না-না-না। আমি চলবো তোমার আদেশে। আমার অভ্যাস—সেটা বিধিদত্ত—আমার বক্তব্য আমি স্পষ্ট ভাষায় জোরদার গলায় প্রকাশ করি। আসলে তুমি জোরদার, ঢের ঢের বেশী জোরদার।

এখন যদি বলো, 'না তুমি আগরতলা যাবে না' আমি নত মস্তকে সে-আদেশ মেনে নেব—এবং আমার অনুভূতির কোনো পরিবর্তন হবে না। তার পর বসে বসে প্রহর গুনব। কবে তুমি ফিরবে। তখন সেটা ধুমধামে করবো সেলিব্রেট। তুমি নিজেই স্বীকার করবে, তোমার আদেশ আমার হৃদয় মনে কোনো জায়গায় আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নি।"

এবারে কীর্তি বললে, "আমার সামাজিক নিন্দার কথা তুলেছিলে? তুমি বহুদর্শী—তোমার মুখে এটা আদৌ মানায়। পুরুষের কুৎসা রটনা—তার আয়ু ক'দিন? জলের তিলক কপালে কাটলে শুকোতে যতক্ষণ লাগে—বরঞ্চ বলি জিন্-এর। ওটা স্পিরিট, উপে যায় তড়িঘড়ি। দেখতে পাও না, এ-দেশের নিত্য দিনের ট্রাজেডি—এমন সব পাষণ্ড যাদের কোনো কুকীর্তি কারো অজানা নয় তাদের হাতে আমরা নিত্যনিয়ত সঁপে দিই না সদ্য ফোটা শিউলি ফুলের মত সরল নিষ্পাপ বধূদের?

আমার বদনাম! খতিয়ে দেখলে শুনবে, অনেকেই আমাকে হিংসে করছে, কেউ কেউ আভাসে ইঙ্গিতে তোমার কাছে আমার এমন সব বদ-অভ্যাস কুকর্ম কেচ্ছা—যে-গুলোর সঙ্গে জীবনে আমার কখনো পরিচয়ই হয় নি—দূর থেকে সন্তর্পণে এগিয়ে দেবে; সেখানে আমার চিন্তা করার কিছুই নেই। তুমি আমাকে ভালো করেই চেনো—আমার কোনো দুর্বলতা তোমার অজানা নয়। ফার্সীতে বলে, 'দুশমন কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান হয়?'—দু'চার জন বন্ধু আমার এমন আছে যাদের শরীরে মনে যথেষ্ট বল আছে এবং দরকার হলে যারা সক্কলের সামনে দু'পাঁচ জনকে ঠ্যাঙাতে হামেহাল তৈরী—তা তারা তাদের সামনেই হোক্ আর আড়ালেই হোক্ তোমার আমার সম্বন্ধে অপছন্দসই কোনো মন্তব্য করলে। কিন্তু এ কথাটার উল্লেখ করলুম, নিতান্ত কথায় কথায়, এটা অবান্তর।

আর অগুনতি লোক তোমার রুচির খুব একটা প্রশংসা করবে না, তুমি আমার মত অপদার্থকে বেছে নিয়েছো বলে।"

শিপ্রা কোনো মন্তব্য করলো না। সর্বশেষ কীর্তি বললে, "কুকুর ঘেউ ঘেউ করে; কাফেলা এগিয়ে যায়। দি ডগ বার্ক্স, দি ক্যারাভান পাসেস।"

ষোড়শ অধ্যায়

বাগডোগরা এ্যারপোর্ট পেঁছবার পাঁচ মিনিট আগে হঠাৎ শিপ্রা দেখে, পালে পালে সাদা ছোট ছোট মেঘের টুকরো যেন তেড়ে আসছে তাদের প্লেনের দিকে। প্লেন ঢুকে গেল মেঘের রাজ্যে। আবার তেমনি হঠাৎ প্লেনটা ফাঁকাতে বেরুতেই শিপ্রা দেখে পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে শ্বেত-শুভ্র

হিমালয়। কী বিরাট, কী মহান, কী গম্ভীর সে গিরিরাজ। অথচ অতি দূরে থেকে দেখছে বলে মনে হল যেন মাত্র গজ তিনেক খাড়াইয়ের এবড়ো খেবড়ো একটা দেয়াল, পৃথিবী ইসপার উসপার হয়েছে। পাঁচিলের উপরের প্রান্ত যেন অসমান ঝালর-কাটা—উচ্চতায় শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিশেষ তারতম্য চোখে পড়ছে না বলে পর্বত প্রাচীরের উপরের রেখা কাটা কাটা—নীল আকাশের পটভূমিতে পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রসারিত হয়ে।

কিন্তু হায়, ভালো করে দেখতে না দেখতেই প্লেন রানওয়ের দিকে নামতে লাগল। দূরের এবং কাছের গাছপালার পিছনে বিরাট হিমালয় পর্যন্ত ঢাকা পড়ে অদৃশ্য হল।

শিপ্রার শরীর রোমাঞ্চিত। এ-রকম দৃশ্য সে জীবনে কখনো দেখে নি। তার দু'চোখ হরিষে বিষাদে ভরে গিয়েছে। তখন হঠাৎ মনে এলো কীর্তির কথা—বিস্ময়ে উত্তেজনায় তার কথা মোটেই মনে পড়ে নি, তার দৃষ্টি সে-দিকে আকর্ষণ করে নি। গোটা দুই খোঁচা দিয়ে বার বার শুধলো, "দেখলে, দেখলে?"

"তোমার মাথাটা যে-ভাবে জানলার উপর চেপে ধরে শার্সিটা চিবোচ্ছিলে সেটার মার্জিন ধরে আমি মাত্র একটা কোণ দেখেছি। কিন্তু এর আগে আরো কয়েক বার দেখেছি।"

শিপ্রার উত্তেজনা তখনো পুরো মাত্রায়; "আমি প্লেন থেকে আল্‌প্‌স্‌ দেখেছি অনেকবার। উপর দিয়ে ফ্লাই করার সময় জিনীভার বিরাট লেক থেকে ছোট ছোট ডোবাগুলোর নাম পর্যন্ত পিন্‌ ডাউন করতে পেরেছি। কিন্তু এ-রকম ওভারহুয়েলমিং দৃশ্য কখনো দেখি নি—যেটা মানুষের সর্বচৈতন্য আচ্ছন্ন করে তার সত্তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেয়। কিন্তু কী ট্রাজেডি। দু'মিনিট দেখতে না দেখতে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল।"

খান সান্ত্বনা জানিয়ে বললে, "কিচ্ছু ভয় নেই, শোক করার নেই। বাগ-ডোগরা থেকে আমরা যাবো গৌহাটি—অনেকখানি পথ—হিমালয়ের সমান্তরাল রেখা ধরে। পুরো পথ ধরে বাঁ দিকে গিরিরাজকে যত প্রাণ চায় দেখবে আর পেন্নাম করবে। কিন্তু কালো চশমাটা পরে নিও। নইলে চোখ ডেমেজড হতে পারে।"

শিপ্রা বিপুল বিক্রমে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "কেন? পার্বতী কি তার পিতা হিমালয়ের মুখের দিকে তাকাতেন না—না তিনি গগল্‌স্‌ পরতেন। আর হিমালয়ের শুভ্রতা যার তুলনায় মসীতুল্য, তাঁর প্রাতঃসূর্যরুচি শ্বেতাম্বর বর শঙ্কর? শুভদৃষ্টির লগ্নেও কি তিনি গান্ধারীর মত চোখে ফেটা বেঁধেছিলেন?"

কীর্তি বললে, "ওরকম অলৌকিক কর্ম শুধু মেয়েরাই পারে। আমরা তো

নহি বধূ, নহি কন্যা।"

শিপ্রা ব্যঙ্গ করে টিপ্পনী কাটলো, "অ। বধূর জন্য পাদপীঠ সংগ্রহ করাতেই সর্ব সাধনা সর্ব কামনা শেষ? বলে দেব খানকে সব? কেন? চন্দ্রবংশের সংবরণ না কে যেন সূর্যের মেয়ে তপতীকে রানী করতে চেয়েছিলেন বলে শ্বশুরমশাই সূর্যের দিকে অপলক চক্ষে তাকাতে তাকাতে উপাসনা করে প্রার্থনা জানান নি?"

শিপ্রা কান্নায় কান্নায় ভেঙে পড়ে আর কি! প্লেন ফের আকাশে ওঠামাত্রই ধরা পড়লো মেঘ আর কুয়াশা এ-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হিমালয়ের রূপরেখা ঢেকে ফেলেছে। দেবতারা কী অকরুণ, কী নিষ্ঠুর।

খান পুনরায় সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "ও সব মেঘ কুয়াশার নুইসেন্স যে কোনো সময় কেটে যেতে পারে। ততক্ষণ নিচের দিকে তাকাও না—ব্রহ্মপুত্র নদ। ইনিও তো হিমালয়ের জন্ম নিয়ে, বাপের মত ঠায় দাঁড়িয়ে না থেকে দেশের পর দেশ অতিক্রম করে যাচ্ছেন, পথিকের তৃষ্ণা নিবারণ করে, তাঁর অংশাবতার জনপদবধূর কলসীতে ঢুকে তাদের কাঁখে আরামসে বসে আনন্দধ্বনি 'ছলাৎ ছলাৎ' করছেন। তার পর তিনি আদর করে কোলে তুলে নেবেন গঙ্গাকে—দু'পথ ধরে দুজনাই বেরিয়েছিলেন হিমগিরি থেকে।···শুধোইগে পাইলটকে ঐ মেঘ বাবুদের গাত্রোৎপাটন করার আশু সম্ভাবনা আছে কি না।"

কামাখ্যার উপর দিয়ে যাবার সময় কীর্তি বললে, "এ জায়গার মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের মেড়া বানিয়ে রাখে।"

শিপ্রা বললে, "আমাকে এখানে নামিয়ে দাও। ভালো করে দেখে নিক সব্বাই, সত্য সত্য তিন সত্যের মেড়ী কাকে বলে।"

কীর্তি বললে, "আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, জোর গলায়, তোমার যা ইচ্ছার জোর, উইল-পাওয়ার আছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে স্বর্গে ইন্দ্রাণী উর্বশীর আসনে বসাতে পারবেন না, মর্ত্যে চার্মিং মার্লেনে ডীটরিষ, সুইট, লিলিয়ান হার্ভের মাধুর্য দিতে পারবেন না। নরকে যমরাজার পাটরানী যমীর কথা দূরে থাক। আর তোমার ইচ্ছা থাকলে তুমি মেড়ী, নেড়ী, ভেড়ী যা খুশী তাই হবার শক্তি ধরো—অর্থাৎ কারো তোয়াক্কা না করে। তুমি তো কলকাতাতে এখনো এক পাল মেড়া পোষো—"

শিপ্রা বাধা দিয়ে বললে, "থ্যাংক ইয়ু। কিন্তু বলো তো, আমি কি হতে চাই?"

কীর্তি চিন্তিত মনে আসমান-জমীন অনুসন্ধান করতে লাগলো।

শিপ্রা ডান দিকে একটু সরে বসে কীর্তির উরুতে হাত রেখে বললে, "কীর্তিপ্রিয়া।"

পেটুক গাণ্ডেপিণ্ডে খেতে খেতে মারা গিয়েছে তবু ভোজন কর্মে বিরতি দিতে পারে নি, এ-দৃশ্যটি প্রাচীন দিনের বহ্বান্নভোজনের একাধিক পরিবেশক চোখের সামনে দেখেছেন বলে দাবি করেন। কিন্তু স্পর্শকাতর রূপের পূজারী, সুন্দরের পিয়াসীদের সামনে প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে ছবির পর ছবি, দৃশ্যের পর দৃশ্য, রূপের পর রূপ ঢেলে দেন তবে সে বেশীক্ষণ সে-দিকে তাকাতে পারে না। তার হৃদয় তখন আকুলিবিকুলি করে প্রত্যেকটি দৃশ্যের রস দিয়ে সে-যেন তার হিয়া রাঙিয়ে নিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ যে-রকম সুন্দরী রাধাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'রাধে, তোমার চোলির রঙ দিয়ে আমার মস্তকাভরণ রাঙিয়ে দাও, (রাধা কি তবে ভ্রমবশত, না স্বেচ্ছায়, বুক চিরে তারই রক্ত দিয়ে কানুর মস্তকের চূড়া লালে লাল রাঙিয়ে "কৃষ্ণচূড়া"র জন্ম দিলেন?')—যাতে করে দুর্দিনে প্রাণের রসধারা যখন শুকিয়ে যায় সেই দারুণ দহন বেলায় এ-সব দৃশ্যের একটি একটি স্মরণে এনে নিজের ভাগ্যকে ক্ষমা করতে পারবে।

নিশ্চল হিমালয়, সচল ব্রহ্মপুত্র, বুকের উপর কত শত দ্বীপ শিশুর মতো প্রতিদিন বেড়ে বেড়ে বড় হয়ে উঠছে, জলের উপর ফোলা পালের স্ফীতবক্ষ বিশাল নিতম্বা মহাজনী নৌকার সারি যেন ডিমের খোসার সাইজ আর ওদেরই মত হেলে দুলে নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, চরের পরিবর্তে হঠাৎ জেগে উঠছে, মাথা উঁচু করে ক্ষুদ্রায়তন উমানন্দ পাহাড় কিন্তু তার আকস্মিক অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বুকে লাগায় চমক, গোয়াল পাড়ার ঘন সবুজ বাঁশ বেত আম-কাঁঠালের মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে উঠেছে হাজার হাজার অবঙ্কিম ঋজু গুবাক বৃক্ষের শুভ্রতা। কত দেখবে পিয়াসী শিপ্রা।

সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গৌহাটি, শিলচর শেষটায় আগরতলা। টসটসে ভেজা ব্লটিঙের মত তার সৌন্দর্য গ্রহণশালার ভাণ্ডারী আর কোনো নবীন রস নিতে সম্মত হয় নি। শুধু শিলচর থেকে ত্রিপুরা পাহাড়ের উপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে তখন কীর্তি ডান দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, "এই তোমার বাল্য সখী বিল্‌কিস্‌-এর দেশ, সিলেট!"

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে, বিল্‌কিস্‌ সত্যি বলেছিল, ফ্ল্যাট পূব বাঙলার মত সবুজে সবুজ তো বটেই, মাঝে মাঝে উঁচু নিচুর টিলাটালি, ক্ষুদে ক্ষুদে পাহাড়, আর সমস্ত দেশটা আঁকা-বাঁকা নদী-নালায় ভর্তি—সবুজ জেব্রার উপর ফালি ফালি ঘোলাজল স্বচ্ছ জলের ডোরা। মাঝে মাঝে আবার দিঘিও তো। না, স্মরণে এল বিল্‌কিস্‌ বলেছিল ওগুলো হাওর, লম্বা চওড়ায় অনায়াসে পাঁচ-সাত মাইল জুড়ে জল—মোস্ট ডেঞ্জারাস। শুধু দেখতে পেল না বিল্‌কিসের বর্ণনার ময়ূরের মত পেখম-মেলা বিরাট বিরাট কৃষ্ণচূড়ার নিচে, টিলার উপরে চা-বাগানের কলঘর, সানুদেশে চা গাছের ঝোপ, পাশের টিলার উপর ম্যানেজারের

নির্জন নিঃসঙ্গ ছিমছাম বাঙলো—প্লেন যাচ্ছিল খুবই উঁচু লেভেলে।

আগরতলার যে বাঙলোতে তারা উঠলে সেটা ওঠবার সিঁড়ি থেকে বাথরুমে জমাদার ঢোকবার দরজা পর্যন্ত সব-কিছু মেগনাম্ সাইজের। বাড়িটা বানিয়েছিল এক ইংরেজ—ত্রিপুরা থেকে বিশ্বের জুগুলোতে একদা সে হাতী সাপ্লাই করতো পাইকিরি হিসেবে, অন্য লোক যে-রকম ভেড়া-ছাগল বিক্রি করে। নীলকরদের কুঠীর মত এক একটা কামরা আস্ত এক একটা জলসা ঘর —ছাত যে কোন্ উঁচুতে দেখতে হলে দুরবীনের প্রয়োজন। তাবৎ বাড়িটা জুড়ে যেন হাঁ করে সব-কিছু গিলে ফেলে বিশাল বিস্তীর্ণ হল ঘর। প্রটেস্টান্ট্ ইংরেজ যেন ক্যাথলিক পোপের ভাটিকানকে পরাস্ত করতে চেয়েছিল। দেশে ফেরার সময় বাড়িটা বিক্রি করতে গিয়ে দেখে, ত্রিপুরার লোকের কাছে হাতী ঘরকী মুরগী বরাবর বলে তারা বর্মার রাজদত্ত "উপহার" শ্বেতহস্তী পোষার খরচটা সম্বন্ধে আগাপাস্তলা ওকীবহাল। অতএব শেষটায় এই শ্বেতোত্তর হস্তী ক্রয় করলেন আমাদের কলকাত্তাই খানের আব্বা সাহেব, বড়া খান।

শিপ্রা প্রথম পদার্পণের সময় এ-সব কিছুই লক্ষ্য করে নি। স্বপনচারিণীর মত বাথরুমে ঢুকল। বেরিয়ে সোজা ডাইনিং টেবিলে। সেখানে ইতিমধ্যে এসে গেছেন দুই ইয়ারের স্থানীয় ইয়ারের দু'পাঁচজন। সামনে গেলাস। শিপ্রা দেবীকে পরম ভক্তিভাবে নমস্কার জানিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আপন আপন গেলাস একটানে শেষ করে ফের নমস্কার জানিয়ে প্রসেশন-পদ্ধতিতে ইয়াররা বেরিয়ে গেলেন।

ক্লান্ত কণ্ঠে শিপ্রা শুধলো, "এরা পালালো কেন? আমি কি বাঘ?"

খান তাড়াতাড়ি বললে, "তুমি বাঘ না, তুমি ক্লান্ত। আর এরা যাবে কোথায়? বললেই আসবে, না বললেও আসবে। ওরা মফস্বলের লোক। তাদের দুশ্চিন্তা, বেগানা লোগর সাক্ষাতে বেগম সাবের সেবার (আহারাদির) তুরুট্ (ত্রুটি) হইতে পারে। বাদে তেনার লগে লগে আরাম করন লাগবো (শুতে যেতে হবে)।"

সীমান্তপারের পাকিস্তান থেকে এসেছে একাধিক বর্ণগোত্রের মাছ। কে বলে ভারত-পাকের সাধারণ জন জন্তু-জানোয়ারের প্রতি নির্দয়? ও-পার যাত্রী মা চিরতরে বিদায় নিচ্ছেন—পুত্র যেতে পারলো না তাঁর কাছে পাসপোর্ট ভিসার অভাবে। এ-পারের চাষা গিয়েছিল বর্ডার ক্রস করে ওপারে তার গুটি কবরেজের কাছে দাদীজানের জন্য "কফ্ নিবারণের" গুটি চারেক বড়ি আনতে। গুঁজে রেখেছিল পরনের দু'হাতী লুঙ্গির ট্যাঁকে। পড়লো ধরা। কস্টমসের ছোটবাবু তাঁর বিলিতি ফার্মাকপিয়ার ফিরিস্তিতে এই 'অসভ্য' ওষধির নাম—হল ডবল ফাইন। কিন্তু মাছের বেলা সদয়তর ব্যবস্থা—তার পাসপোর্ট লাগে না, তার ট্যাঁক কেউ খোলে না। 'কালো'তে এলেও

ইলিশের রং কালো হয় না, কই ধরা পড়ার ভয়ে, 'পাঙাশ' হয় না। দুটো বর্ডার ক্রস করে এসেছে খাসি পাহাড়ের কমলা নেবু।

শিপ্রা বললে, "মফস্বলের লোকের আহারাদি হয় মৌসুমে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে। এখানে দেখি নেবুর দোসর আনারস।"

"তাই তো লোকে বলে 'বাঘের দুধও মেলে'। বাঘিনীও দুধ দেয় বিশেষ অবস্থায়। এখানে সর্বাবস্থায়—বাঘ তো পেটেবাচ্চা ধরে না—বাঘ ভী দুধ দেয়। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। বর্ডারে এখন আর রাইফেল-ধারী পূব বাঙলার পুলিশ নেই—তাদের স্থলে এসেছে মেশিনগান, নানাবিধ অটোমেটিক হাতে পাঞ্জাবী পাঠান আর্মিমেন—পশ্চাতে আর্মার্ড গাড়ি। কাছেই কুমিল্লা কেনটনমেণ্ট, ময়নামতীর ঘাঁটি। হাজার হাজার সেপাই অফিসার আবজাব করছে। পূর্বাঞ্চলে কুমিল্লাতেই পশ্চিমাদের সবচেয়ে ডাঙর কেনটনমেন্ট্।"

শিপ্রার আবছা আবছা মনে পড়ল, বাগডোগরা, এই আগরতলা এমন কি শিলচর কিছুটা দূরে হলেও সব কটাই ইণ্ডো-পাক বর্ডারের কাছাকাছি বলে সর্বত্রই এমন কি প্লেনের ভিতরও তার কানে এসেছে মাত্র একটি টপিক। সেটা রহস্যময় ও প্রশ্নে প্রশ্নে কণ্টকিত। সুদ্দ মাত্র লীগকেই যদি শায়েস্তা করতে হয় তবে কামান কেন, ট্যাঙ্ক কেন, সাজোয়া গাড়ি কেন? তবে কি ইণ্ডিয়া এ্যাটাক্ করার জন্য। তাই হবে। কারণ শেষ মুজোব, লীগ ইয়েহিয়াতে সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। ভারত যদি আক্রান্ত হয়, চীন কী তবে ফের দুশ্‌মনী করবে?

আরো কত শত প্রশ্ন।

খেয়েই শিপ্রা মারলো ছুট—অনন্তকাল ধরে সে ঘুমুবে।

নিদ্রা-রেকর্ডে কুম্ভকর্ণের নাসিকা-গর্জন গোল্ড মেডল পেয়েছে কিন্তু রেকর্ড কৃত্তিবাস স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, ক্ষুদ্র নিদ্রাকর্মটি কিন্তু ছেঁদো। রইলেন শ্রীবিষ্ণু। অনন্তশয্যা। কিন্তু অবতার এবং/কিংবা অংশাবতার হয়ে যখন অবতীর্ণ হতেন। তন্দ্রাবস্থায়? হা, ধিক! শাস্ত্রাদির সম্যক অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ রাখার কুফল বক্ষ্যমাণ পুস্তক।

তবু, অন্তত এটুকু বলা যেতে পারে সেই দিন-যামিনীর শিপ্রা নিদ্রা তার পূর্বতর রেকর্ড। তর্কাতীত ছ'লেংথে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল।

ঘুম একটুখানি কেটেছে মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রা অনুভব করলো, দুটি ছোট কোমল হাত—মেয়েছেলেরই নিশ্চয়—তার পা টিপে দিচ্ছে, কিন্তু চাপেতে যে-জোর, সেটা যেন পুরুষের। একটুখানি চোখ মেলে ক্ষীণালোকে দেখল, পাহাড়ী মেয়ে। এখানকার পাহাড়ীদের নাম কু কী—কিন্তু শিপ্রার মনে হচ্ছে, আর পাঁচজন বাঙালীদের মত গারো, লুসাই, কুকী সবই বরাবর।

কণ্ঠে অত্যন্ত বিরক্তি মিশিয়ে শুধোলে, "তোমাকে পা টিপতে বলেছে কে?"

কুণ্ঠিত কণ্ঠ; "কেউ না। আমার মিসি বাবা হায়রান হয়ে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লে আমি তখন পা টিপে দিতুম। সে আরামসে বেশী ওক্ৎ ঘুমুতো। আমি আরো দু'মিনিট পরে চলে যেতুম—আপনার মালুম ভী হত না।"

বাঁচালে, বাবা। পা টেপো আর যাই টেপো, চুলটা তো আঁচড়ে দেবে। নইলে হাতের নড়া খসে যেত,—খুশী হল শিপ্রা।

"কটা বেজেছে?"

"গ্যারহ্ সে জ্যাদা।"

সর্বনাশ! ওদিকে কানে আসছে মফস্বলের বারান্দায় শ্যামবাজারী রকের তুফান।

হন্তদন্ত হয়ে উঠে বললে, "আয়া, তুমি ওদের গিয়ে বলো, আমি এখ্খুনি আসছি, ওদের কেউ যেন না পালায়" মফস্বলী এটিকেটের বাড়াবাড়ি অম্লান বদনে মেনে নেওয়াটাও এটিকেট নয়। "আর ফিরে এসে এখ্খুনি চুলটা আঁচড়ে দাও। আলোটা জ্বালো।"

সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ মাথার কোন্ অজানা কোণ থেকে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত তার মনে ভেসে উঠলো, "লারী যে মির্জাকে বলেছিল, তামাম পুব বাঙলার উপর স্টীম রোলার চালানো হবে সেইটেই ঠিক।" সে যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন তখন তার অবচেতন মনে নানা গুজোব নানা তথ্যের কাটাকুটি করে সিম্প্লিফিকেশন অঙ্কের মত এই সরল রিজালটে পেঁচেছে। কিন্তু আশ্চর্য! এই নিয়ে এত যে বচসা, ভবিষ্যদ্বাণী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সে শুনলো, কেউ তো একবারের তরেও বললে না, ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ির ছয়লাপ, হয় ভারতকে ভয় দেখাবার জন্য কোনো গভীর কূটনৈতিক চাল, নয় সরাসরি ভারতকে আক্রমণ। সবাই বিনা চিন্তায় ধরে নিয়েছে, নিছক সোঁদরী কাঠের লাঠি নিয়ে লম্ফঝম্প করছে লীগ, যদি তাদের অন্য কোনো প্রকারের অস্ত্রের ব্যবস্থা থাকতো, তবে সেটা কস্মিনকালেও গোপন থাকতো না। অতএব ট্যাঙ্ক কামান ভারতের তরে—কিউ, ইউ, ডী। শিপ্রার মনে হল, তারা ওজনের আঁকে ধুরন্ধর পোদ্দারের মত অতখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুক্তিতর্কের সিটিটাকে যাচাই করে দেখে নি। এরিথমেটিকের অঙ্ক কষেছে তার অবচেতন মন; এদের সচেতন মন যেন জিওমেট্রির স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে চলে গেছে জিওমেট্রিক টেনজেন্টে সরাসরি বিপরীত মুখে।

সপ্তদশ অধ্যায়

আয়া খোঁপাটা বাঁধলো কোন্ দূর বা নিকট পাহাড়িনী স্টাইলে সে-সমস্যার সমাধান না করেই ছুটলো বারান্দার হাইড পার্কী মিনি-মিটিঙের দিকে। দূরে থেকেই লেডি-সুলভ মাঝারি গলায় বললে, "আপনারা কোনো তকলীফ করবেন না, প্লীজ। আমি এক পাশে বসে শুধু শুনবো।"

প্রথমটায় ওস্তাদী গানের অবতরণিকা আলাপের মত বাক্যালাপ কিঞ্চিৎ মন্দ মধুর ক্বচিৎ কাকলীর সুর ধরেছিল বটে কিন্তু পেটের ভিতরকার তরল দ্রব্যগুণ যাবে কোথা? দ্রুত তেতালে স্থগিত দারুণ সংগ্রামে তাঁরা ফিরে এলেন, দ্যাখ্ তো না দ্যাখ্, ডার্বি ঘোড়া ধূলির ঝড় উড়িয়ে।

সুস্পষ্ট দুটি দল। মধ্যপন্থা জনশূন্য। স্বয়ং চেয়ারমেন খান খনে ফ্রন্ট বেঞ্চার খনে চেয়ার আসীন।

প্রথম পক্ষের বক্তব্য: ঢাকাতে সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। মারপিট হবে না।

দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য: আদৌ হয় নি; হবেও না। ইয়েহিয়া জাত ঘুঘু। টালবাহানা দিয়ে সময় নিচ্ছে, শুধু আরো সৈন্যঅস্ত্রশস্ত্র জমায়েৎ করার জন্য।

শিপ্রা এ-সবের অধিকাংশই শুনেছে। বেয়াত্রিচে যা বলেছিল সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল মাত্র।

তুমুল তর্কযুদ্ধের সময় হঠাৎ এক এক সময় সবাই একসঙ্গে চুপ মেরে যায়।

সে-স্তব্ধতা ভাঙলেন একটি বয়স্ক মুসলমান। তিনি হংসমধ্যে বক। অবশ্য বকের মত জল খাচ্ছিলেন না, চুষছিলেন একটা নিম্বু পানি। বললেন, "একটা ঘটনা আমার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকেছে। দিন কয়েক আগে দুটো পাঞ্জাবী সেপাই গিয়েছিল বাজারে। কী একটা সামান্য অজুহাত পেয়ে রাস্তার ছোঁড়ারা —হয়তো বা লীগের দু একজন ছিল—করেছে ওদের ডাহা বেইজ্জৎ। শেষটায় দু'জনারই পাতলুন—" মিয়া সাহেব যেন বিষম খেয়ে আচমকা থেমে গেলেন।

শিপ্রাই বুঝেছে সক্কলের পয়লা। অভয় বাণী শুনিয়ে বললে, "মৌলভী সায়েব, আপনার যা বলার অসঙ্কোচে বলে যান। আমি নাজুক, লজ্জাবতী লেডিদের একজন নই, যাঁরা কারো মুখে 'বাচ্চা বিইয়েছি' শুনলে ভিরমি যান, তাঁরা "জন্ম দেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কাছে সর্বদাই প্রথমটাই প্রকৃতি-সম্মত এবং ভিরাইল ঠেকেছে।"

'মৌলভী সায়েব' কিন্তু সেদিক দিয়ে পাক্কা মডার্ন। ভদ্র রমণীর আদেশ অলঙ্ঘ্য। বললেন,—"পাতলুন কেড়ে নেয়। ভাগ্যিস অন্য হ্রস্বতর অঙ্গবস্ত্র পরনে ছিল, তাই মানে মানে ছাউনিতে ফিরতে পারলো।"

কেউ মৃদু হাস্য কেউবা অট্টহাস্য করলেন। শিপ্রা প্রথম শ্রেণীতে।

সায়েব বললেন, "কিন্তু আসল কথা, তারা ছাউনিতে ফিরে গিয়ে বন্দুক এবং ইয়ার-দোস্ত নিয়ে এসে বেধড়ক মার লাগালো না কেন, গুলি চালালো না

কেন, দোষী নির্দোষীকে অবিচারে—বে-ধড়ক? যা আকছারই হয়ে থাকে পাকিস্তানে। সেইখানেই তো রহস্য। তার কিছু করলো না, সেইটাই তো রহস্য।

এবারে শিপ্রা যেন আলোচনায় যোগ দিল। বললে, "শার্লক হোমসের অন্যতম রহস্য গল্পে আছে তিনি পুলিস ইনসপেকটরকে বললেন, 'রাত্রে কুকুরটার রহস্যময় আচরণের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' ইনসপেকটর আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে তো কিছু করে নি।' হোমস হেসে বললেন, 'সেইখানেই তো রহস্য'।" শিপ্রা থেমে গেল।

খান আর কীর্তি ছাড়া আর সবাই কৌতূহলী নয়নে শিপ্রার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। এ-সজ্জনদের মাঝখানে মাত্র ওরা দুজনাই জানে, শিপ্রা পয়েণ্টলেস, উদ্দেশ্যহীন গল্প বা উদ্ধৃতি কক্খনো ছাড়ে না।

মিঞা সাহেব কিন্তু ধরে ফেলেছে। সে হোমস পড়ে নি, তবু। কারণ তার বক্তব্যের সঙ্গে এটা মিলে যাচ্ছে। হয়তো বা তার এবং অন্য কিছুজনের গল্পটি স্মরণে এসেছে।

অন্য-সবাই স্কুল বয়ের মত পূর্বাপর সংযোগসহ সবিস্তার পূর্ণ বিবরণীর জন্য "গুরু" শিপ্রার দিকে তাকিয়ে আছে ব'লে সে বললে, "আস্তাবল থেকে দামী ঘোড়া গিয়েছিল চুরি, গভীর রাত্রে, অথচ সেটাকে পাহারা দেবার জন্য যে-কুকুরটা ছিল সেখানে, সে ঘেউ ঘেউ করে স্টেবল বয়গুলোকে জাগিয়ে তোলে নি। ডিটেকটিভ হোম্স্ তার থেকে অনুমান করলেন, চুরি করেছে কুকুরের কোনো ঘনিষ্ঠজন। পরে ধরা পড়লো, চুরি করেছিল জমিদারের আস্তাবল রক্ষক স্বয়ং—অসদুদ্দেশ্যে।"

মিঞা সায়েব সোৎসাহে বলল, "বিলকুল সহী বাৎ! সেপাই দুটো তার ভাই-বেরাদর, ইয়ার-দোস্তকে অতি অবশ্যই তাদের বে-ইজ্জতীর কাহিনী বলেছিল। তারা কিছু করলে না, কমাণ্ডান্ট্ও কিছু করলে না, এমন কি যেটা কম-সে-কম মিনিমামেস্ট্ সিভিল, পুলিসকে তদন্ত করার জন্য আদেশ করলে না। অর্থাৎ কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করলে না। বিগলিতার্থ যা স্বাভাবিক যা প্রত্যাশিত সেটা ঘটলো না। কেন?

অন্য গুহ্য খবর আমার না থাকলেও আমি এর থেকে এই অর্থই বের করতুম, কর্নেল কর্তা ওদের বুঝিয়ে বলেছেন,

এখনো তোদের সময় হয় নি।
যেথায় চল্লি যাস নি কো ধনি।

অর্থাৎ এ-তাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যে পরিমাণ সৈন্য পশ্চিম পাক থেকে যোগাড় করা হয়েছে সে-সংখ্যা দিয়ে লীগ এবং তাদের 'অন্ধ' সমর্থক পাগলা পাবলিককে শায়েস্তা করা যাবে না। তোদেরও সময় আসবে, মোকা পাবি

তোটা দিলসে জান্‌সে দাদ নেবার।"

ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা ১৯২০/৩০-এর স্টাইলে চুলকাটা, ঘাড় কানের কাছে প্রায় কামানো এক ফুল-বাবু বললে, "অর্থাৎ, স্যাকরার টুং টুং, কামারের এক ঘা।"

মিঞাজী ভুরু কুঁচকে বললেন, "এক ঘা নয়, চক্কোত্তি। একশ' ঘা।"

এক সিলেটী কারবারি ফ্রান্‌স্‌ দেশে চালান দেয় কোলা ব্যাঙ। কুমিল্লার আশেপাশে খুদ শহরের সর্বাঙ্গে এন্তের বিজ্ঞাপন সেঁটেছে, এখানে কোলা ব্যাঙ ক্রয় করা হয়"; "কোলা ব্যাঙের" স্থলে কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে আছে "ঘাড়ু ব্যাঙ"। এক খাস আগরতলী তাকে শুধলো, "কি ও হাজী, তুমি মুরগীর চালান বন্ধ করে দিয়েছ?" মিঞা হজ করার জন্য সুদূর মক্কা যাওয়া দূরে থাক, ঢাকা চাটগাঁ অবধি তার দৌড়। পরে এসেছে শার্ক স্কিনের পাতলুন, সিল্কের প্রিন্‌স্‌ কোট। এর অদ্ভুত "হাজী" ডাকনাম হল কি করে সে এক রহস্য এবং খাটো কান। শুধোলে, "কিতা?"

শিপ্রা কারো কথা কেটে আপন কথা কয় না। এস্থলে তার উত্তেজিত কৌতূহল ব্যত্যয় বাধালে। সঙ্গে সঙ্গে শুধলো, "হাজী সায়েব, 'কিতা' মানে কি?"

এ-তাবৎ ভদ্রা শিপ্রা কাউকে উপেক্ষা করে নি, আবার কারো প্রতি বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপও করে নি।

হাজী তাই শিপ্রাবানুর নেক-নজর পেয়ে বিগলিত। কোমরে দু ভাঁজ হয়ে, বাও করে, ঘন ঘন কুর্নিশ ছেড়ে বললে, "জনাব বেগম-সাহেবা খানম-বানু, যে কোনো অর্বাচীন সিলেটী আপনাকে বলবে, 'কিতা' মানে 'কি'। আলবৎ। কিন্তু সেখানেই শব্দটার শেষ অর্থ খতম হয়ে দাঁড়ি কাটে নি। ওটা অনেক রহস্য ধরে। 'তুমি কিতা?' তার কতই না উত্তর হতে পারে—"

আর এক সিলেটী সেখানকার মদনমোহন কলেজের লেকচারার বললে, "গুরুর গানে যদি সামান্য পাঠান্তর করি"—বলেই দু'হাত দিয়ে দু'কান ছুঁলেন, অপরাধী যে-রকম মাফ চায়—"এবং বলি

'ওগো মিতা সুদূরের মিতা
আমার কী বেদনা জানো কি তা?'

তাহলে ঐ শেষ 'কি তা' সিলেটী 'কিতা'র রহস্য ধরে।"

শিপ্রা খুশী হয়ে দুই সিলেটীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার কীর্তি যাকে সে আদর করে 'কীতা' ডাকে তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলো।

হাজী পূর্বতর প্রশ্নের খেই ধরে বললে, "মুরগীর ব্যবসার ঠ্যালাতেই তো

দাদা এখানে পালিয়ে এলুম। আমি লীগের রীতিমত সম্মানিত সদস্য। ওদিকে খুদ লীগ হাইকমাণ্ডের হুকুম কি না জানি নে, পাঞ্জাবী-পাঠানদের খানদানা সাপ্লাই বন্ধ করো। কিন্তু কার্যত গাঁয়ের লোকসুদ্দু এ্যামন ক্ষেপে গেছে, আমিও তাদের দলে, তাই ইচ্ছে থাকলেও মুরগী যোগাড় করতে পারি ক শ'?—ঐ কেনটনমেণ্টের তরে? ওটা তো অজানা থাকবে না। তার পর শা—সরি সরি—বড় কর্তা কর্নেল আমায় এত্তেলা পাঠালে—

কোরাস { বাপ্‌স্‌!
সব্বোনাশা!
কিতা কিতা!
ইয়াল্লা!

ধুকুপুকু মুরগীবাচ্চার জানটা নিয়ে গেলুম কর্নেল সমীপে—'সুপুত্তুরে'র বাপ নির্বংশ হোক! আমাকে এই মারে কি তেই মারে। আন্দেশা করছি, হিন্দুদের মত ধর্মপত্নীর সোনার কাঁকন-জোড়া খুলে আনলেই হত। বিক্কিরি করলে, এই মাগ্‌গির বাজারেও এক কেস স্কচ কেনা যায়। তারই নাকি এক বোতল পেটে ঢেলে 'ডাচ্‌ কারেজ' সঞ্চয় করে এলে হত। ব্যাটা—" শিপ্রার দিকে ক্ষণতরে তাকিয়ে সেলাম ঠুকে বললে, "ম্যাডাম! আপনি আমার এই 'অভদ্রস্থ' কথাগুলো এ্যাট্টুকুন মাফ করে দেবেন প্লীজ। 'য' ফলা শিখতে গিয়ে পাঠশালে পড়েছি,

'অশ্লীল কুবাক্য সদা মুখে ফোটে যার।
লোক সনে ঐক্য সখ্য রহে না তাহার'।"

শিপ্রা: "সাহেব, আপনি কি ভুলে গেলেন, আমি গোড়াতেই আপনাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছি, আমি লেডি নই। আপনি দিল্‌ জাম্‌ ভরপুর করে গালাগাল দেন, আপনার ঐ কবিতার 'অশ্লীল কুবাক্য' এস্তেমাল করুন। আমার কলিজাটা নেচে উঠবে। ঐ হারামজাদারা আমার দু' চোখের দুশ্‌মন।"

হাজীকে তখন আর পায় কে? চেয়ার ছেড়ে উঠে অর্ধনৃত্য করে বললে, "শাবাশ, শাবাশ, ম্যাডাম। এবার আমার সত্য জ্ঞানোদয় হল আপনি নিকষ্যি কুলিন লেডি। আপনি পরমহংসী। পাতিহাঁস, পাতি নেড়ের মত পাতি লেডি এ-সব উত্তোমোত্তম ভাবব্যঞ্জক কটুবাক্য শুনে কানে আঙুল—অবশ্য ফুটো দুটো পুরোপুরি বন্ধ করেন না, কারণ তাঁদের জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা—আর চোখে মুখে "ছ্যা ছ্যা" করেন। আমার মনে কোনো সন্দ নেই আপনি রিয়েল স্টাফ, খাঁটি স্কচ, ও সরি সরি, আই মীন আপনি পুরো পাক্কা লেডি। বিশেষ করে 'হারামী'র পরিবর্তে রূঢ়তর কিন্তু হাইলি কালচারড—'জাদা'টা যোগ করে।

কী বলবো, ব্যাটা দেখি আমার হাঁড়ির খবরতক রাখে। বললে, তার পাঁচশ'র বদলে এখন থেকে হাজারটা মুরগীর দরকার। আমি পাক্কা ইংরেজিতে

বললুম, বাই দি লর্ড হ্যারি, পাবো কোথায় ? সম্বন্ধী ব্যাটা বললে, 'আমি জানি, তুমি রোজ ঢাকার হোটেলগুলোকে মুরগীর চালান পাঠাও।' আমিও কম যাই নে। ব্লাফ্-মাস্টারের বেলুন। বললুম, 'তা হলে আপনি সেপাই মারফত সেগুলো স্টেশন থেকে পকড়ুকে আনিয়ে নিন।' আমি জানতুম এখনও কামারের ঘা'য়ের লগন আসে নি।

তারপর কর্নেল হঠাৎ একদম খাদে নেমে বললে, 'মিস্টার মজুমদার, আমরা একটা পোলট্রি ফার্ম খুলতে চাই ময়নামতীতে। আপনি তো স্পেশালিস্ট। মেন্ পয়েণ্টগুলো বাৎলে দিন। আপনার ব্যবসাতে চোট লাগবে না। আমার চাহিদা প্রতিদিন বেড়েই যাবে, কমবে না। তোমার থেকে আরো বেশী নেব।' আমি অবশ্য হরবকৎ জেণ্টেলম্যান—আনাড়িকে নাড়ি-জ্ঞান শিখিয়ে বেহেস্তে যাবো না কেন ? সেই সব টিপ্সই দিলুম যে সব ঢাকা কলকাতা দেয় তাদের 'রুরাল ব্রডকাস্টে' পশুপক্ষী পালন বাবদে চাষাদের। শুনেছি, ওগুলো পালন করলে প্রতি তিন মাস অন্তর মুরগীর মড়ক অনিবার্য। অবশ্য আল্লা যদি আমাদের প্রতি সদয় হন। কিন্তু এহ বাহ্য। দাদারা, বলুন ইয়েহিয়া মুজীবে সমঝোতার সম্ভাবনা কতখানি ? তাহলে আর্মির সংখ্যা কমতো, না ?"

শিপ্রা বললে, "আমাকে এক বিদেশী জেনারেল বলেছিলেন, দেশের রাজধানী, বড় বড় শহরের পাকা পলিটিশিয়ান এমন কি আর্মির মধ্যস্তরের অফিসাররা বহুক্ষেত্রে যে সব টপ সিক্রেট জানতে পায় না, যেমন ট্রুপ মুভমেণ্ট, গ্রামের সাধারণ লোকের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখা যায় না। হাজী সাহেব অবশ্য জবরদস্ত সাপ্লায়ার। কিন্তু তিনিও তো মুরগী, আণ্ডা কিনবেন গাঁয়ের চাষা-ভূষোর কাছ থেকে। শাক-সব্জী, এক কথায় যাবতীয় তাজা মাল ওরাই বেচে ! জেনারেল বলছিলেন ইয়োরোপের যে-কোন কেণ্টনমেণ্ট থেকে মাত্র এক হাজার সৈন্য সরালে, সেও অতিশয় গোপনে, তবু আশপাশের গাঁয়ের লোক সেই সন্ধ্যায় 'পাব্'-এ বসে সঠিক নম্বরটি বলে দিত—একে অন্যের বিক্রির পরিমাণে খবর বদলাবদলি করে। এবং করেও।"

হাজী তো তার মতের সমর্থন পেয়ে খুশী। বাকী পাঁচজনও তাজ্জব মানলো। আর যে-সব কলকাতার সোসাইটি লেডিজ্ দেখেছে তারা, খানের নিমন্ত্রণেই তাঁরা এসেছেন আকছারই স্বামী বা ফিয়াঁসে সহ, তাঁরা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন গেলাস-ফীল্ডে। ইনি তো এক ঘণ্টা হয়ে গেল ছোট্ট একটা ব্রাণ্ডির আধখানাও শেষ করতে পারেন নি, ওদিকে ইয়েহিয়া রাজার গল্প, যে সব গল্পের রাজা—সেটাতে দস্তুরমত তাদের অজানা সব তত্ত্বও যোগ দিতে পারেন।

আর কীর্তি তবে গর্বভরে আসমানী ঘোড়ায় চেপে তামাম শহরটার উপর হাওয়াই চক্কর মারছে।

খান মিটমিটিয়ে হাসছে। একবার হাত কচলাতে কচলাতে বললেও, "আমার বৃথা প্রশংসা করবেন না। এঁকে আমি গড়ি নি। ইনি আমার ইস্কুলে পড়েন নি। হেঁ হেঁ!" ফের সবিনয় ভাব, কেন মিছে লজ্জা দিচ্ছেন!

খানের প্যারা দোস্ত গোস্বামী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমার প্রতি কোনো অবিচার হবে না; তোমার যা মগজের পরিমাণ সে-টুকুন দিলে ঐ সেই চাষার কবরেজী বাড়ীও হয় না। কিন্তু মোদ্দাটা হচ্ছে এই; আমরাও বই পড়ি, মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর ত্রৈমাসিক, বিলিতি লিটরারি সাপ্লিমেণ্ট—অবরে সবরে। তার কিছুটা মনেও গাঁথা হয়ে যায়। কিন্তু কই, সঠিক মোকায় তো সেগুলো কাজে লাগাতে পারি নে। ওদিকে দেখ, বেগম সাহেবা যে দু'চারটি কথা কইলেন তাতে তাঁর গভীর তত্ত্বজ্ঞান, গভীরতর স্বাধ্যায় তো ধরা পড়লই, কিন্তু কি অলৌকিক মোকা মাফিক সেগুলোর প্রয়োগ! দেশ—অর্থাৎ পার্টিতে গল্পগুজোব হচ্ছে এটা রয়েল সোসাইটির মীটিং নয়। পাত্র—আমরা অর্ধশিক্ষিত, ফুর্তির চিঁড়িয়া, তদুপরি ভিন্ন ভিন্ন ধান্দায় চড়ে বেড়াই, আমরা রিসার্চ করি নে। এবং সর্বশেষে সব চেয়ে ইম্পর্টেণ্ট—কাল, অর্থাৎ টাইমিং। মিঞা সাহেব বা হাজীর বক্তব্য শেষ হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি ঠাহর করে নিয়েছিলেন, নলটা চলেছে কোন্ দিকে। যে-কোনো মুহূর্তে ইণ্টারাপ্ট করে—দেখেছো কোনো মেয়েছেলে কবে যার এ-অভ্যাসটি নেই এবং সেটাতে তাদের হক্ক আছে—তাঁর বক্তব্য তিনি বলতে পারতেন। না, তিনি অপেক্ষা করে রইলেন। যতক্ষণ না আমাদের মন তৈরী হয়, তাঁর প্রত্যেক শব্দ যেন আমাদের প্রত্যেকটি ব্রেন-সেলএ পুরো মাত্রায় আঘাত দেয়। এই অসাধারণ গুণটি বড়ই দুর্লভ, হে খান, বড়ই দুর্লভ।"

শিপ্রা চলে গেছে খাবার তদারকীতে—আজ এদের সকলের দাওয়াৎ, তাদের ফ্রেণ্ডস এ্যাণ্ড এনিমিজ সহ।

আপন আপন গেলাস নিয়ে সবাই ডাইনিং রুমে এলেন।

শিপ্রা লক্ষ্য করলে, হাজীকে সে তার পাশে বসালে এবং আর পাঁচজনের গালগল্পে কান না দিয়ে ডিনারের প্রায় অধিকাংশ সময়টা গম্ভীর মুখে গুজুর গুজুর করলে। অবশ্য টেবিলের কায়দা মেনে মেনে। শিপ্রা তো প্রায় সেই ষোল বছর থেকে হোস্টেস। ওদিকে গল্প করছে, শুনছে মনপ্রাণ দিয়ে যে অন্য দিকে কোনো খেয়ালই নেই, ওদিকে তার চোখ তো চোখ নয়, বন্দুক। প্রত্যেকটি গেস্টের প্রতি বন্দুকের অব্যর্থ নিশান। প্রত্যেকের মনে ধারণা হল শিপ্রা যেন একমাত্র তাকেই খেতে ডেকেছে আর সামনে বসে বাড়ছে। শ্রীহরি ও সখীগণ সহ শ্রীরাধা যখন চক্রাকারে নৃত্য করতেন, তখন শ্রীরাধা তো কথাই নেই, প্রত্যেকটি সখী দেখতেন তাঁরই পাশে পাশে কেষ্ট-ঠাকুর নেচে চলেছেন।

ডিনারের পর সবাই বিদায় নিলেন। রাত্রি তৃতীয় যামে পেঁচেছে। কৃষ্ণ-

পক্ষের চাঁদ উঠি উঠি করছে।

বিদায় নেবার সময় মিঞা সাহেব শিপ্রাকে বললেন, "এটা মহরমের মাস। ইয়োহিয়া কট্টর শীয়া। সুন্নীরা মহরম মাস পবিত্র বলে স্বীকার করে বটে কিন্তু শীয়াদের কাছে মহরমের মাহাত্ম্য সর্বাধিক—এমন কি দুই ঈদের মাস বা রোজার মাসের সঙ্গেও তার তুলনা হয় না। এই পবিত্র মাসে ইয়েহিয়া খুনখারাবী আরম্ভ করবে কি? কি জানি।"

শিপ্রা শুয়ে পড়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে দেখে দরজার সামনে একটুখানি সামান্য নড়াচড়া করতেই শিপ্রা ডাকলো, "এসো।"

একটা চেয়ার টেনে পাশে বসতেই শিপ্রা বললে, "আঃ! এই তোমাকে পেলুম এখানে আসার পর থেকে একলা। ভিড়ে তোমাকে আমি হারিয়ে ফেলি। কীই বা ভিড় ছিল আজ! কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন হাজার হাজার লোকের মেলা—আর তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজছি—বার বার।"

শিপ্রার প্রসন্নতা দেখে কীর্তি সাহস সঞ্চয় করে বললে, "হাজীকে শুধোচ্ছিলুম তিনি কুমিল্লা আগরতলা এত ঘন ঘন মাকু মারেন কি করে। হাজী, তুড়ি মেরে বললেন, 'ও তো ডালভাত। আমার তিনটে ভিন্ন ভিন্ন নেশনালিটির তিনখানা পাসপোর্ট আছে। যখন যেটার দরকার হয় তাই দিয়ে চালাই। যদিস্যাৎ নিতান্তই আর্জেণ্ট কাজ থাকে তবে বর্ডার চেক পোস্ট-এর লোকগুলোকে একটুখানি ইশারা দি। ব্যাস্। বাতলটা বাতলটা, বউয়ের জন্য জবাকুসুমটা ছেলের জন্য ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্সটা এ-সব তো আমি প্রায়ই সওগাত দি, পাসপোর্ট থাকলেও। আর তার চেয়েও জলদির মামেলা হলে কালোয়। যে-সব পথ-বিপথ দিয়ে কেণ্ডুপাতা যায়, সুপুরি আসে, তার সব-কটা আমার নখাগ্র দর্পণে।' আমি শুধালুম, 'আমাকে বর্ডার অবধি দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন?' হেসে বললে, 'আমি রাতারাতি আপনার কাগজপত্র তৈরী করিয়ে কালই খাস কুমিল্লায় আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এখন পাকিস্তানে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। তবে বর্ডার অবধি—সে তো হেসে খেলে। কালো পথগুলোও দেখাতে পারি। তবে মোটর ছেড়ে এদিক ওদিক খানিকটে হাঁটতে হবে।'

"তুমি যদি অনুমতি দাও, তবে একবার বর্ডার পর্যন্ত হয়ে আসি। প্লীজ।"

"খানকে বলেছ?"

"হ্যাঁ, সে সঙ্গে সঙ্গে বললে, তোমার অনুমতি নিতে।"

শিপ্রা চিন্তা না করেই বললে, "তবে যাও। তোমার কোনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবন্ধক হবো এ-পরিস্থিতিটা আমি কল্পনাই করতে পারি নে। এবং আমি জানি, তুমি গোঁয়ার নও—খামাখা বিপদ ডেকে আনবে না। আমার মনে

হল হাজী পাকা লোক। তুমি গাইড পেয়েছ সর্বোত্তম।"

কীর্তি বললে, "আর ঘণ্টা দু'তিন পরেই হাজী গাড়ি নিয়ে আসবে। তুমি কিন্তু তোমার কাঁচা ঘুমটি নষ্ট করো না। আমরা দুপুরের আগেই ফিরব।"

"আমাকে একটা চুমো দাও।"

চিরকালই শিপ্রার ঘুম ভাঙে পাশের মসজিদের ভোরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে—সারা রাতের পার্টি থেকে ফিরে যত ভোরের মুখেই শুতে যাক না কেন? আজও দেখতে পেল হাজীর মোটরের হেডলাইট, শুনতে পেল বারান্দা দিয়ে কীর্তির এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু বেরুল না।

সকালে খানের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে শুধলো, "আজ তোমার পার্টি কখন শুরু হবে—মোটামুটি।"

খান ইতস্তত করে বললে, "তুমি যদি অনুমতি দাও তবে আমি একটু কাজ সেরে আসি। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের কাজ। এই ডামাডোলের বাজারে কিছুটা ব্যবসা গুটোতে হবে কিছুটা গুছোতে। নইলে যেতুম না।"

"বা রে, যাবে না কেন?"

আরাম পেল খান। বললে, "আর শোনো, যে ইংরেজ বাড়িটা বিক্রি করে সে তার বেশীর ভাগ বই ম্যাগাজিন রেখে গিয়েছে। বিলইয়ার্ড রুমের পাশের কামরায়। ইনট্রেসটিং কিছু পেয়েও যেতে পারো।"

কামরায় ফিরে দেখে, আয়া জরাজীর্ণ এক প্যাকেট তাসের প্রায় সব ক'খানা কার্পেটের উপর পেতে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে, কি যেন হিসেব করছে আর বিড়বিড় করছে আপন মনে।

হঠাৎ শিপ্রাকে দেখে চরম লজ্জা পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে তাসগুলো এক ঝটকায় তুলে নিল। মাথা নিচু করে বার বার মাফ চাইলে।

শিপ্রা সেদিকে যেন কানই দিল না। বরঞ্চ বললে, "তা থামলে কেন? কি খেলছিলে, পেশেন্‌স?"

একটু হিম্মৎ পেয়ে তার খিচুড়ি ভাষায় বললে, "না, মিসি বাবা। আমি তার থেকে দেখছিলুম, কি কি হবে, মানে কি সব ঘটবে—"

"ফিউচার?"

"রাইট, মিসি বাবা। আর ভাগ্য গণনা। দুটো প্রায় একই। আমি যে মেমসায়েবের কাছে বাচ্চা বয়েস থেকে জোয়ানী তক্ নোকরি করেছি, তিনি আমায় তাসের বহুত কুছ খেল শেখান। আমার সঙ্গে রোজ দুপুরে খেলতেন। আমি ভেবেছিলুম, আপনার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেই তাস ঝটপট তুলে নেব। বেয়াদবী মাফ করুন। আমি একদম মশগুল হয়ে গিয়েছিলুম।"

"কাট্ দ্যাট আউট। কোনো বেয়াদবী হয় নি। তা মশগুল হবার মত

কি পেয়েছিলে ?”

গম্ভীর স্বরে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করলো। বললো, “এই যে সবাই ভাবছে ফিনসে লড়াই শুরু হবে কি না, এক দফা জেসা হুয়া, সেইটে হবে কি না? মেমসাহেব বলতো, আমি পাহাড়ী—সাদা-দিল-ঔরৎ। আমরা নাকি ওদের চেয়ে ঢের ভালো ফিউচার দেখতে পারি।”

শিপ্রা একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে অলস কৌতূহলে শুধলো, “কি দেখলে ?”

পাহাড়িনী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো, “সব আন্ধেরা, আন্ধেরা। এসা বড় একটা হয় না। ফিন্‌সে দেখি।” তাস শাফল্ করে শিপ্রার কাছে নিয়ে এসে বলল, “টোকা দীজীয়ে। তা হলে উয়োঠো হোগা আপকা গিন্‌না।” শিপ্রা লক্ষ্মী মেয়ে। তুরন্ত টোকা দিলে।

ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া বইয়ের ভিতর সে পেয়েছে ইংরেজ লেখক উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকারে ও সিলেট নিয়ে একখানা মোটা বই। তার জানা ছিল থ্যাকারের জন্ম হয়েছিল কলকাতায়। এই বইয়ের যে ক'খানা পাতা উল্টিয়েছে তাতে মনে হল লেখকের অন্য কোনো একটা নূতন গবেষণাপ্রসূত মতবাদ আছে। অবশ্য এটা ধ্রুব সত্য, থ্যাকারের পিতা সিলেটের সর্বময় কর্তা ছিলেন কিছুকাল। শিপ্রার চিন্তাধারা চললো অন্য দিকে। থ্যাকারে কি এ-সব মাম্বোজাম্বোতে বিশ্বাস করতেন? কিপলিং। আজকাল তো বিস্তর হিপি করে।

আয়া গভীরতম মনোযোগ সহকারে এক একখানা করে তাস ফেলে, আর আপন মনে বিড়বিড় করে। এমনই বাহ্যজ্ঞানশূন্য যে শিপ্রার প্রশ্ন প্রথমটায় তার কানেই ঢোকে নি। সংবিতে ফিরে বললে, “ঘোটালা, ফিন্‌সে ঘোটালা! এই তো দেখুন, বার বার পর পর তিনবার পাঞ্জা এসেছে। তো নিকলা, এক তরফমে পাঁচঠো আদমী। তার বাদে দেখিয়ে, দুটো দস্‌সা এসেছে। লাখ লাখ আদমী লেকিন মুশকিল আছে ইনকা। বোহৎ মুশকিল—দোঠাই কালা দস্‌সা। লেকিন উয়ো পাঁচঠো কিয়া? তিন বার আয়া। পেহলাই।”

শিপ্রা অনুমান করলো, দশের তাসগুলোকে আয়া জনতা হিসেবে নিয়েছে। কথায় বলে 'দশের মুখ খোদার তবল', এরই হুবহু লাতিন 'ভক্‌স পপুলি, ভক্‌স্ দেঈ' দশজনের গলা ঈশ্বরের গলা অতএব 'দশের তাস' পপুলি, পাবলিক, জনারণ্য অর্থাৎ আওয়ামী লীগ। কিন্তু তাদের বিপক্ষে আয়া প্রত্যাশা করেছে টেক্কা, কিংবা বাদশা অর্থাৎ ইয়েহিয়া। এসেছে পাঞ্জা। পঞ্চ আব্? পাঞ্জাব? হঠাৎ তার মনে পড়লো, লারী বলেছিল মির্জাকে, অনেকেরই বিশ্বাস, ইয়েহিয়ার তথাকথিত সমর্থক যে মিলিটারি জুন্টা আছে তারা সংখ্যায় পাঁচ এবং আসলে ওদের আদেশে ইয়েহিয়া ওঠ বস করে। শিপ্রা আপন মনে হেসে

উঠলো। 'ধর্মরাজের' পশ্চাতে 'পঞ্চপাণ্ডব'। না তাহলে ইয়েহিয়াটা সাইফার। আয়াকে এই পাঞ্চজন্য' তাসের মহাত্ম্য বোঝাতেই সে আনন্দে ফেটে পড়ে আর কি! বার বার বললে, পুরানা মেম সায়েবের চেয়ে মিসি বাবার নজর বহুৎ দূর দূর যায়, কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে। বেরুল পর পর রুইতন আর ইস্কাপনের টেক্কা।

শিপ্রা, আয়া দুজনাতেই একই ওয়াটারলুতে। পরাজয়। কোনো অর্থ বেরয় না।

ভারত, পূর্ব বাঙলার কটা লোক তখন জানতো, ইয়েহিয়া হারেমের পাটরানী হবার জন্য চলেছে তখন জোর লড়াই। একজন ফর্সা পশ্চিম পাকী—লোকে তাঁর নাম দিয়েছে "জেনারেল রানী"; অন্য জন পূব বাঙলার শ্যামা, ডাকনাম ব্ল্যাক বিউটি।

এ-সব হোকাস পোকাসে শিপ্রার মত মেয়ের কৌতূহল দুরন্ত বাচ্চার হাতে বেলুনের মত "দীর্ঘজীবী"। শিপ্রা পুস্তকের সুগন্ধী বাগিচায় ডুব মারলো। আরব কবি বলেছেন, "পুস্তক সে যেন একটি বাগান, যেটাকে পকেটে পোরা যায়।" তারপর আয়ার 'ভবিষ্যৎ দৃষ্টির' ফলাফল শিপ্রার কানে আর যায় নি।

শুধু একবার শুনলো, "মুজীব। সঙ্গে সঙ্গে এলেন হরতনের বিবি—মুজীবের বীবী। তার বাদেই পর পর দুটো কালো গোলাম। ভেরি ব্যাড্, ভেরি ব্যাড্। উনি বন্দী অবস্থায় গোলামদের পাহারায় থাকবেন কয়েক মাস।"

আয়া যখন শেষটায় সব তাস গুটিয়ে নিল তখন হাই তোলার আভাসটা হাত দিয়ে চেপে শিপ্রা শুধলো, "হরেদরে কি দাঁড়ালো?"

আয়া ভদ্রতা জানে। বললে, "বড় খারাব তাস—এককে বাদ দুসরা। লেকিন এদের নসীব ঔরভী খারাব হত যদি না মিসি বাবা টোক দিতেন। সব্ কে সব্ বদ কিস্মৎ। সক্কলের কপালে দুঃখ। তসল্লী (সান্ত্বনা) বস ইয়েহ—দুঃখের শেষে সুখ বেশী আখেরে।"

"তাহলেই হল", আনমনে বললে সে।

আয়া শুধোলে, "আপনার নসীব দেখবো?"

"প্লীজ ইয়োরসেল্ফ্।"

এবারে পুরো তাসে টোকা মারলে আয়া নিজেই। শিপ্রা আবার তার "বই-বাগানে" হেথা হোথা ঘুরতে লাগলো। বাগানটা কিন্তু তেমন আ মরি আ মরি করার মত নয়। যদি সিলেটী বান্ধবী বিল্কিসের সঙ্গে দেখা হয় তবে বইটার কথা তাকে বলবে? কিন্তু কোথায় কোন্ গ্রামাঞ্চলের জমিদার বাড়িতে হল তার বিয়ে। আবার দেখা হবার সম্ভাবনা কতখানি? হায়, শিপ্রা জানতো না, ত্রিপুরা পাহাড়ের উপর দিয়ে আসবার সময় সে যে-সব হাওর

দেখেছিল তারই একটার পারে বিল্‌কিস্‌দের বাড়ি, টিলার উপর, প্লেন থেকে ত্রিশ চল্লিশ মাইল মাত্র। পুনরায় ডবল হায়, হায়। জানা থাকলেই বা কি হত?

না, সে খুঁজতো এলোপাতাড়ি এবং ডাউন করতে পারতো না। কিন্তু তাতেও তো আছে সুখেদুঃখে মেশানো ছোট্ট একটি অনুভূতির আবেশ।

আয়া যেন বসে বসে উল্লাসে নৃত্য করছে। এ-রকম একটার পর একটা নিরবচ্ছিন্ন খুশ-কিস্মতের তাস সে কভীভী দেখে নি। "আচ্ছী শাদী, আচ্ছে বাল-বাচ্চে—" ভুরু কুঁচকে বললে, "লেকিন্‌ কম।" মাত্র কটি এই কথাই তার কানে এসেছিল। বিলকুল বোগাস্‌! মুচকি হেসে ভাবলে, পাহাড়ীদের ভিতরও তাহলে আর্যা গান্ধারী মাতৃকুল শ্রেষ্ঠা!"

অকস্মাৎ শিপ্রার খেয়াল গেল অকস্মাৎতর বেগে আয়া উপু হয়ে দুহাত দুবাহু দিয়ে সব তাস গুটিয়ে নিচ্ছে। শুধলো, কি হল?

নিশ্চুপ।

শিপ্রা একটুখানি কাত হয়ে আয়ার মুখের দিকে তাকালে। সে ইতিপূর্বে বিস্তর মঙ্গোলিয়ান টাইপের পাহাড়ী মেয়ে দেখেছে, এবং লক্ষ্য করেছিল, এদের ভাব-পরিবর্তন মুখের উপর অতি সামান্য রেখা আঁকে, রং পালটায়। এখন দেখে, আয়ার মুখ যেন কালো হয়ে গিয়েছে—ছোট্ট বাচ্চা কাঁদবার আগে যেরকম মুখ বিকৃত করে অনেকটা সেই রকম।

অবাক হয়ে শুধলো, "কি হল তোমার? খারাপ কিছু একটা দেখেছো? তুমি বড্ড সিমপ্‌ল। এ-সব কখনো কি সত্যি সত্যি ফলে? না হয় আমাকে বলেই দেখো, আমি কি ভাবে নিই।"

"না পুছিয়ে মিসি বাবা।" বলা শেষ হওয়ায় পূর্বেই, সেই কবেকার বাচ্চা বয়েস থেকে তার হাড়ে হাড়ে লোমে লোমে যে-সব ভদ্রতম দেশী-বিলিতি এটিকেট ঢুকে গিয়েছে, সেগুলো এক লহমায় ভুলে গিয়ে খাস পাহাড়ী মেয়ের মত দুই হাঁটুর উপর শাড়ি টেনে তুলে ছুট দিল বাবুর্চিখানার দিকে।

শিপ্রা একটু মুচকি হাসলো। সামান্য তাসের হেরফের ভুলিয়ে দিলে সরলা পাহাড়িনীর পূর্ণজীবনের অভ্যাস, শালীনতা বোধ—অবশ্য আয়ারই মতে—সেটা অলঙ্ঘনীয় শালীনতা—,সামান্য দুখানা তাস এক টানে তাকে নিয়ে গেল সেই দুর্গন্ধ অন্ধকার গিরিগুহায়, তার ভিতরটা এক লহমায় ভরে দিল যুগ যুগ সঞ্চিত তার পিতৃপিতামহ পূর্বপুরুষদের ভীতি দিয়ে—হিংস্র জন্তুর ভয়, ঝঞ্ঝা-বিদ্যুতের ভয়, 'সভ্য' বিদেশীর বন্দুকের ভয় এবং সব চেয়ে বড় ভয়—পৈশাচিক প্রেত-দৈত্যের দানবিক অট্টহাস্যের বিভীষিকা।

সব জানে, সব বোঝে শিপ্রা কিন্তু তবু তার মনটা খচ্‌খচ করতে লাগলো।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কীর্তি কাঁপছে। অন্য কারো চোখে পড়তো না, কিন্তু শিপ্রায় চোখ ভালো-বাসার চোখ, সে তো সব দেখতে পায়।

"কাঁপছো কেন?"

"কই আমি তো টের পাচ্ছি নে।"

"যাও, চান করে এসো, মাথার প্রত্যেকটি চুল পর্যন্ত ধুলোয় ধুলোয় সাদা, গেরুয়া।"

কীর্তির যে যাবার ইচ্ছে নেই, শিপ্রা খুবই টের পেয়েছে। কিন্তু সে চুপ করে রইল বলে কীর্তি বাধ্য হয়ে উঠলো।

শিপ্রা হলঘরে এল। বাইরে রোদ তেতে উঠেছে বলে হাজী বসেছে খানের মুখোমুখি হয়ে। দুপুরের পূর্বেই কীর্তিরা ফিরে এসেছে। নির্ধারিত সময়ের অল্প পূর্বে অপ্রত্যাশিত এই আগমন মনে যে কি আনন্দ দিয়েছিল সেটা সকলের কাছে এতই অকিঞ্চিৎ যে সে সেটা কাউকে খুলে বলতে পারবে না—হয়তো একমাত্র কীর্তিই তার সামান্য কিছুটা অংশের মূল্য হৃদয় দিয়ে নিতে পারবে, কাঞ্চন যতই অকিঞ্চিৎ হোক না কেন সে কাঞ্চন। হলবাইনের ছবিতে উল্লসিত ব্যক্তির মুক্ত অট্টহাস্যের চেয়ে মোনালিসার মৃদু হাসি ঢের বেশী অর্থধারী, রহস্যময়। মোটরের শব্দ শুনেই সে তাই দ্রুতপদে গিয়েছিল বারান্দায়, যদিও প্রাণ চেয়েছিল ছুটে যেতে। কীর্তির ধুলিধুসরিত অঙ্গ বস্ত্র দেখে সে যত না বিস্মিত হয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশী হল তার চেহারার আকস্মিক এক অজানা পরিবর্তন দেখে। ইতিমধ্যে আয়ার 'পত্রলেখা'র ভাগ্যগণনাজনিত খচখচানিটা এক মুহূর্তেই পেয়েছে লোপ—তার অজানাতে, এবং আবার ফিরে এসে পূর্বাসনে বসবার জন্য সেটাতে রুমাল বেঁধে "রিজর্ভড" হক্কের 'ইস্‌টাম্বো' মেরে যায় নি।

"কি কি দেখলেন বলুন।"

হাজী বললে, "দেখার মত খুব বেশী একটা কখনো ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু এখন, আজ ক'দিন যা দেখেছি সেটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে ভবিষ্যতের অদেখা অনেক কিছুর দিকে।"

খান বিয়ারে চুমুক দিয়ে সিগরেট ধরিয়ে বিজ্ঞের মত বললে, "এ তো সব সময়ই হয়! অদেখা জিনিস তো কোনো ইঙ্গিত দিতে পারে না—দেখা জিনিসই অদেখার ইঙ্গিত দেয়।"

শিপ্রা বললে, "যেমন সাহারার মাঝখানে দৃশ্যমান অন্তহীন বালুকা অদৃশ্য মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়, আষাঢ়ের ঘন বরিষণ অদেখা পাকা ধানের ইঙ্গিত দেয়।"

হাজী বললে, "একশ' বার মানি। তুলনাহীনার অতুলনীয়া তুলনা দুটি শুনে আরো বেশী মানি। কিন্তু ব্যত্যয় এইখানে যে দেখার জিনিসগুলো পরস্পর-বিরোধী অদেখার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রতিপদে। একদিকে দেখুন ইমিগ্রেশন আইন মোটেই ঢিলে হয় নি ; অন্যদিকে লক্ষ্য করবেন যে সব ফালতো লোক ইণ্ডিয়ার দিকে আসছে—সবই হিন্দু—তাদের কোনো চেক করা হচ্ছে না। এরা ঠিক রেফুজী নয়। এমনিতে হয়তো এ-সময়টার আগরতলায় মামাবাড়িতে আসতো না, এখন জাস্ট টু বী অন্ দি সেফার সাইড্। আমার মনে কণা মাত্র সন্দেহ নেই ইয়েহিয়ার বিস্তর গুপ্তচর কালো পথে এদিকে আসছে। ওদিকে দেখুন, ত্রিপুরা রক্ষা করার জন্য কি কি গোপন মিলিটারি ব্যবস্থা করা হয়েছে জানি নে, কিন্তু পাবলিককে কি যথেষ্ট তৈরী করা হচ্ছে ?"

খান হেসে বললে, "কিচ্ছু ভয় নেই, হাজী। অন্তত স্পাইদের নিয়ে চিন্তা নেই। পিণ্ডিতে আজ যা ঘটে দিল্লী কাল তা জেনে যায়। আমাদের খবর তারা জানতে পায় পরশু। স্টাইলটা একটু নবাবী কি না।"

হাজী বললে, "কিন্তু সব মিলিয়ে, ওভার্ অল্ পিকচার কারো আছে কি ? এই যে আজ কীর্তিবাবু আমার সঙ্গে মোটরে গেলেন, এন্তের ক্ষেত চষলেন, দেখলেন কট্টুকুন ? ত্রিপুরার তিন দিকে পাক্ বর্ডার। বলতে গেলে পাক-সমুদ্রের মাঝখানে যেন ইণ্ডিয়া-দ্বীপাংশ। এর কতটুকু দেখেছি আমিই বা, আর কীর্তিবাবুই এক সকালে দেখবেন কতটুকু ?"

শিপ্রার কান পড়ে আছে কীর্তির পদধ্বনির তরে। "এত দেরি কেন ? ফ্যাশনেবল মেয়ের মত তার কাজে বাথরুম ঠাকুরঘর, আর ঠাকুরঘর বাথরুম নয় তো।"

হাজীকে সরাসরি শুধলো, "কীর্তি এত উত্তেজিত—না, এত বিচলিত, জাস্ট্ নট হিজ ওন সেল্ফ্ হল কেন ?"

আসমানের দিকে তাকিয়ে হাজী বললে, "জানেন আল্লা পাক। আমাকে খাদ কতবার বলেছে, কীর্তির মত 'হ্যাপি-গো-লাকি-ফেলো', হেল্-ফেলা-উয়েল-মেট হয় না। দুনিয়ার হাল-হালৎ সম্বন্ধে আস্ত একটি পরমহংস। প্যাখনার উপর দুশ্চিন্তার ফোঁটাটি পর্যন্ত জিরিয়ে নেবার ফুরসৎ পায় না। আর আজ ? বর্ডারে পেঁৗছে কি হল, বুঝতে পারলুম না। আমি যা যা দেখেছি তিনিও ঐ সব দেখেছেন, তবে হ্যাঁ, আমি যে অদৃশ্যের প্রতি অলক্ষ্য ইঙ্গিতের কথা বলছিলুম সেগুলোতে আমি, ওয়াটসন, দেখেছি চায়ের পিরিচ, উনি, হোম্স্, দেখেছেন ফ্লাইং সসার্। তবে হ্যাঁ, মোটর মেরামতিতে আমি যখন ব্যস্ত তখন তিনি গামছা-পরা গামছা-কাঁধে কয়েকটা নিতান্ত দীনদুঃখীর সঙ্গে মিনিট কয়েক কথা কইলেন। কিন্তু কখন যে তাঁর গায়ে অল্প অল্প কাঁপন লেগেছে সেও আমি বুঝতে পারি নি—মোটরের ঝাঁকুনিতে। কথা এমনিতেই তিনি

বলেন কম, আর আমার নিজের বকর বকরের ঠেলায় নিজে আমি নিষুতি রাতে অন্য ঘরে গিয়েই শুই। কিন্তু এতে চিন্তিত হবার মত কিছু নেই আয়েম শ্যোর্। আর আপনাদের তো সব কিছু বলবেনই—একটু ঠাণ্ডা হলে পর। আমাকেও উনি কিছু পর ভাবেন না। আমাকেও বলবেন। নইলে আমাকেই বা বেছে নিলেন কেন গাইড হিসেবে—কোনো প্রকারের লৌকিকতা না করে?"

শিপ্রা বললে, "এ কথাটা ঠিক। আপনাকে সে একটা অতি তালেবর খলিফে লোক ঠাউরেছে। আচ্ছা, আমি এখন উঠি। জয়েন ইউ লেটার—টা টা।"

ঘরে গিয়ে খাটে শুতে না শুতেই চিরুনি নিয়ে আয়া হাজির। খানিকটে আঁচড়াবার পরই কীর্তি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আয়া বললে, "একটু পরে আসছি মিসি বাবা।"

কীর্তি সোজা ড্রেসিং টেবিলের টুলটা টেনে এনে বসল। শিপ্রার হাত-দুটি আপন দু'হাতে তুলে নিয়ে বললে, "তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

শিপ্রা তার হাত ছাড়িয়ে তুলে নিল কীর্তির হাত। তার উপর ভেজা চুমো খেয়ে বললে, "আমার তিন তিন বারের সত্য তুমি ভুলে যাও নি, আমি জানি। বলো।"

"তুমি কালই শিলঙ চলে যাও। সেখানে আমি আসছি সপ্তাহ খানেকের ভিতর। শিলচরে একদিনের জন্য নেমে করিমগঞ্জ বর্ডারটা দেখে নেব। তারপর শিলঙ এসে তোমাকে নিয়ে ডাউকি বর্ডার দেখতে যাবো। কাল যাবে শিলঙ? এখন ঐ জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু নিরাপদ বলে নয়। তোমার ইচ্ছে, তাই।"

শিপ্রা লক্ষ্য করলো, এখন কীর্তি আগের মত একটানা কাঁপছে না। মাঝে মাঝে, যেন অল্প নড়ে উঠে। শিপ্রা স্থির করেছে কীর্তিকে এখন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না। সে নিজের থেকেই বলবে, একটু পরে।

"আমি প্লেনের টিকিটের কথা হাজীকে বলে এখখুনি আসছি।"

ফিরে এসে বললে, "যাক্। বাঁচালে। ওরা অন্তত এটুকুন বুঝেছে, তোমার চলে যাওয়াই ভালো।"

যেই না ঐ কথাটি বলেছে অমনি তার মনের দরজা কে যেন হঠাৎ লাথি মেরে খুলে দিল।

প্রথমটায় দ্রুতগতিতে, যেন পাঠশালে ছেলে "পাখী সব" আবৃত্তি করছে, কারণ কি ভাবে তার সমস্ত বক্তব্যটা শিপ্রাকে গুছিয়ে বলবে সেটা সে ঘণ্টা তিনেক ধরে মুশাবিদা করেছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার—বাথরুমেও খসড়াটা আদালতী "ইস্টম্বো"র কাঠামোতে ঢোকাতে গিয়ে বিস্তর ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে। সেটারও প্রথম ইমপর্টেন্ট হাফ হয়ে গেল আদালতের প্রিমা ফাশিতে

উলট্রা ভিরেস্। ব্রিজ খেলায় যাকে বলে ভিয়েনা গ্যামবিট্। কীর্তি ধরে নিয়েছিল, শিপ্রা তাকে ফেলে শিলঙ যেতে রাজী হবে না এবং সেটাকে নাকচ করার জন্য তাকে সত্য এবং অর্ধসত্য যুক্তিতর্ক পেশ করতে হবে। পয়লা হাফ্ বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল—কারণ শিপ্রা প্রস্তাবনার সঙ্গে সঙ্গেই কেতাবের ইনডেক্স্ পর্যন্ত মেনে নিল। এতে করে হয়ে গেল তার কুল্লে মুশাবিদা টালমাটাল। কিন্তু ধুয়োটা রইল ঠিক। সেটা পাঠক চেনেন। কীর্তিনাশ এ-স্থলে কীর্তিমান। শব্দটি "অপদার্থ"।

গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো, "সব চেয়ে ভালো করে তুমি জানো, আমি অপদার্থ। আমি নিজে জানি সেটা তোমার চেয়েও বেশী। আজ হঠাৎ, দয়াময়ের অসীম করুণায়—দাঁড়াও ঠিক হল না, নিষ্ঠুর সম্মানসহ, এই অপদার্থের সামনে বিদ্যুল্লেখার সর্বোজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত করে দিলেন, এবং শিশু যেরকম মাকে খুঁজে পায়—এ তুলনাটা তোমার কাছ থেকে শিখেছি, গুরু—অন্ধকারের শিশুর নৈসর্গিক জ্ঞান পন্থা সহ আমি সব-কিছু স্বচক্ষে আলোকিত প্রকৃতির সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার মাকে খুঁজে পেলুম এবং দেখে নিলুম।

কাল রাত্রে যে-সব আলোচনা হচ্ছিল সেটা সম্পূর্ণ ভুল আশঙ্কা নিয়ে নয়। সেটার প্রধান,—এবং যার চেয়ে অধিক গুরুত্ব ধরে তার অসম্পূর্ণতা—সর্পকে তারা মানবিক বুদ্ধির অক্ষম চন্দ্রালোকে রজ্জু বলে ভ্রম করেছে, স্বয়ং যমকে যমদূত বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক স্বতঃসিদ্ধ থেকে যাত্রারম্ভ হয়েছে বলে তাদের আলোচনার দিক নির্ণয় করা হল যে-সত্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে নয়, আলোচনার পথে চলে গেল টেন্‌জেনট-এ, কোণা কেটে এবং আলোচনা যতই অগ্রসর হতে লাগলো তার দূরত্ব প্রত্যক্ষ সত্যের দৃঢ়ভূমি থেকে বাড়তে বাড়তে বাস্তবতাহীন অন্তরীক্ষে অদৃশ্য হল।

কারণ এরা যমকে যমদূত, মহামারীকে ছিটেফোঁটা পেটের ব্যামো, ইয়োরোপীয় ব্ল্যাক ডেথকে সাময়িক মূর্ছা বলে ধরে নিয়েছে।

শিপ্রা বললে, "তোমার কাছে যেটা সত্যরূপে আবির্ভূত হয়েছে, তুমি সেটাকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছ, সেটা আমি উপলব্ধি না করেও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিচ্ছি—যে কর্ম ইতিপূর্বে আমি কখনো করি নি—কারণ এখন তোমার ধর্ম আমার ধর্ম। তোমার এ উপলব্ধি ধর্মজাত।" সত্যকার কৌতূহল সহ উঠে বসে শুধলো, "তোমার কথা থেকে মনে হল শুধু ইনসটিনক্‌ট্ বা ইনটুইশন দিয়ে তুমি তোমার সত্য উপলব্ধিতে পেঁছও নি। খুলে বলো অন্য কিছু আছে কি?"

"আছে। কিন্তু সেটা খুদ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি নয়, কি যেন, কে যে আমাকে

ধাক্কা মেরে সেই দিকে এগিয়ে দিলে।

গামছা-পরা গামছা-কাঁধে আপাতদৃষ্টিতে গরীব দুটি চাষার সঙ্গে আজ আমার আলাপ হল।"

শিপ্রা বললে, "হাজী বলছিল বটে।"

হাজী সত্যই সব কাজের, সন্ধিসড়ুকের কাজী। কিন্তু আজ সেও ভুল করেছে—অবশ্য সেটা যমদূতে যমে ঘুলিয়ে ফেলার মত অতখানি দূর পার্থক্য ধরে না। ওরা দু'জনাই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপার্জনক্ষম শিক্ষিত যথেষ্ট সচ্ছল, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। একজন হিন্দু, অন্যজন তার প্রতিবেশী মুসলমান। রাজশাহী থেকে ওদের নামধাম বর্ণনাসহ মিলিটারি হুলিয়া বেরিয়েছে মোটা পুরস্কারের প্রলোভনসহ। যদিও মিলিটারি পূব বাঙলার পুলিশকে আর বিশ্বাস করে না—এ তত্ত্বটা এই আমি প্রথম শুনলুম—তাদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ও ব্যত্যয় হিসেবে ওদের নামের হুলিয়া পাঠাচ্ছে। আর খুদ মিলিটারি তো জীপে করে ওদের সন্ধানে উত্তর বাঙলাটা চষে বেড়াচ্ছেই।

অপরাধ? কাল রাত্রে আমাদের পার্টিতে যে সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়েছিল সেটা ঠিক। ছোট বড় সব মিলিটারি ঘাঁটিতেই কমাণ্ডান্টরা সেপাইদের ঠেকিয়ে রেখেছে লুটপাট, অবিচারে যাকে তাকে গুলি করে মেরে বাদবাকিজনদের হৃদয় মনে আতঙ্কের বিভীষিকা সৃষ্টি করে তাদের ক্লীব করে দেওয়া, এবং নারী হরণ করে ঘাঁটির ভিতর এনে ব্রথেল নির্মাণ করা।

রাজশাহী একমাত্র ব্যত্যয়। কেন, সে-কথা শুধোবার কথা মনে ছিল না।

এই মার্চের প্রথম সপ্তাহে সেখানে দিবাদ্বিপ্রহরে পাঞ্জাবী সেপাই তাদের ভদ্রলোক প্রতিবেশীর দুটি মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় ছাউনিতে, বাড়িতে ফেরত দেয় অন্যান্য অত্যাচার করার পর। এই দুই পলাতকের একজন তখন অন্যজনকে ডাক দেয়। একজন বাইসিক্ল চালাল, অন্যজনের হাতে মার্কিন ডিজপোজেলের ক্যাম্পকটের খোল—মোস্ট হার্মলেস লুকিং।

ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়, কী দুঃসাহস! এ তো সজ্ঞানে অবশ্য মৃত্যুর মুখের দিকে ধাবমান হওয়া। এগোলো ছাউনির দিকে, পুরো স্পীডে—সেপাইগুলো যাচ্ছিল পয়দল। শিগগীর দূর থেকে ওদের দেখতে পেল—সবসুদ্ধ ছ'জন। যতখানি অনুমান হল, সংজ্ঞাহীন মেয়ে দুটিকে রিকশায় বসে ধরে রেখেছে দুজন সেপাই। রাজশাহীর প্রত্যেকটি গলি, প্রত্যেকটি কুঁড়েঘরও তারা চেনে আপন বসত বাড়ির গলির মত। একটুখানি ঘুরতি পথে জোরসে সাইক্ল চালিয়ে তারা একটা অতি সরু আঁকাবাঁকা গলির মুখে পজিশন* নিয়ে

---

* ফৌজের কল্যাণে এখন বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম গ্রামের নিরক্ষরতমা চাষী মেয়েও 'পজিশন নেওয়া' কথাটার অর্থ ভালোভাবেই শিখেছে—হাতে কলমে। এরাই বাৎলে দিত 'পজিশন নেওয়ার' সর্বোত্তম স্থানটি কোথায়—গাঁয়ের ভিতরে বাইরে, হাওরের ভাসমান 'দাম' সামনে রেখে

অপেক্ষা করল। শয়তানগুলোর জন্য। কী আশ্চর্য! অবস্থার ফেরে দুই শতাধিক বৎসর ধরে সংগ্রামে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ শ্রেণীও কি রকম হঠাৎ ইনস্‌টিন্‌কটিভলি সর্বোত্তম মিলিটারি টেকটিক এস্থলে কি হবে সেটা সরাসরি উপলব্ধি করে ফেলেছে।

রিকশা দুটোকে তো এগিয়ে যেতে দেবেই। তারপর গেল আরো কয়েকজন। সঙ্কলের পিছনের দুই না-পাকীকে এদের একজন দুটো কার্তুজ দিয়ে ঘায়েল করলো। প্রথম দুজনকে গুলি করলে পিছনের সবাই গলিটার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে বলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যেত ফায়ারিং হয়েছে কোন্ জায়গা থেকে। কিন্তু এই কূট পদ্ধতির ফলে সামনের সব কটা সেপাইকে ঘাড় ফিরিয়ে, সন্ধান করতে হল, ফায়ারিং কোনো বাড়ি থেকে, পাঁচিলের আড়াল থেকে গলিটার এ-মুখ থেকে, না রাস্তা ক্রস করার পর গলির ও-মুখ থেকে। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকে গিয়েছে দুটো বাসা-বাড়ির টাট্টির মাঝখানের মেথরের পথ দিয়ে, খাটা পাইখানা চড়ে উসপার হয়ে, আরেক আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে ঢুকলো একটা জীর্ণ বাসাবাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে।

গৃহস্বামী অর্ধপরিচিত। বুঝিয়ে বললে, 'আপনি যদি ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেন আপনি আমাদের দেখেছেন—কথা কয়েছেন বললে তো কথাই নেই—তবে আপনিও নিস্তার পাবেন না।' তার পর তাদের দামী পাতলুন বুশসার্ট বার্টার করে পেল তিনখানা গামছা—চারখানা ছিল না। উপদেশ দিলে 'জামা পাতলুন উপস্থিত বাসন মাজার ডোবাতে ডুবিয়ে রাখুন—যদিও তার খুব একটা দরকার নেই, কারণ আমরা যখন মেথরের পথে ঢুকি, তখনো বাকী খানগুলো পিছন ফিরে গলির মুখ অবধি পৌঁছয় নি।'

বন্দুক তারা গোটাপাঁচেক খাটা পাইখানা পেরুবার সময় যেটা সবচেয়ে জঙ্গলে ভর্তি, নোংরা সেটাতে পুঁতে দিয়ে দ্বিতীয় গলিতে ঢোকে নিরস্ত্র নিরীহ নাগরিকের মত।

তখন তাদের সামনে একমাত্র সমস্যা, রাত্রের মত বা দুদিনের মত আশ্রয় নেয় কোথায়? গামছা-পরা অবস্থায় সঙ্গের দশটাকার একগুচ্ছো নোট রাখে কোথায়? ওদের কপাল ভালো, একটা বাড়ির সামনে দেখতে পেল কাটা মুরগীর রক্ত। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিন্নীমার কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নিলে খানিকটে হলুদ চুন আর ন্যাকড়া। নোট কখানা পায়ে সাজিয়ে তার উপর বাঁধলো নোংরা ন্যাকড়ার বাণ্ডেজ। তার উপর মাখালো মুরগীর রক্ত, কোনো জায়গায় বা কিঞ্চিৎ হলুদ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে করা হল পুঁজের সাব্‌স্টিটুট্। এমার্-

---

তার পিছনে জলে কাঁধ অবধি ডুবিয়ে, চা-বাগানের টিলার সানুদেশে, চা-গাছের ঝোপের আড়ালে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেনসির জন্য দু'দুখানা দশটাকার নোট ভাঁজ করে পিটে পিটে প্রায় কবচের সাইজে এনে, কলাপাতা দিয়ে মুড়ে, বেঁধে মাড়ি আর গালের মাঝখানে দু'জনা দুটো গুঁজলে।

রাত্রিটা কোথায় কাটানো যায়, এই তখন সমস্যা। এদের একজন উকিল। তিনি সঙ্গীকে বললেন, আদালতে সঞ্চিত তাঁর অভিজ্ঞতা মতে ক্রিমিনাল মাত্রেরই একমাত্র ভরসা বেশ্যাবাড়ি। সেখানে যে-কোনো লোক 'বনা ফাইডি' ক্লায়েণ্টরূপে যেতে পারে। কোনো পুলিশ, সেপাই আর যা শুধোয় শুধুক, এ-প্রশ্নটা "তুমি এখানে কেন ?"—সম্পূর্ণ অবান্তর। ক্রিমিনালকে লুকিয়ে রাখা, আশ্রয় দেওয়া ওদের একটা সাইড প্রফেশন। কিন্তু এই গামছা-পরা লোক দুটোকে আশ্রয় দেবে কি ? দেবে। যদি আগাম টাকা ফেলা যায়। উকিল তাই বুদ্ধি করে কিছুটা গালে পুরে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। মেয়েদের পাড়ায় বরাতজোরে তারা আশ্রয় পেয়ে গেল। খেয়া পেরুবার সময় নৌকাডুবিতে ওদের জামাকাপড় ভেসে গেছে এ অজুহাত মেয়ে দুটো কতখানি বিশ্বাস করেছিল সেটা অবান্তর। রোক্কা দশটি টাকা সর্ব অজুহাতের চেয়ে বড় যুক্তি।

রাত্রে মেয়েগুলো আমাদের মিলিটারি সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা শোনালে। প্রথমেই আরম্ভ করলো, 'বলে ওরা নাকি মুসলমান। ডোম চাঁড়ালকেও ওরকম মেয়েমানুষ গিলতে আমরা কক্‌খনো শুনি নি। কোনো দিন আমাদের নিয়ে যেত ছাউনিতে,—সেখানে যা হত বলে কাজ নেই—নীলাটা তো মারাই গেল। পালাতে পারলে তো বাঁচি। আশ্রয় দেবে কে ? আর রোজ ঐ এক জিগির, ওদের সর্দার ভদ্রঘরের মেয়ে চান, আমরা যোগাড় করে দিলে মেলাই টাকা পাবো।' তারপর তারা প্রায়ই ঠা ঠা করে হেসে বলতো, 'মাস-খানেক পরে মুফতেই পাওয়া যাবে। ঢাকা থেকে খবর এলেই আমরা শুরু করবো সব-কুছ। একদিনেই ইস্কুল কলেজ থেকে এক ঝাপটায় নিয়ে যাবো সব কটা মেয়ে আর পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে'।"

কীর্তি দম নিয়ে বললে, "দুই বন্ধু এ-কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি, কিন্তু আমি করি।

সপ্তাহখানেক ওদের লেগেছিল পাবনা পেঁছিতে।"

শিপ্রা শুধলো, "ওরা অত দূরের পথ না নিয়ে পদ্মা পেরিয়ে ইণ্ডিয়া চলে গেল না কেন ?"

"ওদের কপাল। ওরা ভুল খবর পেয়েছিল, চাঁপাই-নওয়ার গঞ্জ থেকে যশোর অবধি মিলিটারির কড়া পাহারা—অবশ্য সে-পাহারা মোতায়েন হয়েছে, সবে, সেদিন।

পাবনার পাশ দিয়ে যাবার সময় এক কনস্টেবল উকিলকে চিনে ফেলল। কিন্তু সে করলে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আচরণ। ছুটে এসে তাকে কানে কানে

বললে, উকিলের নামে হুলিয়া বেরিয়েছে।...তখন জানতে পারলেন, পুলিশ আর ফৌজে তখন রীতিমত নিরস্ত্র লড়াই, পারলে ওদের আশ্রয় দেয়। পুলিশটাই দুজনাকে জেলেডিঙিতে তুলে দেবার সময় বললে, "ঐ একটা মাত্র বাঁচাওতা রয়েছে এখনো। খানরা পানি বড্ড ডরায়। নৌকো দূরে থাক্, লঞ্চে পর্যন্ত উঠতে চায় না।"

কীর্তি কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, "এদের হাতে এখন মাত্র দু'মাস সময়। পূব বাঙলার এদিকটায় বিশেষ করে চেরাপুঞ্জির তলাকার সিলেটে বর্ষা নামে কলকাতার অনেক আগে। দু'মাসেই কাজ গুটিয়ে নিতে হবে ওদের। তাই ওদের দণ্ড নেমে আসবে খুব শিগগিরই এ ধারণাটা কাল রাত্রেই আমার হয়েছিল; আজ এরা আপন অজানতে কনফার্ম করলে।

আরেকটা কথা; এরা বললে, সেই দূর রাজশাহী অঞ্চল থেকে এই আগরতলা অবধি বহুলোকের সঙ্গে তাদের আলাপচারী হয়েছে। একজন লোকও পায় নি যার ধারণা আছে, এবারে যে মিলিটারি জুলুম আসছে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। ওরা ধরে নিয়েছে, পঁচিশ বছর ধরে নানা রাজা, নানা প্রকারের খেল দেখিয়েছেন, এবারও সেটা হবে—বেশীর ভাগেরই অবশ্য উইশফুল থিঙ্কিং সমঝোতা হয়ে যাবে—সেটারও প্রকৃতি হবে একই রকমের। উনিশ-বিশ হবে শুধু পরিমাণে।"

কীর্তি বললে, "ওদের দুজনাকে আমি তোমার কলকাতার ঠিকানা দিয়েছি।"

শিপ্রা একটু চমকে বললে, "তোমার প্রোগ্রাম কি?"

"যতটা বলেছি, ততখানি ঠিক আছে। আমি তোমাকে শিলঙে মীট করবো। তারপর কলকাতা যাবো। সেটার দিন স্থির করা তোমার হাতে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমার কি হবে, আমি কি করবো সেটা আমার হাতে তো নয়ই, তোমার হাতেও নয়, খুব সম্ভব।"

শিপ্রা বললে, "ওদের দুজনার নাম দাও তো। আমি শিলঙ থেকে রামাকে জানাবো, এঁরা যদি আমার কলকাতা ফেরার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তবে যেন ওদের কলকাতার ঠিকানা ঠিক ঠিক লিখে রাখে এবং বলে আমি ফিরে আসা মাত্রই ওদের সঙ্গে দেখা করবো। ঠিক তো?"

"তোমাকে তো কক্খনো অঠিক কাজ করতে দেখি নি। আয়াকে ডাকবো? তোমার খোঁপাটা বেঁধে দিক। আমাদের একবার হলে যাওয়া দরকার।"

তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে, দাঁড়িয়ে উঠে, মাথা নিচু করে শিপ্রার তরঙ্গে তরঙ্গে নেমে-আসা কুঞ্চিত কেশদামে মাথা গুঁজে দিয়ে পরিতৃপ্ত নিঃশ্বাসে বুক ভরে নিল।

শিপ্রা এলোখোঁপায় পাক লাগাতে লাগাতে বললে, "চলো, ডার্লিং। হ্যাঁ, সৃষ্টিকর্তা এতকাল ধরে তোমাকে অপদার্থ, অকর্মণ্য করে রাখেন নি, তিনি

তোমার ব্যাটারি চার্জ করেছিলেন। এইবারে খেলো, খেলো, তব ভৈরবখেলা।"

শিপ্রা লক্ষ্য করেছে, কীর্তির কম্পন সম্পূর্ণ থামে নি বটে, তব যেটুকু আছে বাইরের লোকের চোখে পড়ার মত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লাফ দিয়ে উঠলো হাজী। খনে দু'হাত দিয়ে কপালের রগ চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে গোঙরায়, "গেলুম, গেলুম, আমায় ধরে তোল্" পরমুহূর্তে দু'হাতে বুক চেপে ধরে গভীর পরিতৃপ্তির শ্বাস ছেড়ে বলে, "আঃ কী আরাম, এসো ক্ষুদিরাম।"

শিপ্রা সোফাতে হাজীর পাশের জায়গায় বসে মুচকি হেসে বললে, "আমি একদম সোজা ঘোড়ার মুখ থেকে পাক্কায়েস্ট্ খবর পেয়েছি—তাও যে-সে ঘোড়া নয়, উত্তম স্কচ জাতীয় 'হোয়াইট হর্স'-এর মুখ থেকে, যে আপনি তিন বোতল 'হোয়াইট হর্স' গেলার পরও ঘোরঘট্টি অন্ধকারে পথ-বিপথ ঠাহর করে করে, কালোয় কালোয় বর্ডার ক্রস করতে পারেন। অতএব আপনি যে এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্রব্যগুণের প্রভাবে—"

"বিষাদে হরিষ, ম্যাডাম হরিষে বিষাদ। এইমাত্র সেদিন আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গে গোটা আগরতলাটা আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠলো। চোখ কচলালুম, দু'চোখ ভরে আরো দেখব বলে, চোখ খুলতেই দেখি, গোধূলির ম্লান আলো। আপনি গোধূলির ধূলি না ছুঁয়ে আপন ধুলো-পায়েই ফিরতি পথ ধরেছেন। হবে না বিষাদ? আর আপনার সঙ্গসুখের আনন্দটাও কী বেআইনী ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু এ বিষাদেও, হর্ষ না হোক, আমি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছি। উপস্থিত যা হাল তাতে গোটা পূব-পাকিস্তান এবং লাগোয়া আগর-তলা কোনো প্রাণীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর তো নয়ই বরঞ্চ আয়ুক্ষয়, এমন কি বায়ু নির্বাপণেরও যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা আছে।"

শিপ্রা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "পূর্ব পার্কের আগুন আগরতলাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই তো আপনার আশংকা? তবে বউ বাচ্চাদের কথা ভাবছেন না কেন? দিন না পাঠিয়ে আমার সঙ্গে। ভাই খান, তুমি একটা কসম খেয়ে তাঁকে ভরসা দাও, প্লীজ, যে আমার বাড়ীতে ওদের স্থানাভাব হবে না, আদর-যত্নের ত্রুটি হবে না। আমার মনে হয় আপনি এবং বাদবাকী বিবাহিত পুরুষের ৯৯% বড্ড ইরেসপনসিব্‌ল্—ঐ বিষয়টায় অন্তত।"

হাতজোড় করে হাজী বিনীত কণ্ঠে বললে, আমি করজোড়ে স্বীকার করছি দারা পুত্র সম্বন্ধে কোনো প্রকারের দুর্ভাবনা আমার সুখনিদ্রাটিকে কোনো

কালেই রক্তিভর জখম করতে পারে নি, কিন্তু ওদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমি দশ বছর পূর্বেই একটা ফৈসালা করে রেখেছি। অবশ্য সবই ভগবানের হাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে অর্থাৎ আজ ভোরে আমি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে একটা ভয়াবহ সংবাদ পেয়েছি। কাহিনীটি প্রাচীন ও দীর্ঘ; আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারছি।

ইয়েহিয়া চায়, ভারতে একটা কমুনাল রায়েট লাগুক।

কমুনাল রায়েটের জন্য উত্তর ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের জমীন সব সময়েই তৈরী। উত্তর ভারতের উগ্রতম পন্থী কিছু হিন্দু আছেন, যাঁরা পাকিস্তানের বিনাশ চান, এবং ভারতের মুসলমানদের নিতান্ত দায় পড়ে সহ্য করেন। এঁরা এই ইচ্ছেটা প্রকাশ করেন পলিটিকসের মুখোস পরিয়ে ('পাকিস্তান তৈরী হয়ে যাওয়া মাত্রই ভারত আক্রমণ করবে; তার পূর্বেই আমাদের আক্রমণ করা উচিত') এবং নিজেদের মনগড়া এক আজব হিন্দুধর্মের ঝাণ্ডা তুলে। আমি পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে বলছি, তাঁরা যা প্রাণ চায় সে-পলিটিক্‌স্ করুন, কিন্তু সনাতন ধর্মের এ-রকম নীচ অবমাননা যেন না করেন—ধর্মে সইবে না।

আর ভারতের প্রতি বিশেষ করে বহু বহু পাঞ্জাবীদের ঘৃণা, বিদ্বেষ, নফরৎ, শত্রুতা এমনই প্রচণ্ড যে তার কোনো তুলনা নেই। এদেরও একটা আজব মনগড়া ইসলাম আছে যে-ইসলাম বলে, অমুসলমান মাত্রই কাফির এবং ভারতের কাফিরকুল তন্মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট অমানুষ। এদের কতল করা ইসলামের (তাদের মনগড়া ইসলামের) আদেশ—দোষী-নির্দোষী উভয়কে সমভাবে। এবং এদের স্ত্রীজাতিকে লুণ্ঠন করা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত। পাঠানদের রক্তে মজ্জায় থাকে সবচেয়ে বড় যে রিপু সেটা—লোভ, গৃধ্নু তা ও তজ্জনিত তস্কর বৃত্তি। কাফিরদের প্রতি তাদের ঘৃণা পাঞ্জাবীদের মত রিফাইনড মীন নয়। ফলে পিণ্ডিতে যে কোনো সরকারই রাজত্ব করুন না কেন, ভারত-বিদ্বেষ-নীতি তারা অবলম্বন করতে বাধ্য, এবং গোপনে সোৎসাহে বিশেষ করে পাঠানদের আপ্যায়িত করেন এই বলে, "দাঁড়াও না, দিল্লী লুণ্ঠন করার ব্যবস্থা শিগগীরই হচ্ছে।

উত্তর ভারতে কট্টর অখণ্ড পাকিস্তানপন্থী, যাদের সঙ্গে অন্য কারুরই তুলনা হয় না—বেহারী মুসলমান। এদের এক প্রভাবশালী অংশ কলকাতায় বাস করেন। তাঁদের পাকিস্তান-প্রীতি চৌদ্দ আনা পরিমাণ নিতান্ত হীন স্বার্থবশত। তাদের ভাই-বেরাদর, একদা যারা, কবিদের মত ঈষৎ অতিশয়োক্তি করে বলছি, পাটনা স্টেশনে কুলির কাজ করতো আজ তারা পূর্ব বাঙলায় ট্রাফিক ম্যানেজার, রেলওয়ে সেক্রেটারি। বাইতে তাঁরা উর্দু কথাবার্তা বলে খানদানী মনিষ্যি রূপে পরিচিত, ভিতরে বলেন, ভোজপুরী মঘী বা মৈথিলী। বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই আপনার প্রিয় কবি; সে ভাষা যদি উর্দু হয় বর্ধমানের পদী পিসীর কোঁদলের

ভাষাও তাহলে উর্দু। এই বেহারীদের অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় উর্দুর কল্যাণে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে একজোট হয়ে পূব বাঙলাকে শুষছেন, হীনতম কলনীর মত। এরা এবং বেহার ও কলকাতার বেহারীগণ সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন পূব বাঙলাকে দিতে রাজী নয়। এরই উপর নির্ভর করছে তাদের পাকিস্তানে প্রীতি।"

শিপ্রা জিজ্ঞেস করলে, "এরা পার্টিশেনের সময় পশ্চিম পাকিস্তান গেল না কেন? সেখানে তো অন্তত শিক্ষিত পাঞ্জাবীরা উর্দু বলে, অশিক্ষিতেরাও অনেকখানি বোঝে। বাঙলায় এল কেন?"

হাজী বললে, "ঐ তো সরল রহস্য, ভদ্রে। পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ সময়ে গেল উত্তর প্রদেশ ও দিল্লী অঞ্চলের অনবদ্য উর্দুভাষী বিস্তর লোক। ওদের সামনে বেহারীর উর্দু যেন রবীন্দ্রনাথের সামনে আমার কুমিল্যার খাজা বাঙলা! তদুপরি পাঞ্জাবীরাও রাইটলি অর রংলি দাবি করে তাদের উর্দু বেহারীদের উর্দুর চেয়ে বেহ্‌তর—যদিও লক্ষ্ণৌ দিল্লীবাসীদের মতে দুটোই একটা গাধার দুটো কান।

পূব বাঙলায় যে-সব বেহারী আছে তারা পাঞ্জাবীদের চেয়ে নৃশংস পদ্ধতিতে লড়বে লীগের বিরুদ্ধে। পাঞ্জাবীরা অবস্থা মারাত্মক জানা মাত্রই ফিরে যাবে আপন দেশে, এরা যাবে কোথায়? দে হ্যাভ্‌ বার্নট দ্যার বুলক কার্টস।

এবং আছে আর একটা দল তামাম উত্তর ভারত জুড়ে। এবং পশ্চিম বাংলার মুসলমান বাঙালীও কিছু সংখ্যায় আছেন।"

তিন কলকাতাগত জনের চোখের সামনে ভেসে উঠলো মির্জার কুটিল মুখচ্ছবি।

"তবে এদের অধিকাংশ মক্তব-মাদ্রাসার লোক।"

ভারতের পূর্বাঞ্চলের এই ধরণের মুসলমানদের পাকপ্রীতিও স্বার্থজাত। এরা ভাবে, কাল যদি ভারতে কমুনাল রায়ট বাঁধে তবে আমরা যাবো কোথায়? পূব বাঙলাই তো হাতের কাছে। সে-দেশটা যদি লীগের পন্থা অবলম্বন করে স্বাধীন হয়ে যায়, তবে তারা ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তখন আমরা মুসলমান বলে তো কোনো আদর, প্রেফারেন্স্‌ পাবো না। বেহারী মুসলমানরা আরো জানে, বাঙালী মুসলমান ভিতরের বাইরের দুদল বেহারীকেই ধীরে ধীরে প্যাঁদাবে।

ইয়োহিয়া এজেন্ট যোগাড় করতে চায় এই পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা বিরোধী, অতএব পশ্চিম পাকপ্রেমী দল থেকে। এবং সব চেয়ে বেশী চায় কলকাতায়। কলকাতাবাসীর পয়সা আছে, তাদের পক্ষে পূব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করা খুবই স্বাভাবিক। তাদের বিস্তর হিন্দু ইনটেলেকচুয়েল

সর্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম মনেপ্রাণে সমর্থন করে। এই পশ্চিম বাঙালী সাহায্য করবেই করবে অন্তত ভাষা বাবদে তার বেরাদর পূব বাঙালীকে। বেতার যন্ত্রটা তার প্রধান অস্ত্র।

অতএব কলকাতায় একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতেই হবে। এবং সেটা আখেরে সাম্প্রদায়িক রূপ নেবেই নেবে। অবশ্য চেষ্টাটা দিতে হবে তাবৎ ভারতে আগুন জ্বালাতে।"

খান বললে, "কলকাতায় এসেছেন ঐ মন্ত্রধারী একটা আস্ত ঘুঘু। তার কথা তোমাকে বলি নি। নাম লারী—"

কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই হাজী "হায় হায়" করছে আর মাথা থাবড়াচ্ছে। শেষটায় বললে, "ওকে আমি চিনি নে? ব্যাটা কুমিল্লাতে এলে সুধা পান করে কেণ্টনমেণ্টে। আর আমার বাড়িতে। কিন্তু বেরাদর, ওকে আমি হাড়ে হদ্দে চিনি। ব্যাটার কাছে পাকিস্তান হিন্দুস্তান মুসলমান কেরেস্থান সব বরাবর। মাত্র দুটি জিনিসের তরে সে স—ব করতে পারে। তার আপন স্বার্থের তরে। তার খাঁই প্রচণ্ড। মাতৃগর্ভে তার দাঁত ছিল না কেন, জানেন কীর্তিবাবু? মায়ের নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলত যে! সে চেনে দুটো জিনিস—একটাও বলা যেতে পারে—রূপচাঁদ ঠাকুর—টাকা, টাকা; ঐ দিয়ে মদ আর —থাকুগে। আপনি তো, কীর্তিবাবু, গোঁড়া হিন্দু নন। ওকে ছুঁইয়ে দিন কিঞ্চিৎ। টিকে গজিয়ে নামাবলী পরে—না, বরঞ্চ তান্ত্রিক পন্থাই বেটা বেছে নেবে। ওর কথা অন্য মোকায় সবিস্তর বলবে।"

শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি জানি, ম্যাডাম, আমি জানি আপনার ডানার নিচে আমার বউ বাচ্চা পাবে সর্বোত্তম প্রটেকশন। কিন্তু অপরাধ নেবেন না, দেবী, রায়টের সময় খুনখারাবী করে এ-পাড়ার গুণ্ডা ও-পাড়ায় গিয়ে এবং ভাইস ভার্সা। এক দল অন্য দলকে লেটেস্ট খবর দেয়, কার বাড়িতে সোনা দানা রুক্কা টাকা পাওয়া যাবে, কোন ব্যাচেলরের বাড়িতে পাওয়া যাবে না কিছুই। আমি রায়ট দেখেছি, ঢাকা কলকাতা দুই শহরেই।

কিন্তু মুসলমান পুষেছেন এ কথাটা প্রকাশ পাবেই পাবে, এবং তখন হামলা হবেই হবে।

আপনার বাড়ি এমনিতে লুঠ হবে না। দারওয়ানের বন্দুক আছে, বরঞ্চ তার চেয়ে বেশী বন্দুক চালাবেন আপনি, জানি, বিলক্ষণ জানি। ফরাসীদের কাছ থেকে শুধু একাডেমিক মিলিটারি স্ট্রাটেজি শিখেছেন আর ওরা আপনাকে আত্মরক্ষার্থে যেটুকু প্রয়োজন—বলতে কি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী—বন্দুক পিস্তল চালাতে শেখায় নি সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আপনার ভিতর দক্ষতা আছে, নৈপুণ্য আছে। সেটা লক্ষ্য করার পরও? প্রকৃত হুনুরি, সত্যকার আর্টিস্ট—তা তার আর্ট বন্দুক চালানোই হোক, আর ছবি আঁকাই

হোক—সে উপযুক্ত পাত্র পেলে তার ভিতর আপন হুনুর, সাধনালব্ধ সম্পদ রাখবেই রাখবে। ম্যাডাম যদি বলতেন যে ফরাসী 'আপাশ' সম্প্রদায়ের গুণীন পকেটমারদের সঙ্গে কাটিয়েছেন তা হলে—কার নামে কিরে কাটবো? —আপনারই সুন্দর নামে কাটি—বিচক্ষণ ব্যক্তির যা সর্বথা করা উচিত, আমি তাই করলুম—গলা কাট্যা ফেলাইলেও মনিব্যাগটা এখানে আনতুম না।

সিরিয়াসলি বলছি, কলকাতাতে দাঙ্গা লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সে অবস্থায় গোটাকয়েক মুসলমানের জিম্মেদারী আপনার স্কন্ধে চাপাই কোন্ বিবেকহীন বুদ্ধিতে?"

শিপ্রা বললে, "এ আপনার আদিখ্যাতা। প্রত্যেক দাঙ্গায় কত মুসলমান কত হিন্দুকে বাঁচিয়েছে, কত হিন্দু কত মুসলমানের প্রাণ রক্ষা করেছে, হাজী সাহেব।"

খান বললে, "শিপ্রাদি, প্রথমেই আমার একটা নিবেদন আছে। সবাই আমাকে হাজী বলে ডাকে, ব্যঙ্গ করে। একে তো হজ করি নি, অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান বাবদেও আমি গাফিল। প্রতিবারে আমাকে হাজী নামে ডেকে হয়তো ওঁদের ঐ ব্যঙ্গ করার পিছনে আছে তাঁদের সদিচ্ছা, আমি যেন ধর্মপথে চলি। অবশ্য, আল্লার ডাক শুনতে পেলে আমি কে, আমার ঘাড় তখন যাবে মক্কায়। কিন্তু আপনি আমাকে এ 'নামে' ডাকবেন না।"

শিপ্রা বললে, "আচ্ছা ডাকবো না। কিন্তু আমারও সদিচ্ছা হয় না, আপনি ধর্মপথে চলুন। আমার বিশ্বাস আপনার পথ ধর্মপথে গিয়ে মিশবে।"

হাজী আবেগভরে বললে, "আমেন, আমেন। তাই হোক তাই হোক।" মূল কথায় ফিরে গিয়ে হাজী বললে, "দাঙ্গার ভিতরও আল্লা তাঁর করুণা প্রকাশ করেছেন, যেমন আমার মত 'অপদার্থ' ও তাঁর দয়া পেয়েছে।"

কীর্তি: "দখুন হাজী, আমার সঙ্গে কম্পীট করতে যাবেন না। 'অপদার্থ' বলতে বোঝায় কীর্তি রায়!"

হাজী সবিনয়, "দাদা বয়েসে অজস্র হলেও এ ব্যাপারে আমি আপনার অনুজ, বিশ্বস্ত অনুগামী।······

প্রতি দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান যখন একে অন্যকে বাঁচায়—তখনই দেখি, প্রতিবার, মানুষের মনুষ্যত্ব। স্বার্থপর পলিটিসিয়ানের প্রপাগাণ্ডা উপেক্ষা করে, পথভ্রষ্ট ধর্মযাজকদের অনুশাসনে কান না দিয়ে, সশস্ত্র গুণ্ডাদের ভীতি প্রদর্শনকে তুড়ি মেরে মানুষকে তখন সত্যের পথে, আর্তজনকে রক্ষার পথে চালায় কে?—সে তার মনুষ্যত্ব। বললে পেত্যয় যাবে না কেউ, আমার মত অপদার্থ—সরি—পাষণ্ডের ভিতরও খুব সম্ভব ঐ ধাতুটির একটি ক্ষুদ্রতম কণার ক্ষীণতম ছায়া অতি কালে-কস্মিনে চিলিক মেরে যায়—নইলে বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনারা—দোহাই মনুষ্যত্বের—এতকাল ধরে বউ আমাকে বরদাস্ত করছে কি

করে ? হুঃ। কিন্তু ঐ নারী সম্প্রদায়ের ভিতর মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে বিস্তর পরিশ্রম করতে হয়েছে—মেহনৎ আমার সয় না।

কিন্তু, ম্যাডাম, আমার প্ল্যানটা আপনার সামনে পেশ করি।

আগরতলা বিপন্ন হলেই আমি বউ বাচ্চা নিয়ে চলে যাবো, কিছুটা মোটরে বা পুরোটাই হেঁটে চলে যাবো পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে, যার উপর দিয়ে আপনি প্লেনে উড়ে এলেন—সেখানকার পাহাড়ীদের সঙ্গে আমার বিস্তর ভাবসাব আছে। সেখানে এখনও প্রায় ফি বছর যাই শিকারে। প্রথম যৌবনে মেয়েগুলোর সঙ্গে নেচেছি, এদের তৈরী নেটিভ বিয়ার বিস্তর খেয়েছি। ইয়েহিয়ার বাপের সাধ্য নেই সেখানে নাক গলায়। আর ওরাও কারো সাতেপাঁচে নেই। এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আমার কল্পনার বাইরে।

আর আপনার নিজস্ব, আপন কলকাতা তো আমার হাতের পাঁচ—নো—পাঁচ কোটি রইলই।"

কীর্তির দিকে তাকিয়ে বললে, "কই কীর্তিবাবু এ-অধম গাইড যে-টুকু পারে সে তো দেখালো। এবারে পাকেচক্রে কলকাতায় এলে বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাবেন তো?"

কীর্তি কিছুমাত্র চিন্তা না করেই বললে, "আল্লা করুন এবার যেন বাঙালরা পাঞ্জাবীদের হাইকোর্ট দেখিয়ে দেয়।"

হাজী কার্পেটের উপর বসে পড়ে হাত দুটি উঁচু করে তুলে ধরলো। আবেগভরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "আমেন, আমেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

স্পষ্ট মনে আছে শিপ্রার, বারটা ছিল বৃহস্পতি।

যে-বেয়ারা বিকেলের চা নিয়ে এল তার চেহারা-ছবি ধরনধারণ দেখে শিপ্রার ধারণা হল লোকটা বোধহয় সিলেটি। শুধলো, "তোমার দেশ কোথায়?"

বেয়ারা বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শিপ্রার চেহারা, চালচলন, তার প্রসাধনের যে কটি কৌটো শিশি ড্রেসিং টেবিলে সাজানো ছিল সেগুলোর খাস বিলিতি ঢপ ঢং দেখে তার প্রত্যয় হয়েছিল, ইনি অতি খাঁটি মিসি বাবা, অর্থাৎ ইনি জানেন শুধু ইংরেজি, আর সে যে উর্দু-অহমিয়া-খাসিয়া-সিলেটী ভাষার লাবড়াকে হিন্দুস্তানী নামে চেনে, সেইটে বলতে পারেন চালে কাঁকরে মিলিয়ে। তাঁর মুখে আচম্বিতে "বিসর্ন্দ" বাঙলা ভাষা বেরিয়ে আসায় সে এমনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে যে তার মুখ থেকে, যেন রিফ্লেক্স

এ্যাকশনের মত, বেরিয়ে গেল খাস সিলেটী, "কিতা কইলা ?"

আদর করে শিপ্রা যে নামে ডাকে "কীতা" কখনো সে জুড়ে দেয় "মিতা," এ-ক'দিন দুশ্চিন্তার ভিতরে কবি এ-শব্দের সঙ্গে যে মিল দিয়েছেন তারই স্মরণে মনে মনে বলেছে, আমি কি "বিস্মৃতা" ?

সিলেটী রহস্যময় "কিতা" শুনে তার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

ইতিমধ্যে বেয়ারা নিজেকে সামলে নিয়ে হোটেলের "ভদ্রস্থ" হিন্দুস্তানীতে একাধিকবার বলেছে, "সিলেটী, মেমসাহেব," 'সিলট' মুল্লুক, মেম সাব্।"

"তুমি মুসলমান ? না ?"

"জরুর, জরুর। হাম্রা নাম শেখ গাব্রু, মেমসায়েব।" মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, এই মিসি বাবাটি নিশ্চয়ই 'কেরামতী' জানেন—নইলে কোন্ দূরের মুল্লুক থেকে এসেই তাকে দেখে ধরে ফেলেছেন, সে এদেশেরই লোক নয় এবং সে মুসলমান। এবারে শিপ্রা যে প্রশ্ন শুধলো তাতে তার বিস্ময় পৌঁছল চরমে। একমাত্র তার সহকর্মী দেশ-ভাইদের দু'একজন তাকে তার জিন্দাগীতে মাত্র দু' একবার শুধিয়েছে।

"এখনো কি মহরম মাস চলছে ?"

এর সঠিক নির্ভুল উত্তর শ্রৈহট্ট অর্থাৎ শ্রীহট্ট, সিলেট-সন্তান গাব্রু মিঞার দেওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য মহরমের শুক্লা দশমীতে (হিন্দু গণনায় একাদশী বা দ্বাদশী) হয়ে গেল মহরমের পরব—তাজিয়া তাবুদের প্রসেশনসহ। তার পর যে কটা দিন গেছে সেটা গুনে যোগ করলেই মহরমের ক' তারিখ, না পরের মাস সফর শুরু হয়ে গেছে ধরা পড়ে যায়। অবশ্য মিয়া গাব্রু ক'টা দিন গেছে আঙুল গুনে মোটামুটি খবরটা দিতে পারতো কিন্তু এহেন বিদ্যাধরী মিসিবাবা যিনি কিনা মহরম যে সুন্দু একটা পরব নয়, মাসও বটে, সে-হেন খাস ইসলামী খবর রাখেন তাঁকে তো উল্টো পাল্টো মাস তারিখ দেওয়া সখৎ গুণাহ্ হবে।

হন্তদন্ত হয়ে বললে, "আমাদের মোল্লাজী বেয়ারাদের ঘরে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে 'ইসলামী পঞ্জিকা' এখখুনি নিয়ে আসছি। সব খবর পাবেন।" হঠাৎ তার মনে ধোকা লাগলো : এৎনা খানদানী মিসি বাবা, ইনি বাঙলা, না হয় বাঙলা বলতে পারেন, কিন্তু পড়তে পারেন কি ? সভয়ে প্রশ্নটা শুধলো। শিপ্রা ঘাড়টি সামান্য বেঁকিয়ে মুচকি হাসলো। গোস্তকীর বিস্তর মাফ চেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো পাঁজি আনতে।

যবে থেকে শিপ্রা শিলঙ পোঁচেছে সেই থেকে কীর্তি বা খানের কোনো খবর না পেয়ে আস্তে আস্তে সে অধীর হয়ে উঠেছে। এখন শঙ্কার চৌকাঠে পা দিয়েছে। ঘরের ভিতর ভীতি, বিভীষিকা।

সব কটা খবরের কাগজ লাইন্-বাই-লাইন্ পড়েছে। সেগুলো এমনি

বিস্ফোরক উত্তেজনায় ভরা যে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়—পাছে না একটু-খানি খোঁচা খেলেই বোমার মত ফেটে ওঠে। ওদিকে বিটউইন দি লাইন্‌স্‌ পড়ে শিপ্রা ঠিক বুঝে ফেলে, অন্তত আগরতলা থেকে পাঠানো সংবাদ হয় অতিরঞ্জিত, নয় মৌনগুঞ্জিত। হাজী, মিঞা সাহেব—

মিঞা সাহেবের নাম মনে আসতেই সে যেন তাঁর শেষ কথা কটি আবার শুনতে পেল। ডিনার শেষে, গভীর রাত্রে, খাস করে তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় একমাত্র তাকেই বলেছিলেন, যেন তাকে খানিকটে আশ্বস্ত করার জন্য, কিংবা পরিস্থিতির যে ছবিটা তর্কাতর্কি, লেটেস্ট সংবাদের অদলবদলের রং দিয়ে নিমন্ত্রিতেরা এঁকেছিলেন সেটাতে একটা অংশ ফাঁকা রয়ে গিয়েছে—সেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ তত্ত্বটির দিকে শিপ্রার নিছক দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য : পবিত্র মহরম মাসে কি কট্টর শীয়া ইয়েহিয়া খুন-খারাবী আরম্ভ করবে ?

সেই গম্ভীর ইঙ্গিত ভরা প্রশ্নরূপে প্রকাশিত তত্ত্ব কথাটি শিপ্রার মনে আসতেই শিপ্রা কেমন যেন এক রকমের অকারণ অস্বস্তি অনুভব করেছিল। কিন্তু সেটা নির্ভর করছে, এখনো মহরমের মাস চলছে কি ? তাই চোখের সামনে যে পড়েছে তাকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছে।

হায় রে প্রখরা বুদ্ধিমতী রমণী শিপ্রা ? তুমি সমস্ত প্রাণমন দিয়ে কামনা করছো, যে গ্রহনক্ষত্র বিশেষ করে শশীকলা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অলঙ্ঘ্য নিয়মে যে বেগে চলেছে, পূর্ণিমা অমাবস্যা এসেছে গিয়েছে, এদের গতিবেগ যেন অকস্মাৎ মন্থর হয়ে যায়, এই মহরম মাসটা যেন বিলম্বিত হতে বিলম্বিততর হয়ে, ২৯।৩০ দিনের পরিবর্তে ২৯।৩০ মাস ধরে চলে। শুধু তার প্রিয়, তার বল্লভ কীর্তির চতুর্দিকে দাবানলের প্রজ্বলন নিরুদ্ধ করার জন্য। তার ফলে কার কীই বা ক্ষতি হত ? স্বয়ং যে রাজার রাজা মহারাজার কনিষ্ঠা-ইঙ্গিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে তাঁরই বা কী ক্ষতি হত ? তাই তো। হঠাৎ তার মনে এলো একটি গীত। তারই এক বাল্যসখা উভয়ের কৈশোরে এ-গীতটি তাকে উপহার দিয়েছিল। কবিতাটি শিপ্রা ছাপাতে কখনো দেখে নি, কারণ 'কবি' ও বাংলা সাহিত্যে কণা মাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। বাইবেলে বর্ণিত কিশোরী তার বল্লভের সন্ধানে যে-রকম দোরে দোরে ঘা দিয়ে নিরাশ হয়েছিল, এ গীতি যে-কাগজে লেখা সেও বহু সম্পাদকের টেবিলের উপর ফ্যানের হাওয়াতে কাঁপতে কাঁপতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় নি। এমন কি তার প্রিয়া কালী পেঁচির দৃষ্টিও না।

মহরম দীর্ঘতর হলে সৃষ্টিকর্তার কীই বা হত ক্ষতি। গানটার মোতিফ ছিল একই :

> কী বা হ'ত তোমার, রাজা,
> একটু মোরে দিলে ?

কীই বা ক্ষতি হ'ত কাহার
বিরাট এ নিখিলে ?
তোমার বিশ্ব বসুন্ধরা
অনন্ত বৈভবে ভরা ;
কণাটুকু যেত না তো
করুণা বর্ষিলে !

চন্দ্র সূর্য গ্রহে গ্রহে
সাজাও আলিম্পন
তারায় তারায় বাঁধো, তুমি
অলখ আলিঙ্গন ।
তোমার এ যে পূর্ণ ছবি
মিথ্যা হ'ত এর কি সব-ই
প্রিয়ার চোখে আমার চোখে
যদি যেত মিলে ।

শিপ্রার মনে আছে, কবিতা বা কবি কারোরই চোখের সামনে সেই ধুমসীর চোখ মেলে নি। অথচ আখেরে এ লক্ষ্মীছাড়িটা বিধির বিধানে পেয়েছিল কলাগাছ যে-রকম কার্তিককে পায়। এবং সে ছোঁড়া ছিল কুবের কুলের পিদ্দিম! বিধির অধর্ম কি কোনোদিন বিধির বিধি কোনো সর্বেশ্বর বিচার করবেন না ? প্রলয় শেষে কিয়ামতের দিনে ?

যখন কবিতাটি শিপ্রা প্রথমে পড়ে তখন মনে হয়েছিল এটা ইণ্টার ক্লাস। তবু এক একটা নিতান্ত বাজে সুর যে রকম মানুষের পিছনে অষ্টপ্রহর লেগে থাকে, তাকে 'হনটু' করে এটাও করেছিল তাই। সেই মেয়েটা এবং এক ঝাঁক সম্পাদকের এই 'কাব্যের উপেক্ষিতা'কে আজ শিপ্রা—কবিগুরু যে-রকম ঊর্মিলাকে তাঁর করুণাধারা দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন—সেই রকমই কবিতাটিকে তার হৃদয়-আসনে বসালো।

হঠাৎ ঐ অনবদ্য প্রবন্ধটির আরেকটি অংশ স্মরণে আসতে তার সর্বচৈতন্য বিকল হয়ে গেল। অবশ্য শুধু ভাবার্থটুকু। শব্দে শব্দে আছে ঃ

"সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকচোন্মুখ হৃদয়-মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভ সময় সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণ···বনে গমন করিলেন !"

কিছুতেই মনে আনতে পারলো না শিপ্রা, "আর্যপুত্র" ঊর্মিলাবিলাসী বনগমনের পূর্বে কয়দিন নববধূ নির্জনে সঙ্গোপনে একান্ত আপন ভাবে আর্য-পুত্রকে কণ্ঠাশ্লেষে আবদ্ধ রাখার অবসর পেয়েছিল ? সে তুলনায় শিপ্রা

কাঁদনের তরে কীর্তিকে? আর এখন সে কোথায়, কোন্ অবস্থায়।

চিন্তাধারা শিলাখণ্ডে বাধা পেল। ভালোই হল। জানলা দিয়ে দেখতে পেল, ঝঞ্ঝা-তাড়িত মেঘদূতের ন্যায় পবনবেগে আসছে গাব্রু শেখ। হাতে ঢাউস একখানা কেতাব, মুখে বিস্তৃত হাসি।

সাইজে এক্কেবারে যেন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। ভিতরে ওরই মত ফুলকপি মূলোর বিজ্ঞাপন, এবং মুসলমান ধর্মের আচার অনুষ্ঠান, পালপরবের সবিস্তর বর্ণন। তার বিস্তর শব্দ তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং কুটেশনগুলো যে কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া সে সম্বন্ধে তার সামান্যতম ধারণা নেই। এই বিরাট দণ্ডকারণ্যে কোথায় মহরমের সন্ধান? হঠাৎ লক্ষ্য করলো পঞ্জিকার এক্কেবারে শেষপ্রান্তে ময়ূর পালকের বুক মার্ক সামান্য একটুখানি বেরিয়ে আছে। সেখানে কেতাব খুলতেই চোখে পড়ল আধপাতা জুড়ে বাংলা, মুসলমানি, শক, ইংরিজি, বিক্রম বহু অব্দের তারিখ গয়রহ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ২৫শে মার্চ, এখনো মহরম, থ্যাঙ্ক গড্।

মহরম মাসে শীয়া ইয়েহিয়া খুন-খারাবী করতে ইতস্তত করতে পারে। সেই নিছক চোরাবালির অনুমানের উপর, দ্যাখ তো না দ্যাখ, শিপ্রা গড়ে তুললো, ইয়াব্বড়া পর্বতপ্রমাণ দেউল—কোণারকের মন্দির। যে খায় চিনি তারে যোগায় চিন্তামণি। সে চিনির তলায় ফাটা সানকি আছে, না মিং বংশীয় সর্বোৎকৃষ্ট পর্সেলিন—কোন্ মূর্খ করে তার বিচার?

বেয়ারা এতক্ষণে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে। শিলঙ শহরে বারো আনা লোকের মুখ চিন্তাকুল। এদের সকলেরই কেউ-না কেউ আছে—সিলেট, কুমিল্লাদিতে। এই সর্বব্যাপী দুশ্চিন্তা উপস্থিত অন্য কোন দুর্ভাবনাকে আমল দিচ্ছে না। মেমসায়েবের মুখে দুশ্চিন্তার আভাস সুস্পষ্ট। রেসেপশনিস্টের কাছে শুনেছে তিনি ডাক, তারের জন্য ব্যাকুল। অতএব তারই মত অবশ্যই মেমসায়েবের কেউ না কেউ পূব পাকে আছে। আপন অজানতেই যেন মুখ থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, "মেমসায়েব, আপনার খোশ্-কুটুম কি কেউ পাকিস্তানে আছে।" সঙ্গে সঙ্গে তড়িঘড়ি বার বার আপন বে-আদবীর জন্য মাফ চাইলে। শিপ্রা তার দিকে সোজা তাকিয়ে বললে, "এতে মাফ চাইবার কি আছে! তোমার দিলে দরদ আছে। তাই শুধিয়েছ।"

গাব্রু মিঞা কি করে শিপ্রাকে চিনবে? সে বেচারী চেনে দুই জাতের মেমসায়েব। চা-বাগানের ইংরেজের স্ত্রী মেমসায়েব এবং তাঁদের অনুকরণে গড়া দিশী মেমসায়েব। এ-দু'জাত দূরে থাক সে কোনো জাতেরই মেমসায়েব, গিন্নীমা, বেগম সায়েব কিছুই নয়। বিধাতা তাকে কোন্ কোন্ ধাতু দিয়ে নির্মাণ করেছেন, পঞ্চভূতের মশলা মেশাবার সময় যে-তৃতীয়টি—তেজ—প্রচুর পরিমাণে ঢেলেছেন—সে বিষয়ে অবশ্য কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই,

সর্বোপরি তার স্বাধ্যায়, একাধিক। সমাজ দেশের সঙ্গে তার কুণ্ঠাহীন হৃদ্যতা, তার বিচিত্র বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতা তার জীবনদর্শন—এসব মিলিয়ে যে শিপ্রা, তাকে বিশ্লেষণ করবে কে? যার নির্মাণ, যার জীবন শিপ্রার চেয়েও বিচিত্র বৈভবে ভরা সে-ই তো? সে কোথায়? তবে কি না, ভালোবাসার সোনার কাঠির পরশ যার প্রাণে লেগেছে সে হয়তো পারে। কীর্তি হয়তো একদিন পারবে।

শিপ্রা বললে, "আমার দুই আপনজন আগরতলায়।"

এর উত্তরে গাব্রু যে মন্তব্য করেছিল তার জন্য সে মনে মনে নিজের গাল দুটোকে অকাতরে চড় মেরেছে। মোল্লাজীর কাছে কাঁদো কাঁদো হয়ে সে-কাহিনী যখন শোনালো তখন তিনি মনে মনে না—সশব্দে তার দু'গালে দুটো চড় কষিয়েছিলেন। এক সারি কটু শব্দ বলে গিয়েছিলেন অল্পশিক্ষিত মোল্লাজী তাঁর গুরুর কাছে যেগুলো শুনেছিলেন—আরবী ফারসী উর্দু, সিলেটী ভাষা উপভাষায়, "আহম্মক, নাদান, উল্লুকে পাট্ঠা" থেকে সিলেটী "আচাভুয়া হুমাভুতা" পর্যন্ত।

গাব্রু সরাসরি অজানতে বলে ফেলেছিল, "আখাউড়া আগরতলা তো বরাবর।"

বলতে না বলতেই সে বুঝতে পেরেছিল, কী সর্বনেশে কথা কটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। রাখালের মাসী যে-রকম বুঝেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছে, মিসি বাবার মুখ যেন মলিন হয়ে গেল।

গাব্রু প্রথমটায় ছুট লাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু থেমে গেল। একখানা আধা সেলাম অসমাপ্ত রেখে ধীরে ধীরে কোয়ার্টারে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত্রে খাবার নিয়ে এলো অন্য বেয়ারা। শিপ্রা শুধলো, "সে-বেয়ারার কি হল? আমি জানতে চেয়েছিলুম, সিলেটের খবর ঠিকমত পায় কি না, তার পরিবার—"

এ-বেয়ারা বৃদ্ধ, বহুদর্শী, নানান্ গেস্টের বহু উনুনে পোড় খেয়ে খেয়ে সে ঝামা হয়ে গিয়েছে। সে পর্যন্ত কুল্লে কায়দাকানুন ভুলে গিয়ে দু'হাত দিয়ে হঠাৎ চোখ মুখ ঢেকে ফেলল।

শিপ্রার প্রশ্নটা অসমাপ্তই রয়ে গেল। "কি হল—" বলতে গিয়ে থেমে গেল। বুড়ো নিঃশব্দে কাঁদছে—তার দু'হাতের কাঁপন থেকে বোঝা যাচ্ছে।

বুড়োকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিয়ে শিপ্রা বলল, "যাও তো মিঞা, মুখ ধুয়ে আসবার সময় মাস্টার্ড নিয়ে এসো।"

মাস্টার্ডের কোনো প্রয়োজন ছিল না শিপ্রার। তার মাথার ভিতর এক সঙ্গে বহু চিন্তা লড়ালড়ি করছে। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরই সে কিছুটা শান্ত হয়ে কিছুটা মনস্থির করে ফেলেছে।

বুড়ো ফিরে এল।

শিপ্রা শুধলো, "মিঞা তুমি নামাজ পড়ো ?"

"জী মেমসায়েব।"

"রোজা রাখো।"

"জী, হাঁ।"

"আচ্ছা তবে শোনো। এ-সব তো করো আল্লার হুকুমে ? না ? আমি বুঝতে পেরেছি তুমিও সিলেটী,—তোমার বাল্-বাচ্চাও সেখানে ? না ?"

বুড়ো ঘাড় নাড়লো।

"তাহলে এবারে ভালো করে শোনো। সমস্ত জীবন ধরে নামাজ রোজা সব করলে আল্লার হুকুমে। তাঁর উপর নিশ্চয়ই তোমার ভরসা ছিল, নইলে হুকুম মানলে কেন ? তুমি আমার বাপের বয়েসী। অবশ্যই তোমার মাথার উপর দিয়ে বহুৎ ঝড় তুফান গিয়েছে। তাঁরই উপর ভরসা রেখে এ-সব বিপদ-আপদ কাটিয়েছ। এখন এই শেষ বয়সে সে ভরসা কম-জোর হয়ে গেল ? তুমি ভেঙে পড়লে ঐ অল্প-বয়সী বেয়ারাটাকে হিম্মৎ যোগাবে কে ? উপরে মালিক সব দেখছেন।

"আমার হাল তবে এবারে শোনো। আমি এখানে একা। তোমাদের তিনজন, ম্যানেজার-ট্যানেজার—ওরা কাজের লোক, আপন কাজ নিয়ে থাকেন। ব্যস্। আমি মেয়েছেলে। আমার এক দোস্ত, আরেকজন—তাকে আমি মহব্বত করি—দুজনা আটকা পড়েছে আগরতলায় ! হয়তো বা বেরিয়ে আসতে পারবে, হয়তো বা পারবে না। আমার বাপ নেই, ভাই নেই। এবারে যাও, মিয়া, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আর ঐ আহাম্মুখ ছোকরাটাকে বলো, সক্কলেরই দিল এখন কাতর। সে কি বলেছে, না বলেছে তাতে কি যায় আসে ? ভাবনা বাড়বে ? কমবে ? তার কথায় ? এখন যাও।"

এই যে আল্লার নাম নিয়ে শিপ্রা বুড়োকে শান্ত করলো, সে নিজে কি ঈশ্বর মানে ?

আর বহু লোকের মত শিপ্রা ছিল ধর্ম বাবদে মোটামুটি উদাসীন। প্যারিসে টুরিসট্ গাইড তাকে সুদ্দু একপাল মার্কিনকে নিয়ে গিয়েছিল বিরাট এক গির্জা দেখাতে। গির্জা তখন ফাঁকা। শিপ্রা বেরুবার সময় গাইডকে বললে, "চমৎকার ! ফুলদানীটা অতি সুন্দর। কিন্তু ফুল কোথায় ? মানুষ উপাসনা করছে—সে-ই তো গির্জার ফুল।" তারপর সে মাঝে মাঝে গির্জায় যেত উপাসনার সময়। বিশেষ করে মমারৎর্-এ পুরো শনির রাত হৈ-হুল্লোড় করে রবির ভোরে বাড়ি ফেরার মুখে। ক্যাথলিক গির্জার অর্গেন সঙ্গীত ধ্বনি-লোকের অপূর্ব গম্ভীর যেন বিরাট সিন্ধু। হাড়-পাকা নাস্তিকও সে সঙ্গীতে অবগাহন করে। পোঁচ নাস্তিক ঐ সঙ্গীতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে গির্জাঘর এড়িয়ে চলে। শিপ্রার ভয় নেই, ভরসাও নেই।

একদা এক প্যারিসীনি তাকে শুধিয়েছিল, সে ঈশ্বর-বিশ্বাসী কি না ?

যেন শব্দগুলো বাছাই করে করে শিপ্রা বলেছিল, "ভগবান বাজারে বিক্রির রেডিমেড টমাটো কেচাপ্ নন—কিনে নিয়ে ব্যাগে পুরলেই হল। সমস্ত জীবন ধরে তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে।"

রোদন-ক্রন্দনের বিকৃত মুখ, দুশ্চিন্তার শোকে ভেঙে পড়ার বিকট ভঙ্গী শিপ্রা আগেও দেখেছে। কিন্তু আজকের মত নয়।

কীর্তির সর্বাঙ্গ কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্লোকের আকস্মিক পরিবর্তন শিপ্রার কাছে এক মুহূর্তে সরল স্বচ্ছ হয়ে গেল—নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে-রকম আগের দিনের কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান পেয়ে যায়।

শিপ্রা কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কটেজ ছেড়ে সুস্থ গতিতে হোটেলের মেন বিল্ডিঙে গিয়ে দাঁড়ালো রেসেপশনিস্টের মুখোমুখি হয়ে। স্মিত হাস্য দিয়ে আপ্যায়িত করলে "গুড্ ঈভনিং" সহ। পুনরায় "গুড্ ঈভনিং—এয়া-এর—"

হন্তদন্ত হয়ে ছোকরা বললে, "সরি, মিস রে—আমাকে উইল্‌সন্ বলে ডাকে সবাই—জিমি উইল্‌সন্।"

ছোকরা হকচকিয়ে গিয়েছে। এতদিন দু-চারবার শিপ্রাকে যখনই দেখেছে, তখনই তার মনে হয়েছে, ইনি অন্যলোকের প্রাণী। আজ রাত এগারোটায় সেই নিরাসক্তা, গম্ভীরা এ কী রূপে দিল দরশন! তার মন বলছে, "হাও লাভলি! হাও সুইট।"

শিপ্রা সহজ সুরে শুধলো, "এনি নিউজ ?"

আসলে এতদিন সে কোনো রেসেপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে নি—পাছে কোনো অপ্রিয় গুজোব, সংবাদ, ওয়ার্নিং ওরা দিয়ে ফেলে। বিশ্বময় ঐ গোত্রের কর্মচারী অর্থাৎ রেসেপশনিস্টদের চোদ্দ আনা চ্যাটারবক্‌স্।

ছোকরা কাউণ্টারের উপর একটু ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বললে—যদিও স্থানটা জনশূন্য—"উয়েল মিস রে, বলবো কি বলবো না, বুঝতে পারছি নে। আমার এক বন্ধু আছে এখানকার ট্রাঙ্ক-কল দফতরে। ওরা অনেক কিছু শুনতে পায়। এখ্‌খুনি সে আমায় ফোন করেছিল। তারই মত আরেক ট্রাঙ্ককর্মী শুনতে পেয়েছে ইন্ডো-পাক বর্ডারের গারো না ডাউকি না যশোর কোথা থেকে কে যেন কাকে ট্রাঙ্ক-কল-এ বলেছে, আজ রাত্রেই নাকি ঢাকাতে ট্রাব্‌ল আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। তা, তা, মিস রে, সেও যে খুব শ্যোর শুনেছে তা নয়।"

গুজোব হোক্, খবর হোক্ এইটেই যদি সে ঘণ্টাটাক পূর্বে শুনতে পেত তবে আপাদমস্তক মুষড়ে পড়তো। কিন্তু এখন তার বুকের ভিতর কে যেন একখানা টিন প্লেট বসিয়ে দিয়েছে।

স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধলো, "আর যশোর, কুমিল্লা, বাদবাকী বর্ডার ?"

ছোকরা উত্তর দিলে, "আজ, এখ্‌খুনি, তো আর কিছু বলে নি।" তারপর

খানিকক্ষণ ঘাড় চুলকে বললে, "কিন্তু দিন পাঁচেক আগে বলেছিল, গোলমাল লাগলে সব জায়গায় এক সঙ্গেই লাগবে। তবে সে শ্যোর ছিল না এটোল্। এখন কে শ্যোর হয়ে কি বলতে পারে ?'

শিপ্রা হাঁটুর কাছে কেমন যেন একটা দুর্বলতা অনুভব করলো।

খানিকক্ষণ না জানি কোন্ দেবতার কৃপায় তার দুশ্চিন্তা-বর্ষার অবিরল বারিধারা সম্পূর্ণ থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তার পরের ইলশে গুঁড়ি ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়। তারই স্বচ্ছ যবনিকা যেন নেমে এল তার বুকের ভিতর।

তবু মুখে হাসির ক্ষীণ পরশ লাগিয়ে বললে, "তোমার কথা খাঁটি, উইল্সন্। সব-কথা বিশ্বাস করলে কি আর মানুষ বাঁচতে পারে ? থ্যাংক য়্যু, অল্ দি সেম। গুড্ নাইট্—" শিপ্রা মনে মনে বললে, "ছেলেটি দরদী", লক্ষ্য করলো তার বুশ শার্টের বুকের কাটে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা ক্রস্। বললে, "মাদার মেরি, তোমার মঙ্গল করুন। গুড্ নাইট্ ওল্ড্ ম্যান।"

জিমি যদিও ছোকরা বেয়ারের মত ও-রকম খুনিয়া "ফো পা" অর্থাৎ "সাপের ন্যাজ মাড়ায়" নি তবু শিপ্রার ভাব পরিবর্তন থেকে আমেজ করতে পেরেছিল সে বেসুরো কর্কশধ্বনি ছেড়ে বসেছে। এক ফো পা মেরামৎ করতে গিয়ে দুসরা কদম খাদে ফেলল না। কাউণ্টার ঘুরে শিপ্রার পাশে পাশে, কিন্তু সম্মানার্থে আধ কদম পিছনে পা ফেলে তাঁকে কটেজে পোঁছিয়ে দিতে সঙ্গে চললো। যেতে যেতে বললো, "মাদার মেরি হেভেন্ আর্থের কুইন মেরি! তাঁকে আমার স্মরণে আনি আর নাই আনি, তাঁর করুণাধারা কখনো ক্ষান্ত হবে না।"

শিপ্রা মৃদু কণ্ঠে দরদভরে বললে, "আমেন।"

সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের অনভ্যাস সত্ত্বেও, ফরাসীদেশের আর পাঁচজনের মত অজানতেই ডান হাত দিয়ে বুকের উপর ক্রস চিহ্নের প্রতীক দেখালো।

উইল্সন্ একটু লজ্জা পেল। বিধর্মী পালন করলো সেই আচার—সে যেটা সমাজে পাঁচজনের অযথা দৃষ্টি আকর্ষণ না করার জন্য আপন সমাজের বাইরে এড়িয়ে যেত। কটেজের সামনে পোঁছে বললো, "গুড নাইট, ম্যাডাম। এনি থিং এল্স্—আর কিছু ?"

এই অস্বস্তিজনক পরিস্থিতিতেও তার মনে পড়ল—প্রাচীন স্মৃতি নবীন পরিস্থিতির বিনা অনুমতিতেই উদয় হয়—প্যারিসের রেস্তোরাঁতে ওয়েটার খানা অর্ডার দফে দফে শেষ হওয়ার পর যখন জিজ্ঞেস করতো, "এনি থিং এল্স্ মাদাম" তখন তাদের মধ্যে বেপরোয়া মেয়ে বলে উঠতো, "হ্যাঁ, তোমার প্রেম !"

শিপ্রা বললে, "থ্যাংক ইউ, গুড্ নাইট, ইয়াং ম্যান্। মা মেরি তোমার মঙ্গল করুন।"

কুটিরে ঢুকে শিপ্রা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ভুলে গিয়েছে এর পর কি করতে হবে, তার পর কি, শুয়ে পড়বার আগে। মাথাটা যেন ভেকুয়াম। এবং সে বোধশক্তিও নেই। হাত মুখ ধোয়া, কাপড় ছাড়া, এসব নিত্য রাতের যান্ত্রিক রীতি—তবু—

এমন সময় কাঠের বারান্দায় দুমদাম করে পায়ের শব্দ হল। ছুটে আসছে কেউ। হঠাৎ একেবারে চুপ। আস্তে আস্তে দোরে টোকা। মৃদু কণ্ঠে "মাদাম, টেলিগ্রাম।"

তার হাত কেঁপেছিল কি না, পরে স্মরণ করতে পারে নি। শুধু এক্স্পেরিমেণ্ট করে দেখেছিল বারান্দার ক্ষীণালোকে টেলিগ্রামটা পড়া যায় কিনা। তখন কিন্তু পেরেছিল।

বেচারা জিমি ঠায় দাঁড়িয়ে।

যেই দেখল, শিপ্রার মুখে হাসি ফুটেছে, ভদ্র হোটেলের বেবাক এটিকেট ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "গুড্ নিউজ, ম্যাডাম?"

"থ্যাংকু। হ্যাঁ।" জিমির তিন লম্ফে পলায়ন।

শিলচর থেকে তার। "সাতাশ তারিখে পেঁচিচ্ছি। কীতা খান।"

চতুর্থ অধ্যায়

শিলঙকে বলা হয়, "হিল স্টেশনের রানী" রাজা কে? দার্জিলিং?

রবীন্দ্রনাথ দুটোর তুলনা করেছেন অতিশয় সংকীর্ণ পরিসরে:

"দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।"

কিন্তু দার্জিলিঙের সঙ্গে তুলনা না করে তারপর শিলঙের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তাতে শিলঙের প্রায় কোনো মাধুরিমাই বাদ পড়ে নি। যে পাইন বন শহরে পেঁছুবার বহু আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় সেটাই শিলঙের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। রবীন্দ্র কবিতাতে দু'দুবার তার উল্লেখ করেছেন।

খুব ভোরেই শিপ্রার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু এই পাইন বনের অকল্যাণে—বিশেষ করে যেখানে বনটা নিবিড় ঘন—কবি বর্ণিত:

"এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়" সেই চন্দ্রোদয়, সূর্যোদয় শিলঙের বহু জায়গা থেকেই দেখা যায় না। তাই শিপ্রার চোখে পড়েছে, অনেকক্ষণ ধরে ঘন পাইন বনের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে গলে আসা প্রদোষের আধা আলোর কেমন যেন সবুজ সবুজ ভেজা ভেজা রেশের পরশ। কিন্তু কানে আসছিল যে—

বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে।

তারই ক্ষীণ ঝির ঝির মধুর, যেন কচিৎ জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলী। শিপ্রা কিন্তু পূর্ণ জাগরিত। নিত্য উষায় তার সদভ্যাস—প্রথম আলোর চরণধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথম পদক্ষেপ করে শয্যা থেকে ভূমিতে—কলকাতায় শেষের দু ভোরে করেছে পাদপীঠ 'পরে। কীর্তি সোনালী নীলের গালায় আঁকা, ঢেউ খেলানো পা-ওলা বর্মা দেশের একটি পাদপীঠ তার অজানতে একদিন চুপিসাড়ে রেখে গেছে।

বেদনার উত্তেজনাতে মানুষ তবু কিছুটা কাজকর্ম করতে পারে, কিন্তু নির্ভাবনার প্রশান্তি আনে অবসাদ।

ছোট্ট জানলাটির শার্সির ভিতর দিয়ে সে তাকিয়ে আছে মাঝারি পাইনের শীর্ষ পল্লবের মৃদু আন্দোলনের দিকে, আর হেথা হোথা টুকরো টুকরো নীলাকাশের পানে। ততখানি উপরে উঠতে দেবতার ঢের সময় লাগে। টিলার সানুদেশ পাইন পাতার ছুঁচে আবরিত। এখানে ওখানে সূর্যরশ্মির গোষ্পদ। চিকচিক করে তার পিচ্ছিলতা। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে কেমন যেন একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব—মনটাকে প্রফুল্ল করে তোলে না।...একটি খাসিয়া মেয়ে পিছলে পাইন পাতার উপর পা টিপে টিপে সন্তর্পণে পাহাড় চড়ছে। মাঝে মাঝে পিছন পানে তাকাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে ওদিকে? ওখানে কাঠ কাটতে দেয় না। একটা ছোকরা এসে নিচের রাস্তা থেকে ডাকলে ওকে। মেয়েটা কিছু উত্তর না দিয়ে সন্তর্পণতা বর্জন করে লাফিয়ে লাফিয়ে চললো উপরের দিকে। কীই বা করে ছোঁড়াটা। সেও ছুটলো পিছনে। দুজনাই অদৃশ্য। অনেকক্ষণ পর নেমে এল দুজনা, হাত ধরাধরি করে, কিন্তু রাস্তায় নেমে একে অন্যের হাত ছেড়ে দিল। শিপ্রার মনে হল এদের রস আছে—নইলে এত সকালে লুকোচুরি খেলা!

বেয়ারা ভোরের চা নিয়ে এল। শিপ্রা বিছানা থেকেই বললে, বাইরের ঘরে রেখে যাও। সে সুসংবাদ পেয়েছে, ওকে মুখ দেখায় কি করে। কবির "বিনু" ছিল কমবয়সী—তার চিত্তে উদয় হয়েছিল ভাব, বিশ্বসংসারের দুঃখ না ঘোচাতে পারলে তার সেই হঠাৎ-পাওয়া আপন আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না। শিপ্রার সে-সাধ হওয়ার কথা নয়, তবু চেনা জনের দুশ্চিন্তা, তার সামনে বেরোয় কোন্ মুখে।

আবার দুম্‌দাম্ শব্দের সঙ্গে নিস্তব্ধতা, টোকা, "কাম্ ইন্।"

তিনবার "গুড্ মর্নিং" বলার পর উত্তেজনায় ফেটে চৌচির জিমি একরাশ খবর দিলে। সেগুলো সংগ্রহ করেছে, কিছুটা বেতার থেকে, কিছু ট্রাঙ্ক-তারের বন্ধুর কাছ থেকে, কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সবজান্তাদের ফোন করে, ফোন পেয়ে।

সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান সংবাদ। ঢাকায় কাল রাত থেকে লেগে গেছে ধুন্ধুমার। অন্য কোন্ কোন্ জায়গায় সে-খবর সঠিক কেউ বলতে পারে নি, তবে খুব সম্ভব সব ক্যানটনমেণ্ট টাউনে। জোর দিয়ে বার বার বললে, "শিলচর ইজ সেফ্—পাকা খবর।"

"কি করে শ্যোর হলে জিমি?"

"গুড লর্ড! আমি আমার ট্রাঙ্ক-বন্ধুদের অতিষ্ঠ করে তুলি নি, সেই ভোরবেলা থেকে, শিলচরের খবর জানাতে?" মুচকী হেসে বললে, "ওরা হয়তো ভেবেছে আমার ফিয়াঁসে বুঝি শিলচরে।"

"আরেকটা ইমপর্টেণ্ট খবর, মাই লেডি, পাক্ আর্মি ইণ্ডিয়ান এলাকায় ঢুকবে না—এইটেই ৯৯% রিপোর্টার স্বামীনাথন তো বললে, সে তার লাস্ট শার্ট বেট্ করতে রাজী আছে? অতএব শিলচর ভেরী সেফ।"

"সিলেটের খবর?"

গলা নামিয়ে বললে, "ভালো নয়, মন্দও নয়। তবে স্বামীনাথন জোর গলায় বললে, সে নিজে জানে সিলেটে পাঞ্জাবী পাঠান সেপাই অতি অল্প—নেগলিজেবল!"

শিপ্রা একটু চিন্তা করে বললে, "দ্যাট্স্ ইট। বলো তো, জিমি, এখানকার সব চেয়ে সরেস রেডিয়ো-ডিলার কে?"

"গুডনেস মী! সে তো আমার ইয়ার বরুয়া। নাইস চ্যাপ। কিন্তু ম্যাডাম আপনি টাকা দেবেন না। শুধু দামটা জিজ্ঞেস করবেন। তারপর দেখি তার দৌড় কদ্দুর।"

"টাকা না দিলে—"

"দেবে না? মানে? হেভেনস্। ন'টার সময় দোকান খোলে যাকে বলে কারেক্ট টু দি গান।"

"কি দরকার দর-কষাকষি করে?"

"প্লীজ, ম্যাডাম। আমাকে অন্তত একটা চান্স্ দিন। আপনি এখন খুশী। লেট মী বী হ্যাপি ওলসো।"

শিপ্রা এখন গুজোব, খবর, ব্লাফ্, প্রপাগাণ্ডা, সব শুনতেই রাজী।

কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় বরুয়ার দোকানে গেল ট্যাক্সি করে। সর্দারজী ঢাকা, কুমিল্লার যে-সব রোমাঞ্চকর গুল্-ই-বাকওলির কেচ্ছা শোনালে তার কাছে জিমির রিপোর্ট সরকারী এশতেহারের মত পানসে, বলে অনেক মীন করে নাথিং, যেন হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধা। কোনো প্রকারের ওসকানি শিপ্রাকে দিতে হয় নি। সেদিন ডিকটেটর ইয়েহিয়ার কাহিনীই সকল কাহিনীর ডিকটেটর। এমন কি পুচকে ডিকটেটর ইয়েহিয়ার তুলনায় দানবকার বড়া ডিকটেটর হিটলারের অতর্কিত রুশ আক্রমণের খবর তাঁর দুশমন চার্চিল

রুজভেল্ট দুজনাই জানতেন ও স্তালিনকে মাসখানেক পূর্বে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মুসসোলীনির অতর্কিততর গ্রীস আক্রমণের পূর্বাভাস হিটলার পান নি। আমাদের পুচকে ডিকটেটর "হেইয়া সাব" কিন্তু কুল্লে ডিকটেটরকে এ-বাবদে ঘোল খাওয়ালেন। শেখের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা দিনের পর দিন তিনি যখন চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন পশ্চিম পাক থেকে তিনি আনাচ্ছেন টর্নাডো বেগে হাজার হাজার পাঠান-পাঞ্জাবী সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন। ২৫শে মার্চের দুপুর রাত পর্যন্ত ঢাকার অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করতো, ইয়েহিয়া মুজীবের মধ্যে একটা ফয়সালা হয়ে গিয়েছে। সদুর (শব্দার্থে "চক্রবর্তী") ইয়েহিয়া দু'একদিনের মধ্যেই ফৈসালার বিবরণ প্রকাশ করবেন। ২৬ মার্চ সকালে ইয়েহিয়া ভুট্টো মুজীবের সম্মিলিত হওয়ার পাক্কা এপয়েন্টমেণ্ট। ২৫ মার্চ বিকেল পাঁচটায় ইয়েহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন মুজীব এমন কি তাঁর বামহস্ত ভুট্টোকে পর্যন্ত কোনো খবর না দিয়ে। সেদিন সে-খবর জানতে পারলো অতি অল্প লোকই। খুদ ঢাকা শহরেও। আর্মি অফিসার ইয়েহিয়া তাবৎ সিভিলিয়ান ডিকটেটরদের শিখিয়ে দিলে একটি নবীন তত্ত্ব। আর্মি ডিসিপ্লিনে যে-কোনো প্ল্যান গোপন রাখা অফিসারদের "ধর্ম"—সিভিলিয়ানের পক্ষে সেটা অস্ত্রমাত্র।

শিলঙ জানতে পেরেছে ২৬ সকালে ধুন্ধুমারের খবর। যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই ঢাকার রণাঙ্গন থেকে জঙ্গী লাটের পলায়ন—যথা, দুর্যোধনের হৃদয়ে সাহস দেবার জন্য না বাজিয়ে পিতামহ ভীষ্ম যদি চুপিসাড়ে পুষ্পক প্লেনে পলায়ন করতেন, তোবা! তোবা! শুনলেও পাপ হয়—এ-খবর হয় তো লাগে তাক না হয় তুক্কা রূপে কোনো কোনো ফলিত জ্যোতিষী অনুমান করেছিলেন মাত্র। ড্রাইভার সর্দারজী হয়তো পূর্বজন্মে জ্যোতিষী ছিল।

শিপ্রার স্মরণে এসেছে, আগরতলায় মিঞা সাহেবের কথা।

তাহলে শীয়া ইয়েহিয়া শেষ পর্যন্ত মহররমের পবিত্রতা বিনষ্ট করে ঐ মাসেই নরহত্যায় লিপ্ত হল।

"ইসলামী পঞ্জিকা"-খানাতে শিপ্রা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছিল বটে, কিন্তু ঠিক যে স্থলে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, মুসলমানী হিসেবে দিবস আরম্ভ হয় সন্ধ্যা থেকে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে, সে অবধি পেঁছয় নি। ২৫ মার্চ দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বিশ্ব মুসলিমের "স্যাবাৎ" পবিত্র জুম্মাবার, শুক্রবার। কট্টর শীয়া আরম্ভ করলেন তাঁর নরহত্যা শীয়া সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের পবিত্র জুম্মাবার রাত এগারোটায়, সুন্নীর কাছে পবিত্র, শীয়ার কাছে পবিত্রতম মুহরম মাসে!

শিপ্রা দোকানে ঢুকে বেছে নিল সবচেয়ে ভালো বেতারযন্ত্র—পরের মুখে ঝাল না খেয়ে সে স্বকর্ণে শুনতে চাইল ঢাকা, কলকাতা, পিণ্ডি, বিবিসি এবং জোরদার বিদেশী স্টেশনগুলো। দাম শুনে শুধলো সর্বোত্তম এরিয়ালের

সরঞ্জাম বরুয়ার লোক হোটেলে ফিট করে দিয়ে আসতে পারবে কি না, তার চাই আজই, এখখুনি। বলতে না বলতে জিমি এসে উপস্থিত। মাদামকে আরেক দফা সুপ্রভাত জানিয়ে তাঁকে বললে, "আপনার সেট পছন্দ হয়েছে? গুড্। এবারে আপনি সেটটি সঙ্গে নিয়ে যান, আর এই লাগিয়ে দিচ্ছি ঘণ্টা দুয়েকের তরে মোস্ট টেম্পরারি একটা এরিয়েলের তার। তারের অন্য প্রান্তটা কোনো একটা জানলা দিয়ে বাইরে ঝুলিয়ে দেবেন। দাঁড়ান, এই আমি ১৩ মিটারে লাগিয়ে দিচ্ছি নীডলটা। ডাইনে বাঁয়ে ওটাকে সামান্য নাড়লেই পেয়ে যাবেন এবিসি, আই মীন অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি না করপোরেশন কি যেন? মিনিট পনেরো পরেই পেয়ে যাবেন নিউজ বুলেটিন। ইণ্ডো-পাক খবর বিতরণে এরা প্রায়ই বিবিসিকে কানা করে দেয়। টাকা? সে আপনি আমাকে বরুয়ার নামে চেক দিয়ে দেবেন একাউণ্ট পেঈ। অবশ্য সেটা পছন্দ হলে। নইলে আজ বিকালে আমি বরুয়ার সেটটা—বেসট্ ইন্ দি ঈস্টা অব সুয়েজ, মাদাম।" বলে সেট তুলে নিয়ে চলল মাদামকে আধা বোটের মত পিছনে পিছনে টেনে।

প্যোরেস্ট অব্ দি প্যোর অহম সন্তান বড়ুয়া সমস্তক্ষণ দু'কান-ছোঁয়া মৃদু হাস্য, তৎসহযোগে ঘাড় নেড়ে নেড়ে, "অফ কোর্স্", "সার্টেনলি", "টাকার কথা কে তুলেছে?—নট মী,—বহক্, ম্যাডাম, বহক্, চেয়ারতায় বস্‌টে আজ্ঞা হোক" মৃদু কণ্ঠে বলে যাচ্ছে তো বলেই যাচ্ছে। শিপ্রা দু'একবার আপত্তি তোলবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

প্লাগে কনেকট করতে আর তার লটকাতে ক' মিনিট লাগে। নীডল একটু ছুঁতে না ছুঁতেই মেলবার্ন গাঁক্ গাঁক্ করে উঠলো, এরিয়ালের উদ্বাহু বামন বেতারের কল্যাণেই। ইতিমধ্যে দেখতে পেল এসে গেছে অহম দেশের গভীরতম অরণ্যের গগনচুম্বী বংশাবতংশদ্বয়। এ-হেন এরিয়েল দিয়ে কটকের চিঁউ চিঁউ মিঁউ মিঁউ থেকে টোকিয়োর গাঁক গাঁক শোনা যাবে পরিষ্কার—দাঁত মুখ খিঁচিয়ে স্পীকারে কান না সেঁটেও!

সমস্ত দিন কাটলো শিপ্রার এ স্টেশন ও স্টেশন শুনে শুনে।

বিশেষ করে কলকাতার ডি সি বেতার রিসেপশন এতই পীড়াদায়ক যে, সে সেখানে তাদের যন্ত্রটাকে কয়েক মাস নাড়াচাড়া করে একদম তালাক দিয়েছিল।

এখানে কী লাক্!

প্রথম সন্ধ্যাতেই, পিণ্ডি থেকে নীডল একটু সরে যেতেই শিপ্রা শুনতে পেল পরিষ্কার যদিও ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে, "ইসি পারি, ইসি পারি।" "এখানে প্যারিস এখানে প্যারিস, মেদ্‌মোয়েজেল, মেদাম—"

শিপ্রা মুহ্যমান! কত বর্ষ, কতকাল পরে সে শুনতে পেল সেই প্রাচীন যুগের নিত্যদিনের সঙ্গী "ইসি পারি, ইসি পারি।" সংবিৎ হারিয়ে—প্যারিস

দিচ্ছিল খবর—সে-কথা কইতে লাগলো প্যারিসের সঙ্গে—"উই উই—হ্যাঁ হ্যাঁ, মে সার্তেনমা—নিশ্চয় নিশ্চয়—" তারপর কি একটা অনিবার্য দুর্ঘটনার সংবাদে "মে ক্য ভুলে ভু—আহা, তার আর কি করা যায়—" ফ্রানসবাসী যে কোথাকার কোন্ এক কনফারেনসে তাদের ফরেন মিনিস্টার যাচ্ছেন না শুনে মোটেই বিচলিত হয় নি—শুনে শিপ্রা ঘাড় গর্দান শ্রাগ করে মুখ বেঁকিয়ে বললে, "জ্য মা' ফু অাঁস—আম্মো থোড়াই কেয়ার করি।"

কে যেন দরজায় নক্ করলো। শিপ্রা তখন প্যারিসে।

"আঁত্রে, সিল্ ভু প্লে—ভিতরে আসুন প্লীজ। যেই দেখলো ঢুকেছে সেই জোয়ান সিলেটী বেয়ারা, অমনি কোথায় মিলিয়ে গেল প্যারিস! একটা ফুঁতে নিভে গেল পিদিমটি। অন্ধকার॥

পঞ্চম অধ্যায়

শিপ্রা ইংরিজি, ফরাসিস, বাঙলা বুঝতে পারে ভালো, কিছুটা হিন্দী।

সকালে মেলবার্ন হতে যাত্রা আরম্ভ করে পিণ্ডি, দিল্লী হয়ে বিবিসি, দুপুরে জর্মনির কলোন, সন্ধ্যায় প্যারিস। সর্বশেষে চীন আর রাশা। ইতিমধ্যে হয়তো উটকো আজরবাইজান থেকে শুনলো ফরাসিতে কিংবা ভয়েস অব্ আমেরিকা থেকে বাংলাতে।

ফলে সব কিছু গেল ঘুলিয়ে। পরে কিছুতেই মনে পড়লো না স্বাধীন বাংলা বেতারের বাক্যস্ফূর্তি হয়েছিল কোন্ দিন, আর, ঢাকা বেতার লীগ-প্রেমীদের হাত থেকে খানরা ছিনিয়ে নিল কোন্ সময়—ছাব্বিশের সকালে। বস্তুত ঠিক সে-সময় শিপ্রা বেতার কিনতে বাজার গিয়েছে। তবে তার ভাসা-ভাসা একটা ধারণা হয়েছিল, খানদের অমানুষিক অত্যাচার এবং পাশবিক বর্বরতার সর্বপ্রথম সংবাদ দেয় এবিসি।

শেষ পর্যন্ত শিপ্রার হৃদয়ঙ্গম হল, বিস্তর স্টেশন শুনে বিশেষ কোনো লাভ হয় না। পঞ্চ পাণ্ডবের চেহারা হুবহু এক রকমের হলে দ্রৌপদী নিশ্চয়ই আপত্তি জানাতেন। এস্থলে গোটা পাঁচ—বিবিসি, মার্কিনী এবং গোটা দুত্তিন, একুনে ওকীবহাল পঞ্চ স্টেশন বিস্তর মেহন্নৎ ও দেদার পয়সা ঢেলে খবর সংগ্রহ করে; বাদবাকি কুল্লে দুনিয়ার বুড়ি বুড়ি স্টেশন এদের সঠিক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কার্বন নন বটে কিন্তু ঐ পঞ্চ পাণ্ডব প্রদত্ত সংবাদের বিভিন্ন রকমের ঘ্যাঁট বানিয়ে বিতরণ করে। শিপ্রার এত প্যারা যে "ইসি পারি" তিনি পূব বাঙলা বাবদে প্রায়শ উদাসীন কিন্তু যখন নিন্দে করতে চায় তখন বিবিসির মত পিন-পিনিয়ে শ্যাম-কুল রক্ষা না করে, দ্যায় চুটিয়ে গালাগাল এবং মাঝে মাঝে একটা

হুলো আর মেনী বেড়াল গালগল্পের মাঝখানে এমন সব বর্ডার-ছোঁয়া আদি-রসাত্মক মাল ছাড়ে যে আমাদের এক্‌স্‌-প্যারিসিনী শিপ্রা ভিন্ন—মেয়ে নয়—যে কোনো পুরুষেরই পিলে চমকে উঠতো।

"লিবের্‌তে, লিবের্‌তে তুজুর লা লিবের্‌তে।"

কোন্‌ বেতার কতখানি "লিবের্‌তে" উপভোগ করে সে প্রশ্নটা শিপ্রার মনে আবার উদয় হল। বছর কয়েক আগে সে পাক-ভারত লড়াইয়ের সময় বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে আর-সবাই শুনতে চায় বলে সেও সঙ্গ দিয়ে কয়েকবার বিবিসি শুনেছিল। এখন মাত্র দু'দিন—অবশ্য বেশ বার কয়েক—বিবিসি শুনে তার মনে হল দায়িত্ববোধ মাত্রাধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে সে ক্লীব হয়ে যাচ্ছে। আধা-ফর্সা সুন্দরীর আপন ফর্সাত্ব বাঁচানো সম্বন্ধে দায়িত্ববোধ যখন বড্ড বেশী বেড়ে যায় তখন সে যেমন রোদ্দুরে বেরুতে চায় না। চিন্তা করে শিপ্রা সিদ্ধান্ত করলো, এখন বিবিসির মূল্য নেতিবাচক। অমুক গুরুত্বপূর্ণ নিউজ-আইটেমটা পূব পাকের প্রতিবেশী বর্মা বেতার দিয়েছিল সকালবেলা, সেদিন তো নয়ই, পরের দিনও বিবিসি সেটা উল্লেখ করলো না, এমন কি বর্মার বরাত দিয়েও না। অতএব খবরটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাক বেতার যে একটাই রেকর্ড অনবরত, কিবা দিন কিবা রাত্রি, বাজিয়ে চলেছে—তার ধুয়া "তামাম পুরব বাঙালময় অখণ্ড শান্তি, অপার নিরাপত্তা।" ঐটা যে হবে সে তো নিতান্ত স্বাভাবিক। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রপাগাণ্ডা বিশারদ হের ডক্‌টর্‌ গ্যোবেল্‌স্‌ও শেষ পর্যন্ত আপন প্রপাগাণ্ডার হাড়কাঠে মুণ্ডুটি হারালেন। "বার্লিনের পতন কক্‌খনো হবে না," "বার্লিন কস্মিনকালেও পরাজিত হতে পারে না" এ জিগির তিনি শত শত বার শুনিয়েছেন বেতারে, বিশেষ বিশেষ বুলেটিনে, মার্চ ম্যুজিকের তেজীয়ান তাল-লয় সহ, বলীয়ান রণদামাদা সহযোগে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী বার্লিন নাগরিকদের —আজ যে-রকম হুবহু "পৃথিবীতে শান্তি অন্তরীক্ষে শান্তি" জিগির গাইছেন 'ছোটা' ডিকটেটর ইয়েহিয়া—বার্লিন পতনের পূর্ব মুহূর্তে সেই কাপ্তান গ্যোবেল্‌স্‌ নিমজ্জমান বার্লিন-মানওয়ারী জাহাজ থেকে খালাসী লস্করকে আপন আপন নসীবের হাতে সমর্পণ করে এক লাফে লাইফ-বোটে আশ্রয় নেবেন কি করে? সে তো অনেক দূরের কথা—ইয়েহিয়ার তরে, এখন। এখন তার জীবনপুঁথির নয়া পাতা সে উল্‌টিয়েছে মাত্র। কিংবা সে নব-বর। আতশ বাজীর ফাঁকা আতশ—আগুন নয়, উৎসব-বহ্নি দাউদাউ করে জ্বলছে, জ্বালাচ্ছে হাট-বাড়ি, মন্দির-মসজিদ। কাঁচা বাঁশের খুঁটি আগুনে তেতে উঠে যে বিকট শব্দে ফেটে উঠছে তার কাছে কোথায় লাগে পাঠানের বিয়েতে রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ?—লোকে বলে ইয়েহিয়া পাঠান, আসলে সে শীয়া দারওয়ান গুষ্ঠির ছেলে, জাতে কিজিলবাশ, পাঠান কুত্রাচ শীয়া হয় না। বিয়ের বর্ণ লাল, লালে

লাল, রক্ত লাল। আবির আর পিচকারী মারার তরে লাল রঙের কী প্রয়োজন? —মোগল ছবিতে হোলির দিনে, বিয়ের সাঁঝে পাঠান মোগল হারেম-মহিলারা পিচকারি দিয়ে টকটকে সুগন্ধি লাল জল—সুর্খ্-আব্ মারতেন একে অন্যের তনুদেহে—এন্তের মোগল তসবীরে আছে, মুসলিনের দুপাট্টা, সোনার চুমকিদার উড়িষ্যার ফিলিগিরি রুপোর তার আর রেশমী সুতোয় বোনা সদরিয়া ভেদ করে সিক্ত করে দিয়েছে শুভ্র ফেননিভ সিত কুণ্ডলিকা। নৃত্যের তালে নীবিবন্ধ শিথিল হতে শিথিলতর হয়ে উন্মোচিত করে দিয়েছে নাভিপদ্ম। লক্ষ্য ভেদ করো, মারো পিচকারি, হে হারেমরাজ নটবর ইয়েহিয়া মহরমের শুক্রের রাতে। কি ? রক্তরাগরঞ্জিত বারি আর নেই!

কি ভাবনা তব ওহে সৈনিক,
হোয়ো নাকো ম্রিয়মাণ!

না, না, না—স্ফটিকাধার থেকে শিরাজের লাল পানি নিচ্ছো কেন, রসরাজ। যদি তুমি এখন ঢাকেশ্বরীর প্রসাদাৎ প্রাসাদে দুর্বার স্কন্ধাবার নির্মাণ করে থাকো তবে আনাও না রক্ত, জোয়ানদের তাজা খুন্, রমণীদের অঙ্গরক্ত। বুড়ীগঙ্গার পানি তো ডুবে মরেছে উপরের রক্তস্রোতের চাপে। কোনো লাস্যবতী ন্যাকরা করে বলতে পারবে না, বঁধু রং দিয়ো না গায়।

তুমি তো দিচ্ছ রক্ত। ড্যাম ইয়োর রং।…

. সাতাশে মার্চ শিপ্রা ধীরপদে গেল রাত এগারটায় হলঘরে। উইলসন মাস্টার ছোট্ট একটা কমজোর বাল্‌ব ছাড়া, সবকটা আলো নিভিয়ে ঝিমুচ্ছে। যেন ঘিয়ের পিদিমের আলোতে একটা বাচ্চা ছেলে ঘুমুচ্ছে। কোনো প্রকারের শব্দ হলেই সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নিদ্রালু ভাব কাটবার আগের থেকেই জপ করতে আরম্ভ করে, "ইয়েস্ প্লীজ! হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ।" কিন্তু শিপ্রা এসেছে অতিশয় নিঃশব্দে। এবং তার পায়ে দিল্লীর বিল্লী মোরান মহল্লার সেলিম-শাহী—এর সোল নাকি তৈরী হয় চামচিকের ডানা পিটে পিটে; সত্য নির্ণয় কঠিন। শিপ্রা দুই হাত আড়াআড়ি বিছিয়ে তার উপর বুকের ভর দিয়ে চুপসে দাঁড়িয়ে রইল। দেখছিল, সরল কিশোরের তন্দ্রা তার মুখচ্ছবি কী মধুর আর সরলতর করে দিয়েছে। এ-রকম আদুরে আদুরে মুখ থাকলে কী কিশোর, কী যুবা, কী শিশু সবাইকে কণ্টিনেণ্টে বলে "মাদারজ্ ডার্লিং" "মায়ের দুলাল"।

এক সময় জেগে উঠবেই। ধড়মড়িয়ে দাঁড়িয়ে "গুড্—" সম্পূর্ণ করার পূর্বেই শিপ্রা শুধোলে, "জিমি, সে, ইউ গট ব্যাণ্ডি, কন্যাক্—ফ্রেঞ্চ?"

জিমি থ। ইনি অবশ্যই সোসাইটি লেডি। এঁর চতুর্দিকে যে আবহাওয়া সে তো সোসাইটি লেডিরই উপযুক্ত, এবং সেও ইলিয়ট রোডের প্রাচীন দিনের এ্যাংলো—মদ্যের সঙ্গে শিশু বয়েস থেকে তার পরিচয়—তবু এ লেডির সঙ্গে

কন্যাকে কেন, ব্যাঙের ফোঁটা পর্যন্ত খাপ খাওয়াতে পারলো না। যে রকম তার ড্যাডি। পাল-পরব ভিন্ন তাকে সে কখনো সে-পাশ মাড়াতে দেখে নি।

জিমি : "সার্টেনলি, সঙ্গে সোডা না প্লেন্ জল ?"

"সোডা আর জল দুইই। আর দুটো ওয়ান গ্লাস নিয়ে আসবে, সঙ্গে করে ? কিন্তু বঁ দিয়ো—ইয়াল্লা—কাউণ্টার সামলাবে কে ?"

"কী যে বলেন, মাদাম ! বেয়ারা রেখে যাবো। সে ডেকে দেবে। কিন্তু এখন তো বড় কিছু একটা কাজ থাকে না।"

শিপ্রা কটেজের ড্রইংরুমে জিমিকে মুখোমুখি বসিয়ে "হিয়ার ইজ লাক !" ব'লে জিমির গেলাসে আপন গেলাসের সঙ্গে টক্কর লাগিয়ে টুং করে ধ্বনিতরঙ্গ জাগালে।

জিমির বয়স কম হলেও বড় হোটেলের রেসেপশনিস্ট্ রূপে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে বহু বিচিত্র এবং প্রচুর। সে তাগড়া জোয়ান, চেহারা মিষ্টি মিষ্টি, সব্বাইকে আপ্যায়িত করতে হামেহাল তৈরী। বিস্তর চা-বাগানের মেমসায়েব, নেটিভ মেমসায়েব, সোসাইটি লেডি, মার্কিন টুরিস্টনী হিল স্টেশনে আসে নিছক যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে। তাদের ভিতর আবার গড্ ড্যাম্ পার্ভার্ট। কলকাতায় পুরুষরা বড় বড় হোটেলে ঢলাঢলি করেন। শঙ্কর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সে-নাটকের অত্যুত্তম বর্ণনা এবং নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে যে রস সৃষ্টি করেছেন, সেটি গৌড়জন আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি। অবশ্য ঢলাঢলির জন্য রমণী দরকার। অতএব তেনারাও আছেন, কিন্তু সেখানে তারা প্যাসিভ উপাদান মাত্র, যেমন হুইস্কি। কিন্তু বোম্বাই কলকাতাতে যৌন-ক্ষুধাতুরা রমণীরা সক্রিয় স্বাধীন পদ্ধতিতে রতি-সখার সঙ্গসুখ উপভোগ করার জন্য বড় বড় হোটেলের "সদ্ব্যবহার" করতে ঈষৎ কুণ্ঠিত হন। ফলে বংশানুক্রমে এঁরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেটা বহুবিধ পথ আবিষ্কার করেছে। তার মধ্যে দুটি পন্থা উৎকৃষ্ট। জাহাজে করে দরিয়ায় দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে নব নব যৌনাভিজ্ঞতানন্দ সঞ্চয় অত্যুত্তম বটেক্, কিন্তু যদি অত্যধিক, সহ্যাতীত উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতার দরুন সংকট দেখা দেয়—যদিও এস্থলে পরিষ্কার বলে রাখা ভালো, এ-সব টুরিস্ট জাহাজের অধিকাংশই ইহভুবনে সর্বজনবিদিত, সমর্থিত "জলচর সোনাগাছি"—সোনাগাছিকে অপমান করা এ-পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়—তখন কাপ্তেনের আদেশে কাট্ আউট্, কেবিনে রুদ্ধাবস্থা থেকে সে রমণী মুক্তি পায় কি প্রকারে ? অথচ প্রতি রাত্রে কোটিপতিনীর অসহ্য প্রয়োজন একটা তাগড়া জোয়ানের, কোনো কোনো স্থলে একাধিক। কথিত আছে, রাশার জারীনা কাতেরীনার জন্য প্রতিদিন নিত্যনূতন গার্ড অব অনার উপস্থিত রাখা হত, নিত্য নবীন বলিষ্ঠ প্রিয়দর্শন আর্মি-অফিসার দ্বারা নির্মিত। মহারানী ফাইলের সম্মুখ দিয়ে ধীরপদে যেতে যেতে যাকে সে-সন্ধ্যার নর্মসখা রূপে

উৎকৃষ্ট মনে হত তার দিকে এক মুহূর্তের শতাংশেক মাত্র চোখের একটি ঝলক বুলিয়ে দিতেন। মহারানীর সহচর বয়স্যের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ক্ষুরধার অসিকে এক কটাক্ষে দ্বিখণ্ডিত করতে পারতো। মানুষ মাত্রেরই ভ্রান্তি হয় এ-প্রবাদটি বক্ষ্যমাণ বয়স্যের ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রযোজ্য। যমরাজ সম্বন্ধে সুপ্রচলিত গল্পটির "ট্র্যাজেডি অব্ এরর" তিনি কুত্রাপি কদাচ ঘটাতে দেন নি—কিংবদন্তী সে-বিষয়ে সবিশেষ সোচ্চার।

কিন্তু মার্কিন কোটিধারিণীরা যা-ই করুন না কেন, জারের আর্মি অফিসারদের মত বিশ্ববাছাই সুদর্শন যুবক সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ জারের আর্মিতে বা রাজদরবারে প্রবেশ করার গৌরব তথা অর্থলাভার্থে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে বাছাই বাছাই সুদর্শন, দুঃসাহসী, ভদ্রাচারণ-সম্পন্ন যুবক আসতো সেণ্ট পীটারসবুর্গে, মস্কোতে। রুশের কালিদাস কবি-সম্রাট পুশকিন্-এর মাতামহ মূলত ছিলেন আবিসীনিয়ার হাবশী—পীটার দি গ্রেটের ফৌজে তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আজ কী নিকসন, কী মাও সে তুং এ-সম্মেলন করতে অক্ষম। ন্যাশনালিটি তার বিষফল পাসপোর্ট—স্বদেশে আপন নাগরিকতা না হারিয়ে ভিন্ন দেশের ফৌজে ঢোকা আজকাল প্রায় অসম্ভব। শ্রীসুভাষের ফৌজ হিটলার বা মিকাডো-ফৌজের অঙ্গরূপে শপথ নেয় নি। এ-তত্ত্বটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, কারণ বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পূর্বে ও পরে এ-সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

অতএব মার্কিন কোটিধারিণীরা বিশ্বপরিক্রমায় বেরোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সভ্য অসভ্য নানা সৌন্দর্য উপভোগ করতে। হিল স্টেশনে অর্ধসভ্য, পূর্ণ অসভ্য সর্বশ্রেণীর মানুষ সুলভ। এঁদের অনেকেই অতিসভ্য ককটেল, মাত্রাধিক মার্জিত পুরুষসঙ্গ সর্বাধুনিক নৃত্য অত্যধিক উপভোগ করার ফলে এ-সবের তরে সোয়াদ রুচি হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা তখন বোরোন প্রকৃতির সন্ধানে। সভ্যতা দ্বারা অকলুষিত তরুণ-তরুণীর সন্ধানে—যারা পূর্ণিমা রাতে গাঁয়ের ছোট্ট নদীটির পারে পারে বাঁশী বাজিয়ে প্রিয়াকে জানায় আহ্বান, প্রকৃতিদত্ত তার দেহটি মনুষ্যনির্মিত কোনো উপাদান দ্বারা কলঙ্কিত না করে তরুণী নিমজ্জিত করে আছে তার দেহবল্লরীটি ঝরণাধারার স্বপ্নমগ্ন বালুচরের উপর। পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল রৌপ্যালোক তার ঘনকৃষ্ণ চিক্কণ মসৃণ চর্মে বার বার আঘাত হেনে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

হিল স্টেশনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণঃ সমস্ত রাত ধরে পাহাড়ীদের সঙ্গে নৃত্যগীতে টুরিস্ট মগ্ন হলেন, লুকোচুরি খেললেন, সমতলভূমি হলে ছোট্ট নদীটিতে জলকেলি করলেন, ওদের হোম মেড্ বিয়ারে ধক্ অত্যল্প বলে বে-এক্তেয়ার হলেন না, ওদের আচার-ব্যবহার কায়দা-কেতায় খাপ খাইয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারলে ওরাই অতিথির (ঠিক শব্দ নয়, যেন ভিন্ গাঁয়ের জাতভাই)

নিঃসঙ্গতা সইবে না, গা ঘেঁষে বসে এমন এক বলা-না-বলার ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করবে, আভাসে ইঙ্গিতে মৃদুহাস্যে লজ্জাবনত নয়নে কত না না-বলা-বাণী দিয়ে ভিনদেশীকে সম্পূর্ণ আপন করে নেবে। সখীরা কখনো কাছে এসে, কখনো দূরের থেকে সাহসিকাকে গানে-গীতে সঙ্গ দেবে, আর কখনো বা অশরীরিণীর মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।···পক্ষান্তরে তাঁতের ঘরে বলদ ঢোকার মত রামপেঁচা গাড়লস্য গাড়ল কোনো কোনো টুরিস্ট ইডিয়টের মতো বেমক্কা জেব থেকে নোটের তাড়া বের করে সঙ্গিনীর হাতে ঠাস করে চড় খেয়েছে এ হেন বিপর্যয়ও অবিদিত নয়। এবং মাঝে-মধ্যে শ্রাদ্ধারম্ভ হয় সেখানেই। পরের দিন পাহাড়ী বেয়ারাদের ঠোঁট-কাটা-কোনো-একজন কাহিনীটি কীর্তন করে অন্য বেয়ারাদের কাছে এবং ক্রমে ক্রমে সেটা লেফাফা-দুরস্ত ক্লাবেও পেঁছে যায়। এ-পরিস্থিতিতে মাঝদরিয়ার জাহাজ থেকে নিস্কৃতি কোথায়? হিল স্টেশনের সেই তো সুবিধে। চলে যাও অন্য কোনো স্টেশনে। "বেটার লাক্ নেক্সট্ টাইম এট নেক্স্ট্ প্লেস, ওল্ড বয়, ও রভোয়া।"

রাত তো কাটলো প্রকৃতির অকলুষ বাতাবরণে আনন্দঘন চৈতন্য থেকে চৈতন্যান্তরে।

দুপুরে টুরিস্ট ফের সভ্যতার উচ্চতম শিখায় আরোহণ করবে, অর্থাৎ ঝকঝকে চকচকে উচ্চ দণ্ডাসনে বসবে পেতল, স্টেনলেসের বার-এর সমুখে। বার-এর থাকে থাকে স্ফটিক পাত্রে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা বর্ণের রশ্মিচ্ছটা। বার-মেড্ হেথায় মেড্ অব্ লিপস্টিক, রুজ, ম্যাসকারা মাখানো আঁখিপল্লব; ভুরুর স্থলে দুটি বঙ্কিম রেখা যেন অনঙ্গ বিহঙ্গ এই এক্ষুনি দুটি বিস্তৃত পক্ষ সামান্যতম কম্পন লাগাতে না লাগাতেই বিলীন হয়ে যাবে দিকচক্রবালে। মাথায় প্রতিদিন নিত্য নবীন কবরী। কভু বা বাবুই পাখির বাসা, কভু বা রেমব্রাণ্টের আঁকা বিদেশী সদাগরের পাগড়ি-পারা, কভু বা মুণ্ডুটা যেন আস্ত একটা টী পট—তার উপরে বসিয়ে দিয়েছে ভুটানী টী-কোজি।

উত্তম উত্তম পানীয়। দূর থেকে ভেসে আসছে, বিলিতি বাদ্যির বাজনা। দু' চক্কর শটিশে বা পেনশনারদের মত মন্থরগতিতে সম্মুখপানে মর্নিং ওয়াক, মন্থরতর গতিতে প্রত্যাবর্তন—ল্যামবেৎ ওয়াক।

কিন্তু বেচারী জিমি সভ্যতার এ-প্যাটার্নের সঙ্গে নিজেকে কখনো খাপ খাওয়াতে পারে নি। চা বাগিচার রদ্দী থার্ড ক্লাস ইংরেজও যে ভিতরে ভিতরে তাকে "এ্যাংলো" বলে তাচ্ছিল্য করে সে সেটা আট বছর বয়সে প্রথম স্কুলে গিয়েই টের পেয়েছে, পরে অপমানিত বোধ করেছে, এখন অনেকটা সয়ে গিয়েছে। কারণ "বিজনেস ইজ বিজনেস," খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতেই হবে, হোক সে পাঁড় মাতাল, লম্পট ইংরেজ, হন তিনি মার্কিন লক্ষ ডলারের মালিক—

সেইখানেই তো সংকট। সে বড় হয়েছে তার কট্টর প্যুরিটান পিতার হাতে। তার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না যে হোটেল বার-এ যে সভ্যতার প্যাটার্ন বিরাজ করে সেটা খৃষ্টানদের কলঙ্ক। কারণ এ-সব নারকীয় উচ্ছৃঙ্খলতা এদেশে প্রবর্তন করে ইংরেজ এবং তারা খৃষ্টান।

তদুপরি জিমির চেহারাটি যেমন মধুর—হাসলে দু'পাটি দাঁত ঝলমলিয়ে ওঠে—শরীরটাও তেমনি দড় মজবুৎ। সুন্দুমাত্র তার কব্জি কতটা চওড়া একবার তাকিয়ে দেখলেই হয়, বুকের পাটা থাক্। মার্কিন টুরিস্টিনীদের কেউ কেউ সর্বভুক, দূরের অনেককে নিকটতম বন্ধুরূপে পেতে চান। ঠেকাবে কি, কে? ডলার নেই?

একথা সত্য যে ম্যানেজার, প্রোপাইটারের ইচ্ছা এটা নয় যে জিমি অনিচ্ছায় হোটেলের বেসরকারী 'জিগোলো'—পুং বেশ্যা—রূপে মার্কিন মহিলাদের সঙ্গ দিক। অবশ্য এটাও সত্য, ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে হোটেলের কিছুটা বদনাম হবে। সেটা তাদের স্বার্থবিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে জিমির অনমনীয়তায় ক্রুদ্ধ হয়ে কোন মার্কিন যদি পরদিন জিমির বিরুদ্ধে উল্টো-পাল্টা অভিযোগ আনেন সেটাও হোটেলের সুখ্যাতিকে ক্লিষ্ট করে—আর জিমির পক্ষে ভয়াবহ সংকট।

হোটেল-ম্যানেজারকুল উকীল ডাক্তারের চেয়েও বহুদর্শী। ম্যানেজার জানে অভিযোগ মিথ্যা।

তাই এহেন উভয় সংকটে ম্যানেজার মাত্রেরই মুখে মাত্র একটি বুলি, "ট্যাক্‌ট্, জিমি, ট্যাক্‌ট্। একটুখানি ট্যাক্‌ট্ দিয়ে ম্যানেজ করো না কেন? তোমার কি দরকার, জানো, জিমি? আরেক আউন্‌স্ ট্যাকট্।"

ব্যাপারটা ট্যাক্‌টের সীমা ত্রিসীমানার ওপারে সেটা জিমি সবিস্তর বুঝিয়ে বলেনি—কক্‌খনো। তার যথেষ্ট ট্যাক্‌ট্ আছে বলেই সে জানে, বলাটা হবে ট্যাক্‌ট্‌লেস। ম্যানেজারকে আহম্মুক বানিয়ে তার লাভ? সব জেনে বুঝেও তাঁর আত্মসম্মানে লাগবে চোট। তাই সেটা হবে মোক্ষম ট্যাক্‌ট্‌লেস। হুঁঃ ট্যাক্‌ট্? হিটলারকে বললেই হত, "একটুখানি ট্যাক্‌ট্ খর্চা করলেই তো স্তালিনগ্রাদের লড়াইটা জিততে পারতে!"

এবং ম্যানেজার সেটাও বুঝতে পারতো, দু'তিন দিন পরে অকারণে তার পিঠ চাপড়ে বলতো, "উয়েল, জিমি, জীবনটা কি রকম? হাও ইজ লাইফ?"

এই হোটেলের চাকরিতে জিমির এ-রকম অভিজ্ঞতা পূর্বে কখনো হয় নি।

চাকরির দৈনন্দিন জীবনে আপিসে হোটেলে দোকানে চাকুরের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ আছেই। এই যে ম্যানেজার এ্যাব্বড়া তনখা পায় তাকেও তো জাঁতাকলের ভিতর দিয়ে যেতে হয় প্রতিদিন। তবে হ্যাঁ, কারো কলটা বড্ড

ভারি, কারোটা অপেক্ষাকৃত হালকা।

এ-রকম ধারা রাত এগারোটায় তাকে এতদিন কোনো টুরিস্ট দুটো গেলাসসহ আহ্বান জানানো মাত্রই—বস্তুত জানানোর পূর্বেই সে গোঁফ দেখতে পেত—জানানোর পর শিকারি-বিড়ালসুদ্ধ। "ডিউটির সময় আমাদের ড্রিংক বারণ" "৩২ নম্বর অপেক্ষা করছেন টোকিও থেকে একটা ট্রাংক-কল; আমাকেই কানেক্ট্ করতে হবে" দুনিয়ার কুল্লে সত্য কারণ, মিথ্যে অজুহাত, দুটোর ককটেল অছিলা—এটা অবশ্য এখনো পরখ করে নেয় নি—"আবহাওয়া দপ্তর এখখুনি খবর দিয়েছে, কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা দশে আমাদের হোটেলে দারুণ ভূমিকম্প হবে। সেটা সামলে নিয়ে, এই এলুম বলে, ম্যাডাম।" প্রায় সব-কটাই এস্তেমাল করেছে জিমি,—এখন তার রেস্তো তলানিতে খতম খতম করছে—এক কাঁড়ির ফায়দা ওঠাতে পারে নি।

আজ এই তার জীবনে সর্বপ্রথম দুটো গেলাস সে নির্ভয়ে—না, নির্ভয়ে নয়—বড় তৃপ্তি আর আশা পূরণের দৃঢ় আশ্বাস নিয়ে এসেছে। ডিউটিতে, বাইরে, বাড়িতে—না, বাড়ি বলতে হতভাগার প্রায় কিছুই নেই, "গৃহে মাতা নাস্তি" এমন কি "অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা চ" নেই—তার জীবন বৈচিত্র্যহীন। প্রত্যেকটি দিন যেন অন্তহীন একটা মালগাড়ির ওয়াগন—সব কটা হুবহু একই ঢঙ একই বহরের। জন্মমুহূর্তে এঞ্জিনটা চলে গেছে পশ্চিম দিকে অস্তাচলের দেশে, এখন সে দেখছে, রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ওয়াগনের পর ওয়াগন চলেছেতো চলেছেই। অবশ্য কোনোটার রং চটা, কোনোটা ডাইনে বাঁয়ে দুলছে, কোনোটা বা ঝাঁ চকচকে সদ্য বার্নিশ পালিশ করা। কিন্তু এ-মালগাড়ির শেষ কোথায়? পূর্বাচলের দিকে তাকিয়ে দেখে গাড়ির শেষান্ত সেখানে বিলীন, ফের অস্তাচলের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রারম্ভাংশও সেখানে অদৃশ্য।

কী মহিমান্বিত, কী ডিগনিফাইড এই সুন্দরী। সামান্যতম অস্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই তাঁর প্রশান্ত মুখচ্ছবিতে। আর কি সহজ সুরে বললেন, "তোমাকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে, জিমি। তোমার মুখটা খাঁটি 'মাদারস ডার্লিঙে'র মত, কিন্তু দেহটা—বাই অল দ্যাট্ ইজ হোলি—কী মজবুত, ম্যাগনাম সাইজের হাড় দিয়ে তৈরি।...শোনো, তোমাকে ডেকে আনলুম, সেলিব্রেট করতে। স্টেশনটার কি নাম ধরতে পারি নি। বললে, রাশা নাকি অতি দৃঢ় ভাষায় ইয়েহিয়াকে বলেছে, রক্তারক্তি বন্ধ করতে। আমার মনটা যেন নাচছে। ...কই তুমি খাচ্ছো না কেন? আমি কিন্তু, ভাই, কিছু মনে করো না, এক গেলাসের বেশী খাই নে। তুমি নির্ভয়ে খেয়ে যাও। বানচাল হবার বহু আগেই তোমার একটা চুলের এ্যাট্রন কাঁপন দেখেই তোমাকে থামিয়ে দেব।"

জিমি মনে মনে বললে, "সে আবার বলতে! আস্ত বোতল গেলার মত

চীজ ইনি নন।” গেলাসটা নাক অবধি তুলে ধরে একটু বাও করে বললে, “আমাদের ভিতর সক্কলেই কোনো না কোনো দিক দিয়ে পূব বাঙলার সঙ্গে বিজড়িত। আমার মুরুব্বী মিস্টার সেন—হেম সেন—সিলেটে তাঁর বেশ কিছু টাকা পড়ে আছে। ভিজা পান নি সেখানে গিয়ে তদ্বির করার জন্য। শেষটায় আমি যাই, সিলেটের চা-বাগান ম্যানেজার এক ইংরেজকে পটিয়ে। বাগাতে পারলুম সামান্যই—এক বেহারীর বাচ্চা খামোখা দিলে বাগড়া পদে পদে। ঐ বিচ্চু গুলোই বী ইন দি অয়েন্টমেণ্ট। আর এটা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন, আজ কোন্ এক মেজর জিয়া আজ সকালে চাটগাঁ বেতারে পূব বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন? কিন্তু ম্যাডাম, আপনার আনন্দে আমি পুরোপুরি যোগ দিতে পারছি নে। আমার ট্রাঙ্ককলের বন্ধু ঘণ্টাটাক আগে আমাকে জানালে সেই সুন্দরবন অঞ্চলের হাসনাবাদে, পশ্চিমে পদ্মা পেরিয়ে উত্তর বাগডোগরা অঞ্চলে আর এই আমাদের দক্ষিণের সিলেট বর্ডার পেরিয়ে দুটি পাঁচটি রেফুজি আসতে আরম্ভ করেছে, অলরেডি—”

“আর শিলচর?”

“যে দু'পাঁচটি ঐ পূব বর্ডারে ক্রস্ করেছে, তারা নিশ্চয়ই করিমগঞ্জেই আশ্রয় নেবে। আমি রেফ্যুজি দেখেছি অনেক। ওদের শরীরে কি কিছু আছে যে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে দূর শিলচরে যাবে!”

“আমার বন্ধুরা তাহলে কাল নাও আসতে পারে?”

“আপনার অনুমতি নিয়ে, কেন?”

“ওরা বোধহয় রিফুজিদের সাহায্য করতে চাইবে।”

জিমি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললে, “আপনারা তো কলকাতার লোক। অপরাধ নেবেন না, আমি কিই বা জানি। তবু বলি, সাহায্য করতে পারে কলকাতা আর দিল্লী। ড্যাডি আমাকে বলেছিল, চল্লিশের দশকে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন সব চেয়ে বেশী সাহায্য আসে কলকাতা থেকে। কিন্তু কলকাতার খাস বাসিন্দারা তো অনেক পরে জানতে পারবে, তাও আপন চোখে দেখে নয়, ওদের কী মরণ বাঁচন হাল। করিমগঞ্জ, শিলচরে ভলাণ্টিয়ারের অভাব হবে না, আমি শ্যোর। আপনার বন্ধুরা ইনফিনিটলি বেশী সাহায্য করতে পারবেন, কলকাতাতে চাল ডাল, ওষুধপত্র এবং টাকা—ইয়েস্ টাকা—যোগাড় করে। ওঁরা তো আগরতলা, করিমগঞ্জ, শিলচরে যথেষ্ট দেখে শুনে ওয়াকিফ হয়ে গিয়েছেন। ওঁরাই পারবেন কলকাতায় পাবলিক ওপিনিয়ন ফর্ম করতে। 'সরি', ম্যাডাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এবারে আর কম্পন শিহরণ নয়। এবারে কেমন যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব। খান তাকে সোজা নিয়ে গিয়েছে পাশের কটেজে। খাটে শুইয়ে বললো, "তুমি শিপ্রার সঙ্গে কথা কও তো, ভায়া। কিন্তু দোহাই আল্লার, সবটা বোলো না—কেটে ছেঁটে। আমার এখনো পিলে চমকাচ্ছে। আমি চললুম জিমিকে শুধোতে লেটেস্টটা কি ? ওর গায়ের প্রত্যেকটা লোম বেতার এনটেনা।"

শিপ্রা বললে, "জিমি এখন অফ্‌ফ্ ডিউটি।"

"ঐ আনন্দেই থাকো। আমি আসছি জেনেও সে অফ্‌ফ্ হবে! পীপিং পীটারকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। শেয়ানা ছোকরা, আমাদের ত্রিমূর্তি-মিলনে চতুর বলেই চতুরানন হতে চায় নি, ওয়ান—নো,—টু, টু-মেনি হতে যাবে কেন ?"

শিপ্রা খুশী মনে খানের বকর বকর শুনছে; ততক্ষণে কীর্তি জিরিয়ে নিক, মনের জট ছাড়াক। বললে, "আমার ঘরে একটা বেতার আছে। মিনিট দশেক পরেই বিবিসি খবর।"

"আমাদের ত্রি-মূর্তির ঐ একটা মাত্র কমন পয়েন্ট। বেতারাসক্তি কারোরই নেই। শুনেছি, লেবাননের আরব চাষা হাল চালাবার সময় বলদের শিঙে ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে বেলি ডান্‌সের তালে তালে হেলে দুলে এগুতে থাকে। বেতার বটতলার মাল। এখন অগত্যা শুনি। কপাল!"

"বলদটাও তালে তালে পা ফেলে তো ? তাহলে নিশ্চিন্ত মনে নটের গুরুর কাছে দীক্ষা নাও। তোমার তো, জানি, দুটোই বাঁ পা।"

"নো, মাদাম, ভূতের হয়। আমার চারটে।···তা কি হবে, কও (বার-এর 'কোন্ মদ্য খাবে'র পরিভাষা)? কীর্তি' হোয়াট্ ইজ ইওর পয়জন ? তোমার সর্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। কড়া বিষ খাও। চাঙা হয়ে উঠবে।"

শিপ্রা বললে, "ব্র্যান্ডি এ্যান্ড চেসার-ই ভালো। আর আমার জন্য আলাদা ক'রে পাঠিয়ো না। আমি ওরই থেকে এক-আধ চুমুক নেবো'খন।" খান অন্তর্ধান।

শিপ্রা ঝুঁকে নিচু হয়ে কীর্তি'র কানের লতি-তে চুমো খেয়ে কানে কানে বললো, "কাপড় ছাড়বে না, কীতা ?"

"মিতা, এখন তুমিই আমার সব। আমি সব সয়ে নিয়ে সব করতে পারবো। আমি হৃদয় দিয়ে বলছি, শিপি, আমার সব অবশতা কেটে গিয়েছে। আগরতলাতে আমি সত্যি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু করিমগঞ্জে আমার বিভ্রান্তি অন্তর্ধান করলো। দাঁড়াও বুঝিয়ে বলি; আগরতলাতে যেন শীতের ছায়া-ঢাকা দুপুরে হঠাৎ কে আমায় পিছন থেকে ধাক্কা মেরে হিম-শীতল জলে ফেলে দিলে আর আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অবশ। এমন সময় দেখি, ওপারে

বুড়ো গোছের লোক দিব্য সাঁতার কেটে কেটে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। ইতিমধ্যে আমার হাত-পা নিজের থেকেই একটু আধটু নড়াচড়া আরম্ভ করে দিয়েছে—রক্ত সঞ্চরণের প্রয়োজনবশত। আমি ভালো সাঁতার জানি, ডুবে মরতুম না নিশ্চয়ই। এবং অবশ্যই পত্র-পাঠ ফের ডাঙায় ফিরে আসতুম, কিন্তু ঠাণ্ডা জলের প্রতি বুড়োটার ঐ ন্যাক্কার-ভরা তাচ্ছিল্যে যেন আমার অজানতেই সর্বাঙ্গের জড়ত্ব ডাণ্ডাশ মেরে তল্লাট-ছাড়া করে দিয়েছে। আম্মো তৎক্ষণে পাঁই পাঁই করে মাঝ পুকুরে চক্কর মারছি আর ডুব সাঁতারে পুকুরের এপার ওপারে মাকু চালাচ্ছি। করিমগঞ্জে গিয়ে সে-বুড়োটার কাহিনী শুনলুম। কিন্তু তুমি কি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলে? খবর গুজোব যতই ছড়াচ্ছিল ততই তোমার কথা ভাবছিলুম।”

শিপ্রা সদয় মুচকি হেসে বললে, “প্রথম দিনটা বড্ড খারাপ গেল। দু' কান বন্ধ করে রইলুম পাছে খবর গুজোব শুনে ফেলি। তারপর কি যে হল জানি নে। নিজে যেচে খান যে-জিমির কথা বলছিল তার কাছে গেলুম। ও-রকম ছেলে হয় না। সে-ই আমার রয়টার, টাস্ এবং মাতাহারি।”

“মাতাহারি? স্পাই?”

“ইনটেলিজেন্স্ ম্যান।” আমি জানতুম না ট্রাংককল কর্মীদের ভিতর এত দোস্তী সমঝোতা থাকে। কোথায় জলপাইগুড়ি, কোথায় বনগাঁ শিলচর শিলঙ? একে অন্যকে কখনো দেখে নি কিন্তু গলা চেনে নাম জানে। ওরা যে অনেক কথাবার্তা শুনতে পায় সে তো জানা কথা। জিমির এক বন্ধু ট্রাঙ্কে কাজ করে। সে ইণ্ডো-পাক বর্ডারের যত সব তাজা খবর জিমিকে জানাতো। তাই জিমি আমার মাতাহারি × ১০০ = ০০

শেষটায় যখন শুনলুম ঢাকায় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে শয়তানের কারবার—হেল্ লেট্ লুস্—তখন সব ভয় কেটে গেল।

পড়লো পড়লো ঐ তো ভয়
পড়ে গেলে সব-ই সয়॥”

কীর্তি বললে, “কী আশ্চর্য! আমার বুড়োর কাহিনী ঐ ট্রাংককল্ অপারেটার দোস্তী নিয়েই শুরু। ২৫ মার্চ বিকেলের দিকেই ঢাকার ট্রাংক কর্মীরা জেনে যায়, রাত্রেই আর্মি ক্র্যাক্ ডাউন ঢাকা, চাটগাঁ, আরো অনেক টাউনে একই সঙ্গে আরম্ভ হবে। আর্মির আপন বেতার, জোরালো ট্রানস্মিটার আছে, কিন্তু কাজের চাপ সামলে উঠতে না পারলে ওরা সাধারণ ট্রাঙ্কেরই শরণ নেয়। নিশ্চয়ই টাপেটোপে এবং পাঞ্জাবী ডায়লেক্টে—ঢাকা থেকে অফিসাররা অন্যান্য শহরের অফিসারদের ইন্স্ট্রাকশন্স্ দিচ্ছিল ক্র্যাক ডাউন সম্বন্ধে। কিন্তু ট্রাঙ্কের লোক আড়ি না পেতেও আপন কাজের খাতিরেই কয়েকটা চালু ভাষা বেশ শিখে ফেলে—আর পাঞ্জাবী তো তারা শোনে নিত্যি

নিত্য, সিভিল মিলিটারি দুইই।

আমি যে-বুড়োর বাহাদুরীর কথা বলছিলুম, তিনি আদৌ বুড়ো নন। এমন কি প্রৌঢ়ও বলা চলে না। বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙালী অফিসারদের একজন— মেজর। তিনি কি করে খবর পেলেন সিলেটের হবিগঞ্জ টাউনে বসে, ২৫-এর সন্ধ্যায় যে, আজ রাত্রেই শুরু হবে বোঝাপড়া? ট্রাঙ্ক কর্মীর কল্যাণে। অবশ্য অন্য মাধ্যমও হয়তো ছিল।

বেঙ্গল রেজিমেণ্টের একমাত্র বাঙালী হিন্দু অফিসার মেজর দত্ত তখন ছুটিতে, হবিগঞ্জ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিঠি পাঠালেন, সেই রাত্রেই, লোক মারফৎ, খবর জানিয়ে; তিনি পরদিনই না-পাক্ খানদের খতম করার জন্য সিলেটের দিকে রওয়ানা হবেন। দত্ত যোগ দেবেন কি?

দত্ত উত্তরে জানালেন, কাল ভোরেই তাঁর কাছে পেঁছবেন।

কীর্তি অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে রইল। চোখ মেলে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে, যেন স্মরণে আনতে পারছে না, ভুলে-যাওয়া কোনো-কিছু। মাঝে মাঝে তাকায় শিপ্রার চোখের গভীরে—যেন সেখানেই পাবে রহস্যের সন্ধান। শেষটায় প্রত্যেকটি শব্দ, মনে হল যেন বাছাই করে করে ধীরে ধীরে বললো, "শিপ্রা, আমার বিস্ময়ের অবধি নেই, অত্যাশ্চর্য অলৌকিক এ-রকম একটা ব্যাপার যে আদৌ সম্ভবে তারই সামনে আমি দিশেহারা, সৃষ্টি রহস্যের চেয়েও ঘনতর রহস্য যেন সৃষ্টির এক নগণ্য অংশ, ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হবিগঞ্জে—যার নাম তুমি আমি কেউই কখনো শুনি নি, শুনতুমও না—অকস্মাৎ কুয়াশার যবনিকায় বৃহত্তম, খুদ সৃষ্টি রহস্যকে ঢেকে ফেলতে পারে, এ যে সর্ব তর্ক-শাস্ত্র, ন্যায় মীমাংসাকে অর্থহীন করে দেয়; অংশ কি কখনো পূর্ণের চেয়ে বৃহত্তর হতে পারে! সিন্ধু-বিন্দু কি কখনো সিন্ধুর চেয়ে বিরাটতর কায়া ধারণ করতে পারে? ২৫ মার্চের সন্ধ্যায় এই হবিগঞ্জের লোকটি কোন দুঃসাহসে একাই যুদ্ধঘোষণা করে দিল ইয়েহিয়া, তার ফৌজ এবং সবচেয়ে বাস্তব কঠিনতম শত্রু ওদের ট্যাঙ্ক, বমার প্লেন, সাঁজোয়া গাড়ি, বিরাট বিরাট কামানের বিরুদ্ধে? লোকটা তো গলির আধ-পাগলা পুঁচকে ছোঁড়াটার মত নয়, যে নিত্যি নিত্যি রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্তালিন হিটলার মা কালী মৌলা আলীর বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা' করে। দুজনার কাছ থেকে আমি ওর কথা শুনলুম। দু'জনাই একমত: লোকটা অতিশয় শান্ত প্রকৃতির, স্থির ধীর। তার দুর্দমনীয় চঞ্চলতা প্রকাশ পায় সুন্দুমাত্র তার ঘন ঘন ঠা ঠা উচ্চহাস্যে—যেন সে সর্বক্ষণ তক্কে তক্কে আছে ঠা ঠা করার সুযোগের তরে।···মেজর সে। সে কি জানে না, ইয়েহিয়ার শক্তি কতখানি? পূব পশ্চিম উভয় পাকিস্তানে সৈন্য সংখ্যা কত,

কোন্ কোন্ শহরে আছে ক্যাণ্টনমেণ্ট, ট্যাংক বোমারু জঙ্গী-বিমান সংখ্যা-সব—সব তার নখদর্পণে, সে যে তাদেরই একজন ; সে জানবে না ? সব জেনে শুনে সে হয়ে পড়লো একা, একান্ত একা ছিটকে পড়লো সেই সর্বগ্রাসী অসংখ্যের মাঝ থেকে ? যেন গ্রহচ্যুত নক্ষত্রের মত ক্ষিপ্ত বেগে অদৃশ্য অজানার পানে ধেয়ে ধেয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই-ভস্ম খাকধুলোতে—না,—নিঃশেষ নাস্তিতে পরিণত হতে ?

কোন্ মামদো-পিশাচ চাপলো তার স্কন্ধে যে হঠাৎ উদোম ভূতের নৃত্য আরম্ভ করে দিল সে !

জানো শিপ্রা বরিশালের খাজা বাঙাল আমার এক ক্লাস ফ্রেণ্ড বিপদে পড়লেই, মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতো,

'কী কল পাতাইছ তুমি ?
বিনা বাইদ্দে নাচি আমি।'

হ্যাঁ এ-ভূতের বাদ্যের সঙ্গতও নেই। কোথায় মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ঢক্কা-ডিণ্ডিম ? এমন কি একটা বাঁশের বাঁশি—অর্থাৎ একটা রাইফেলও নেই কারো কাছে।

বললুম না, অজানা অদৃশ্যের উদ্দেশে ?

শেখ সায়েব, আওয়ামী লীগের নেতারা সব কোথায় কে জানে ?

কোনো প্রকারের নির্দেশ মেজর পান নি। ইনি যে পদক্ষেপ করলেন সেটা পরে ওঁদের সম্মতি পাবে কি—যদি, অবশ্য, তাঁরা স্বয়ং কোনো নিরাপদ আশ্রয় পান।

বরিশাল-খুলনা থেকে সিলেট, কক্সবাজার থেকে দিনাজপুর এই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে এমন কোনো সংযোগ ব্যবস্থা নেই যে সংবাদ আদান-প্রদান মারফৎ ইয়েহিয়ার বর্বরতার ফলে কোন্ জায়গায় কি প্রকারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সে-সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া যায়।

তিন শ্রেণীর বাঙালী রাইফেলটা অন্তত চালাতে পারে

(ক) বেঙ্গল রেজিমেণ্টের যে-সব অফিসার সেপাই বাঙালী

(খ) আধা-মিলিটারি বেঙ্গল রাইফল্‌স্

(গ) পুলিশের বেশ-কিছু সংখ্যা

এরা কি মেজরের পন্থা অবলম্বন করবে ? যদি না করে তবে যে-সব কিশোরযুবক তাঁর চতুর্দিকে জড়ো হবে, রাইফেল চালানোর ঐ যৎসামান্য ট্রেনিংটুকুই বা ওদের দেবে কে ?

এবং সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, উপর থেকে নির্দেশ না-পাওয়া সত্ত্বেও গ্রামের লোক সাড়া দেবে কি ?"

কীর্তি দম নিয়ে বললে, "এ রকম দফে দফে প্রশ্নের সংখ্যা অগুনতি।

মোদ্দা কথা ঃ অর্গেনাইজেশন নেই, নির্দেশ নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই।"

আমার লেটেস্ট খবর দুই মেজর কয়েকশ' রাইফেল নিয়ে এগুচ্ছেন শ্রীমঙ্গলের দিকে। সেখানে নাকি এক ঝাঁক খান রয়েছে।

তারপর কাল ২৭ মার্চ চাটগাঁ থেকে আমাদের এই মেজরেরই মত সমস্ত দায়িত্ব আপন স্কন্ধে নিয়ে মেজর জিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন, চাটগাঁ বেতার মারফৎ। এখন দেখা যাক্ বাদবাকি দেশটা কি ভাবে সাড়া দেয়।"

শিপ্রা বললে, "তুমি যে সব সমস্যার অসম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলে ঠিক ঐগুলোই নিয়ে মেজর বিব্রত হয়েছেন, এমনতরো নাও হতে পারে। যারা তোমাকে বিবরণ দিয়েছে তারা পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে তাদের যুক্তি বুদ্ধি অনুযায়ী এ সব প্রশ্ন তুলেছে। এই সমস্যাগুলো মেজরকে বিব্রত করুক আর নাই করুক, তাঁর অন্য সমস্যা থাক আর নাই থাক, প্রশ্নগুলোর কিন্তু একটা বাস্তব মূল্য আছে। এগুলোতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অন্তত হবিগঞ্জ অঞ্চলের সাধারণ জনের চিন্তাধারা, মনের অবস্থা। আমাদের কাছে তার মূল্য প্রচুর।"

কীর্তি মুগ্ধ হয়ে বললো, "মিতা, আমি কি বৃথাই বলি তুমি তুলনাহীনা। আমি শুধু সমস্যা আর প্রশ্নগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম, তোমার অন্তর্দৃষ্টি গিয়েছে সেগুলোর পটভূমির দিকে তীক্ষ্ণতম ক্ষুরধার নিয়ে।...বেচারী রবি কবি! তাঁকে যেতে হয়েছিল তুলনাহীনার সন্ধানে সাতসমুদ্র পেরিয়ে আর্জেনটীনা না কোথায় যেন।

'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

আর আমি কী অবিশ্বাস্য ভাগ্যবান।"

শিপ্রা হেসে বললে, "আর আমি যদি বলি, আমি ভাগ্যবান, আমিও দেখেছি সমুদ্র না পেরিয়ে—

'অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

এমন সময় ঘরটাকে দাপটে থান থান করে খান সাহেবের প্রবেশ।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললে, "মদ্যাদি যখন আরেক কদম এগুলেই সম্পূর্ণ বর্জন করে ফেলবে তখন মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নাও না, এই বেলাই? আমার মত সদ্‌গুরু পাবে না। খুদ আরব মুল্লুকেও না। পাকী একটা ঘণ্টা আমি বেতার যন্ত্রটার কান মলে মলে, বিবিসি কলোন ভিয়েনা চুঁ মারার সঙ্গে সঙ্গে সাপটে দিলুম আধা বোতল গর্ডন। আর হেথায় হেরি, ফুলবাবু মশাই আর পটের বিবিটি কড়ে আঙুল পরিমাণ গেলাসটি শেষ করতে পারেন নি। একেই কি বলে সভ্যতা? হায় শ্রীমধু!...শোনো আমি এসেছি তোমাদের

বাইরে নিয়ে যেতে। সত্যি বলছি এ-রকম বন্ধ ঘরের অবশ বাতাসে গুজুর গুজুর করতে তোমাদের গুজুর গুজুরের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। মুক্তি সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে হলে চাই মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস। আরেকটা তত্ত্ব কথা বলি, তোমরা মদ ছেড়ে দিলেই বাঙালীরা রাতারাতি পাঞ্জাবীদের হাইকোর্ট দেখাতে পারবে না, আর মাত্রা বাড়ালেও লীগ তাদের আশা ভরসা বুড়ীগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে না। এ্যাব্বড়া যুদ্ধটা যখন চার্চিল চালালো সে কি তখন নির্জলা উপবাস করেছিল। হ্যাঁ নির্জলা অতি অবশ্য বটেক; নির্জলা হুইস্কি ঐ সময়েই মাঝে মধ্যে সে টেনেছিল। রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না? তৈরী হও এখ্খুনি।"

ঘর থেকে বেরুতেই দেখে জিমি দাঁড়িয়ে আছে।

খান তার গতানুগতিক সম্ভাষণ করার পূর্বেই জিমি নিচু গলায় বললে, "সব কথা বলতে গেলে এখানে দাঁড়িয়ে হয় না। কাল একজন নূতন গেস্ট এসেছে হোটেলে। আমাকে অ্যাংলো জেনে ড্রিংক অফার করলে, দোস্তী জমাবার তরে। তার ইংরেজি উচ্চারণ থেকে হানড্রেট পার্সেন্ট শ্যোর লোকটা পাঞ্জাবী। কিন্তু কোন্ পাঞ্জাবের? অথচ হোটেলের খাতাতে লিখেছে, মিরাট। আমার কি রকম যেন ধোঁকা লাগছে। কারণটা হয়তো আপনার কাছে এপীল করবে না, তবু বলি। লোকটা যদি আর পাঁচটা টুরিস্টের মত আমাকে সোজাসুজি শুধতো, ইণ্ডো-পাক বর্ডার কত দূরে, কদ্দুর অবধি যাওয়া যায়, রেফুজিরা ভিড় লাগায় নি তো রাস্তায় তা হলে আমার মনে ধোঁকা লাগতো না। দিস্ জনি সোজা পথ না ধরে বিস্তর বীটিং এবাউট দি বুশ করে করে পৌঁছল চেরাপুঞ্জিতে—কী তার আগ্রহ, কত বৃষ্টিপাত, বছরে ক'দিন বৃষ্টি হয়, আর যত সব র‍্যাবিশ প্রশ্ন। তার পরও বর্ডারের পথ ধরলো না। ফের আশ কথা পাশ কথা। তারপর এল বর্ডারের টপিক্। আমি ইচ্ছা করেই ভাসা ভাসা উত্তর দিতে লাগলুম। কখনো বা রহস্যময় উত্তর ফিসফিস করে। স্পষ্ট দেখলুম তার ক্যোরিসিটি দারুণ উত্তেজিত হয়েছে। মুখোস খসে গেছে। হুস হুস করে একটার পর একটা প্রশ্ন শুধোতে লাগলো—মাঝেসাঝে বাজে প্রশ্নের ভেজাল দিয়ে আসল উদ্দেশ্য কামুফ্লাজ করতে ভুলে গিয়েছে। তার প্রশ্নের রকমারি থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ব্যাটা এখানে আসার আগেই সব কিছুর সন্ধান নিয়ে এসেছে। এখন শুধু লেটেস্ট অবস্থাটা জানতে চায়।

আরেকটা কথা: এখানে নেবেই চেল্লাচেল্লি, পথে তার ট্রানজিসটার খোয়া গিয়েছে। ম্যাজিক ভিন্ন সে দুদণ্ড বাঁচতে পারে না। আমাকে সক্কলের পয়লাই শুধলো, এখানে ট্রানজিসটার পাওয়া যাবে তো, দোকান কোথায়? ছুটলো টী না খেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে আমি বড়ুয়াকে ফোনে আমার সন্দেহের কথা জানালুম। বড়ুয়া তো একদম শ্যোর লোকটা ওয়েস্টু পাঞ্জাবের। এবারে শুনুন মজাটা।

যতবার আমি তার কামরার বারান্দা দিয়ে গিয়েছি কান পেতে শুনেছি, নো, নো, নো ম্যাজিক এটোল। লো ভলুমে শুনছে ন্যুজ। এনি উয়ে, টক্। ম্যাজিক ককখনো না।

আজ আমাকে শুধোচ্ছিল, অত উঁচু এ্যারিয়েল কার? তবে কি বেতার কর্মী? তবে—"

হঠাৎ জিমি থেমে গেল। বললে, "ঐ আসছে চিঁড়িয়াটি। আপনি পরিচয় না করতে চাইলে, স্যর কেটে পড়ুন। ও সকলের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে চায়। দু'একবার স্নাবড্‌ও হয়েছে। অভ্যাস বদলায় নি।"

চিঁড়িয়া এসেই অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ বিরক্তির সুরে বললেন, "বাজে ট্রানজিসটার। আচ্ছা, ঐ মিঃ বড়ুয়া, সে এটার দাম কেটে একটা পুরো পাক্কা রেডিয়ো সেট দেবে না, ঐরকম স্কাই হাই এরিয়েল সহ?"

"আমার তো মনে হয় না, মিঃ কুরেশী।" (বাজে কথা। কিন্তু জিমি বড়ুয়ার স্বার্থ দেখছে)

"কেন? হোটেল বলতে পারে না, আমি রেসপেকটেবল গেস্ট? ওর মেশিন বিগড়োই নি।"

"আমি পাতি রেসেপশনিস্ট্। বরঞ্চ ম্যানেজার পারেন।" (জিমি জানে, বেটা আখেরে বড় রেডিয়ো কিনবেই।)

খান মাঝখানে নাক গলিয়ে বললে, "আপনাদের কথার মাঝখানে বাট্ ইন করছি বলে অপরাধ নেবেন না। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি টুরিস্ট্। হেথা হোতা ঘুরে বেড়াবেন। ট্রানজিসটারটা কাজে লাগবে—আজকাল প্রতি বুলেটিনে গরম গরম খবর দিচ্ছে। আর বাড়ির বড় সেটটা দিয়ে শুনবেন রাত্রে ফরেন, দুবলা স্টেশন।"

চিঁড়িয়া সোৎসাহে খানের সঙ্গে জোর ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যাণ্ড শেক করে "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হলুম। আমার নাম রহমান কুরেশী—"

জিমি বিস্মিত হল, খান তখখুনি নিজের পরিচয় দিলে না কেন—যেটা স্বাভাবিক এটিকেট।

খান তখন কুরেশীকে বলছে, "বাট্ শ্যোরলি আই মেট্ ইউ এট্ লাহোর, প্রেসক্লাবে,—এই ফেব্রুয়ারী, না জানুয়ারিতে অর্থাৎ হাই জ্যাকিঙের আগে। আপনার গলায় ছিল ভারী মজার একটা টাই।"

এক মিলিমিটারের শতাংশের এক অংশ টাক লোকটা যেন বেসামাল হলো। একটু জোর গলায় বললে, "অসম্ভব। আমি কখনো পাকিস্তান যাই নি।" আরো সামান্য গলা চড়িয়ে "আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন বাই বার্থ। উত্তরপ্রদেশ।"

খান প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "আই এম সরি, অত্যন্ত দুঃখিত"···, অতঃপর তার এক্কেবারে নিজস্ব "উর্দুতে"—"বেয়াদবী মাফ করেংগাহে।"

কুরেশী উর্দুতে তুফান তুলে টর্নাডোতে পৌঁছবার পূর্বেই খান ইংরিজিতে ফিরে গিয়ে বলল, "আমি উর্দু জানি না তাই বলে কি কোন্‌টা লক্ষ্ণৌয়ের উর্দু আর কোন্‌টা লাহোরের উর্দু তার তফাৎ জানি নে! আমি মুর্গ মুসল্লম বানাতে জানি নে, তাই বলে কোন্‌টা সুখাদ্য হয়েছে আর কোন্‌টা রদ্দি তাও জানি নে! লাহোরের কারো মুখে এমন কি স্যর ইকবালের ভাতিজার মুখেও এমন চোস্ত উর্দু শুনি নি।"

"থ্যাঙ্কু, খুদা হাফিজ" বলে কুরেশী ঈষৎ দ্রুতপদেই স্থান ত্যাগ করলেন। জিমি একটু গলা চড়িয়ে বললে, "আমি কি বড়ুয়াকে ফোন করবো আপনার ট্রানজিসটার বিষয়ে ?"

কুরেশী শুনেও শুনলো না।

খান এক রকম জোর করে দুই ইয়ারকে নিয়ে গেল মরেল্লোতে। বললে, "এ দোকানের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের বেয়াত্রিচের দেশ-ভাই, কিন্তু আভিজাত্যে বেয়াত্রিচের হেঁটোর বয়সী।" মানুষের হাতে তৈরী অপ্রাকৃতিক লোকটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শিপ্রার খুবই পছন্দ হল। এমপরিয়ামে যদিও শিপ্রা গেল অনিচ্ছায় তবু আসামের "পাত" সিল্ক জীবনে সে এই দেখল প্রথম। খান শব্দতত্ত্ব ঝেড়ে বললে, "আমার চেয়েও যারা অগা তারা বলে পট্টবস্ত্র – সিল্ক— পাট থেকে তৈরী হয়। আমার মনে হয় এই "পাত" শব্দটা অনেক অহমিয়া "পাট" উচ্চারণ করে বলে ওটার "শুদ্ধি" করে পণ্ডিতেরা ওর নাম পট্টবস্ত্র দিয়েছেন।

বড়বাজারও দেখালে খান, বললে, "এই দেখ, মাতৃক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ! তাবৎ দোকানীই খাসিয়া মেয়েছেলে। ব্যাটাছেলেগুলো বিড়ি ফোঁকে, জুয়ো খেলে আর প্রতি সন্ধ্যায় মদ খেয়ে মাতলামো করে, বউয়ের পয়সায়। তবে হ্যাঁ বউ যদি কোনো ইয়ারের সঙ্গে রাত্রিবাস করে আসে— কত পার্সেন্ট করে জানি নে, আমার অতি সোহাগের খাসিয়া মেয়েদের সম্বন্ধে আমি অপ্রিয় কোনো কথা বলতে চাই নে—তবে স্বামীটির টুঁ ফ্যাঁ করার সামাজিক হক্ক নেই। অত্যুত্তম ব্যবস্থা।"

শিপ্রা বললে, "স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক বাবদে আজ পর্যন্ত কোনো সামাজিক ব্যবস্থারই প্রশংসা তো করা যায়ই না, গুণী জ্ঞানীরা স্বীকৃতি পর্যন্ত দেন নি। তাই বিশ্বজনের মতে পৃথিবীতে মাত্র যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রবাদ আছে সেটি "বিবাহ এক মাত্র জুয়োর বাজি খেলা (গ্যামলিং) যাতে দু'পক্ষই হেরে ক্ষতি-গ্রস্ত হতে পারে। যুধিষ্ঠির তো জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারালেন। এর পর তার জুয়ো খেলা বন্ধ—বাজি ধরার স্টেক্ একটা কানাকড়িও নেই। দুর্যোধন ছোকরা চালাক। সে দিয়ে দিলে দ্রৌপদীকে ফেরত—সব জুয়ো যখন বন্ধ

তখন চলুক ঐ মোক্ষম জুয়োটি, যেখানে দুই পক্ষই হারে। এখানে এক দিকে একজন—দ্রৌপদী, অন্য দিকে পাঁচজন।"

খান শুধোলো, "পাঁচজন কেন? আমি তো শুনেছি, তিনি অর্জুনকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, যে কারণে তাঁর পতন হল। অর্জুন অন্তত লুজার নন।"

শিপ্রা বললে, "আর অন্য মতে তিনি যে গোপনে কর্ণকে ভালবাসতেন সেটা জানো না? যে মোটর ড্রাইভারের ছেলে কর্ণ (তখনো কুন্তী ছাড়া কেউই জানে না, কর্ণ আসলে যুধিষ্ঠিরেরও অগ্রজ) প্রকাশ্য রাজসভায় ডাচেস্‌ বলো, এমপ্রেস, বলো, দ্রৌপদীকে সক্কলের চেয়ে এমন কি দুঃশাসনের চেয়েও বেশী অপমান করেছিল রূঢ় চণ্ডালের ভাষায়। বস্ত্রাকর্ষণ করাতে দুঃশাসনকে বলা যেতে পারে বর্বর, কিন্তু ভাষা দিয়ে অপমান করাতে কর্ণ ইতর, মীন। ভাষার মার মোক্ষমতম মার। অতএব দ্রৌপদীও লুজার। এবং সবচেয়ে বেশী লুজার। কারণ দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে কস্মিনকালেও অপমান করেন নি।"

এবারে কীর্তি মুখ খুললো, বিস্ময়ের ভান করে বললো, "অ। তাই বুঝি কেউ কেউ বিয়ে গ্যাম্বলটাকে ডরায়!"

সপ্তম অধ্যায়

টোকা দিয়েই কটেজে ঢুকে ছিল। কিন্তু হাবভাব দেখেই বোঝা গেল বিলক্ষণ উত্তেজিত।

শিপ্রা বললে, "এক কাপ চা?"

"থ্যাংকু মাদাম।" খানের দিকে তাকিয়ে বললে, "মিঃ কুরেশী মিসিং—"

খান ইচ্ছা করেই শিপ্রাদের কিছু বলে নি—কুরেশীর সঙ্গে তার প্রেমালাপ সম্বন্ধে। জিমি কি বললে, "দাঁড়াও, এঁরা ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জানেন না। বলে নিই।" বলা শেষ হলে কীর্তি মন্তব্য করলো, "মিসিং নয় এব্‌স্‌কাণ্ডই—পালিয়েছে।"

জিমি বললে, "সেই যে আপনার সঙ্গে কথা প্রায় শেষ না করে কুরেশী ঘরে চলে গেলেন তারপর লাঞ্চ, টী'তেও এলেন না। তা সে মেলাই টুরিস্ট আকছারই দু'তিনটে খাবার পর পর মিস্‌ করে যান। টী'র সময় বেয়ারারা অনেকক্ষণ ধরে টোকা দিল—সাড়া দিলে না। ডিনারে এল না। সন্ধ্যা থেকে দুটো কামরাই অন্ধকার। রাত এগারোটায় কিন্তু একটা বেয়ারা দেখতে পেল ঘরে আলো জ্বলছে। টোকা দিয়ে সাড়া পেল না। সমস্ত রাত কিন্তু আলো জ্বললো। সংক্ষেপে বলছি, আজ সকাল দশটায় বেয়ারাদের সন্দেহে ম্যানেজার

পুলিশ ডেকেছেন। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল সুট মুট শার্ট টাই সেভিঙের জিনিস সব বিছানার উপর ছড়ানো, ট্রানজিসটারও রয়েছে। তখন কে যেন লক্ষ্য করলো, নেই মাত্র একটি জিনিস—সুটকেসটা, অর্থাৎ শূন্য সুটকেসটা মাত্র নিয়ে লোকটা দুপুর রাতে উধাও হয়েছে। কাল রাতে আমার ডিউটি ছিল না। তাই পুলিশ আমাকে কিছু শুধোয় নি। শুধোলে কি বলবো, মিঃ খান?"

"সত্যি কথা বলবে। সে যে-সব প্রশ্ন করেছিল আর তোমার উত্তর যতখানি স্মরণে আনতে পারো বলবে। তোমার মনে কি সন্দেহ হয়েছিল অথবা নিজের কোনো মন্তব্য প্রকাশ করবে না, পুলিশ সরাসরি জিজ্ঞেস না করলে। সর্বশেষে বলবে, তোমার যতদূর জানা মিঃ খানের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আর কেউ তাকে দেখে নি। পুলিশ আমার কাছে আসবে। আমিও সরাসরি যে ক'টি কথা হয়েছিল বলবো। আমাকে জিজ্ঞেস না করলেও আ-মি আ-মা-র সন্দেহের কথা বললে বলতেও পারি। তুমি কোনো চিন্তা করো না, জিমি। আমি আমার ওয়ার্ড অব অনার দিচ্ছি তোমাকে, তোমার কেশাগ্রটুকুও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। এখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে ডিউটিতে ফিরে যাও।"

জিমি চলে যেতেই খান বললে, "জিমিকে বলি নি, এখন বলি, আমি লাহোরের প্রেস ক্লাবে কক্‌খনো যাই নি। ওটা প্যোর ব্লাফ।

শিপ্রা: "তাহলে ঠিক ঐটেই বললে কেন?"

কীর্তি: "সোজা উত্তর: প্রেস ক্লাবে যায় ন্যুজ-মেন এবং খবরের সন্ধানে বিস্তর স্পাই। নেটিভ লাহোরের পাঞ্জাবী স্পাই যায় বিদেশী সংবাদ-দাতাদের পাম্‌প করতে। লোকটা যদি সত্যই স্পাই হয় তাহলে, তাহলে হয়তো সামান্য একটু বেসামাল হবে।"

শিপ্রা: "কিন্তু মজাদার টাই?"

খান: "ওর গলায় ছিল যে টাইটা সেটার মত বিকট টাই আমি কখনো বাস্তবে বা ফিল্মেও দেখি নি। শিলঙের মত আন্ডার ডেভালাপট্ শহরের হোটেলে-ক্লাবে অর্ধসভ্য ইংরেজ এখনো পরে 'এডওয়ার্ডিয়ান সোল্‌লেস্' টাই। সেটা দেখার পরও যে খলিফে ওরকমের আচাভুয়া টাই পরে, তার স্টকে পাদ্রী সায়েবদের পানসে টাই থাকার কথা নয়। এটাও ব্লাফ, আগের ব্লাফটা জোরদার করার জন্য।"

কীর্তি: "তার প্রতিক্রিয়ায় সে তার ন্যাশনালিটি নিয়ে চেল্লাচেল্লি করতে লাগলো। আর তুই তখন নিশ্চয়ই খুব বেকুব বনে গেলি? না?"

শিপ্রা: "এ কি কথা। সে তো তখন খুশী যে তার টেস্‌ট্ সফল হয়েছে।"

খান: "না কীর্তির অনুমানটাই ঠিক। এ রকম একটা থার্ড ক্লাস

টেস্টের মুখে নেহাত কাঁচা স্পাইও বিচলিত হয় না। সে যে স্পাই এটা আমি তখন আদৌ ধরে নিই নি। রোমান্টিক জিমি হয়তো ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখে ধরে নিয়েছে লোকটা স্পাই—আর যখন সর্বত্র পাক্ স্পাই ম ম করছে। তাই ব্যাটার চেল্লাচেল্লি শুনে আমি প্রথমটায় বেকুব বনে গিয়েছিলুম। তখন বুঝলুম, একমাত্র গাড়ল পাঞ্জাবীদের মধ্যে গাড়লস্য গাড়লই কল্পনা করতে পারে, সে পার্ফেক্ট স্পাই এবং শুধু তাই নয়, আর পাঁচটা, জাতভাই গাড়লের মনে বিশ্বাস জন্মাতে সমর্থ হয় যে সে স্পাই রানী মাতাহারির জারজ সন্তান কারণ তার উর্দু এ্যাসন চোস্ত লখ্নওয়ী যে এখনো বাপের সে-সুপুত্তুর পয়দা হয় নি যে ঠাহর করতে পারবে, সে আম্মাজানের গব্ব থেকে তেড়ে পাঞ্জাবী বুলির ফোয়ারা ছুটিয়েছে শালিমার বাগ-এর বেবাক ফোয়ারা এক জোট করে।"···খান নিজের রসিকতায় নিজেই খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করেছে। শেষটায় সামলে নিয়ে বললে, "লোকটা যেই না আমার ইচ্ছাকৃত বিকৃততর খাসে কলকাত্তাই উর্দুর দু'টি মাত্র লব্জো শুনেছে অমনি ছোটালে তার "উর্দু"—সে যে উত্তর প্রদেশের প্রকৃত সন্তান সেইটে সপ্রমাণ করার জন্য। আর বলবো কি, দিদি, সেটা শুনলে আমাদের পাড়ার পর্দানশীল কুলীন ঠাকরুন পাদি পিসি পর্যন্ত বলে উঠতো, 'এ ম্যা—ভদ্রলোকের ছেলে, মাইরি, কতা কইচে ডাইভার সন্দার-জীর মতো—নোকের সামনে নজ্জা করে না!' অতিশয় নির্ভেজাল অমৃতসর-লাহোর-মার্কা পাঞ্জাবী উর্দু-প্লাস্টিকের পাতর-বাটি! সুনীতি চট্টো রেকর্ডে তুলে রাখতেন। আমাদের পাড়াতে এক বাঙাল ভদ্রলোক আছেন—তুই তো চিনিস রসরাজ ভশচায—ত্রিশ বছর ধরে। প্রায়ই বলতে শোনা যায় 'রারী (রাঢ়ী) দ্যাশে মাক্যা থাক্যা দ্যাশের আপন ব্বাসাটা (ভাষাটা) এক্কেবারে পাউরি গেছি, (ভুলে গিয়েছি, পাসরি গেছি)। এমনই আবেস্তা (অবস্থা) ওংকা (এখন) গিরিনি (গৃহিণী) পইরজন্ত (পর্যন্ত) আমার বিসুদ্দ রারী ব্বাসা (বিশুদ্ধ রাঢ়ী ভাষা) বুস্তা পারইন না (বুঝতে পারেন না)।' মিঃ কুরেশী 'উর্দু' বলার সময় হুবহু ভশচাযের আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আপন উত্তর প্রদেশীয়ত্ব সপ্রমাণ করার জন্য লেগেছিলেন ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের চর্বি খেয়ে।"

এমন সময় জিমি এসে বললো, "পুলিস আপনার কাছে আসতে চায়, না আপনি যাবেন।"

খান বললে, "আমিই যাচ্ছি। থাকতো আজ আই জি তালেবর দত্ত, হুঃ, আমাকে কেন, কাউকে কোন প্রশ্ন না শুধিয়ে, দ্যাখ তো না দ্যাখ, ক্যাক্ করে আপন হাতে পাকড়াতো হারামীকে।"

খান চলে গেলে শিপ্রা শুধলো, "খান লাহোরীটাকে টেস্‌ট্ না করে অগাটার চেয়ে অগা সেজে, ধীরে ধীরে খাঁটি মুসলমানত্ব জাহির ক'রে—সেটা

করতে পারতো সে কোনো ভান না করে, এবং অতি অনায়াসে, কারণ তুমিই বলেছো, সে ইসলামের ইতিহাস বহু বৎসর ধরে পড়েছে—এবং মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই, ভাই ইয়োহিয়া তার বড় ভাই সাহেব—মির্জা সেটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে। তারপর লাহোরের মিঞাজীকে সাপ্লাই করতো ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে রগরগে বোগাস্ ইনসাইড্ 'ইনফরমেশন', এবং পাম্প করতো তার পেট থেকে পশ্চিম পাক্ সম্বন্ধে যতখানি মাল বের করতে পারে, এবং সবচেয়ে ইমপর্টেণ্ট কনটাক্‌ট্ রাখার নাম করে ভারতে পাকিস্তানী ও হিন্দুস্তানী স্পাইদের যে-কটা নাম সংগ্রহ করতে পারে। দুচ্ছাই, ওসব আবার বলি কেন ?—লারী কোম্পানীকে সে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে তেলিয়েছিল।"

কীর্তি বললে, "ও রকম একটা গণ্ডমূর্খকে কোনো দেশ যে স্পাই করে পাঠাতে পারে, সেটা বেচারী অনুমান করবে কি করে ? সে ভেবেছিল, একটু-খানি ন্যাজ খেলানোর পর, ধরবে সাপের ন্যাজটা। কিন্তু পয়লা কোপেই বেরিয়ে এল সাপের বদলে কেঁচো। তবে মিঞা খুব একটা কাজে লাগতেন বলে মনে হয় না। ওকে হয়তো পাঠিয়েছিল, জেনে শুনে যে সে ধরা পড়বেই। ভারতের ক'দিন লাগে ওকে পাকড়াতে, পাকড়ে ওকে নিয়ে কি করে—অর্থাৎ ওর নাম করে, কিংবা ওকে বাধ্য করে বোগাস খবর পাঠায় কি, না, ওকে কিনে ফেলে নিজেদের স্পাই করে পশ্চিম পাকের এমন জায়গায় পাঠায় কি, না যেখানে সে পরিচিত নয়, এবং আরো অনেক কিছু—এবং তার থেকে বিচার করবে ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টি-স্পাই বিভাগ কতখানি চালাক, কতখানি আপ্-টু-ডেট্।"

শিপ্রা ঃ "ঢাকা বেতার এখন খবর দেবে। কি বলে শুনি।"

প্রধান খবর ছিল, হামিদুল হক বিবৃতি দিয়েছেন, "এটা যুদ্ধ নয়, হত্যা নয়, বর্বরতাও নয়। সামান্য অপারেশন। তাতে দু'চারজন লোক মরবেই—"

কীর্তি ঃ "মাই গড্ !"

—"যারা আইন মেনে চলছে আমি তাদের কোনো ক্ষতি তো করছেই না, বরঞ্চ তাদের নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশ লীগ 'শয়তানদের' গুণ্ডামী থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন যা লুট রাহাজানি খুন হচ্ছে সে সব করছে লীগের লোক। গ্রামের লোক ভারী খুশী, আমি অপারেশনের খবর শুনে, আমার কাছে গাঁয়ের সব খবর আসে" এবং সর্ব প্রকারের কটুকাটব্য, জলজ্যান্ত মিথ্যা ভাষণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে আয়নার উল্টো ছবির মত ইয়োহিয়া টিক্কার সপক্ষে অনবদ্য একখানা মাস্টার পীস।

শিপ্রা স্তম্ভিত হয়ে শুনলো। সে এমনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে যে গ্যোবেল্স্-এর তুলনা পর্যন্ত তার অবশ মনে সঞ্চারিত হল না।

কীর্তি অতখানি না। শুধোলে, "এই হক্‌টি কে চেন ? ইনি বাঙালী মুসলমান। ইনি এবং একজন বাঙালী হিন্দু দু'জনাতে পার্টিশেনের পূর্বে

বর্মা থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য ফাণ্ড থেকে অন্তত লাখ তিরিশেক টাকা তজরূপ, চুরি, যা ইচ্ছে, বলো করাতে—ওদের নামে গ্রেফতারীর হুকুম বেরয়। ঠিক ঐ সময় পার্টিশন হল; হক্ ঢাকা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। খুব সম্ভব এখনো তার নামে কলকাতায় এরেস্ট ওয়ারেণ্ট জারী আছে; এই চব্বিশ বছরে তিনি ভারতে পদার্পণ করেন নি। সেখানে রাজনীতির খেলাধুলোতে সুবিধে না করতে পেরে রাজনৈতিক বনবাসে চলে গেলেন—তখনকার মত। বর্মার কড়ি দিয়ে একটা দৈনিক খবরের কাগজ কিনে রেখেছিলেন; সেইটে দিয়ে আড়াল থেকে কল-কাঠি নাড়াতে লাগলেন। অনেকটা—"

"থামলে কেন?"

"অল্ রাইট—অনেকটা গোয়িং ইনটু টেম্‌পরারি রিটায়ারমেন্ট লাইক এন ওলড্ প্রসটিটুট, বিকাম এ হোল-টাইম, প্রফেশনাল পিম্‌প্ এ্যানড্ এওয়েট এ স্টেজ-ব্যাক এ্যাজ দি সোল্ ওনার অব্ ফুল-ফ্লেজেড্ ব্রথেল্‌স্।"

খানের প্রবেশ।

খান: চতুর্দিকে পুলিশ ছড়িয়ে পড়েছে; হুলিয়া বেরিয়েছে মিঞাকে পাকড়াবার জন্য।"

কীর্তি: চতুর্দিকে কেন? ও তো এখন সিধে ধাওয়া করবে সব চেয়ে নিকটের পাক্ বর্ডারের দিকে। এবং যাবে চেরাপুঞ্জির ঘুরতি পথে। জিমিকে যে পই পই করে চেরাপুঞ্জির খবর জিজ্ঞেস করেছিল সেটা শুধু কামুফ্লাজ নয়। পশ্চাদপসরণ—লাইন অব্ রিট্রীট—সম্বন্ধেও ওকীবহাল হওয়ার প্রচেষ্টা তাতে ছিল। এবং সে সোজা সরকারি সড়কও ধরবে না। খাসিয়ারা অতিথি-বৎসল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর হয়ে চেরাপুঞ্জি একপাশে রেখে—কি একটা জায়গার নাম, কি যেন, "উঠনি"—'মহাদেরে উঠনি' না কি যেন—সেটা অপরিহার্য—কয়েক শ' ধাপ সান-বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে চেরাপুঞ্জি অঞ্চলের উচ্চতা থেকে নামবে কি যেন একটা ছোট্ট খাসিয়া গ্রামে—কি এক 'পুঞ্জি'—সেখান থেকে কোম্পানিগঞ্জ, ভুলাগঞ্জ, জন্তিয়ার ওৎরাইটার পথ খুবই সুহজ। চেক্ পোস্টটার নাম বোধহয় ডাউকি। সে নিশ্চয়ই সেখানে যাবে না। ওখানেও পাক্-সিলেটে ঢোকার তরে বিস্তর চোরাবাজারের গুপ্তিপথ রয়েছে।...'স্পাই মাস্টার' যে-রকম ভয় পেয়েছে আর অ্যাক্কেলটিও গুড়ুম, সে তার বর্তমান মুক্ত-কচ্ছাবস্থায় দু'কান-কাটার মত সদম্ভে গৌহাটির অষ্টপ্রহর গম্‌গম্ করা সরকারি বে-সরকারি কোনো পথই ধরতে পারে না।"

খান শুধোলে, "ম্যাপটি যোগাড় করলে কোত্থেকে?"

কীর্তি, তৃপ্ত বদনে: "হাজী সকল কাজের কাজী; নিজের থেকেই দিয়েছিল, টু মাইল টু এন ইঞ্চ ম্যাপগুলো।"

খান ঃ "তার পর প্রশ্ন উঠলো, লোকটা সব-কিছু ফেলে রেখে সুন্দ্মাত্র খালি সুটকেসটা নিয়ে গেল কেন ? এমন কি ট্রানজিসটারও ফেলে গেল কেন ? অন্তত ডাউকি বর্ডারের অবস্থাটা তো গৌহাটি স্টেশন থেকে শুনতে পেত।"

কীর্তি ঃ "উত্তর অতি সরল। সুটকেসটাতে ছিল ফল্‌স্ বটম—গুপ্তি-তলা। সেখানে আর কিছু না থাক, ম্যাপ-ট্যাপ কম্পাস এমন কি ছোট ট্রান্‌স্মিটার থাকাও অসম্ভব নয়। কামরার ভিতর সেগুলো নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব। অতএব পয়লা মোকাতেই ওটা সে ফেলে দেবে যে-কোনো জঙ্গলা একটা খাদে—তার অভাব কি এখানে। তোকে যদি কখনো মার্ডার করি তবে শিলঙে ডেকয়্ করে এনে। লাশ গায়েব করার তরে আইডিয়াল প্রলোভিনী এখানকার খাদগুলো। লেকের পাশ দিয়ে যদি যায় তবে সেটা ব্যাড সেকেণ্ড। কী মূর্খ লোকটা সেটা আরো বোঝা গেল ট্রানজিসটার সঙ্গে নেয় নি বলে।"

শিপ্রা বললে, "অনুমান করতে পারছি।"

খান বললে, "আমি সদাই ওয়াটসন। রহস্য সমাধান হয়ে যাওয়ার পরও সে-সমাধানের 'কৈশল'ও তার কাছে রহস্যময় থেকে যায়।"

কীর্তি বললে, "নিয়ে গেলে পুলিশের হুলিয়াতে অন্তত থাকতো 'সম্ভবত পলাতকের হাতে ট্রানজিসটার আছে'। তোরই মত পুলিশ ভাববে, ঐ যন্ত্রটি ছাড়া ওর চলবে কি করে ? ওদিকে সে সেটা সুটকেসে পুরলে সেটার ওজন বাড়বে। খাদের ঝোপঝাড়ে আটকা পড়বে না—তদুপরি পুলিশের অন্যতম সনাক্তীকরণ চিহ্নও তার হাতে নেই। পুলিশ কিছু বুদ্ধি খাটালে ও সামান্য তৎপর হলেই ওকে ধরতে পারবে সেই 'উঠনি'র নিচে। পকেটে যদি কিছু পায় তবে, কম্পাস আর ম্যাপ।"

খান বললে, "মিঞাকে নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। তোকে ফার্সী প্রবাদটি তো একাধিকবার বলেছি, 'আহাম্মুখ দোস্তের চেয়ে আক্কেলওলা দুশ্‌মন্ ভালো।' কিন্তু ঐ মিঞাটার মত দুশ্‌মন্ যদি রাঁচির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ইম্বেসাইল হয়, সে সম্বন্ধে প্রবাদ নীরব।"

শিপ্রা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, "এ রকম, একটু ভালো, আরো বোকা কত আসবে যাবে, সে নিয়ে মাথা ঘামালে হবে বর্বরস্য বলক্ষয়—আর তুমি, খান, মাত্র অর্ধ বর্বর। চলো না কলকাতায়, তোমার মত ধুরন্ধর চোখ না মেলেও দেখতে পাবে মার্কিন, রুশ, চীনা, বিশেষ করে উভয় পাকের চর কভু স্ববেশে কভু বা ছদ্মবেশে আবজাব করছে।"

কীর্তি বললে, "তোমাদের সম্মতি থাকলে কালই কলকাতা রওয়ানা হওয়া—"

খান আশ্চর্য হয়ে শুধোলে, "এত ম্যাপ ঘাঁটাঘাঁটির পর ডাউকি যাবে না ?"

কীর্তি শান্ত কণ্ঠে বললে, "করিমগঞ্জে যে দু'একটি শরণার্থী দেখেছি, সেই

প্যাটার্নই তো ইছামতী থেকে পদ্মা ব্রহ্মপুত্র ডাউকি, সর্বত্রই একই রূপে দেখা দেবে।"

খান বললে, "অ-অ-অ! হাতে হাঁড়ির একটা ভাত টেপা ঝোপের দশটা পাখির সমান।"

অষ্টম অধ্যায়

"জিমি!"

"ইয়েস, ম্যাডাম!"

"তুমি সত্যি ভেরি ভেরি ব্যাড্ বয়।"

"আমার ড্যাডি, অনুমতি করুন ম্যাডাম, আমাকে এইটুকু হাইট থেকে (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এই সত্য বাক্যটি বলেছেন। আমার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, আজ থেকে সেটা একদম লোপ পেল—"

"ফাজলামো করো না। সেই ভোর চারটে থেকে তোমাকে আমি খুঁজছি। সবাই বলে, তুমি অফ্ফ্ ডিউটি। সো হোয়াট্? শেষটায় গোহাটির পথে তোমার বাড়ি গেলুম। পথে দেখি, সেই জোয়ান বেয়ারাটা, ভ্যাক করে যে কেঁদে ফেলেছিল আমার সামনে, সে ছুটেছে টাট্টু ঘোড়ার মত। জিজ্ঞেস করলুম, লিফ্ট্ চাই। বললে, তোমার বাড়ী যাচ্ছে, তোমাকে খবর দিতে। সেখানে শুনলুম, ইয়োর বেড হ্যাজ্ নট বিন্ স্লেপ্ট ইন এটোল। আই লাইক দ্যাট্! কোথায় ছিলে সমস্ত রাত? আমি তোমার বাপ হলে এতক্ষণে আমার দুই উরুর উপর উপুড় করে ফেলে, উইদ দি রং সাইড অফ্ মাই ব্রাশ এমন প্যাঁদানি দিতুম—

হঠাৎ জিমিকে গোহাটিতে পেয়ে এমন খুশী যে বহুদিন পরে অনর্গল বকর বকর করে যেতে লাগলো।

জিমি সবিনয় বললে—ছোকরাকে এরকম "বকাঝকার" লাই ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেয় নি, এণ্ড বাই হোয়াট এ ড্রীমল্যাণ্ড ফেয়ারি! মাদার মেরি তুমি এঁকে সর্ব অমঙ্গল থেকে রক্ষা করো, মা!—"ম্যাডাম, আমার ওজন ১৭০ পাউণ্ড, তাই এই মাটিতে লম্বা হচ্ছি! আপনি—" ছোকরা জীবনে এতখানি স্নেহ ইহজন্মে পায় নি। নইলে এ-রকম বাচালতা তার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকত। বাপের স্নেহ ছিল পুরুষের, পিতার স্নেহ।

"চুপ করো। এই চেয়ারটায় বসো তো।" তারপর হ্যাণ্ড-ব্যাগ খুলে সিল্কে মোড়া একটা কেস বের করলো। বললো, "খুলে দেখো। তুমি প'রো। আর বিয়ের বউয়ের আঙুলে আংটি পরাবে তো, চার্চের ভিতর? বেরিয়ে এসেই এটি তাকে পরিয়ে দেবে—ইফ্ আই বি অন দি আদার সাইড—"

"ম্যাডাম, প্লীজ !"

"শোনো। আমি বেঁচে থাকলে অন্য কথা। এখন সিরিয়াস হয়ে শোনো। এটা তোমাকে আমি ফ্রী দিচ্ছি না। আমি প্রতিদান চাই।"

জিমি হাত তুলেছে শপথ করতে।

"শুনে যাও, প্লীজ। তোমার হেল্প্ আমার দরকার হতে পারে, না, হবেই। হয়তো উইদাউট এনি নোটিস। হয়তো বা দিতে পারবো। তুমি 'না' বললে আই শান্ট্ টেক ইট্ এমিস্ এটোল। সী হোয়াট্ আই মীন ?"

"প্লীজ, ম্যাডাম। আমাকে মাত্র একটি কথা বলতে দিন। আমার ড্যাডির জীবনের আদর্শ তিনি নিয়েছিলেন কার কাছ থেকে আমি ঠিক জানি নে। বোধ হয় প্রিন্স্ কনসর্ট এলবার্টের এই 'মটো' ছিল। জর্মনে দুটি শব্দ, 'ইষ ডীনে' (Ich diene) 'আমি সেবা করি,' 'আমি সেবার জন্য', 'আই এম হিয়ার টু বি য়ুজড্।' আমিও সেই আদর্শে বিশ্বাস করি।"

"গুড্। আমি তোমাকে এমন কোনো সেবা করতে বলবো না, যেটা হীন কিংবা তোমাকে কোনো বিপদে পড়তে হবে। প্রথম সন্ধ্যাতেই আমি বুঝেছিলুম, পরের হিত করে তুমি আনন্দ পাও। তারপর যখন মিঃ খানের কাছ থেকে শুনলুম, পাঞ্জাবী গুপ্তচরের প্রতি তোমার ঘৃণা, এবং খানকে সব-কিছু তুমি বলেছো যাতে করে সে খানের বা অন্য কারোর অনিষ্ট না করতে পারে তখনই—ওয়েল নেভার মাইণ্ড—তুমি কবে কলকাতায় আসছো ?"

"আপনি যখনই আদেশ করবেন।"

"আচ্ছা, তোমাকে শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করি : তোমার পিতা এবং তুমি বড় হওয়ার পর, তোমার সম্প্রদায়ের আর পাঁচজনের মত তোমরা ক্যানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেলে না কেন ?"

"ড্যাডি ছিলেন অতি এক্স্পার্ট বয়লার ইন্স্পেক্টর। কাজেই তিনি আর পাঁচজনের তুলনায় ঢের ঢের ভালো অফার পেয়েছিলেন। এবং তিনি এটাও জানতেন, তাঁর নিকট আত্মীয়স্বজন প্রায় সবাই মাইগ্রেট করার ফলে তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে নিতান্তই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে। তবু তিনি যান নি। কেউ জিজ্ঞেস করলে উত্তরটা এড়িয়ে যেতেন। মাত্র একদিন একবার আমাকে, একান্ত আমাকেই বলেছিলেন, 'যারা যাচ্ছে, যাক্। আমি কক্খনো বলবো না, তারা অন্যায় করছে। কিন্তু, মাই জিমি, আমি যে-দেশে জন্মেছি, যে-দেশকে আমি ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসতে শিখেছি, সে-দেশ আমি ত্যাগ করতে পারবো না। আমি এ-দেশেই মরতে চাই, যাতে করে আমার বাপ পিতামোর হাড্ডির কাছে আমার হাড্ডিও ঠাঁই পায়—আই উয়াণ্ট মাই বোন্স্ টু বি গেদার্ড্ আনটু মাই ফোর ফাদার্স হোয়ার দে আর।' ম্যাডাম, আমার বেলাও তাই—সেম্ হিয়ার। আমি চলে গেলে তাঁর গোরে ফুল দেবে কে ?"

তাই তো, অবাক হয়ে ভাবলো মনে মনে শিপ্রা, তাই তো, খৃষ্টান মুসলমান যাদের গোর দেওয়ার রীতি, তারা চায় তাদের হাড়গুলো যেন তাদের বাপ পিতামোর হাড়ের কাছে স্থান পায়, কালক্রমে ধুলো হয়ে মিশে যায়। হৃদয় দিয়ে যারা এ-দেশকে ভালোবেসেছে তাদের পক্ষে এদেশ ত্যাগ না করার বিরুদ্ধে এটা একটা অতিরিক্ত 'হৃদয়ের যুক্তি'।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো, বার্টন না ওপেন্‌হাইম্ কার লেখাতে সে-যেন পড়েছে, বসরা বন্দর থেকে ভারতাগত জাহাজ যে-সব শত সহস্র মুসলমানদের ওষধি-রক্ষিত মৃতদেহ "সাত-সমুদ্র" পেরিয়ে নিয়ে এসেছে, তাদের বোঝাই করে এগিয়ে চলেছে মরুভূমির এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে বিলীন শত সহস্র উষ্ট্র গর্দভের কাফেলা পুণ্যভূমি কারবালার দিকে, যেখানে তাঁদের নেতাজী শহীদ ইমাম হোসেনের রক্তধারা কারবালা-মরুভূমির সহস্রাধিক বৎসরের শুষ্ক বালুকা সিক্ত, রঞ্জিত করেছিল, যেখানে তাঁর অস্থি সমাহিত হয়েছিল তারই নিকটে একই মরুভূমিতে ভারতীয় অস্থি স্থান পাবে বলে, একই ধুলোয় ধূলি হবে বলে।

এবং এরই সঙ্গে তার মনে আরেকটি চিন্তা উদয় হয়ে তার দেহটা যেন বিষিয়ে দিল: জেনারেল ইয়েহিয়া অতিশয় গোঁড়া কট্টর শীয়া, এবং সম্প্রতি জানতে পেরেছে মিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টোও শীয়া—গোপনে গোপনে তিনিও ধর্মান্ধ, তাঁর শীয়া মতবাদ ভিন্ন অন্য সর্ব বর্ণ সর্ব গোত্রের মুসলমানের প্রতি তার প্রতিটি লোমকূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-হলাহলে জর্জরিত।

এবং সে সাম্প্রদায়িকতা এমনই বিশ্বব্যাপী—"যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ"—যে সে ধর্মান্ধতাকেও পরাস্ত করে ধর্মনিয়ন্ত্রিত পবিত্র মহরম মাসে, পুণ্য শুক্রের দিবসারম্ভে তাদের সর্ব পবিত্রতাকে কলুষিত করে শীয়াদের ধর্মবৈরী সুন্নী মূর্খ পাঠানকে উত্তেজিত নিয়োজিত করে তার ধর্মভ্রাতা পূব বাঙলার সুন্নী মুসলমানকে নিধন করতে, তার বধূভগ্নী কন্যাকে—। তাদের শেখানো হয়েছে পূব বাঙলার মুসলমান কাফির। ইয়েহিয়া শুধু মদের নেশায় বলতে ভুলে গিয়েছিলেন শীয়ারা সর্ব সুন্নীকে, অতএব পাঠানকেও কাফের মনে করে।

ইয়েহিয়ার পরলোক ইরাকের কারবালায়, ইহলোক শীয়া ইরানে তিনি ভুলতে পারেন না, ভুলতে চান না যে তাঁর পূর্বপুরুষ কিজিলবাশ্ গোষ্ঠী এসেছে ইরান থেকে—শুধু ভুলে গেছেন তারা ইরানে এসেছিল মূল মাতৃভূমি সুন্নী তুর্কোমানিস্তান থেকে। ইরানের সঙ্গে তাঁর দোস্তী; পূব বাঙলার সুন্নী তাঁর দুশমন। তাঁর দোস্ত ইরান তাই তাঁর সুন্নী নিধন কর্ম সুসমাপ্ত করার জন্য শানিয়ে দিচ্ছে তাঁর তলওয়ার, সওগাৎ পাঠাচ্ছে বোমারু বিমান।

হঠাৎ সংবিতে ফিরে এলো শিপ্রা। জিমি সম্বন্ধে শেষ কথা তার যা জানার ছিল সেটা জানা হয়ে গিয়েছে। তার আনুগত্য ইংলণ্ডে বা কানাডার প্রতি এক্সট্রা টেরিটরিয়াল নয়।

আমাদের মেয়েরা একদা "অষ্ট অলংকার" দিয়ে প্রসাধন করতেন, "ওষ্ঠরঞ্জন" ইদানীং বহুস্থলে—হোটেলে, ট্রামে-বাসে, থিয়েটারে—তাঁদের এক মাত্র অলংকার। পক্ষান্তরে গোরা রায় অদ্যাপিও "অষ্টপদী" ব্রেকফাস্ট খায়! তারই এক ঢাউস সংস্করণ বেয়ারা এনে রাখলো জিমির সামনে।

শিপ্রা বললে, "আজ এই খাও। এতদিন তোমার কর্তব্যের আওতায় না পড়া সত্ত্বেও তুমিই যে আমার খানার তদারকি করতে সে আমি জানি।" একটু মৃদু হেসে বললে, "আর কলকাতার বাড়িতে খাবে পুঁইশাকের চচ্চড়ি আর মোচা-ঘণ্ট।"

"কিন্তু আপনি অর্ডার দিলেন কখন?"

"ওহে জনপদবাসী যুবক, আমি নাগরিকা। আমাদের টেকনিক ভিন্ন। আমার চেয়েও সুচতুরা, বিদগ্ধা নাগরিকার নাম বেয়াত্রিচে। আমাকে গুলে খেতে পারে। এসো কলকাতায়। এই এপ্রিলেই। ঐ কথাই রইল—ডান্?"

"ডান্! অনার ব্রাইট। ঐ কথাই রইল।"

শিপ্রা সেন্টিমেন্টাল নয়। শব্দটি ইংরিজিতে স্থান বিশেষে সব সময় প্রশংসনীয় নয়। বাঙলায় আমরা বলি "ভাবাবেগে গদ্গদ হওয়া", "উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হওয়া" কিংবা যে-রকম বলা হয়, পড়ুয়া প্রহ্লাদ যখন বর্ণমালার "ক" অক্ষরে এলেন, তখন কৃষ্ণ নামের স্মরণে ভাবাবেশ মূর্ছিত হয়েছিলেন। শিপ্রার অনুভূতি এস্থলে সে পর্যায়ের নয়। সে দেখতে পেয়েছিল জিমির ভিতর একাধিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য যে-গুলোকে সাধারণ জন রেসেপ্সনিস্টের মামুলী কর্তব্য বোধ মনে করে তার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করতো না। সব ভালো হোটেলেরই রেসেপ্সনিস্ট—এমন কি ক্লাব-চ্যাটার বক্সের সমগোত্রীয় হোটেল-স্নব হয় তো বলেই ফেলতো, ছোকরার উচ্চারণ "ট্যাশুয়া"—চেষ্টা করে গেস্টের সেবা, কিন্তু সেবাই যে জিমির ধর্ম সেটা যত না বুদ্ধি দিয়ে ততোধিক অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছিল শিপ্রা। শিপ্রার সেন্টিমেন্ট আছে, কিন্তু সে সেন্টিমেন্টাল নয় কারণ তার সেন্টিমেন্টের পিছনে অহরহ জাগ্রত থাকে পর্যবেক্ষণশীল অন্তর্দৃষ্টি।

শিপ্রা আর জিমি লাউঞ্জে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় একে অন্যকে যখন চিনে নিচ্ছিল, খান ততক্ষণে ঝপঝপ্ গোটা পাঁচেক জিন্ মোকামে পেঁছিয়ে দিয়েছে, রেস্তোরাঁতে বসে কীর্তি সঙ্গ দিয়েছে বটে কিন্তু সে আধ গেলাসও শেষ করতে পারে নি।

মাইক্রফোনে প্যাসেঞ্জারদের উদ্দেশে সমন জারী হয়েছে। খান খপ্ করে কীর্তির গেলাসটা তুলে নিয়ে বটম্ আপ করে বললে, "চ,—যত সব দুশ্চরিত্র পেঁচি মাতাল!"

লাউঞ্জে শিপ্রাদের সামনে দাঁড়িয়ে এবারে বাক্য সম্পূর্ণ করে বললে, "যত-

সব পে‍ঁচি মাতালদের পাল্লায় পড়ে আমার চরিত্রটা ঝরঝরে হয়ে গেল।"

জিমি এখন শিপ্রার প্রটেজে। জিমির ইংরিজি ট‍্যাঁশ্‌ হোক, আর নাই হোক্‌, তার বাঙলাটা খাজা ট‍্যাঁশ মার্কা। শিপ্রা প্রথম তাকে বুঝিয়ে বললে, "পাঁড় মাতাল অর্থাৎ কনফার্মড বুজার, আর পেঁচি মাতাল মানে, যারা আধ ফোঁটা গিলতে না গিলতেই ঘরের ভিতর আটটা পাঁচিল দেখতে পায়।" তারপর খানকে শুধলো, "পেঁচির সহবতে দুশ্চরিত্র হলে কোন্‌ অলৌকিক অধ্যবসায় এবং ইন্দ্রজাল-ভানুমতীর সমন্বয়ে।"

খান হাহাকার সহকারে বললে, "হায় হায়, এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্যন্ত জানো না, সুন্দরী। তাই বলছো ভানুমতীর খেল। ঐ যে আমাদের পাঁড়স্য পাঁড় কেষনগরের ব্যারিস্টার গোসাঁই, তাকে লণ্ডনে পুলিশ ধরে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। অপরাধ? রাস্তায় মাতলামো করেছে রাত দুটো অবধি। পুলিশ যা প্রমাণপত্র পেশ করলে তার সামনে হাকিমের মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না, ব্যাটা পাঁড়। তবু জানো তো, ব্রিটিশ জাস্টিস, অপরাধের পুরো বয়ান শোনার পর তবে তো স্থির করবে, দণ্ডটা গুরু না লঘু হবে। আসামীকে শুধোলেন, এমন কি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল, এমন কি কোনো বিপাকে পড়েছিলে যে ফলে বেহেড মাতলামোটা করলে?

গোসাঁই চিঁ চিঁ করে করুণ কণ্ঠে বললে, 'আমি দুজন অসচ্চরিত্র লোকের পাল্লায় পড়েছিলুম, ধর্মাবতার, ইওর অনার।'

জজ উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'খুলে কও।'

গোসাঁই অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে, 'মি লার্ট্‌, আমার সঙ্গী-দুটো যে এতখানি দুশ্চরিত্র জানা থাকলে আমি কস্মিনকালেও ওদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতুম না। দুই শুয়োরই—বেগ্‌ পার্ডন, স্যর—টি টি, টী টোটেলার মদ্যস্পর্শটা মুসলমানদের চেয়েও হারাম বলে বিশ্বাস করে। ক্রিস্‌মাস, আপন আপন জন্মদিনে পর্যন্ত মদ্যপান করে না।'

প্রহেলিকাচ্ছন্ন দ্বিধাভরা কণ্ঠে জজ ফের বললেন, 'আরো খুলে কও।'

'আর ছিল, হুজুর, একটা পুরো মেগ্‌নাম্‌ সাইজের হুইস্কির বোতল—খাঁটি স্কচ্‌, ছিপি পর্যন্ত খোলা হয় নি। সেই সমস্ত বোতলটা আমাকে একাই খতম করতে হল, পাষণ্ডেরা কিছুতেই হিস্যে নিলে না। মেগ্‌নাম্‌ বোতলে নেশা হবে না তো কি হবে? ঐ দুটো লোককে দুশ্চরিত্র বলবো না তো কি বলবো, কুসঙ্গ বলবো—'"

কলকাতার স্মার্ট্‌ সেট্‌-এর কায়দা-কেতা প্রটোকল-বাঁধা। কোন্‌ অঙ্গের রসিকতায় মুখে ফুটবে একটুখানি স্মিত হাস্যের ক্ষীণাভাস, কোন্‌ পর্যায়ের চুটকিলাতে শীতের ফাটা ঠোঁটের চেরা হাসি, মোনা-লিসা-স্মিতহাস্য করে করে

সুরে সুরে সর্বশেষে রবীন্দ্রাগ্রজ "বড়বাবু"র ঠাঠা অট্টহাস্য। শিপ্রা কোনো প্রটোকল কখনো মানে নি, তার হাস্যমাত্রা কি হবে সেটা 'মেট্-এর' আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু গাঁইয়া জিমি একহাতে মুখ চেপে অন্য হাতে পেট চেপে দু'ভাঁজ হয়ে গিয়েছে।

শিপ্রা বললে, "আম্মো সেই লণ্ডনী জজের মত রহস্যাচ্ছলা হয়ে শুধোই, এস্থলে কথিকাটি কি ভাবে প্রযোজ্য।"

"আরে কও কেনে? আমি সদাই সাথীরূপে রাখি ছ'টা বিগ্ হুইস্কি, ছ'টা 'রা' জিন্—তোমাদের এই প্যারা কংগ্রেস সরকারের মেহেরবানীতে এ-সব সুধা ভারতময় লুকোচুরি খেলে, কটকে রাজরাজমহেন্দ্রবরম বা তিরুচিরপল্লী কোন্‌টা ড্রাই, কোন্‌টা ওয়েট, কোন্‌টা স্যাঁৎসেঁতে, সেটা আবার হঠাৎ এক লম্ফে বোনড্রাই হয়ে গিয়েছে কবে, তার নেই খবর—মরো গিয়ে সেখানে সুধার অভাবে। অতএব প্রকৃষ্টতম পন্থা ক্যাঙারু পদ্ধতি। আপন থলেতে আপন মাল নিয়ে চলা-ফেরা করা। আজ সঙ্গে ছিল ছ'টা বড়া জিন্ আর ছিল আন্দেশা, দুনো ইয়ারের তরে বাড়ন্ত হলেই তো সব্বোনাশ—নাশ নয় লাশ—আখেরে হল সর্বনাশই। ছ'টার সাড়ে পাঁচটা খেলুম আমি, ইয়ার খেলেন হাফ্। চরিত্র নষ্ট হল না আমার, এই পেঁচি মাতালটার পাল্লায় পড়ে? বরঞ্চ গোসাঁইয়ের কপাল ছিল ঢের ভালো, তার প্রলোভন ছিল মাত্র সেই বোতলটা। কাউকে খেতে দেখলে, কিংবা যদি কেউ সঙ্গ দেবে বলে জানা থাকে তবে প্রলোভনটা হয় প্যারাডাইজে সেই প্রথম নর-নারীর মত নজীরহীন, অভূতপূর্ব লালসা ভরা আপেল। এক পেগ আপেল, নো, আই মীন একটা আপেল—সেটা হাফাহাফি করে খেয়ে একে অন্যকে উৎসাহিত করলো। বাবু কীর্তিনাশ আমাকে সঙ্গ দেবার লোভ দেখিয়ে চাটলেন তাঁর জিন্‌টা, পেঁচি রাঁধুনী যে-রকম আড়াই ফোঁটা ঝোল চেটোতে নিয়ে দেড় বার চেটে নুনটা পরখ করে নেয়। এখন বলো, ভদ্রে শিপ্রা, সম্পূর্ণ মদ্যবর্জিত লোক এবং কীর্তি কে বেশী বিপজ্জনক দুশ্চরিত্র! তবে কি না, একটা সান্ত্বনার কথা, শুধু ঐ ছ'টা জিন্ পেগ নয়,—ছ' বোতল স্কচ আর তিন বোতল স্কচ লুট করেছি ঐ পাতি স্পাই পাঞ্জাবীটার ঘর থেকে।"

ত্রিমূর্তি বাক্‌হারা, স্পন্দনহীন। এলেফেণ্টার প্রস্তর ত্রিমূর্তি এদের তুলনায় তখন মুখরিত বাচাল।

নবম অধ্যায়

পোঃ আলীগ্রাম
গ্রাম পাহাড়পুর, সিলেট,

"'দোয়া পর সমাচার এই,
স্নেহের শিপ্রা বোন—"

শিপ্রা যেন বিজলির শক্ খেল। খামের উপর ছিল ভারতীয় স্ট্যাম্প। ঠিকানাও অচেনা হাতের। অলস অবহেলায় চিঠি খুলেছে, আনমনে পড়তে শুরু করেছে—হঠাৎ বুঝতে পারলো এ যে বিল্‌কিসের চিঠি! কত যুগ পরে! চিঠির ডান কোণে তাকালো—হ্যাঁ, সিলেটের ঠিকানা। খামটা তাড়াতাড়ি বাস্কেট থেকে তুলে নিল—ঠিকই তো দেখেছে। ভারতীয় স্ট্যাম্প। তারিখ বিশ। তখনো তো মানুষ পূর্ব বাঙলা ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করে নি। পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর আগাগোড়া চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে ধরে ফেলল জায়গাটা যেখানে তার উত্তর আছে। লিখেছে ঃ

"এখানকার অবস্থা এমনই অস্বাভাবিক যে চিঠিটা এক হিন্দু ভদ্রলোক মারফত ভারতে পাঠালুম। ভদ্রলোক সেই পার্টিশনের সময় থেকে সব রকমের ঝড়ঝঞ্ঝা সয়েছেন, কিছুতেই দেশত্যাগ করতে রাজী হন নি। কাল হঠাৎ এসে আমার মেয়েকে বললেন, তাঁকেও শেষ পর্যন্ত ভিটের মায়া ত্যাগ করতে হল। মেয়ে আশ্চর্য হল, কারণ আমাদের অনেকেই তো এখনো পুরো আশা ধরে আছেন, লীগ আর ইয়েহিয়াতে সমঝোতা হওয়া খুবই সম্ভবপর। অথচ একাধিক বার যখন হিন্দুদের চতুর্দিকে ঘোরঘুট্টি অন্ধকার, প্রায় সবাই পালাচ্ছে তখনো তিনি প্রতি সন্ধ্যায় এখানে এসে বৈঠকখানায় তোমার জামাইবাবুর সঙ্গে দাবা খেলে গেছেন। উপস্থিত হিন্দুদের ভিতর বিশেষ কোনো চাঞ্চল্য নেই, তবু তিনি বৌবিকে বললেন, এত দিন বাইরের গুণ্ডা এসেছে মার-পিঠ লুঠতরাজ করতে, তাঁর হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশী, ইয়ার দোস্তের সাহায্যে তিনি তাদের ঠেকিয়েছেন। এবারে—তাঁর স্থির বিশ্বাস—স্বয়ং সরকার আসবে বেহদ্দ জুলুম করতে। জুলুম করতে আসে যে-সরকার তার জাত নেই, ধর্ম নেই। মুসলমান হিন্দু কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না। বৌবি তাঁর ইঙ্গিতের কিছুটা ধরতে পেরে ভয় পেয়ে শুধলো, মুসলমানদের উপরও জুলুম চলবে না কি? তিনি ভালো মন্দ কোন উত্তর না দিয়ে বৌবির হাতে চন্দন কাঠের একগাছি মালা দিয়ে চলে গেলেন। ভশচায মশাই করিমগঞ্জ হয়ে কোথায় যাবেন সেটা এখনো স্থির করতে পারেন নি। দাদার বন্ধু শ্রীযুত দেশরঞ্জন চক্রবর্তী, করিমগঞ্জ, কাছাড়, ঠিকানায় উত্তর দিয়ো। ভশচায আমাদেরই মত

সাদামাটা মানুষ; তাঁর দিব্যদৃষ্টি আছে এ-রকম কোনো খবর বা গুজোব আমার কানে কখনো পেঁছয় নি, ভবিষ্যদ্বাণী করতেও শুনি নি। তাই তাঁর দেশত্যাগ শুধু বেদনা দিচ্ছে। এর মধ্যে আশা বা নিরাশার কোনো আভাসই নেই।

বাইরে যথেষ্ট। মিনিটে মিনিটে রকমারি খবর গুজোব এখানে পেঁচাচ্ছে—আমাদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত। কোনটা সুখবর, কোনটা দুঃসংবাদ সেটা পর্যন্ত সব সময় বোঝা যায় না—কারণ তারই ফল আখেরে কি হবে, কেউ অনুমান করতে পারে না। সর্বোপরি বেবি আর তার বেতার। ঢাকা বলে এক কথা, পিণ্ডি বলে উল্টোটা, লণ্ডন মনস্থির করতে পারে না। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলুম, ইণ্ডিয়া ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে কি? কলকাতা শুনে তো মনে হয় না। কিন্তু কে জানে? হয়তো দিল্লীই জানে সবচেয়ে বেশী কিন্তু উচ্চবাচ্য করাটা সময়োপযোগী বলে মনে করছে না।"

চুপ করে শিপ্রা ভাবতে লাগলো—বাকি চিঠি পড়া স্থগিত রেখে। একরাশ চিন্তা একটা আরেকটাকে ঠেলে ফেলে কোনোটাই তার শেষ সীমানা অবধি পেঁছয় না। শুধু একটু বেদনাবোধ তার হৃদয় মনের গভীর অতলে বসে আছে। তার কোনো পরিবর্তন নেই। ওয়ান জাস্ট্ কান্ট্ থিংক ইট আউট—বহুকাল ধরে সে জানে বিল্‌কিস্‌দিদের পক্ষে দেশত্যাগ করে কলকাতা চলে আসাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কতকাল হয়ে গেল, কতবার সে অনুরোধ করেছে একবার দেশ থেকে বেরিয়ে আসতে—দু'দশ দিনের জন্য। সে নিজে যাবে স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়াটা হয়ে গেল বটে কিন্তু সেটা পাহাড়পুর নয়, সেটা স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়পর্বত, নদী হ্রদ। তারপর দীর্ঘ নীরবতা। আলস্য, জড়ত্ব।

আবার চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করলো, অন্য এক জায়গা থেকে। লিখছে, প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য দেশের খবর দেবার মত কিছুই নেই। সব পরস্পর-বিরোধী। এবং সবচেয়ে মারাত্মক যে পাপ বিষ প্রত্যেকের দেহমনকে আচ্ছন্ন করে তাকে নির্জীব, ক্লীব করে দিচ্ছে সেটা ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা। কেউ জানে না, কার কপালে কি আছে? কোনো সন্দেহ নেই, এখন, এই মুহূর্তে দেশের পনেরো আনা লোক—মেয়েছেলেরাও পিছিয়ে নেই—লীগপন্থী। সত্য বটে এ-রকম সর্বব্যাপী আন্দোলন আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নি। তবু মনে ভয় জাগে একাধারে ভাবালুতার উচ্ছ্বাস, অন্য দিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন জড়ত্ব—এ দুটোর ভিতর জিতবে কোনটা যদি কখনো পরীক্ষা আসে।

শেষ কথা। বেশীর ভাগ লোকের বিশ্বাস, লীগ ইয়েহিয়াতে যদি সমঝোতা না হয় তবে পূর্ববঙ্গবাসী যে আন্দোলন আরম্ভ করবে এবং সেটাকে আয়ত্তে

আনার জন্য জুণ্টা যে দমননীতি প্রবর্তন করবে তার আন্দোলনটা সেই স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে যে-ধারা বয়ে ইয়েহিয়াতে এসে পৌঁচেছে সেই সনাতন ধারা বয়েই চলবে, সেই প্যাটার্নই যুগধর্মের বর্ণে রঞ্জিত হয়ে স্বপ্রকাশ হবে— মাঝে মাঝে কখনো বা ভাষার জন্য, কখনো বা য়ুনিভার্সিটির উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে কয়েকটি নিষ্পাপ যুবক আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হবে; এবং ইয়েহিয়ার দমননীতিও সেই আলীপুর মামলার ফলস্বরূপ কয়েকটা দ্বীপান্তর ধরনের শাস্তি, জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য টিয়ার গ্যাস, হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় রবারের নল দিলে জোর করে গেলানো, কখনো বা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ, গোপনে গোপনে কিছুটা উৎপীড়ন—এই প্রাচীন রাজকীয় পন্থাই অবলম্বন করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-পন্থার সমান্তরাল হয়ে চলবে সেই সনাতন তোষণ-নীতি—মোমেন খানদের সংখ্যা বাড়ানো হবে অকাতরে, স্পাই পোষা হবে অগণিত এবং অধুনা যে ছাত্র-আন্দোলন দ্রুতবেগে উগ্র হতে রুদ্রতর রূপ ধারণ করছে সেটাকে করায়ত্ত করার জন্য বিস্তর ছাত্র-স্পাইকে অকৃপণ হস্তে বিতরণ করা হবে দেদার কাঁচা টাকা, মাসিক মাইনে, তাদের ককটেল পার্টির জন্য কাপ্তাই ড্যামাবদ্ধ পরিমাণ নিষিদ্ধ পানীয় এবং সমান্তরাল পন্থায় সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে সসম্মানে এগিয়ে যাবে এতাবৎ সরকার কর্তৃক পদদলিত, সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত ভাড়াটে গুণ্ডার পাল—যে-সব ভ্রষ্টমতি, দুষ্টবুদ্ধি, রাষ্ট্রদ্রোহী, পঞ্চনদবৈরী সম্প্রদায় সরকারের মেহেরবানী কদরদানী তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করে সদাশয় সরকারের প্যারাদের বদনমণ্ডলে আপন গণ্ডদ্বয় পূর্ণ নিষ্ঠীবন বিচ্ছুরিত করে লাঞ্ছিত করেছে—তাদের পৃষ্ঠস্কন্ধমস্তকে সরকারী ফরমান মাফিক লগুড়াঘাত করতে করতে।

বোন শিপ্রা, বুঝতেই পারছো, এটা আমার ভাষা নয়। আমাদের পাশের গাঁয়ের এক সরল গোসাঁইজীকে সেই দেশত্যাগী ভট্টাচার্য যাত্রাকালে একখানা চিঠি লেখেন। বেচারী গোসাঁই সেই চিঠি তোমার জামাইবাবুকে কাঁদতে কাঁদতে পড়ে শোনান।

সর্বশেষে ভশচায ইতিপূর্বেই যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সেইটেই যেন প্রাণখুলে লিখেছেন, যেন গোর গোসাঁইয়ের নরম বুকটি খান খান করার জন্য কিংবা যাবার বেলা সেটাতে হিম্মৎ ভরে দেবার জন্য। লিখেছেন, "এক দরবেশ একদা আমায় বললে, খুদা-পাক সব শহরে এবং প্রতিটি জনপদখণ্ডে চার চারজন করে সাধুপুরুষ "কুতুব" (মিনার) বা স্তম্ভ রাখেন। সে দেশ, সে জনপদ তাঁদেরই দৃঢ়াত্মার উপর নির্মিত। এ অঞ্চল তুমি একজন, তোমার পিতা ছিলেন আর একজন। এঁরা স্বেচ্ছায় কদাচ, কুত্রাপি দেশত্যাগ করেন না। ভুবনেশ্বরের দৈবাদেশে যদি মাত্র একজনও দেশত্যাগ করেন তবে সে-দেশ, সে অঞ্চলের জনপ্রাণী কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সমূলে বিনষ্ট হয়—"সমূলস্তু বিনশ্যতি", "মহতী

বিনষ্ট”—অন্য তিন মহাত্মা “কুৎব্”সহ। তুমি জানো—তোমাকে আর কী শেখাবো—সম্পূর্ণ গ্রাম যদিস্যাৎ খাণ্ডবদহনে ভস্মীভূত হয় তবে সর্বজনপূজ্য মহাকাল মন্দিরও নিষ্কৃতি পান না। দরবেশ ফার্সীতে বলেছিলেন ঃ

দাবানল যবে জনপদভূমি
দগ্ধদহনে দহে
কিবা মসজিদ, কবরসৌধ
প্রভেদ কিছু না সহে।

তুমি, গৌর, এ-অঞ্চল ছাড়লে এর সর্বনাশ হবে।

তাই যাত্রারম্ভে তোমাকে সে-প্রস্তাব দি নি।

গুরু সাক্ষী, তোমার আখড়া সাক্ষী, তার রাধামাধব বিগ্রহ সাক্ষী, আমি কস্মিনকালেও ভবিষ্যদ্বাণী করি নি। তবু একটা কথা বলে যাই, দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর ধরে আমি নিরবচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানে বাস করেছি, তার দৈনন্দিন পরিবর্তন, ক্রমবিকাশ, পতন-অভ্যুদয় সাগ্রহে লক্ষ্য করেছি। এরই উপর নির্ভর করে আমার ভবিষ্যৎ দর্শন গণনা। এর সঙ্গে গণৎকারের ফলিত জ্যোতিষ গণনা পদ্ধতির কণামাত্র সাদৃশ্য সামঞ্জস্য তো নেইই, অপিচ ফলিত জ্যোতিষীর ব্যাক্যাড়ম্বরসহ ভ্রান্তিমুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করার কোনো প্রকারেরই শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।

জনসাধারণের বিশ্বাস, ঢাকার দর কষাকষি নিষ্ফল হলে পূব পাক রাজনীতি সেই প্রাচীন ধারা বেয়েই চলবে, হয়তো ঈষৎ দ্রুততর বেগে। সঙ্গে সঙ্গে দমননীতিও তার ধারা বেয়ে চলবে, হয়তো ঈষৎ উদ্দামতর বেগে, রূঢ়তর পরিমাণে। মোদ্দা কথা প্যাটার্নের পরিবর্তন হবে না।

সেখানে আমার বক্তব্য, না, অবশ্যই হবে।

প্রথম সম্ভাবনা ঃ কলমের এক খোঁচাতে পূব পাক্ যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন চায় সেইটে রাতারাতি পেয়ে যাবে। এটা কিছু অভিনব ইন্দ্রজাল নয়। খুদ পাকিস্তানের জন্ম ও স্বাধীনতা কলমের এক খোঁচাতেই হয়েছিল। সে উদ্দেশ্যে ক'জন লোক, কি স্বার্থত্যাগ করেছে, শুনি? ক'জন নেতা কারাবরণ নির্বাসন গরম করেছিলেন বলতে পারো? এক সিলেটী খালাসী তার সরল ভাষায় বলেছিল, 'স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান অর্জন করলেন জিন্না সাহেব তাঁর পাতলুনের ভাঁজ—ক্রীজ—সমুচা চোস্তু রেখেই, ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ ফুঁকতে ফুঁকতে। তিনি যদি গাঁধী নেহরুর মত জেলে ফেলে যেতেন তবে গোটা হিন্দুস্তানটাই তার কব্জাতে এসে যেত।' অন্তত এ-কথা তো সত্য যে, ইংরেজ অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাক্ রাষ্ট্র নির্মাণে সম্মতি দিল তখন হবু পাক্ নেতারা রীতিমত সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন।...তারপর গেল তেইশ বৎসরের মধ্যে 'কলমের এক খোঁচাতে' কি রত্তিপরিমাণ স্বাধিকার অর্জন করতে পেরেছে?

সে প্যাটার্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবশ্য বলতে পারো, সেটা ১৯৪৭-এর প্যাটার্ন ? তাই সই। আমার প্রতিপাদ্য ছিল গত তেইশ বৎসরের প্রচলিত প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি আর হবে না। ইয়েহিয়ার কলমের এক খোঁচাতেই যদি স্বায়ত্তশাসন ভূমিষ্ঠ হয়—এবং এ-তথ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য যে মধ্য ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাঁর সে সদিচ্ছাই ছিল—তবে আর যা বলো, আর যা কও সোঁদরী কাঠের লাঠি আপাদমস্তক নিষ্প্রয়োজন। আমার ইয়ার মৌলবী সাহেবের জবানে, বিলকুল বেকার, বেফায়দা ফজুল ! এটা বললুম, নিতান্ত কথাপ্রসঙ্গে।

বিকল্পে যদি তা না হয়, তবে 'ঈশ্বর রক্ষতু' ! তখন যে দমননীতির বজ্রপাত হবে সেটাও সেই মান্ধাতার আমলী টিয়ার গ্যাস ছেড়ে হেথা হোথা বন্দুকের গণ্ডা কয়েক ফাঁকা আওয়াজ মেরে, দু'দশ জনকে শহীদ পর্যায়ে উত্তোলন করে পুনরায় সেই প্রাচীন প্যাটার্নের অনুকরণ করবে না। (খুদাতালার দোহাই, এঁরা আমার নিত্যপ্রাতঃস্মরণীয়) এটা হবে সম্পূর্ণ অভিনব, অভূতপূর্ব, অবিশ্বাস্য, অতুলনীয়। যদিও বা কলমের এক খোঁচায় স্বরাজ দানের উদাহরণ আমাদের কারো কারোর স্মরণ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, কিন্তু এই সিলেটে তথা পূর্ববঙ্গে দমননীতির চরমতম বীভৎস বিভীষিকার প্রকাশ [illegible] আমাদের স্মৃতি মন্থনে প্রভাসিত হচ্ছে না। অস্মদ্দেশীয় সাতিশয় নগণ্য সংখ্যক দু'একজন মাত্র জানেন যে আমাদের সমসাময়িক কালেই বহু দূরের এক সভ্য দেশে অভূতপূর্ব এক নবীন প্যাটার্ন বুনেছিলেন বহু বিচিত্র প্যাটার্নের সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ইতিহাসের এক অত্যুদ্ভূত অলিম্পন ডিকটেটর হিটলার। ক'জন জর্মন কল্পনা করতে পেরেছিল যে লুথার, কাণ্ট, গ্যোটে, বেটোফনের মত চিন্তাশীল, রুচিবান দেশে হঠাৎ এমন এক সৃষ্টিছাড়া কিং-নর আবির্ভূত হয়ে মাতৃভূমির সর্ব ঐতিহ্য সর্বসাধনার ধন লণ্ডভণ্ড করে এমন এক নৃশংস নিপীড়ন, সর্বব্যাপী নিধনযজ্ঞ প্রজ্বলিত করবে যে তার তুলনার জন্য মানুষকে এ-যুগ ছেড়ে যেতে হবে চেঙ্গিস আট্টিলার সন্ধানে ?

আর ভুলো না গোসাঁই, হিটলার যুদ্ধজীবী ছিল না। তার উভয় কুল অসামরিক। সে নিজে চিত্রকর। এখানে ইয়েহিয়া, তার মন্ত্রণাদাতা, তার আদেশ বহনকারী সর্বভূতে আছে মাত্র একটি ভূত—তেজস্, অগ্নি, রণাগ্নি। এদের প্রত্যেককে তুমি ফৌজাবতার নাম দিতে পারো। এমন কি ইয়েহিয়া-হারেমের রানী, প্রধান রক্ষিতার জনসমাজে প্রচলিত আদুরে নাম "জেনারেল রানী"।

অতএব, যদিস্যাৎ কলমের খোঁচায় সমস্যার সমাধান না হয় তবে বিকল্পে কি হবে ? সবাই ভাবছে সনাতন সঙ্গিনের খোঁচা। না। আমাদের সুদূর এই পাহাড়পুরেও খবর পৌঁছে গেছে ঢাকাতে কি পরিমাণ ট্যাঙ্ক জড়ো হচ্ছে এবং হবে। এবারকার প্যাটার্নে হিটলারের কীর্তিকে ইয়েহিয়ার বিস্ফোরক-চূর্ণ-ধূম্রে

ম্লান করে দেবে, অষ্টাঙ্গ আচ্ছাদিত করে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে দেবে। ঈশ্বরের অভিসম্পাতে যদি এই বিকল্পই সাধিত হয়—আমি সন্ধ্যাহ্নিকের পর প্রতি রাত্রে আমাদের গুরু পীর শাহজালালকে নতজানু হয়ে স্মরণ করিয়ে দি, তিনি তাঁর মাতৃভূমি আরব-ইয়েমেন ত্যাগ করে যেখানে এসে মুক্তি লাভ করলেন সে-দেশকে একমাত্র তিনিই রক্ষা করতে পারেন—তবে আমি যে অনিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে যাচ্ছি, সেখানে হয়তো নিষ্কৃতি পাবো না। তথাপি আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছাড়বো না, সুদিনের প্রতীক্ষায় দিন গুনবো।

মহাত্মাজী পদ্ধতিতে যদি দেশের মনস্কামনা পূর্ণ হয় তবে সোঁদরী কাঠের লাঠি বেকার!

বিকল্পে হিটলার পদ্ধতির ট্যাঙ্ক কামানের সামনে সোঁদরী কাঠের লাঠি বেফায়দা।

তুমি তোমার পিতা গোস্বামী সমাজের উজ্জ্বল নীলমণির পুত্র এবং শিষ্য। আমি জানি, তাই তুমি ওপারে যাবার জন্য নিত্যনিয়ত প্রস্তুত; এখন এপারে থাকার জন্য প্রস্তুত হও।

আমার শেষ অনুরোধ—"

চিঠিটি অসমাপ্ত। বিস্তর দারুণ ইনটারেসটিং বইয়ের শেষ ক'খানা পাতা ছিল না বলে বালিকা শিপ্রা কতবারই না নিষ্ফল আক্রোশে গর্জন করেছে। প্লটটা কী সুন্দর সাজানো, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত কী অদ্ভুত অথচ বাস্তব, চরিত্রগুলো রহস্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন সত্ত্বেও পাত্র-পাত্রী সুস্পষ্ট—পাতা কটির অভাবে অকস্মাৎ সবাই একসঙ্গে কর্পূর হয়ে গেল। কত কাল চলে গেল তারপর। এখন আর সে-অনুভূতির উদয় হয় না। মসিয়ো পোওয়ারো বা "দি সেন্ট" অসমাপ্ত রেখেই, ফরাসী কায়দায় কাঁধে শ্রাগ্-এর সামান্য ছোঁওয়া লাগিয়ে বিলিয়ে দেয়।

জাল আবার এল সেই প্রাচীন দিনের অনুভূমি। অসমাপ্তির নিবিড়ঘন নৈরাশ্য—আক্রোশ দূরে থাক, ক্ষোভেরও শেষ রেশ সে-নৈরাশ্যে ঠাঁই পায় নি। যে লোকটি প্রতি শব্দে, প্রতি ছত্রে, প্রতি দরদী কথায় শিপ্রার চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হয়ে স্বপ্রকাশ করতে করতে তার সম্পূর্ণ আপন-প্রিয় হয়ে গিয়েছিল সে হঠাৎ কোন্ অদৃশ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ যে মরণেরও অধিক মরণ। এ বড় অন্যায়, কঠিন অবিচার।...বিলকিসও এই আকস্মিক অসমাপ্তির উপর কোনো মন্তব্য করে নি।...আজ কোথায় এই জনপদ স্পষ্টবক্তা, সত্যদ্রষ্টা! হঠাৎ শিপ্রার সর্বাঙ্গ ভয়ে শিউরে উঠলো। হিটলারের আগমন ও ফলস্বরূপ শাশ্বত রাষ্ট্রাদর্শবৈরী শ্মশান-ধূম্রে গঠিত পৈশাচিক "তৃতীয় রাষ্ট্রের" গোড়াপত্তন শিপ্রা জয়ী ভটচাযের মত সামান্য যে ক'টি জর্মন বিধিদত্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের প্রায় সবাই প্রাণ দেন সুক্ষ্ম

দড়ে তারে ঝুলতে ঝুলতে ক্রমে ক্রমে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস হতে হতে। কসাই যে-রকম হুক্-এ ঝুলিয়ে রাখে শুকের বাছুরের মৃতদেহ, এঁদের নগ্ন শবও হিমঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল দিনের পর দিন—শত্রু-মিত্র সর্বজনের দর্শন ও শিক্ষা-দানার্থে।

প্রক্রিয়ার পূর্ণ ফিল্ম্ হিটলার প্রতি রাত্রে ডিনারের পর সবান্ধব আদ্যন্ত দেখতেন, আপন প্রাইভেট সিনেমা হলে।

দশম অধ্যায়

নির্জীব কণ্ঠে কীর্তি বললে, "শুনেছ, শিপ্রা ?"

শিপ্রা উঠে গিয়ে কীর্তির দুজানুর উপর কোলে বসে ডান হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, বাঁ হাত দিয়ে তার মাথা বুলোতে বুলোতে বললে, "কিছু কিছু শুনেছি বই কি ? আজকাল বিদেশী বেতারগুলো—কাপুরুষ, মীন্, ইতর, কি গাল দেব ভেবে পাই নে—একটু একটু সাহস সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তোমার মুখে শোনা সে তো ভিন্ন—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কীর্তি বললে, "শুনে কোনো আনন্দ পাবে না। সব খবরই দুঃখের। একটিমাত্র খবর আমাকে এই নৈরাশ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে আশার আলোক দেখায়। সুন্দরবনের পাশ থেকে হাসনাবাদ, যশোর হয়ে—সীমান্তের যতখানি কাছে যেতে দেয়—গিয়েছি ভগবানগোলা, পদ্মার ওপারে পূব বাঙলার সারদা পুলিশ কলেজ, আইয়ুব ক্যাডেট কলেজ—দুটো জায়গাতেই হারামীরা হানা দিয়ে পুলিশকে খুন করেছে। ভাগ্যিস, ক্যাডেট কলেজের বাঙালী প্রিনসিপ্যালে ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু পলিটিশিয়ানদের বহু পূর্বেই অশথ গাছের মগডালের কাঁপন থেকেই কালবৈশাখীর পূর্বাভাস ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছিল বলে মিঞাজী ছেলেদের আপন আপন বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরাই হারামীদের চার নম্বরী শিকার—"

"চার নম্বরী মানে ?"

"অস্ত্র ব্যবহার যারা জানে, তারা ওদের শিকার। পয়লা নম্বর, বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙালী—এরাই ৬৫-র যুদ্ধে লাহোর বাঁচিয়েছিল এবং যত সব বড়ফাট্টাই করনেওলা পাঞ্জাবী পাঠান বলে তারা রণবীর, যোদ্ধার জাত, মার্শাল রেস, এদের সব্বাইকে টিড দিয়ে পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী মেড্ল্ আর ডেকোরেশন। তার প্রতিদান স্বরূপ এই সব প্রাণরক্ষকদের যেখানে মেড্ল্ ঝোলে সেখানে ঢুকিয়েছে রস্ত্র-বুলেট, ইয়েহিয়া মেড্ল্—আইয়ুব মেড্লের জায়গায়। দুই নম্বর : ঈস্ট পাকিস্তান রাইফ্ল্স্—এরা সশস্ত্র পুলিশ।

রাইফেল চালাতে জানে, ব্যস। তিন নম্বর: সাধারণ পুলিশ, যাদের কেউ কেউ একটু আধটু বন্দুক চালাতে পারে। এগুলোর কথা আমরা আগেই শুনেছিলুম। এবার এসেছে চার নম্বর: যে-কটি ক্যাডেট পুর বাঙলায় আছে তাদের ছাত্র এবং প্রাক্তন ছাত্র—এরাও কিছুটা রাইফেল চালাতে জানে। এদের বেশ কিছু ছেলে—কত আর বয়েস হবে, ষোল-সতেরো—পদ্মা পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এসে এখানে ওখানে জড়ো হয়েছে। একটি ছেলে—কি বলবো, শিপ্রা, সে কী লাবণ্যভরা মুখ, আর সর্বক্ষণ চোখেমুখে হাসি লেগেই আছে, আমার কান্না পেল, বয়স তার চোদ্দ হয় কি না হয়!"

শিপ্রা কেমন যেন অজানতে কীর্তির কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মনে পড়লো, ভট্টাচার্য তাঁর বন্ধু গোস্বামীকে লিখেছিলেন, এবারকার প্যাটার্ন যাই হোক না কেন, সেটা হবে সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়। নইলে চোদ্দ বছরের বাচ্চা—? না তো, অভিমন্যুর বয়স কত ছিল?—মনে আনতে পারলো না শিপ্রা।

কীর্তি যে ছিন্নালিঙ্গন হয়েছে সেটা সে লক্ষ্যই করে নি। গলাতে একটু জোর দিয়ে বলে যেতে লাগলো, "তোমাকে শক্ত হতে হবে শিপ্রা, এ-ছাড়া অন্য গতি নেই। এখন শোনো। আমরা সেই চোদ্দ বছরের ছেলেটিকে মোটরে তুলে নিয়েছিলুম। কথায় কথায় বললে, যেন তেমন বলার মত কিছু নয়, জাসটু এমনি, কে যেন কাকে খেয়া নৌকোয় বলছিল, ২৫শে ছিল বিষ্যুৎবার—"

শিপ্রা বললে, "হ্যাঁ, ২৭শে মুহর্‌রম্‌ ছিল ঐ দিন। পর দিন অমাবস্যা।" "ইসলামী পঞ্জিকা" পড়ে পড়ে তার সব-কিছু সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। এমন কি "মুহর্‌রম্‌" যে শুদ্ধ উচ্চারণ সেটাও শিখেছে ঐ পঞ্জিকার মেহেরবানীতে। বললে, "পরে বুঝিয়ে দেব।"

কীর্তি বললে, "শনিবার দিন সকালে ঢাকাতে কারফ্যু ছিল না। এক ভদ্রলোক বেরিয়েছেন তাঁর বন্ধুর সন্ধানে। সে বন্ধু থাকেন যে-পাড়ায় তার পাশের বাজারটা আগের দিন ভোরে হারামীরা পুড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে তাঁর সন্ধান না পেয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন সেই পোড়া বাজারের এক পাশে। এমন সময় একটা ছোট্ট বাচ্চা, 'মা, মা' বলে ডেকে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা পার হতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে—এমনিতেই সে ভালো করে চলতে শেখে নি, তার উপর দু' চোখ জলে ভরে যাওয়াতে কিছুই ঠিক ঠিক দেখতে পারছিল না। রাস্তার ওপার থেকে এক বুড়ি ভাঙা গলায় ডাকছে, 'ওরে দুলাল, ও দুলু, আয় এদিকে আয়।' দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় ভদ্রলোক হয়তো কিছুই লক্ষ্য করতেন না। এখন কিন্তু শুধোলেন, কি হয়েছে? বুড়ি বললে, 'পরশুদিন ওর বাপ রিকশা চালাতে বেরিয়েছিল; এখনো ফেরে নি। রোজ রাত দুপুরে ফেরে। সে-রাতেই তো চাদ্দিকে গোলাগুলি চললো। ভোরের দিকে বাচ্চাটার

মা রাস্তা পেরোচ্ছিল জল আনতে, এমন সময় কোত্থেকে একটা মিলিটারি গাড়ি এদিক দিয়ে জোর হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়ালো। বউটাকে গোটা তিনেক সেপাই একটানে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেল, আমি রাস্তায় পেঁছিতে না পেঁছিতে। দেখলাম গাড়ি বোঝাই অল্পবয়সী অনেকগুলো মেয়েছেলে। মোল্লাজীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম—আমার ছেলে বউয়ের খবর নেবার তরে। তিনি বললেন, মেয়েগুলোকে ছাউনিতে নিয়ে গিয়েছে। ওরা আর ফিরবে না—"

শিপ্রা এতক্ষণ কীর্তির মুখোমুখি টান টান খাড়া হয়ে সব শুনছিল। আস্তে আস্তে ডান হাত মুঠো করে, শক্ত—আরো শক্ত চাপ দিতে লাগলো। নখগুলো বুঝি তেলোতে ঢুকে যাবে। বাঁ হাত দিয়ে ডান মুঠো জোর চেপে ধরলো। ডাইনে বাঁয়ে সে অল্প অল্প টাল খেতে শুরু করেছে। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গিয়েছে, মেলে যাওয়া চোখ দৃষ্টিহীন, কীর্তির চোখের মণি ভেদ করে মহাশূন্যে বিলীন। কীর্তি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তার কোমর ধরতে গেছে। শিপ্রা তাকে নিরস্ত করে শুধোলে, "তুমি মনস্থির করেছ, তুমি কি করবে ?"

অতিশয় শান্ত কণ্ঠে কীর্তি বললে, "সে তো আমি আগরতলাতেই করেছি, তুমি জানো। তবে হয়তো আমার অজান্তে লারীর কুচক্রের ব্যাখ্যান শুনে আমার মন বিরূপ হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। এ কী ঔদ্ধত্য! নিরীহ পূব বাঙলার লোককে নিয়ে তোমরা বন্দুকের জোরে যা-খুশি করতে পারো ?"

শিপ্রার চট করে মনে পড়লো, বহুদিনকার ভুলে যাওয়া একটা ঘটনা। খান্ তাকে বলেছিল, "ঐ যে আমার ক্যাবলা শান্ত কীর্তিকান্ত—ওর মত নির্ঝঞ্ঝাটে প্যালারাম এ-দুনিয়ায় খুঁজতে হলে শকুন্তলার আশ্রমে-ফাশ্রমে যেতে হয়। মাত্র একটিবার একটা ব্যত্যয় ঘটেছিল—কেউ যদি দোসরা একটা বলতে পারে, আমি হাজার টাকা দিতে রাজী। 'বার্ আসিয়াতিকের' টাকার কুমীর মালিক—খোট্টা ফোট্টা হবে—খামখা, অন্তত কীর্তির বিশ্বাস, বিলকুল বে-কারণ, খামখা, ঠাস করে চড় মেরেছিল এইটুকুন একটা বয়ুকে। কীর্তি প্রথমটায় কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করলো। তারপর আমাদের কিচ্ছুটি না বলে মালিকের সামনে কি যেন ফিস্‌ফিস্ করলে। মাইন্‌ড ইয়ু—আগাপাস্তলা সাদা চোখে। মালিক ব্যাটাও কুল্লে দুনিয়ার মত জানতো, কীর্তিকান্ত সাতিশয় কর্মে ক্লান্ত শান্তশিষ্ট প্রাণী। সেই হল তার ব্যাকরণে ভুল। যেমন গুণ্ডাকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা যায়, তেমনি শান্ত স্বভাবকে বস করতে হয় শান্ত স্বভাব দিয়ে। সে কীর্তির দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কি যেন একটা বললে। সঙ্গে সঙ্গে কীর্তি ঠাস ঠাস করে মালিককে মারলে দুটো চড়। হৈহৈ রৈরৈ। পুলিশ এল। মালিকের বক্তব্য, হোটেল বার-এ যে-কোনো ব্যক্তি আইন প্রয়োগ করার ভার

আপন স্কন্ধে নিয়ে—টেকিং ল' ইন হিজ ঔন হ্যাণ্ড—ভায়লেণ্ট এ্যাকশন নেয় তাকে সে 'বার'-থেকে বের করে দিতে পারে। কীর্তির বক্তব্য, বয় যা করে থাকুক না কেন, মালিক আইন প্রয়োগ করার ভার আপন স্কন্ধে নিয়ে ভায়লেণ্ট এ্যাকশন করেছে—প্রথম—কীর্তির আগে। অতএব সে 'বার' ছেড়ে বেরিয়ে যাক্। কে যেন মাফ চাইবার প্রস্তাব করাতে কীর্তি তাকে লাগায় তাড়া।...শেষটায় মোকদ্দমায় কীর্তির জরিমানা হয়। আর মালিককে জজ ভবিষ্যতে সাবধান হওয়ার জন্য ওয়ার্নিং দেন। পরদিন থেকে কীর্তি তিন বেলা ঐ বারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। 'এশিয়ান বার'-এ কীর্তির প্রবেশ নিষেধ এ-হুকুম আদালত দেন নি। হনুমান লঙ্কায় ন্যাজ পুড়িয়েছিলেন বলে তাঁকে কি আর ফিন্‌সে সেখানে যেতে দেওয়া হয় নি। কীর্তি মালিকের উপর কড়া চোখ রাখে, আর মাঝে মাঝে নোটবুকে কি সব টোকে। মালিকের প্রাণ অতিষ্ঠ। তার শেষ আশা, কীর্তি এ-কর্ম কতদিন চালাবে?—ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। উঁহু। ঠিক উল্টো। প্র্যাকটিসের ফলে অভ্যাস। অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় সে তিন বেলার ম্যাদ আরো বাড়াতে লাগলো। মালিক বেয়ারা, বয়কে ভালো করে শাসন করতে পারে না, মালিক চোখ রাঙালেই দেয়াল ঘড়ি থেকে টাইমটা নোটবুকে কীর্তি টুকে নেয়—চড় মারার বাসনা মালিকের মাথায় উঠেছে। চাকরবাকরের পোয়া বারো। তাদের শাসন করলেই তারা এক ঝলক কীর্তির দিকে তাকায়। কীর্তি নোটবুক খোলে।...শেষটায় মালিকই হার মানলো। মাফটাফ কি যেন, মনে নেই।"

খান যদিও শিপ্রাকে বার বার বলেছিল, সবাই তখন কীর্তি যে আণ্ডার ডগ্-এর তরে মালিককে চড়, সরকারকে জরিমানা দিল, তার জন্য পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিল, তবু শিপ্রা লক্ষ্য করেছিল ঘটনার অন্য আরেকটা দিক—সেটা কীর্তির ধৈর্য। ক্ষণতরে উত্তেজিত হয়ে চড় মারা, জরিমানার খেসারতি দেওয়াটা বিরল নয়, কিন্তু দিনের পর দিন ধৈর্য ধরে স্বেচ্ছায় একটা রুটিন মেনে চলা বঙ্গ সন্তানের পক্ষে যে কী "গব্বযন্তনা" সেটা শিপ্রা জানে—নইলে যে-বাঙলা সাহিত্যে সব কিছু আছে সেখানে নিত্য দিনের সহজ কর্ম ডাইরি-লিখন এবং তার থেকে যে ডাইরি-সাহিত্য গড়ে ওঠে—ইয়োরোপে যার ছড়াছড়ি—সেটা একদম নেই কেন?

আজ পূর্ব বাঙলার সাহায্যে দেবার মত যে বিরল 'ধাতু' কীর্তির আছে, সেটা তার ক্লান্তিহীন, নিরবচ্ছিন্ন, অতন্দ্র ধৈর্য। সবুর সে করতে জানে; মেওয়াও সে চায় না।

কীর্তির চেয়েও আরো শান্ত কণ্ঠে শিপ্রা বললে, "কোনো প্রকারের অত্যাচারই তুমি বরদাস্ত করতে পারো না, সেটা আমি অনেক আগেই জানতুম আর আমাকেও এটা কতখানি পীড়া দেয়, সেও তুমি জানো। এ-ছাড়া তোমার

অন্য কোনো কারণ আছে ?”

কীর্তি খানিকক্ষণ চুপ করে ভেবে নিয়ে বললে, “পূব বাঙলার পাশে গিয়ে পশ্চিম বাঙলার দাঁড়ানোটা আমার কাছে এতই স্বতঃসিদ্ধ যে নিজের জন্য আমি কোনো যুক্তি, ঐতিহাসিক নজীর বা আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের সমর্থন খুঁজি নি। তবে সেদিন খানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার মনে পড়ল একজন লোকের কথা। কপাল আমার মন্দ ; একদা বাধ্য হয়ে অধ্যয়ন করতে হয় আমাকে, আন্তর্জাতিক আইন। এ-বিষয়ে বহু দেশের বহু আইনজ্ঞ বিস্তর গ্রন্থ লিখেছেন ; তদুপরি ছিলেন জিনীভা কনভেনশন, সাধনোচিত ধামে গত লীগ অব নেশনস্, আছেন জীবন্মৃতের চেয়েও অধম সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ—”

'ডাক্তারেতে বলে যখন “মরেছে এই লোক,”
তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,
কিন্তু যখন বলে “জীবন্মৃত”
সেটা শোনায় তিতো।'

এবং এমনই নোংরা রকমের তিতো শোনায় যে কবি স্বয়ং পুস্তকাকারে ছাপার সময় এ লাইন কটি বাদ দেন। সে-কথা থাক্। “আন্তর্জাতিক আইন” শব্দ দুটো শুনলেই আমার তেতো হাসি পায়। বহ্বাড়ম্বরপূর্ণ স্ফীতোদর-এর ধারাগুলো নির্মিত হওয়ার বহু আগের থেকেই হোমরাচোমরা রাষ্ট্রগুলো সেগুলো তো ভেঙেছেই, নির্মিত হব-হচ্ছি হব-হচ্ছি যখন করছে, তখনো এগুলো মদমত্ত উদ্ধত পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বার বার প্রমাণ করেছে এর ভারিক্কি ভারিক্কি ধারা-উপধারা সব 'পেপার টাইগারস', এগুলোতে বিশ্বাস করার ভান, ভক্তির ভণ্ডামি দেখায়, একমাত্র নপুংসক, পদলেহী, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল কতগুলো রাজনৈতিক যারা আপন আপন দেশের জনসাধারণের স্বীকৃতি না পেয়ে ঐ সব অস্তিত্বহীন 'আন্তর্জাতিক আইনে'র দোহাই দিয়ে—অনেকটা নেই-ভূত খেদানেওলা ওঝার আগড়ম-বাগড়ম বিড়বিড় করে—ইউনাইটেড নেশনসের পবিত্র জর্ডনজলে বাপ্তিস্ম হয়ে আপন আপন দেশে ফিরে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট, ডিকটেটর রূপে স্বৈরতন্ত্রের অবাধ অত্যাচার-অবিচার চালায়—সুন্দুমাত্র টিকে থাকার জন্য। তাদের জন্য প্রতি মাসের টায় টায় পয়লা তারিখে আসে বন্দুক কামান, রোক্কা রুপেয়া তনখা বৃহৎবৃহৎ রাষ্ট্রের কাছ থেকে যারা এইসব 'রাষ্ট্রপ্রধানদের' মারফত তাদের দেশগুলোকে শোষণ করে—প্রতি মাসের পয়লা তারিখে, 'বাড়িউলী' ও ভাড়াটিনীদের কাছ থেকে এতখানি টায়-টায় তার অতিশয় হক্কের পাওনা অষ্ট-গণ্ডা, ন'সিকে পায় না। পুতুল রাজার পাল আর তাদের মনিব দু'দলই প্রতিদিন দুই কায়দায় দুনিয়াটাকে শুনিয়ে দিচ্ছে, 'আন্তর্জাতিক আইন'—ফোঃ! ছোঃ!”

শিপ্রা জানলা দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে পার্কের নিরস ঘাসের দিকে তাকিয়ে

নির্জীব কণ্ঠে বললে, "আমারও দে'তো, তেতো হাসির সঙ্গে বেরিয়ে আসছে সেই প্রবাদপ্রায় তত্ত্বকথাটি, তোমারই ভূতের মত উল্টো পা চালিয়ে, 'কাদম্বিনী বাঁচিয়া প্রমাণ করিতেছে, সে বাঁচে নাই'।"

কীর্তি বললে, "তাই সুর মিলিয়ে গাইতে প্রাণ চায়, 'ভীরু মাধবী, বাঁচিবে কি মরিবে কি ? দ্বিধা কেন ?' কিন্তু নিদারুণতম তত্ত্ব, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হতে হয়, শিপ্রা, যখন সেই লোকটির কথা স্মরণে আসে, যাঁর কথা থানকে বলছিলুম। হল্যাণ্ডের হুগো গ্রটিয়ুস, একাধারে বহুবিষয়ে পণ্ডিত, বিশেষ করে ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রে অর্থাৎ জুরিসপ্রুডেনসে অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কমিয়ে সমিয়ে বলতে গেলেও আস্ত একটা দিন কেটে যাবে। ভাবো দিকি নি, সেই কোন্ ১৬২৫-এর কাছাকাছি এক সময়ে এই লোকটি নির্বাসনে, প্যারিসে প্রকাশ করেন "যুদ্ধ ও শান্তিবিষয়ক আইন-কানুন"। সেই আমলে লোকটি স্বাধীন মতবাদ প্রচার করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন স্বদেশে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর ছিল আর একটি লুকনো গুণ, যে-সম্বন্ধে কড়া দণ্ডধর জেলার এবং অন্য সর্বজন ছিলেন তিমিরান্ধকারে—তাঁর নিপুণ চতুরতা। তাই দুই বছর যেতে না যেতে গ্রটিয়ুস হল্যাণ্ডের জেল থেকে পালিয়ে, যখন, সে-দেশময় হুঙ্কার উঠেছে, "ধরো ধরো পাকড়ো পাকড়ো" তারি মাঝখান দিয়ে, নিজস্ব চতুরতা প্রসাদাৎ দিব্য স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে প্যারিসে পৌঁছলেন। ফ্রান্সের রাজা সসম্মানে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে রাখেন। আজো সে-রাজা গুণীজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

আন্তর্জাতিক আইনে' বিশ্বাস করো, আর না-ই বা করো গ্রটিয়ুস্ তার জন্মদাতা বলে আজ সর্বত্র স্বীকৃত। তাঁর যে-সব বিধান তখনকার গুণী-জ্ঞানীদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল আজও সেগুলো বহুলোককে বিস্মিত করে, এবং নিশ্চয়ই বিগ ইয়েহিয়া এবং জুণ্টার বিগার কর্ণে বদ্ধ উন্মাদের প্রলাপবৎ শোনাবে।

সর্বপ্রথম তিনি বলছেন, মানুষে মানুষে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, নেশনে নেশনে তাই হবে। ব্যক্তি বিশেষ অন্য ব্যক্তির অনিষ্ট করলে যে রকম তাকে দমন করা হয়, ঠিক সেই রকম একই মাপকাটি দিয়ে বিচার করতে হবে এক নেশন অন্য নেশনের অনিষ্ট করছে কিনা, যদি করে থাকে তবে সে নেশনকে দমন করতে হবে। এ-কথাগুলো নীতি হিসেবে অনেকেই মেনে নেবে। অবশ্য ভণ্ড মুচকি হাসি সহ।

কিন্তু এরপরই তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, যে ব্যবস্থা অবলম্বন বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছেন সেটা আজ যদি ইউনাইটেড নেশন্সে কেউ প্রস্তাব করে তবে প্রভু খৃষ্টের ন্যায় তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। দুই নেশনে যদি লড়াই লাগে তবে ছোট বড় কোনো নেশনই নিরপেক্ষ

থাকতে পারবে না, সে হক্ক তার নেই।”

শিপ্রা আশ্চর্য হয়ে বললে, “সে কি? সব নেশনকে নামতে হবে লড়াইয়ে?”

উৎসাহিত হয়ে কীর্তি বললে, “ঠিক ধরেছ, গুরু। আমিও প্রথমটায় আমার চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারি নি। আমি তো বাঙলায় বললুম ‘নিরপেক্ষ’ থাকতে পারবে না। আসলে গ্রটিয়ুস ব্যবহার করেছেন, ‘নন্-বেলিজারেন্ট্’, হতে পারবে না, ‘অস্ত্র সংবরণ’ করে থাকতে পারবে না—তিনি সজ্ঞানে ‘নিউট্রেল’ শব্দটি এড়িয়ে গেছেন, সে তো তিনি কাউকেই থাকতে দেবেন না। ঐ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া বশত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে নেশনের সামান্যতম ক্ষয়ক্ষতি হয় নি তাকেও দোষী নেশনকে সাজা দেবার জন্য অস্ত্র-ধারণ করতে হবে।”

“সাজা দেবার জন্য!”

“হ্যাঁ, সুন্দুমাত্র কড়া শাসনের শাস্তি দেবার জন্য। তাতে করে সে-রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধি পেল কি না, আখেরে তার ক্ষতির পরিমাণটা কি দাঁড়াবে—এ সমস্ত কুটিল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা সম্পূর্ণ অবহেলা করে।”

শিপ্রা ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লো। কীর্তির একটা হাত তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে আপন কপালে থাবড়া মেরে বললে, “হায় রে কপাল! সাড়ে তিনশ’ বছর হতে চললো ভদ্রলোকের কোন্ প্রস্তাবটা কে মেনেছে? কোন্ রাষ্ট্র আজ জানে না, পুব বাঙলায় আজ কি হচ্ছে? মাত্র ত্রিশ বছর আগে পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় শক্তিশালী রাষ্ট্র—বাকি দু’জনা আগের থেকেই হাত গুটিয়ে আরাম করছিলেন—তারই প্রধানমন্ত্রী ঘাড় ফিরিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলেন যখন হাহাকার রব উঠেছে অস্ট্রিয়ায়, তার কাতর আর্তনাদ ধেয়ে চলেছে লণ্ডন পানে—ধর্ষণ করছে তাকে গুণ্ডা হিটলার!···কে বলে নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে? বছরটা ঘুরলো কি না, পড়ি মরি হয়ে এবার ছুটলো সেই সৌন্দর্যামোদী গোরা রাজ—চেকদের স্বহস্তে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করার জন্য যাতে করে পিশাচ পুজোর পুরুত হিটলারের এক ঘাতেই পটপট করে সারি বেঁধে সব কটা মুণ্ডুই—থাক।”

কীর্তি একটু চিন্তা করে বললে. “হিটলারের কীর্তি-কাহিনী পড়লে শিউরে উঠতুম একদিন। এখন মনে হয় বেচারীর শেষ সান্ত্বনাটুকুও গেল।”

“মানে?”

“সাধনোচিতপ্রাপ্ত ধামে বসে সে অন্তত একটা গর্ব অনুভব করতো যে, এ-যুগে সজ্ঞানে তার মত নিষ্ঠুরতা আর কেউ দেখাতে পারে নি। পঁচিশের পৈশুন্য-রাত্রে, ইতিমধ্যে বাঙালীর মরণ কামড় খেয়ে সেখানে ইয়েহিয়ার বেশ ক’টি চেলা হিটলারের সঙ্গ পেয়ে ‘হাইল হিটলার’ ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ সম্ভাষণান্তে দু’দণ্ড রসালাপ করতে বসে গেলেন। যথাভ্যাস, হিটলার কাউকে

মুখটি খোলার মোকামাত্র না দিয়ে তাঁর গৌরবময় দিনের ম্যানিকী কায়দায় বলে যেতে লাগলেন, গ্যাস চেম্বার—তার চেয়েও সস্তায় মানুষ খতম করার ইনজেকশন আবিষ্কার, ইহুদি রমণীদের কুন্তলদাম দিয়ে মোলায়েমতম তাকিয়া-কুশন নির্মাণ, লাশের নীল উল্কিতে চিত্রবিচিত্র চামড়া দিয়ে তৈরী ল্যাম্প-শেড—ওহোহো! সেগুলো কী অপূর্ব আলো-ছায়ার আলিম্পন ঘরের সর্বত্র বিচ্ছুরিত করে দিত—"

বাধা দিয়ে এক পাঠান বললে, 'খাবসুরত নয়ী নয়ী চীজের বাৎই যদি তুললেন, তবে, আমার মনে হয়, হুজুর, গৃহস্থ ঘরের উচ্চ কুচ বিশিষ্টা...' হঠাৎ কীর্তি থেমে গেল।

শিপ্রার তিক্ত মুখ কীর্তি ইতিপূর্বে আর দেখে নি। বললে, "এখনো লজ্জা! ভয় তোমার গেছে, জানি, কোনো কালেই খুব-একটা ছিল না। ঘৃণাটা আমাদের কখনো যাবে না। তোমার সম্মুখে যে কঠোর কর্তব্য উপস্থিত সেখানে সহকর্মী সংগ্রহ করার জন্য তোমাকে লজ্জাশরম সম্পূর্ণ বর্জন করে স্ত্রীপুরুষ সকলকেই বলতে হবে হীনতম অশ্লীলতম আচরণের কথা।"

কীর্তি নীরস কণ্ঠে: "পাঠান বললে, 'আমরা জনাদশেক একটা কলেজের মেয়েকে ধর্ষণ করার পর মেয়েটা আমারই নিচে খাবি খেতে লাগলো। বেহুঁশ হওয়ার আগে 'পানি পানি' বলে গোঙরাচ্ছিল, আধমরা গলায় আস্তে আস্তে 'ইয়া আল্লা! ইয়া রসুল!' আরো কী কী সব বিড়বিড় করছিল, আমি জানি নে ওসব, কিন্তু ডেরা ইসমাঈল খানের মৌলবী সাহেবের জবানে শুনেছি। তারপর হাত পা খিঁচতে খিঁচতে হঠাৎ চোখ দুটো ইয়াব্বড়া তাম্বুর মত খুলে গেল। দেখি, চোখের কালো মণিটনি কিচ্ছু নেই, একদম সাদা চোখ দুটো জড় ছিঁড়ে ফেলে সমুচা উল্টে গিয়ে ভিতরের দিকটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে,—আমাদের সর্দারকে ফাঁসী দেওয়ার পর লাশে এ্যাসা চোখ দেখেছিলুম—মার্বেলের মত ধবধবে সাদাতে কিন্তু রক্তের ছিট গোলাবী রঙ ধরে তার পাকা আপেলের গোলাবী গালের মত হয়ে গিয়েছিল।—তখন গাল দুটো হলদে রঙের পুঁজ মাফিক—আলবৎ তখন না, যখন সে ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিল আপন জান নেবার জন্য আর আমরা নিচে তখন তৈয়ার ছিলুম ওকে পাকড়াবার জন্য। আরো কতো পড়লো, আমরা গপাগপ্ পড়ার আগেই ধরে নিলুম। জ্যায়সাকে পাক্কা মেওয়া। হিটলার সাহেব, কী বাতাই আপকো। সবসে খাবসুরৎ দেখলুম, লাল খুন তার দুধের মতো সফেদ উরুর উপর—ওয়াহ্, ওয়াহ্। সব-কুছ আমার পীর সাহেবের মেহেরবানীতে।...কিন্তু, হুজুর, জওয়ান ঔরৎটা বড়া বেতমীজ ছিল। কুছ না—অচানক দম বন্ধ—ছট্‌সে মরে গেল। আমাদের শের দিল খান গয়রহ তিন বেরাদর তখনো বাকী। লেকিন ওরা পাক্কা মর্দ। জিন্দা মুর্দাতে

ফরক করনেওয়ালা পাঠানকা বেটা ওরা নয়। জঙ্গী খান একটা চোটীর ডগা কামড়ে মুখে পুরলো। আমি ছোরা দিয়ে দুসরাটা কেটে—এ্যাসা বড়া কভীভী দেখবার খুশ-কিস্মৎ আমার জিন্দেগীতে হয় নি— পুরা সমুচা হাড্ডিতক কেটে আমার সঙ্গীনের ডগায় খোঁচা দিয়ে সঙীন উ'চা করে ধরলুম। তারপর সব ভাই বেরাদরের তালে তালে হাততালি শুনতে পেয়ে সঙ্গীন উঁচা করে জুড়ে দিলুম মহরম মিছিলের নাচ—আপনি, জনাব-ই-আলা-হিটলার-সায়েব হয়তো জানেন না, মহরম আমাদের সবসে খাস, সবসে পাক্ মাস—আর তখনো চলছে মহরম। মেজর আসদ খান আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বড়া বড়হীয়া খেদমৎ করেছ পুরব-পাকিস্তানের কাফির লেড়কীকে খতম করে—পাক্ মহরম মাসে। সোনার মেডেল পাবে। আমি সুপারিশী চিঠঠি আজই ভেজ দেব।'

হিটলারের লাল গাল তখন হলদে। সর্বাঙ্গে কম্পন।

এমন সময় কে একজন কঠিন দর্শন অপরিচিত, য়ুনিফর্ম-পরা অফিসার এসে উপস্থিত। সেটা হিন্দুর নরক, মুসলমানের দোজখ্, খৃষ্টানের হেল, ইহুদির গেহান্নেম, গ্রীকদের কলাসিস্ কোনো "মুল্লুকেরই" উদী নয়। পাঠানরা ঠাহর করতে পারছিল না, তারা কোথায় এসেছে। তবে এটা যে বেহেশৎ বা দোজখ্ কোনোটাই নয় সেটা বুঝে গিয়েছিল। হিটলার ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিলেন—অত্যন্ত বিষণ্ন বদনে।

অফিসার ডানহাত তুলে "হাইল হিটলার" সম্ভাষণ জানিয়ে শুধোলে, "আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? এ প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় আপনিই ছিলেন প্রথম এবং একমাত্র সদস্য—যাকে বলে ফাউনডেশন মেম্বার। আপনি তকলীফ করে অন্যত্র যাবেন কেন?"

হিটলার বিষণ্নতর বদনে বললেন, "আমি বিখ্যাত জর্মন গোষ্ঠীর একজন; কিন্তু আজ বড়ই লজ্জা পেয়েছি কতকগুলো আকাট, পাঁড় বর্বরের কথায়। আপনারা আমার সাধনোচিত ধাম নির্ণয় না করতে পেরে এই নবীন প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। আমার কোনো আপত্তি নেই—কারণ ইহুদিদের জন্য আমিই এক নয়া নিধনাগার—গ্যাস চেম্বার—নির্মাণ করি। কিন্তু এই পাঠানদের সামনে আমাকে নিত্য নিত্য লজ্জা পেতে হবে, এটা আমার সইবে না। আমাকে বরঞ্চ ডিমোট করে নিম্নাঙ্গের যে-কোনো অগ্নি পুরীষ কুণ্ডে পাঠান।"

অফিসার বিস্মিত হয়ে শুধোলেন, "লজ্জাটা কিসের? আমি অতিশয় প্রাচীন সর্বাভিজ্ঞ অফিসার। আদম ইভের প্রথম পাপ থেকে আরম্ভ করে হেন কোনো অতিশয় উর্বর মস্তিষ্কধারীর অচিন্ত্যনীয় কল্পনা-প্রসূত কোনো আচরণ দেখি নি—অপরাধ নেবেন না—যেটা আপনাকে লজ্জা দিতে পারে।"

হিটলার বললেন, "থ্যাঙ্কু! আমি গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু শুনুন,

আমি ফ্রানসকে পদানত করেছি, আরেকটু হলে আমার চেয়ে ঢের ছোট ক্যালিবারের চার্চিলকেও ঘায়েল করতুম, গ্যাস চেম্বার, অনেক নূতন নূতন উৎপীড়ন পন্থা আবিষ্কার করেছি—সে নিয়ে আমার কোনো অহমিকা নেই। গর্ব, আত্মপ্রসাদ, দম্ভ, ঔদ্ধত্য ছিল আমার মাত্র একটি সামান্য, সংকীর্ণ বিষয়ে—যেটাকে হোমরা চোমরা পলিটিশিয়ান, মিলিয়নের, রাজারাজড়া, বীরবীরেন্দ্র কেউই কণামাত্র সম্মান দেন না, বস্তুত অবহেলা, তাচ্ছিল্য করেন, এমন কি কৃপার চোখে দেখেন—সে বিষয় আর্ট। এ-তাবৎ আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল, কলানৈপুণ্যে আমি কল্পনা পরীর পাখায় ভর করে যে সর্বোচ্চ গগনে উড্ডীয়মান হয়ে নব নব সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম উৎকট উৎকট দৈহিক মানসিক যন্ত্রণাদায়িনী পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলুম, সেগুলি মহাপ্রলয় পর্যন্ত মহামানবের অভাবনীয় গৌরব, বিশ্বমানবের অকল্পনীয় বৈভব হয়ে মহাপ্রলয় পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে আমার জয়ধ্বনি গাইবে। এই মাত্র আমার সে-বিশ্বাস নস্যাৎ হল। এখন শুনছি, দিক দিগন্তব্যাপী চিৎকার।...মহামূর্খ যে-পাঠানের না আছে সাহিত্য না আছে নাট্য যাদের সঙ্গীত শুনে শিবাশৃগাল সোল্লাসে উপযুক্ত শিষ্যপ্রাপ্তির পরিতুষ্টিতে চিৎকারিয়া নব নব কর্ণপটহ বিদারিণী "রাগ-রাগিণী" দ্বারা বনস্পতি মরুভূমি প্রকম্পিত করে—সেই পাঠান আজ আমাকে সর্বজন সমক্ষে, নিপীড়ন কলাশাস্ত্র ও তজ্জনিত সঙ্গীনাগ্রে স্তন সম্বলিত নৃত্যে প্রথম ভাগের প্রথম ছত্র শিক্ষা দান করলো! যে-লোকে আছি তার অন্ত নেই তাই সেখানে অন্তিম বাসনাও নেই, নইলে এই মুহূর্তে বাম করতল নিষ্ঠীবনপূর্ণ করে সেই কুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে সর্ব অবসান ঘটাতুম। আমি চললুম'।"

কীর্তি বললে, "এটা এক ভদ্রলোক আমাকে রসিয়ে রসিয়ে শোনাচ্ছিলেন যে-জায়গার একটা লজঝড় ছাউনিতে—তার নামটাও বিকট—'ফাঁসি দেওয়া' না কি যেন। সেই বাগডোগরা যেখান থেকে তুমি হিমালয় দেখেছিলে, তারই কাছে। ভদ্রলোক নিষ্ঠাবান মুসলমান। পূব পাক্ থেকে এপারে এসে ছেলে-ছোকরাদের জড়ো করে বন্দুক চালাতে শেখাচ্ছিলেন। কথায় কথায় তাঁর মুখে গড়ে নতুন নতুন হাসির গল্প, কিংবা হাসি-কান্নায় মেশানো। আমি একটা খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে অধোমুখে দেখছিলুম সেই হাস্যমধুর লোকটি খোলা আকাশের নিচে, জায়নামাজ পেতে প্রায় দুপুর রাত অবধি নামাজ পড়লেন, দু'হাত তুলে প্রার্থনা করার সময় গুনগুন করে গীত গাইলেন। তিনিই তাঁর আপাতদৃষ্টিতে স্রেফ গুলতানী শেষ করে সভাপঙ্গের আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, চৌধুরী সায়েব, বলুন তো হিটলার ইহুদিকুলকে নির্মূল করার সময় কি খুব বেশী ইহুদি স্পাই, স্যাদিস্ত-এর মদৎ পেয়েছিল? আমি যদ্দুর জানি খুব অল্প কয়েকজন মাত্র।'

আমি বললুম, 'স্পাই স্যাদিস্ত আদৌ পায় নি। যেটুকু যে-ক'জন করেছে

সেটা হিটলার-হিমলারের সেপাইদের গুলিভরা বন্দুকের সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে খেয়ে।'

'অথচ দেখুন, মাতাল লম্পট ইয়েহিয়া ওদিকে আবার কট্টর শীয়া। ভুট্টোর বাপ স্যর শাহ নাওয়াজ খান ভুট্টোকে খাঁটি সিন্ধী মুসলমান বলা চলে না। সিন্ধু দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করে খুদ আরবদের হাত থেকে অষ্টম শতাব্দীতে। পক্ষান্তরে ভুট্টোর হিন্দু পূর্বপুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন রাজপুতানাতে সপ্তদশ শতাব্দীতে। পরে সিন্ধুদেশে চলে আসেন এবং ক্রমে ক্রমে বিরাট বিস্তীর্ণ, আল্লা জানেন কত লক্ষ বিঘের জমিদারি গড়ে তোলেন'।"

শিপ্রা বললে, "বাপ্স্! একবার ভাবো তো মারওয়াড়, রাজপুতানার যারা এদেশে বসবাস করছে, তারা যদি মাছ মাংস খেয়ে আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যেত, তবে আমরা, বাঙালীরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতুম না। পূব বাঙলায় যদি তারা মুসলমান হয়ে যেত—, থাক। বলো কি বলছিলে।"

"ভদ্রলোক বললেন, 'ভুট্টোর পিতা জমিদারীর জোরে ক্রমে ক্রমে জুনাগড় স্টেটের প্রধানমন্ত্রী হলেন। দেশবিভাগের সময় মিঃ জিন্নার নির্দেশ অনুসারে তিনি নওয়াব সাহেবকে জুনাগড় যেন পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিত হয় সেই মন্ত্রণা দেন। কিন্তু হিন্দু মুসলমান প্রজারা রুখে দাঁড়ালো। শেষ ফল তো জানেন। শাহ নাওয়াজ শেষ চিঠিতে জিন্নাকে লিখলেন, "জুনাগড়ের মুসলমানদের পাকিস্তান-প্রীতি নেই বললেও চলে"।

'কিন্তু আশ্চর্য, শাহ নাওয়াজ গোষ্ঠী শীয়া এবং অত্যন্ত গোঁড়া শীয়া। উভয় বাঙলায়ই শীয়ার যে ছিটেফোঁটার ভগ্নাংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে সিন্ধুতে তারও বাড়া—আছি-কি-না-আছি গোছ। তৎসত্ত্বেও।

'শাহ্ নাওয়াজ খানের চারজন বীবী ছিলেন। জনৈক প্রাজ্ঞ সমসাময়িক ঐতিহাসিক-কাম-সাংবাদিক এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, এই ধরনের পরিবারে এইটেই ছিল রীতি। সে-সিদ্ধান্তে তিনি পেঁছিলেন কি করে, সেটা আমি বুঝতে পারি নি—যদিও আমি পূব পাকের নিম্নতম স্তরের জজ ছিলুম বটে, তবু শুধু যে সেই দেশের মুসলিম আইনানুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করতে হয়েছিল তাই নয়, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মুসলমান, আধা-মুসলমান, সিকি মুসলমানদের উপর সম্পত্তি বণ্টন ব্যাপারে দেশাচার কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার গবেষণাও আমাকে করতে হয়েছে। কিন্তু এ-সব শপ্ শুনতে কি আপনার মন যাচ্ছে?'

আমি সবিনয় বললুম, 'ধর্মাবতার, হুজুরই, বেগ্ পার্ডন, মহামান্য আদালতই বিচার করুন। যদি অনুমতি দেন তবে নিবেদন, আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার নই।'

বাধা দিয়ে ছোট জজ বললেন, 'সেটা আর বলতে হবে না। সংবাদদাতা

গুষ্টির নিতান্ত চ্যাংড়া ভিন্ন কোন্ বড়া সাব ঢাকার ইণ্টারকণ্টিনেন্টাল বার্, কলকাতায় তো জাত-বেজাতের এন্তের, ত্যাগ করে হোটেলের দুর্গম প্যাসেজ, বিপদসঙ্কুল বারান্দা পর্যন্ত বেরন সন্দেশ সংগ্রহণার্থে? মাফ করবেন—আপনি বলুন।'

'ও সে তেমন কিছু নয়, মোদ্দা কথা, ওদেরও অধম যারা তামাশা দেখবার তরে হাসনাবাদ থেকে করিমগঞ্জ আগরতলা অবধি রোঁদ মারে, আমি তাদেরও কেউ নই, আর আপনাদের মত, স্বয়ং আল্লাতালা দ্বারা নির্বাচিত শ্রেষ্ঠতম সৃষ্ট দেবদূতের কাছে এসে দাঁড়াবার মত দম্ভ, হীন কৃপার পাত্র বাতুল আমি—'

জজ জিভ কেটে 'ছি ছি, তওবা তওবা' বলে কানে আঙুল দিলেন। 'এ-সব না-হক অভদ্রভাবে বন্ধ না করলে আল্লা পাক আমাকে আমার মায়ের কোলে ফিরে যেতে দেবেন না।' কীর্তি বললে, "ভাবালুতা, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য জজদের সর্বথা বর্জনীয়।" তাই তাঁর আম্মাজানের কথাটা আপন অবিবেচনা মনে করে সেটা ঢাকবার জন্য তাড়াতাড়ি খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'ভারতের যত্রতত্র ভূস্বামী, যত্র তত্র একদারনিষ্ঠতা—এটা মূল সূত্র, অবশ্য বাস্তবতর হবে "একদারদাসত্ব"। চারটে বিয়ে করে বারটা ছেলে পয়দা করলে, ভাগ, তস্য ভাগের ফলে তিন পুরুষেই জমিদারী নিকুচি। অতএব "রীতি" চার স্ত্রী নয়, এক স্ত্রী এবং হারেমে জনাতিনা "খাদেমা" অর্থাৎ সেবিকা, কিংবা ঐ জমিদার বিগ্রহের "সেবাদাসী"ও বলতে পারেন। নিতান্ত যারা আল্লাকে বড্ড বেশী ডরায় তারা দু'জন সাক্ষী সামনে রেখে বিয়ের একটা ভড়ং করে। তা সে যাক্ গে। মোদ্দা কথা, মিঃ জুলৎ-ফিকার আলী ভুট্টোর মাতা শাহ্ নাওয়াজকে বিয়ের প্রাক্কালে হিন্দুধর্ম বর্জন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানেরই একাধিক কাগজ একাধিকবার বলে, বিয়েটা নাকি আদৌ হয় নি। ভুট্টো প্রেমীজন প্রমাণ স্বরূপ বলেন, বিবাহে গুলাম মহম্মদ হিদায়েৎউল্লা ও উল্লেখযোগ্য কিছু লোক ছিলেন। নিন্দুক বলে, "ওটা বিয়ের মজলিস্ ছিল না মোটেই। ইংরেজ যেটাকে বলে nautch—বাইনাচ। প্রধান নর্তকী কে ছিলেন, সে আলোচনা ঐতিহাসিক-কাম্-সাংবাদিকরা করবেন।

বিয়ে হয়েছিল কি না, সেটা তর্কাধীন। জানি যে, আপনার কি মত, কিন্তু সেটা আমার মনের উপর কণামাত্র রেখাপাত করে না। তর্কাতীত সত্য, জুল-ফিকারের মাতা হিন্দুরূপে জন্ম নেন। তার উপরও আমি কোনো প্রাধান্য আরোপ করি নে। এক হজরৎ আলী ছাড়া আমাদের পয়গম্বরের সব শিষ্যই তো মুসলিম হওয়ার আগে আরবদের বর্বর 'ধর্ম' মেনে চলতেন।

কিন্তু যারা ফ্রয়েট্ পদ্ধতি দ্বারা মিঃ ভুট্টোর সর্বপ্রধান 'ধর্ম'—ভারতের প্রতি এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, হিন্দুদের প্রতি তার প্রতি লোমকূপে প্রোথিত বিদ্বেষ, ভদ্রজনবর্জিত ভাষায় সুযোগে, কুযোগে, অযোগে নিত্য নিত্য

তাদের প্রতি কুৎসিততম গালিগালাজ, এই একটিমাত্র অটল অবিচল অপরিবর্তনীয় অবিমিশ্র ধাতু দিয়ে নির্মিত তার সত্তা। তবে কি তার দেহে যে হিন্দু রক্ত আছে সেইটে অস্বীকার করার জন্য, লোকে যেন সেটা স্মরণেও না আনতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই হিটলার প্রশংসিত নীতি, হিট্ হিট্ হিট্, হাতুড়ি দিয়ে হানো, হানো, হানো যতক্ষণ না লোকে পুনরাবৃত্তির ফলে হিপনোটাইজড, সম্মোহিত অবস্থায় তোমার বাণী, সত্যই হোক মিথ্যাই হোক, গলাধঃকরণ করে ?

অপরাধ নেবেন না, আমার স্মৃতি-রাজ্যে শেক্সপীয়রকে দেবার মত আসন নেই—হেমলেট না কে যেন বলেছিলেন তাঁর দেহে তাঁর মাতার যে অংশটুকু আছে সেটা তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিতে চান অথচ ভুট্টোর মাতৃদেবী হয়তো সতী সাধ্বী নারী ছিলেন। এবং আমি এ-সব কথা আদৌ তুলতাম না যদি ভুট্টো স্বয়ং একাধিক বার শেখ সাহেবের "ব্যাকগ্রাউন্ড" নিয়ে গবেষণা করার নির্দেশ না দিয়ে থাকতেন। শেখের ব্যাকগ্রাউন্ড জানে না কে ? আমারই মত পূব বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মামুলী মুসলমান তিনি। ভুট্টো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, পূব বাঙলার সমস্ত "অনাসৃষ্টির" জন্য দায়ী মুজীব এবং তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড। একথা তথাপি তর্কাতীত সত্য যে মুজীবের মাতার সঙ্গে তাঁর পিতার বিবাহ হয়েছিল কি না সে প্রশ্ন ফরিদপুর অঞ্চলের লীগবৈরী, মুজীবের আশু পরলোক গমনাকাঙ্ক্ষী নেমকহারাম বিহারীরা পর্যন্ত করে নি এবং বিয়েটা প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী হেদায়েৎউল্লার উপস্থিতিও প্রয়োজন হয় নি।

ভুট্টো ইসলামের কোনো নির্দেশই মানেন না। ওদিকে ভয়ঙ্কর শীয়া।

জুন্টার নির্দেশে যে-মেজর-জেনারেল ইস্কন্দর মির্জা সর্বপ্রথম "আইনত" ডিকটেটর হয়ে তিন সপ্তাহ রাজত্ব করেন তিনিও গোঁড়া শীয়া। মির্জাই ধর্ম-ভ্রাতা ভুট্টোকে আপন "উপদেষ্টা" রূপে বা "মন্ত্রণা সভায়" ডেকে নিয়ে রাজনীতির সুন্নৎ (সারকামশিসন) করান—অবশ্যই শীয়া কায়দায়। অবান্তর নয় যে মির্জাকে ডিকটেটরিতে প্রমোশন দেবার ষড়যন্ত্রটা করা হয় এক শীয়া-ভবনে, ভুট্টোজনকের প্রাসাদে।

ইয়েহিয়াও গোঁড়া শীয়া। শীয়ারা বিশ্বাস করেন, সুন্নীরা তো মুসলিম নয়ই, তারা কাফির। এবং চরমপন্থী শীয়াদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, সুন্নীমাত্রই "ওয়াজিব উল্ কৎল্" অর্থাৎ সুন্নী দর্শনমাত্রই তাকে নিধন করা শাস্ত্রাদেশ।

ওদিকে জুন্টাতে কোনো শীয়া আছেন বলে শুনি নি। ইসকন্দরের আমল থেকে এযাবৎ জুন্টাই পাক রাষ্ট্রের একমাত্র শক্তিধর।

সেই সুন্নী জুন্টাকে বোকা বানিয়ে, পূব 'বাঙলার মুসলমান মাত্রই "কাফির" সে-তালিম "মুসলমান" পাঞ্জাবী-পাঠান-বেলুচের অস্থিমজ্জায় উত্তমরূপে চুকিয়ে দিয়ে অগণিত বাঙালী মুসলমানকে করালে খুন, তাদের অবলাদের করালে ধর্ষণ, তাদের ঘরদোরে জ্বালালে খাণ্ডবদাহন—মাত্র দুটি শীয়া। অত্যদ্ভুত

পৈশাচিক নৈপুণ্য না থাকলে দুটি মাত্র শীয়া—ইয়েহিয়া এবং ভুট্টো—যাদের কাছে উভয়াপাক্-এর অগণিত সুন্নীই "কাফির" এক পাক্-এর কাফির দিয়ে অন্য পাক্-এর কাফির উৎপাটন করার মত ধৃষ্টতা হৃদয়ে ধরতে পারতো কি?

হিটলার পেরেছিল কি জর্মনির "কাফির" ইহুদিদের বোকা বানিয়ে, তাতিয়ে দিয়ে ফ্রান্সের "কাফির" ইহুদিদের হত্যাধর্ষণলুণ্ঠন করাতে? দূরেই থাক সে দুরাশা! বরঞ্চ সে যাদের মর্ত্যের আদর্শ মানব (সুপার মেন) উপাধি দিয়ে চির জীবন প্রপাগাণ্ডা চালালে, সেই নর্ডিক্ জাতের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—সম্ভ্রান্ত অনেক অফিসার, রমেল সহ, তিন তিন বার চেষ্টা দিল তাকে হত্যা করতে। ফলে দু হাজার থেকে পাঁচ হাজার—কে জানে কত—নর্ডিক্ সুপার মেনকে মেশিন গান্-এর গুলিতে, ফাঁসি কাঠে, শক্ত সরু তারে ঝুলতে ঝুলতে আধ ঘণ্টাটাক শূন্যে পা দুটো আছড়াতে আছড়াতে—এ-পদ্ধতিতে ফাঁসির মত এক ঝটকায় না—দম বন্ধ হয়ে প্রাণ দিলে। এ-যাবৎ কোনো শীয়ার শরীরে আঁচড়টি তক লাগে নি।

এবারে বলুন, চৌধুরী সাহেব, সেই অনামা অমর্ত্য লোকে কার নীচাসন—হিটলারের না ইয়েহিয়ার ফাঁসুড়েদের?"

একাদশ অধ্যায়

আলিঙ্গন ঘনতর করে বাষ্প-ভরা কণ্ঠে কীর্তি বললে, "এই তো আমার অক্ষয় সম্পদ। তোমার প্রেমই আমাকে দেখিয়ে দেবে পথ, ভরে দেবে আমার বুক সাহস দিয়ে, আর সবচেয়ে বড় কথা—আমার মত অপদার্থকে করে দেবে কর্মনিষ্ঠ। যেখানেই যাই না কেন, যেতে যেতে যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ি না কেন, তোমার কথা ভাবলেই পাবো নবীন উৎসাহ।"

মৃদুকণ্ঠে শিপ্রা বললে, "তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই।"

কীর্তি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

শিপ্রা বিদায়-বেলার পীড়া হাল্কা করে দেবার জন্য বললে, "একজন নীরবে চিন্তামগ্ন হলে অন্যজন প্রায়ই বলে, 'তুমি কি ভাবছো সেটা যদি আমাকে জানাও তবে তোমাকে একটা পেনি দেব—এ পেনি ফর ইয়োর থট্'; আমি যদি এটা পাল্টে বলে দিতে পারি, তুমি এখন কি ভাবছো, তুমি একটা পেনি দেবে?"

কীর্তি তবু চুপ।

শিপ্রা বাসনার লহরে লহরে রঙিন দুটি ঠোঁট দিয়ে কীর্তিকে নিবিড় চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিয়ে বললে, "তুই ভাবছিস, মিতা, 'এখন যদি বলি,

আমাকে বিয়ে করো তবে শিপি আগের মত আর না বলতে পারবে না, এইমাত্র যখন কথা দিয়েছে আমাকে তার অদেয় কিছু নেই।' বলু, কিতা, ঠিক ধরেছি কি না?"

কীর্তি একটিমাত্র শব্দে উত্তর দিল, "ঠিক।"

শিপ্রা অভিমানের ছল করে বললে, "বা রে! তুমি কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছো না যে! একদিন আমার দুর্বলতম মুহূর্তে—যেদিন আমি আমার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলুম তোমাকে, অগ্রণী হয়ে, নিজের থেকে নারীর শেষ সম্বল—তুমি আমায় বলো নি, ঐটেই তোমার একমাত্র ভাবনা। আমি তখন সেটাকে হাল্কা করে দেবার জন্য বলেছিলুম, "হৃদয় আর ভাবনা তো একই সত্তা ঃ

'কিবা সে হৃদয়? হৃদয় কাহারে কয়?
সে তো একবিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি।'

শেষ ভাবনা উধাও হয়ে যাবে শেষ কামনা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তখন রইবে শুধু এক বিন্দু শোণিত; ভাবনাটা উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে লোপ হৃদয়ও। ভাবনা-ভরা হৃদয়-হারা সুন্দুমাত্র এক বিন্দু শোণিত তো মানুষ ভিন্ন সব প্রাণীরই আছে। ভাবনাভরা শোণিত বিন্দুটির নামই তো কীর্তি ঠাকুর। আমার ঠাকুর।' উত্তরে তুমি বলেছিলে 'তোমার মন্তব্যটাতে শোণিত বিন্দুও নেই।'···আজ যদি কবির সুরেলা গলার সঙ্গে আমার বেসুরো গলা মিশিয়ে অর্থাৎ একটু পরিবর্তন করে গাই, জানি সেটা জনসমাজে করলে হবে ধৃষ্টতা, কিন্তু তুমি আমি মধুর ভাষে দীন, হিয়া প্রকাশে হীন, তাই কবি সেটা ক্ষমা করবেন—

'হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হল আজি
হেরি আঁখি-ভরা মনে
মম প্রিয়া চিত্তমাঝে বসি স্থির আসনে।'

তা হলে?"

কীর্তি তখনো চুপ।

শিপ্রার আদর যেন অফুরন্ত। বললে, "আজ আমার পেনি জমাবার দিন। যদি বলতে পারি এখন তুমি কি ভাবছো, আরেকটা পেনি দেবে?"

"বলো।"

"মিতা, আমি জানি যে, তুমি জানো, আমি কি উত্তর দেব। এবং সেই নিয়ে তোমার মনে তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে। আগে ছিল ভাবনা, এখন দুর্ভাবনা।"

কীর্তির ঠোঁটের কাছে এনে তার নিশ্বাস শিপ্রা আপন নাক দিয়ে নিঃশেষে শুষে নিয়ে গুনগুন করে গাইলে, "আমাতে মিশাকু তব নিশ্বাস নবীন ঊষার

পুষ্প সুবাস—” বার বার। তারপর আবার বার বার “বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল, হে প্রিয়/করুণ মম অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো।” তার পর কীর্তনিয়া রীতিতে বার বার আখর দিলে, “অরুণ অধর পিয়ো হে পিয়ো।” মাঝে মাঝে থেমে থেমে কীর্তির নিশ্বাস নিঃশেষে শুষে নিয়ে আপন বুক ভরে নেয়—তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

হঠাৎ একবার দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেটা কীর্তির গাল ছুঁয়ে গেল। কীর্তির দু'হাত দিয়ে ছড়িয়ে পড়া ঘন কোঁকড়া চুলের নিচে আধা হারিয়ে-যাওয়া মুখটি কাছে টেনে এনে বললে, “বলো দেখি, তুমি কি অস্বস্তি বোধ করছো?”

শিপ্রা চোখের উপর থেকে চুল সরিয়ে ঠোঁটে মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে বললে, “অস্বস্তি কিসের? নিজের ভিতরের দিকে তাকিয়ে শুধু আমি একটু হতাশ হলুম। আমি আশা করেছিলুম, বাবার বন্ধু ফরাসী ফৌজী অফিসাররা যেরকম ভালো মন্দ, বিপদ আপদ, সুখ দুঃখ, সব অবস্থাতেই ধরে নেয় যে এটাই প্রকৃতির নিয়ম, এটাই তো স্বাভাবিক, আটপৌরে—এমন কি আমাদের কবির সর্বশেষ কবিতার যে প্রায় সর্বশেষ ছত্রে আছে, ‘অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে’ ঠিক তাও নয়, ছলনাটাও তাদের কাছে ছলনা নয়, ওটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু কবির ‘অনায়াস’ বেশীর ভাগ চরিত্রেই থাকে এবং সেটার মূল্য দেয় শোলডার শ্রাগ করে, ‘তাঁ পি’ বলে, মানে, ‘জানা তো ছিলই, জীবনটা একটানা শ্যাম্পেন আর কাভিয়ার হতে পারে না, জেনারেল ব্যাটা আটকে দিলে প্রমোশনটা, আর প্রিয়া তো হর হামেহাল উঁচিয়ে আছেন জিল্‌ট্‌ করার পিস্তল, —তারপর সেই স্বাভাবিক আটপৌরেটার সামনে তার আচরণটাও অনায়াস লব্ধ —প্যারিসের ‘প্রিমা দন্নার’ অযাচিত প্রেম যদিস্যাৎ অকস্মাৎ বিলকুল ফ্লুকে লটারির প্রাইজের মত পেয়ে যায় তবে অনায়াসে তাকে নিয়ে সগর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে, আবার বিকল্পে যদি উপলব্ধি করে, পরের দিন জুয়োর দেনা শোধ না করতে পারলে মান-ইজ্জৎ থাকবে না, তখন তো সেই নিত্য দিনের ‘তাঁ পি’—সো মাচ্‌ দি ওয়ার্স আছেই—প্রিয়ার মুখটি সাদরে তুলে ধরার মতই অনায়াসে পিস্তলটা তুলে ধরে ঠেকাবে রগে—আমি আশা করেছিলুম একটানা বহু সায়ং সন্ধ্যা তাঁদের অনায়াস সঙ্গ পেয়েছিলুম বলে আমিও তাদের শোলডার শ্রাগ করে ‘তাঁ পি’—‘বয়ে গেল’—বলতে পারবো, অন্তত খানিকটে।”

কীর্তি করুণ কণ্ঠে বললে, “কেন অযথা আত্মনিন্দা করো? আমার যদি কাল ভোরের প্লেনে করে মোলায়েম সুইটজারল্যাণ্ডে যাবার প্ল্যান থাকতো তা হলে তুমি সেটাকেও অত অনায়াসে নিতে পারতে না। যাকে ভালোবাসি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে থাকলেও হারাই-হারাই ভাবনাটা সব সময়ই জেগে থাকে হৃদয়ের কোন্‌ এক গোপন কোণে। তার উপর তুমি মেয়েছেলে।

পুরুষের হৃদয় যদি একবিন্দু শোণিত আর ভাবনার রাশি দিয়ে গড়া হয়, তবে মেয়েদের বেলা একবিন্দু শোণিত আর রোদনের রাশি। আসলে আমার প্রশ্নটাই ভুল। আমি কিংবা খান তো এমন কোথাও যাবো না, যা তোমার অস্বস্তির কারণ হতে পারে, আমি কিংবা খান বন্দুক চালিয়ে কটা পাঠানকে খতম করতে পারবো? ছোকরা জিমি পর্যন্ত জানে, তুমিই তো বলেছিলে, আমাদের কাজ কলকাতায়। সেই ঘুঘু লারীটা পর্যন্ত জানে, নজর রাখতে হবে কলকাতার উপর। এবং আমাদের বড় বড় ক্লাবগুলোর উপরও। যে সব ছেলে-ছোকরারা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে পুব বাঙলাকে সাহায্য করতে চায়, তারা টাকার জন্য, বন্দুকের জন্য যাবে যে সব পয়সাওলাদের কাছে তারা তো এসব ক্লাবেরই মেম্বার। এবং এরা লারী ফারীর সামনেও বেপরোয়া বলে দেবে, ছোকরাদের জন্য একসপ্লোসিভ যোগাড় করতে কার লবেজান, কে এক রাশ টাকা দিয়ে ছেলেদের পাঠিয়েছে নাগা পাহাড়, সেখানে যদি জাপানীদের ফেলে-যাওয়া বন্দুক মেশিনগান নাগাদের কাছ থেকে কেনা যায়। ইণ্ডিয়া গাভ্‌র্নমেণ্ট এখনো আসরে নামে নি বলে ছেলেরা কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, না মুরুব্বীরা তাদের শুধু হাতে ফিরিয়ে দেবে। শুধু কি তাই, খান বলে নি বুঝি, বাংলাদেশের এক রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার এ-পারে সময়মত চলে এসেই শুনতে পেলেন, অমুক বাঙালী হিন্দু অফিসার বর্ডারে মোতায়েন হয়েছেন। 'ইআল্লা' বলে এক লম্ফে তাঁর কাছে উপস্থিত। ব্যাপার কি? পার্টিশেনের পূর্বে দু'জনা একই জায়গায় ট্রেনিং পেয়েছিলেন, পার্টিশেনের সময় পর্যন্ত একই আর্মিতে কাজ করেছিলেন। দু'জনাতে দোস্তী হয়েছিল গভীর। গিয়েই বললেন, 'জানো তো, দোস্ত, আমি রিটায়ার করেছি বটে কিন্তু দেশে যে সংকট এসেছে সেটার মোকাবেলা যথাসাধ্য আমি করবই করবো—এই ভরসা যদি আমার দেশের লোক রাখে তবে কি সেটা অন্যায় হবে?' আসলে অতখানি লম্বা-চওড়া অজুহাত একে অন্যকে এঁরা কখনো দেন নি। এক ইয়ার আরেক ইয়ারকে দেখা মাত্রই বুঝে গিয়েছেন ব্যাপারটা কি। বাক্য ব্যয় না করে ইয়ারকে নিয়ে গেলেন অস্ত্রাগারে হাত দিয়ে কুল্লে হাতিয়ার দেখিয়ে বললেন, "যা খুশি নিয়ে যাও, যত খুশী নিয়ে যাও—হেল্‌প্‌ ইয়োরসেলফ্‌'। সত্যি বলছি—"

শিপ্রার অবসাদ আগাপাস্তলা উধাও। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। ফরাসী অফিসারদের কাছ থেকে সে—শুধু ফৌজী-তত্ত্বকথাই শোনে নি, শুনেছে বিস্তর গুলও তাদের মুখে—নইলে আর্মিতে ঢুকবেই বা কেন, গুল মারার সনাতন ট্রাডিশনটাই বা ডোবাবে কেন? কিন্তু এ রকম একটা সৃষ্টিছাড়া ভুতুড়ে গুল? ঢোক গিলে রাম-তোতলার মত টক্কর ঠোক্কর খেতে খেতে শুধলো, "সে কি করে হয়? তুমি সত্যি জানো? এ তো বিশ্বজোড়া শান্তির সময়ও অসম্ভব।

আর এখানে সরকার যাকে পাঠিয়েছে সীমান্ত রক্ষার জন্য, তাঁর কি হাল হবে? বলা তো যায় না, ইয়েহিয়া জাঁতাকলে পড়লে দুর্যোগটা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কোন্ না কোন্ ডেসপারেট মিলিটারি গ্যাম্বল শুরু করে দেবে। তার শেষ তাস দিয়ে। আক্রমণ করবে আইনত নিরপেক্ষ কিন্তু কার্যত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ভারতকে—যাতে করে রাষ্ট্রপুঞ্জ ইণ্টারফিয়ার করে দুই পক্ষকে ঠেকায় আর ইয়েহিয়া সেই লুপহোল দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে যায়।

কীর্তি সোল্লাসে বললে, "শুধু ইয়েহিয়াই বুঝি কলিযুগের নিরেস যুধিষ্ঠির! সত্য যুগের আসল যুধিষ্ঠির, না ইয়েহিয়া কে যে জুয়োতে বেশী বুদ্ধি দেখাতেন সেটা বাঙলার ইতিহাসে একটা চিরন্তনী সমস্যা হয়ে রইবে। সেই গুপ্তযুগ কিংবা তারো আগের থেকে কত না রাজা, পাঠান মোগল কেউ বাদ যান নি, এদেশে এসেছে জুয়ো খেলতে, ওদের সক্কলেরই মারাত্মক প্রয়োজন ছিল, যুদ্ধের জন্য হাতীর। ত্রিপুরাতে প্রচুর সে মাল, প্রতিবেশী সিলেটীরা এখনো পৃথিবীর সেরা মাহুত। ইংরেজ বোম্বাই, মাদ্রাজ যে কোনো জায়গায় জুয়ো পার্টি বসাতে পারতো। কিন্তু বেছে নিল বাঙলা। ধনী দেশ, অন্তত তখন পর্যন্ত ছিল – আমাদের তরফ থেকে স্টেকটা হবে ভারি। জিওপলিটিক নামক আধা-বিজ্ঞানটি তখনো আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু তথ্যগুলো তো ছিল—আমাদের বন্ধু এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কে যেন কথাচ্ছলে বলে, 'অক্সিজেন আবিষ্কৃত হয়, ১৭৭৪-এ'। মন্ত্রী সবিস্ময়ে শুধোলেন, 'তার আগে মানুষ বাঁচতো কি দিয়ে?' তারপর পাঁচ আঙুলে খ্যাঁস খ্যাঁস করে দাড়ির উকুনকে আদর করতে করতে ডরালু গলায় শুধোলেন, 'কিন্তু সাপ্লাই ঠিক আছে তো?"—

শিপ্রা শুধোলে, "তুমি একদিন কথায় কথায় বলছিলে না ডাঙর ইয়েহিয়ার আর বড়া বড়া জুণ্টা-গোসাঁইদের কানও বড় বড় হয়—তখন মনে পড়ে নি ভলতের এ-সম্বন্ধে একটি সুন্দর এপিগ্রাম লিখেছেন চার ছত্রে, অনেকটা আমাদের সুভাষিতের মত, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে বিস্তর আছে—"

কীর্তি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধোলে, "পঞ্চতন্ত্র? সে তো কোন্ এক মোল্লা না কে যেন বাঙলা একটা সাপ্তাহিকে লেখে।"

শিপ্রা বললে, "দম্ভ আছে লোকটার! স্বয়ং বিষ্ণুশর্মা যে বই লিখে দূর মার্কিন মুল্লুক পর্যন্ত প্রাতঃস্মরণীয় লেখক হলেন, তাঁর গল্পের কাছে কখনো কেউ আসতে পারবে নাকি যে সে তার রঙবাজ্ গুলতানির জন্য পঞ্চতন্ত্র নাম বেছে নিলে।"

কীর্তি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, "বাঁচালে! আমি ভেবেছিলুম মাস্টারের পড়ানো সেই 'আগম পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্রকথা' বুঝি আমাদের যে তন্ত্রটন্ত্র আছে তারই পাঁচটাতে মিলে কোনো একটা সিনথেসিস।···যাকগে···ভলতেরের একটা এপিগ্রাম বলতে যাচ্ছিলে না?"

"হ্যাঁ।

'এলাস ! লেজোরেই দে গ্রাঁ
স' স্যুভাঁ দ্য গ্রাঁদ্ জ' অরেই'

'হায় ! বড়লোকদের যে আকছারই বড় বড় কান হয়', অর্থাৎ গাধার কান। স্বভাবতই ইঙ্গিত রয়েছে, এদের মস্তিষ্কও ঐ প্রাণীটার মত।"

কীর্তি বললে, "তাই তো রক্ষে। বড়লোকদের ধন-দৌলত আছে, যশ প্রতিপত্তি প্রচুর। তার উপর যদি মগজটিও সরেস ধরনের হত তবে গরীবদের আর বাঁচতে হত না। তাদের হাড় মাস খেয়ে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাতো। এই ধরো না টিক্কা ইয়েহিয়ার একটা মোক্ষম মুখ্খোমি। আজ যে সমস্ত পূব বাঙলায় বড়র অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছোট রুখে দাঁড়িয়েছে, মুক্তি-বাহিনী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে—দর্শন বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব নিকুচি করে দিয়ে সামথিং গ্রোইং আউট অব নাথিং—তার জন্য ঐ মূর্খনীতি আচরণ কতখানি দায়ী সে-কথা ইতিহাস একদিন বিচার করবে। এটা আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ, আপন খেয়াল নয়। মনে আছে তোমার, শিলঙে তোমাকে বলেছিলুম হবিগঞ্জের এক পাগলা-জগাই, শব্দে শব্দে,

ঢাল নেই, তলওয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার
ট্যাঙ্ক কামান হামলা করে, হুঙ্কারে 'মার মার' !

সেই মেজর আমার এক মুরুব্বীকে বলেছেন, "পঁচিশে রাত্রেই টিক্কা প্রয়োজনের চেয়েও ঢের ঢের অপর্যাপ্ত সৈন্যবল, আধুনিকতম ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, কামান সর্ব বল নিয়ে আক্রমণ করলে তিন শ্রেণীর লোককে। প্রথম দল বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী। একদা পাকিস্তানের, বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ে এরাই লড়েছিল আইয়ুব খানী যুদ্ধে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ এবং তাঁর অল্পক্ষণ পরেই মামুলী পুলিশকে আক্রমণ করে [illegible] স্ত করে দিল। এদের মাত্র যে কিছু লোক পালাতে সক্ষম হয়েছিল, তা[illegible] ূব বাঙলায় সুন্দু মাত্রই এরা জানে, কি করে রাইফেল চালানো শেখাতে হয়। এদের নিয়েই গড়ে উঠলো বাঙলা দেশময় মুক্তিবাহিনীর ছোট ছোট দল। এখন প্রশ্ন এই, এদের কিছু সংখ্যক লোক লীগের প্রতি কতখানি দরদী ছিল সেটা বলা কঠিন—জুণ্টা অবশ্যই সেটা আদৌ হিসেবে ধরে নি, তাদের পুরো পাক্কা ধারণা, এদের সমূলে বিনাশ করতে কী আর বেগ পেতে হবে, সময়ই বা লাগবে কতটুকু ?—বমার অব্ বেলুচিস্তানের ঐ বাবদে দম্ভ তো আজ দেশে-বিদেশে কারো অজানা নেই —কিন্তু এ-কথা তো সত্যি, যে এই তিন শ্রেণীর লোক ডিসিপ্লিন্ কাকে বলে সেটা অতি উত্তমরূপে জানে, উপরওলার আদেশ এ-স্থলে 'বমার' হোক, 'বুচার' হোক, টিক্কা খানের—আদেশ তারা অন্তত একশ' বছর ধরে মেনে নিতে অভ্যস্ত, এবং সর্বশেষ কথা—পাক আল্লার নামে কসম খেয়ে তারা রাষ্ট্রপতির

আনুগত্য স্বীকার করেছে। তাই প্রশ্ন, এদের এ-ভাবে টিক্কা যদি আক্রমণ না করতো তবে কি এরা নিজের থেকে বিদ্রোহ করতো' ?"

কীর্তি থামলো। যেন সামান্য একটু চিন্তা করে বললে, "এ-প্রশ্নের উত্তর মেজর কখনো পাবেন না। করতোই, সেটা জোর গলায় বলা চলে না, আবার আলবৎ করতো না তার উত্তরও তদ্বৎ। তবে মেজরের একটা সত্য নির্ণয় তর্কাতীত। ওরা আক্রান্ত না হলে, এবং তারই ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ না দিলে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলাটা তো প্রায় অসম্ভব হত। আবার, তাদেরই চোখের সামনে গ্রামাঞ্চলে দিনের পর দিন, 'মুক্তি' গড়ে না উঠলে, গ্রামের লোক তো মনোবল হারিয়ে ফেলত—রুখে দাঁড়ানো দূরে থাক্, বিরুদ্ধ ভাব অন্তরে অন্তরে পোষণ করতই বা ক'দিন ? এবং তার শেষে যখন বর্বররা ব্যাপকভাবে সর্বত্র হত্যা-লুণ্ঠন-দহন-ধর্ষণ আরম্ভ করতো—এবং করতো তার সর্বাবস্থাতেই—তখন ? তখন তো টু লেট্, তখন কে গড়ে তুলতো মুক্তি বাহিনী ?"

শিপ্রা বললে, "আমার মনে হয়, ভারত যে সরাসরি ইয়েহিয়ার গালে চড় মারছে না, তার প্রধান কারণ, সে দেখতে চায়, বাংলাদেশে যে 'বিদ্রোহ' মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছে সেটা বাঙালীর নিত্যকালের হুজুগে মেতে ওঠার সোডা-বোতলের গ্যাস কিনা। সেটা ঠিক ঠিক অনুমান না করে তাড়িঘাড়ি পুরোদম যুদ্ধে যদি নেমে যায় এখ্খুনি, এবং অল্পদিন পরেই পূব বাঙলার মনোবল ভেঙে যায় তবে যে শেষটায় ভারতকে বিশ্বের কাছে বিড়ম্বিত হতে হবে। ওদিকে ফরাসী অফিসারদের একজন আমাকে লিখেছেন, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, মিলিটারি দৃষ্টিবিন্দু থেকে—জোর দিয়ে বলেছেন একমাত্র প্যোরলি মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির বিচারে—এইটেই ভারতের সুবর্ণ সুযোগ, এই বেলায়ই ভারতের যুদ্ধে নেমে যাওয়া উচিত।···তা তো বুঝলুম, কিন্তু প্রশ্ন, সব জেনেশুনে পৃথিবীর প্রায় সব নেশনই চুপ করে আছে কেন ?"

"বা—রে ! তোমার আপন দেশ ভারতবর্ষও তো এখনো স্বাধীন বাংলা-দেশকে স্বীকৃতি দেয় নি।"

"সে কি কথা ! একটা দেশের সরকারই বুঝি সব ! আমরা—তুমি, আমি—আমরা বুঝি দেশের মালিক নই ! এই বাঙলাদেশেই তুমি কখনো দেখেছো, ঘটি বাঙাল হঠাৎ এক হয়ে গিয়ে পূব বাঙলার বেদনায় চিৎকার করে বলে উঠেছে, 'ভাই আমরা আছি'। আর এটাও তো স্বীকার করতে হবে, আজ পর্যন্ত ভারতই সবচেয়ে খোলাখুলিভাবে, স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছে, তার পূর্বতম সহানুভূতি কার প্রতি। তুমি জানো—"

কীর্তি কেন যে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেটা বুঝতে না পেরে শিপ্রা থামলো। তার হাতখানা আপন হাতে তুলে নিয়ে শুধোলে, "বন্ধু, আমার কোনো কথা

কি তোমাকে পীড়া দিল ?"

কীর্তির মুখে অমনি হাসি ফুটলো। কণ্ঠস্বরে যেন সর্ব মধু ঢেলে দিয়ে বললে, "শিপ্রা তুমি সত্যি শিপ্রা—শব্দটি এসেছে ক্ষিপ্রা থেকে, অর্থাৎ যে দ্রুতগতিতে চলে। তুমি প্রথম যেদিন আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি—কেউ-দেখলো-কেউ-না—প্রসন্ন স্মিত হাস্যের আভাস দিয়েছিলে, সেদিনই সর্ব-প্রথম আমি একটা বড় বাঙলা অভিধানের স্মরণ নি। তারই কল্যাণে বুঝতে পারি যে শিপ্রা বা ক্ষিপ্রা—"

"ক্ষিপ্রা বললে আরো মানানসই হয়।"

চিন্তাকুল বদনে কীর্তি যেন আপন মনে বললে, "প্রেমে পাগলিনীকে খ্যাপা বা ক্ষিপ্তা বলেছেন কবি, কিন্তু সংক্ষিপ্তা যেন না হয় আমার প্রতি তোমার প্রেম-প্রীতি-আসক্তিটি—"

শিপ্রা করুণ কণ্ঠে অনুনয় করলো, "বলবে না, রাজা, আমার কোন্ কথায় তোমার বুকের ভিতর থেকে গরম বাতাস বেরল—হঠাৎ, কোনো আভাস না দিয়ে !"

কীর্তি যেন ঝটিতি রাজাদেশ পালনে শশব্যস্ত হয়ে বললে, "বলছি, গুরু, বলছি। যে-মুহূর্তে তুমি বললে, পশ্চিম বাঙলার লোক আজ যেন সমবেত কণ্ঠে পূব বাঙলার ডাকে সাড়া দিয়ে সাহস দিচ্ছে, 'আমরা আছি' আমার মনে তৎক্ষণাৎ সেই দুশ্চিন্তা, সেই কবেকার আগরতলায় যার জন্ম, সেটা অহরহ আমাকে আশা নিরাশায় ক্ষণে আকাশে তোলে, ক্ষণে মাটিতে আছাড় মারে। পূব বাঙলা দাঁড়িয়েছে প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে। সে-শক্তিকে একমাত্র সৈন্যবল ছাড়া আর সব দিচ্ছে পূর্বাচল অস্তাচলের দুই বৃহত্তম রাষ্ট্র—যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, প্লেন যা চাই তাই, যুদ্ধ যদি দীর্ঘদিন ধরে চলে তবে পশ্চিম পাকুকে তার জন্য অপর্যাপ্ত অকাতর অর্থসাহায্য,—সে-সব সাহায্য যদি সুন্দুমাত্র পশ্চিম পাকেই যেত তবু না হয় একটা ব্লাফ মারা যেত এগুলো পশ্চিম পাকুকে দেওয়া হচ্ছে, ভারত আফগানিস্তান ও রুশ একজোট হয়ে যেন পশ্চিম পাক্ আক্রমণ করে 'বিশ্বশান্তি' ভঙ্গ না করে !—এগুলো খোলাখুলি-ভাবে পাঠানো হচ্ছে পূব বাঙলায় হারামীদের হাতে, তারা কি নয়া ধরনের বিশ্বশান্তি রক্ষা করছে সেটা জেনেশুনে যাতে করে তারা আরো নির্ভয়ে, জীবন বিপন্ন না করে আরো নিধনধর্ষণলুণ্ঠনদহন কর্ম আরো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে করতে পারে। শুধু কি তাই,—নিরীহ গ্রামবাসী নরনারীকে কি ভাবে যম-দূতেরও বাড়া নিষ্ঠুর নির্যাতনের ভয় দেখাতে হয়, কি প্রকারে স্বামী পিতা পুত্রের সম্মুখে অবলা নারীকে ধর্ষণ করে মানুষের শেষ সম্পদ তার আব্রুইজ্জৎ ইমান কোন্ কোন্ বীভৎসতা দ্বারা বিনাশ করে তাকে ক্লীব পশুত্বে পরিণত করার বিভীষিকা দেখাতে হয় সে-সব 'নীতি' কায়দা শেখাবার জন্য বিত্তশালী

দেশে বাছাই বাছাই সাদিস্তুদের জন্য একটা—কেউ কেউ বলেন একাধিক—বিশেষ স্কুল খোলা হয়েছে—খানদানী মিলিটারি অফিসার ও জোয়ানদের জন্য। আইয়ুবের সামনেই সেখানে পশ্চিম পাকের আর্মি বাছাই বাছাই লোক পাঠায়। ইয়েহিয়ার সেদিকে খুব একটা নজর ছিল না, কিন্তু জুন্টা জানতো, হাওয়া একদিন কোন্ দিক দিয়ে বইবে। তারা সে 'ইস্কুলে' ছাত্র পাঠাতে কোনো কসুর করে নি। আসলে আজ আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যে স্বয়ং আইয়ুবই জানতেন, পূব পাক্ আর পশ্চিম পাকে একদিন মোকাবেলা হবেই হবে।

তাই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, জনপদবাসী কতদিন ধরে এ অত্যাচার সইতে পারবে? তারা যদি মনোবল হারায় তবে তো সর্বনাশ! প্রবলতর শত্রুর হাতে পর্যুদস্ত হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই, কিন্তু সে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়াতে, তার দাসত্বে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়াতে সর্বনাশের চেয়ে সর্বনাশ। কারণ তার ফল ভোগ করতে হবে তাদের সন্তানদের—বংশানুক্রমে।

ছোট বড় শহর আয়ত্তে রাখা খানদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু গ্রামের পর গ্রাম, হাজার হাজার গ্রাম আয়ত্তে আনা অসম্ভব। কিন্তু যদি জনপদবাসী বশ্যতা স্বীকার করে নেয় তবে এই সব বাচ্চারা, ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চারা, সুন্দমাত্র দু'চারটে উটকো বন্দুক নিয়ে ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ির মোকাবেলা করছে, তারা পা জমাবে কোথায়?

জানো শিপ্রা, চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে বেরয় খানদের সন্ধানে। বেতার নেই, কোনো প্রকারের যোগসূত্র নেই এক গ্রুপের সঙ্গে অন্য গ্রুপের,—আর ক' রাউন্ড গুলিই বা পায় এরা যাত্রাপথে নামবার সময়—চাষাভুষো যদি এদের আশ্রয় না দেয়, চিঁড়ে মুড়ি না যোগায়, খানদের সন্ধান না বাতলায় তবে ক'দিন লড়বে তারা?"

শিপ্রা অন্ধকার জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে, পার্কের উপরের রাস্তায় ক্ষীণ একটা আলোর দিকে। তার মনে ক্ষণে ক্ষণে ভয় জাগছিল ওদের জয়াশা আমাদের জয়াশা ঐ আলোরই মত ক্ষীণ। আবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সাহস জেগে উঠছিল, প্যারিসের সেই বুড়ো জেনারেলের স্মরণে। তিনি বলেছিলেন, 'মাদ্‌মোয়াজেল যতক্ষণ না একটা জাত পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, ততক্ষণ সে পরাজিত হয় নি'। এবং শেষ যে আপ্তবাক্যটি বলেছিলেন সেইটে সে মুখ ফুটে কীর্তিকে শোনালে ঃ

" 'যে ভেঙে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, তাকে প্রবলতম শক্তিও দাঁড় করাতে পারে না। যে জাত ভেঙে পড়ে নি, সেও যেন অপরের সাহায্যের উপর বড্ড বেশী ভরসা না রাখে'।"

অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত, অত্যদ্ভুত হল কীর্তির প্রতিক্রিয়া! সোফা ছেড়ে

প্রায় নাচ শুরু করে দিলে ঘরময়। শিপ্রা অবাক। এমন কি দারুণ নয়া সত্য ছিল তার কথা কটিতে ?

শিপ্রার হাত দুখানি আপন হাতে তুলে বললে, "বাঁচালে তুমি আমাকে। আমি কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলুম এইবারে বলি,—যে কথাটা, কবে সেই আগরতলা থেকে আমার মনের ভিতর ঘোরপাক খাচ্ছিল কিন্তু বলার মত সাহস যোগাড় করতে পারি নি। আমি জানি, অনেকে মনে করে বাইরে তুমি যে রূপেই দেখা দাও না কেন, যেমন মনে করো হিস্পানি টাঙ্গো নাচে স্পেনের কনসালকে পার্টনার পেলে এদেশের অজানা টাঙ্গোর জন্মভূমিতে যে রীতিতে একে অন্যের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে দুহুঁ দুহুঁ কুহু কুহু করতে করতে দো-দুল-দোলা জাগাও সেটা তোমার নিতান্ত বাহ্যরূপ, আসলে তোমার হৃদয় নামক বস্তুটি গড়া স্টেনলেস স্টীল দিয়ে। নাগরমল তুষ্ণীয়াল ভেজাল স্টেনলেসের রাজা, একদা তোমার এডমায়ারারদের রিংসীটে যে বসতো সে চিনবে না খাঁটি বস্তু ! কিন্তু আমি প্রথম দিন থেকেই জানি, কী দারুণ রোমান্টিক তুমি। প্রমাণ স্বরূপ পেশ করতে পারতুম; হৃদয়ের শত সহস্র সংজ্ঞা, বহু বিচিত্র বর্ণনা আছে। তবু তুমি হৃদয় বলতে 'ভাবনার রাশিটাই' যে তার মূল ধাতু সেটা মেনে নিয়েছ কেন ? এবং সেই ভাবনারাশির সঙ্গে টানাপোড়েন জড়িয়ে রয়েছে একটা অনাগত নৈরাশ্য—যেটা আমার মনে অহরহ এনে দেয় অজানা ভীতি।"

শিপ্রা চায় না, তার আপন মনের মানুষ কোনো দুঃখ পায়—তা সে বাস্তব বা কাল্পনিক যা-ই হোক না কেন। বললে, "আমি নৈরাশ্যবাদী নই। আমার কাছে বিশ্বসৃষ্টির কোনো অর্থ বা মূল্য এখনো ধরা পড়ে নি। এর বেশী কিছু পষ্টাপষ্টি বলতে গেলেই আমি নিজের সঙ্গে নিজেই তর্কে জড়িয়ে পড়বো।"

কীর্তি যেন একটু সাহস পেল। বললে, "তাহলে তুমি বুঝতে পারবে—অন্তত অনেকখানি। কিন্তু আমি যতদূর সংক্ষেপে পারি বলতে চাই, আমার বুকে একটা কাঁটা অহরহ খচ্ খচ্ করে খোঁচাচ্ছে সেটার কথা বলা দূরে থাক, ভাবতেও আমি চাই নে।

আমি জানি, তুমি রোমান্টিক। তাই আমার মত অপদার্থ যখন একদিন তার জড়ত্ব ঝেড়ে ফেলল তখন তোমার আশা হয়েছে, আমি অবশ্যই একটা কৃতিত্ব দেখাতে পারবো—অসাধারণ না হোক, মামুলী বিস্বাদ, মিডিওকারের চেয়ে উচ্চ স্তরের, অন্তত সে ভিন্ন স্তরের তো হবেই, যতই ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র হোক না কেন আমার সাফল্য তার মধ্যে কিছু-না-কিছু একটা অসাধারণত্ব থাকবেই। কারণ, আমার জড়ত্বটা ছিল মিডিওকারের দৈনন্দিন কাজকর্মের মামুলী বিরস চঞ্চলতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি নয়, প্রশস্তি তো নয়ই।…কিন্তু আমি যতই ঘুরে ফিরে সব-কিছু দেখি, কোনু পথে মুক্তি কোনু

দিকে আশার আলো তার সন্ধানে সর্ব চৈতন্য নিয়োজিত করি—সেখানে কণামাত্র জড়ত্ব নেই, প্রচেষ্টাতে বিন্দুমাত্র শিথিলতা নেই,—ততই স্পষ্ট অনুভব করি, আমি এমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারবো না, যা দেখে তুমি গর্ব অনুভব করতে পারো—”

এতক্ষণ কীর্তি কথা কইছিল মাথা নিচু করে। অকস্মাৎ যেন তার বুকে পরশ লাগলো তারই চেনা আরেকটি বুকের অজানা স্পন্দন—অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনই শুধু সে শিহরণ জাগাতে পারে। চকিতে মাথা তুলে তাকালো শিপ্রার বিহ্বল মুখের দিকে।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে আছে “দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে স্নেহময়ী তুমি মাতা”। সে মাতা আমাদের জনগণভাগ্যবিধাতাতেই সীমাবদ্ধ নন। সে মাতা দেশকালের অতীত—সে মা-জননী চিরন্তনী। তাঁর পরিচিত জনের নিত্যদিনের পরিচয় তাঁকে করে দেয় আমাদের কাছে অপরিচিত। নিত্য দিনের প্রাচীন অভ্যাস, সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে ক'জন ভাগ্যবান তাঁকে অকস্মাৎ একদিন চিনে ফেলতে পারার তুলনাহীন সম্পদ অক্ষয় অধিকার পায়। তাই না খৃষ্ট বলেছেন, শিশুর মত সরল হতে হবে তাঁকে দেখতে যদি চাও।

শিশুর মত সরল চোখে তাই দেখতে পেল, সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

শিশুকে আদর করার মত শিপ্রা টেনে আনলো কীর্তিকে তার কোলের দিকে।

মা মেরির মত প্রসন্ন কল্যাণ মুখ স্মিতহাস্যে আলোকিত করে বললে, “তোর মত সরল লোক আজ বিরল। তুই কি সত্যি ভেবেছিস, আমি মনের কোণে কখনো ঠাঁই দিয়েছি, তুই একদিন গারিবাল্‌দি হবি, মাদ্‌জীনি'র মত হীরো হবি! আর, দূর বিদেশের জন্য ‘খুনিয়া' এক হীরো, আটপৌরে সমাজেও যে হীরোর মত দাপাদাপি করতো, সেই বায়রন গেলেন গ্রীসে, দেশটাকে মুক্ত করতে হীরো স্টাইলে—মারা গেলেন বৃষ্টিতে ভিজে, বেতো সর্দিতে, তার সঙ্গে এসে জুটেছিল স্যাঁৎসেঁতে বিলুয়া হাওয়ার জবর, পূব বাঙলায়ও বিলের অনটন নেই। এই বুঝি হীরোজনোচিত শেষ শয্যা গ্রহণের নাটুকে কায়দা! ওদিকে তাঁর প্রথম যৌবনের ‘অসামাজিক আচরণ' তাঁর দেশবাসীরা তাদের বুকের পাথরে খোদাই করে রেখেছে খুবই গভীর অক্ষরে। গ্রীসের মত একটা প্রাচীন সভ্য দেশের জন্য তাঁর সর্বস্বদান, আত্মত্যাগ, অকালমৃত্যুবরণ খান খান হয়ে গেল, না পেলেন ঠাঁই সেই পাথরে টক্কর খেয়ে। শেষটায় সেই নটিংহাম যেখানে একদা ডাকু-বীর রবিনহুড্ তার প্রতাপ দেখিয়েছিল সেইখানে বীর বায়রন পেলেন ছ'ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া গর্তে তাঁর চিরদিনের আবাস। ···আর এখন তো দুনিয়া জুড়ে গণতন্ত্রের জয়জয়কার। কম্যুনিস্‌ট্ ভায়রাও রব

তুলেছেন. 'প্রিয়েরে দেবতা করা' চলবে না, চলবে না, চলবে না। ব্যক্তিবিশেষ কিছুই নয়। আমিও বলি, যদি কেউ থাকে তবে সে হরিপদ কেরানী।

বিস্তর লোক এখনো বলে, এককালে তো সবাই বলতো, প্রকৃত বীরের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ যদি দেখতে চাও তবে তার সন্ধান পাবে চার্চিল-এ। বলতে গেলে ঐ একটি মাত্র লোক, অবহেলিত, বহু বৎসর ধরে তার পার্টিপ্বারা প্রায় অপমানিত, কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করতে রাজী হল না—বাঙলাদেশ যেন এঁরই মত কস্মিনকালেও না করে—হিটলার যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চরম লাঞ্ছনা-সহ পলায়িত ইংরেজের দেশে উইক্‌এনড্‌ কাটাবার জন্য স্যাণ্ডউইচের রুটি কাটছেন। শত লক্ষ প্রাজ্ঞজন এখনো বিশ্বাস করেন, সেই বিকট সংকট থেকে, সুনিশ্চিত বিনাশ থেকে ইংলণ্ডে ও অসূর্যস্ত কলোনিগুলোকে অবশ্যম্ভাবী শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ করতে আবির্ভূত হলেন, শ্বেত-কল্কি চার্চিলা-বতার! কিন্তু···কিন্তু বুঝলে মিতা, স্বয়ং সেই চার্চিলও ভুলে গেলেন—কৃষ্ণাবতারও তো পরবর্তীকালে সীতা স্মরণে আনতে পারেন নি—বেবাক ভুলে গেলেন তে হি দিবসা গতাঃ! এখন আর লাটবেলাটের বীরত্বের খড়্গ পুজো করার দিন নেই। এখন গণতন্ত্র আর একচ্ছত্র মানে না, জমিদার বাড়িতে পাত পাড়তে যায় না, এখন পাঁচো ইয়ারে মিলে লাগায় পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী পুজো। সামন্ত জয়সেনের বীরত্বের যুগ ভিক্ষুণী সুপ্রিয়াদের ছায়াতলে ম্লান ঃ তিন মাস যেতে না যেতেই পর্ণাপিতার এক পিতা ভয়ত্রাতা চার্চিল পেলেন তাঁর চরম অসম্মান। এককালে পিতা পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করতো, গণতন্ত্রের যুগে পুত্র-গণ—তারাই গণ, তারাই গণপতি, কবির ভাষায়, "জয়ধ্বজা ঐ যে তাদের গগন জুড়ে/পূব হতে কোন্‌ পশ্চিমেতে যায় রে উড়ে—এখন পুত্রগণ পিতাকে ত্যাজ্যপিতা করে।"

কীর্তি আরামের নিশ্বাস ফেলে বললে, "আমার পিতা আমাকে অসংখ্যবার ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তুমি যে গণতন্ত্র গণতন্ত্র কপচাচ্ছো, বলছো, পূব হতে কোন্‌ পশ্চিমেতে যায় রে উড়ে, সেটা পূবের কোন্‌ দেশে চালু হয়েছে কও?"

"তোমার কথাও ঠিক, আমার কথাও ঠিক। গণতন্ত্রের পিটুলি গোলাতে যখন পাঞ্জাবীদের অরুচি ধরলো তখন তারা আইয়ুবকে বানালে ডিকটেটর। অন্য দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে—ফীল্ড-এ—জয়লাভ করে জাঁদরেলরা হতেন ফীল্ড মার্শাল ; মার্শাল ল' জারী করে আইয়ুব খেতাব নিলেন ফীল্ড মার্শাল। জেনারেল ইয়েহিয়া সেটার কার্বন কপি হলেন না। তাই তাঁর জঙ্গীগুষ্টি তাঁর প্রথম যৌবনের রক্ষিতা, বর্তমানে ইয়া ধুমসী লাশকে খেতাব দিয়েছে 'জেনারেল রানী'। চীনেরা যে-রকম কাগজের বাঘ বানায়, পাক্‌ ভারতেও পেপার ডেমোক্রেসী, পেপার ডিকটেটর, পেপার পঁপাদুর—'জেনারেল রানী'।"

কীর্তিকে আরো কাছে টেনে নিয়ে কিছুটা তিক্ততা কিছুটা করুণা মেশানো গলায় বললে, "তোমার শক্তিতে যা আছে, তাই তুমি করবে। লঙ জাম্প মেডেলিস্ট্ও আপন ছায়া লাফ দিয়ে ডিঙোতে পারে না। আরেকটা সত্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পূব বাঙলা যদি স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হয় তবে স্বাধীনতা আনবে সে-দেশের চাষাভূষা, মাল্লামাঝি এমন কি লেঠেল-ডাকাতও কিছুদিনের তরে পৈতৃক ব্যবস্থা ক্ষান্ত দিয়ে—তারা গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্র কিছুই বোঝে না। বোঝবার দরকারও নেই। সেই নিরীহ চাষা-বউকে ধর্ষণ করছে ইয়েহিয়া। ইছামতীর ওপার থেকে ওদের আর্তচিৎকার শোনা যায় এপারে, আমাদের পারে। একটা অতি নগণ্য সাপ্তাহিক থেকে আমার এক বন্ধু কাটিং পাঠিয়েছে—তাতে এক ফরাসী দরদী বলছে, "যেন তারা আপন জাত ভাই, এখনো যাদের দেশভাই বলে মনে করে, সে-সব পশ্চিমবঙ্গের লোককে চিৎকার করে আপন অসহায় অবস্থা জানিয়ে সাহায্য মাঙছে। তাদের আপন মরদরা তো সন্ধেবেলায়ই বন্দুকের গুলিতেই মরেছে আপন চোখের সামনে। তারপর সমস্ত রাত ধরে চলেছে অত্যাচার, টর্চলাইট দিয়ে বনবাদাড় থেকে খুঁজে বের করছে নতুন নতুন শিকার।"

উত্তরে তোমরা বলেছ, "ভাই, আমরা আছি।

তুমি যাবে পূব দিকে, ছায়ার মত তোমার পিছনে 'আমি আছি'॥"

শহ্‌র্‌-ইয়ার

উৎসর্গ

শ্রীমান পশুপতি খানের

করকমলে—

যৌবনে আমার মাথায় ছিল কাঁথার মত চুল। সেলুনের তো কথাই নেই, গাঁয়ের নাপতে পর্যন্ত ছাঁটতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেত। কাজেই সমস্ত অপারেশনটা এমনই দীর্ঘস্থায়ী আর একঘেঁয়ে লাগতো যে আমি ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়ে সেলুনে ঢুকতুম। চুলকাটা শেষ হলে পর সেলুনের নাপতে ধাক্কা-ধাক্কি করে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। সেদিনও হয়েছে তাই। কিন্তু—ইয়াল্লা, আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি চুলের যা বাহারে 'কট্' দিয়েছে সে নিয়ে চিতা-শয্যায় পর্যন্ত ওঠা যায় না, ডোম পোড়াতে রাজী হবে না। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। মহা বিরক্তি আর উষ্মা গোস্সাসহ রাস্তায় নাবলুম।

ঠিক যে ভয়টি করেছিলুম তাই। দশ পা যেতে না যেতেই পাড়ার 'উত্তম কুমারের সঙ্গে দেখা। উভয়েই থমকে দাঁড়ালুম। আমার মস্তকে তখন বজ্রপাত হলে আমি বেঁচে যেতুম—উত্তমকুমার তা হলে সে বাহারে 'হেয়ার কট' দেখতে পেত না। কিন্তু আমি জানি, আপনারা পেত্যয় যাবেন না, উত্তর শুধোলে, 'খাসা ফ্যাশানে চুলটা ছেঁটেছে তো হে—সেলুনটা কোথায়? তোমার আবিষ্কার বুঝি?' গোড়ায় ভেবেছিলুম বাবু আমাকে নিয়ে মস্করা করছেন। পরে দেখলুম, না। সে গড্ ড্যাম সিরিয়স।

সেই দিন থেকে একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছি। যা-ই করো, যা-ই পরো কেউ না কেউ সেটার প্রশংসা করবেই। এমন কি যা-ই লেখ না কেন!! সে লেখা সাগররমাপদমণীন্দ্রাশু সবাই ফেরত পাঠানোর পরও দেখবে, সেটি লুফে নেবার মত লোকও আছে।

তাই আমার বিশ্বাস, কোন্‌টা যে সরেস সাহিত্য আর কোন্‌টা যে নিরেস, সে সম্বন্ধে হলপ করে কিছু বলা যায় না। যদি বলেন, সবাই অমুকের লেখার নিন্দা করছে তবে আমি উত্তর দেব: প্রথমত ভোট দিয়ে সাহিত্য বিচার করা যায় না (এমন কি রাশায় নাকি একবার গণভোট—প্লেবিসিট—নেওয়া হয়, ভগবান আছেন কি নেই এবং ভগবান শতকরা একটি ভোট পান!), দ্বিতীয়ত, ভালো করে খুঁজলে নিশ্চয়ই সে-লেখকের তারিফদার পাঠকও পাবেন।

তাই আমার পরের স্টেপ: সরেস সাহিত্যিক এবং নিরেস সাহিত্যিকে পার্থক্য করা অসম্ভব।

অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই বলতে পারেন, আমি নিরেস সাহিত্যিক বলে এই মতবাদটি প্রচার করছি। আমি ঘাড় পেতে মেনে নিলুম।

মেনে নিয়েছি বলেই ট্রেনে প্লেনে—বিশেষ করে ট্রেনে—আমি আমার পরিচয় দি নে। দু'একবার আমার সঙ্গীসাথীরা মানা না শুনে ট্রেনে আলোচনার মাঝখানে অপরিচিতদের কাছে আমার নাম প্রকাশ করে দেন। দেখলুম, আমার ভয় বা ভরসা অমূলক। কেউ কেউ আমাকে চিনতে

পারলেন। যদিও আমি নিরেস লেখক।

এসবের স্মরণে, একদিন যখন আমি একটা মহা বিপদে পড়েছি তখন নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমার নাম, আমি যে সাহিত্যিক সে কথাটা প্রকাশ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফাটার শব্দ। কে একজন ব্যঙ্গ শ্লেষ ঠাট্টা মস্করা সব কিছুর একটা ঘ্যাঁট বানিয়ে বললেন, 'সাহিত্যিক! ছোঃ! এরকম ঢের ঢের সাহিত্যিক দেখছি নিত্যি নিত্যি। আমি মশাই আমাদের পাড়ার লাইব্রেরী কমিটির মেম্বার—কই, আপনার নাম তো কখনো শুনি নি!' আর-সবাই তাঁরই কথায় সায় দিলে।

ঐদিন থেকে স্থির করেছি, জেলে যাবো, ফাঁসীতে ঝুলবো তাও সই কিন্তু নিজের পরিচয় প্রকাশ করবো না। পেঁয়াজ পয়জার দুই-ই কবুল বিলকুল উল্লুকই শুধু করে।

* * *

আমার আপন ভাগ্নী পর্যন্ত ফরিয়াদ করে, আমার লয়েলটি-বোধ নেই; মুসলমান হয়েও মুসলমানদের গিয়ে গল্প উপন্যাস লিখি নে। এবারে সে বুঝতে পারবে কেন লিখি নে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, বোলপুর থেকে শেয়ালদা যাচ্ছি। এবং পূর্ব সংকসম অনুযায়ী মুখ যা বন্ধ করেছি তারপর কি ইরেসপনসিবল কি রেসপনসিবল কোনো 'টকে'র জন্যই ডিআই আর আমার গোঁপাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না—যদ্যপি তখন কম্পার্টমেণ্টে তুমুল তর্ক বেধেছে শ্লীল অশ্লীল সাহিত্যের জাতিভেদ নিয়ে। একবার লোভও হয়েছিল কিছু বলি, যখন একে অন্যে সবাই সবাইকে শুধতে আরম্ভ করেছেন, কেউ লেডি চ্যাটারলিজ লাভারুজ পড়েছেন কি না? দেখা গেল কেউই পড়েন নি। আমার পড়া ছিল। কিন্তু পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আলোচনাতে কোনো প্রকারের সাহায্য করলুম না —পাছে ঐ খেই ধরে শেষটায় কেউ না দুম্ করে শুধিয়ে বসে, 'মহাশয়ের নাম?'—এদেশে এখনো অধিকাংশ লোক নাম জিজ্ঞাসা করাতে কোনো-কিছু আপত্তিজনক দেখতে পায় না। আমিও পাই নে— অবশ্য আমি যখন কৌতূহলী হয়ে অন্যকে শুধোই, ভাইস-ভারসা নয়।

তবু আমি চুপ, এবং এমনই নিশ্চুপ যে স্বয়ং কম্যুনিস্ট ফরেন আপিস পর্যন্ত আমার বাক-সংযম দেখে, 'খরশুশো, খরশুশো', শাবাশ শাবাশ জয়ধ্বনি তুলতো।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিলুম, এক কোণে যে একটি যুবতী বসে আছেন তিনি যেন আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন—আড়নয়নে না, পুরোপাক্কা সাহস ভরেই। আমি বিশেষ শঙ্কিত হলুম না, কারণ পারতপক্ষে আমি কাউকে আমার ফটো উপহার দি না, আর খবরের কাগজে আমার যা ছবি উঠেছে তার তুলনায় আলীপুরের শিম্পানজীর ছবি উঠেছে ঢের ঢের বেশি।

১৮৩০ না ৪০ খৃষ্টাব্দে আসামে বুনো চায়ের গাছ আবিষ্কারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত বর্ধমান-কেল্নার খবর পায় নি যে চা নামক পানীয় আদৌ এ পৃথিবীতে আছে এবং বাঙলা দেশেও পাওয়া যায়। কারণ গত চল্লিশ বৎসর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমি বর্ধমান-কেল্নারের কাছ থেকে চা আদায় করতে পারি নি। এ তত্ত্বটি অনেকেই জানেন; কাজেই বর্ধমানে গাড়ি দাঁড়ানো মাত্রই কামরার অধিকাংশ লোকই চায়ের নিষ্ফল সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নেবে গেলেন। আমি মুসলমান—শ্রীশ্রীগীতার মা ফলেষু কদাচনতে না-হক্ক কেন বিশ্বাস করতে যাবো? বসে রইলুম ঠায়।

এমন সময় হুঙ্কার শোনা গেল, 'এই যে আলী সায়েব, চললেন কোথায়?' এবং সঙ্গে সঙ্গে মালপত্রসহ রেলের মজুমদারের প্রবেশ। আমি ভালোমন্দ কিছু বলার পূর্বেই ফের প্রশ্ন, 'তারপর? "শবনম" কি রকম কাটছে?'

এর পর যা ঘটলো সেটা অবিশ্বাস্য না হলেও আমার জীবনে ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। সেই অন্য প্রান্তে যুবতীটি হরিণীর মত ছুটে এসে, আমার 'আরে করেন কি, করেন কি, থামুন' সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মুসলমানী কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করে বাঙ্কের উপর উঠে বসলেন আমার মুখোমুখি হয়ে। ঠিক যেরকম গুরু-শিষ্য পদ্মাসীন হয়ে মুখোমুখি হয়ে বসেন। কারণ, একটু আরাম করার জন্য আমি ইতিপূর্বে বাঙ্কের হাতলটাকে হেলান বানিয়ে বসেছিলুম হাফ-পদ্মাসনে। যুবতী যে-ভাবে আসন নিলেন তাতে আমাদের একে অন্যের হাঁটুতে হাঁটুতে আধ ইঞ্চিরও ব্যবধান নয়। এবং সমস্ত অভিযানটি তিনি সম্পূর্ণ করলেন মজুমদার, তাঁর মালবাহী-কুলী, দু'একজন প্যাসেঞ্জার যাঁরা ভাঁড়ের চায়েতেই সন্তুষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে গাড়ীতে উঠে পড়েছেন—এঁদের সক্কলের ব্যূহ অবহেলে ভেদ করে।

হার্ড-বয়েলড মজুমদারও যে বেকুবের মত তাকাতে পারে এটা আমি জানতুম না। আমার কথা বাদ দেওয়া যেতে পারে। আমি যে বেকুব সে আমি চার বছর বয়েস থেকে বড়দার মুখে শুনেছি; এখনো শুনি।

যুবতী একবার শুধু বাইরের দিকে তাকিয়ে বেশ উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, 'ওগো, এদিকে এসো—আমাদের আলী সাহেব!' আমাকে শুধু বললেন, 'বে-আদবী মাফ করবেন, আমি প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারি নি।' ব্যস্ তখনকার মত আর কিচ্ছু না। আমি তো মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছি—বাদবাকি ধীরেসুস্থে হবে।

ইতিমধ্যে ঐ 'ওগো'-টি, এবং আর পাঁচজনও কামরায় ঢুকলেন। যুবতীর আদেশে তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন। ডাঃ জুলফিকার আলী খান। যেমন দেবী তেমন দেবা নন। ভদ্রলোক বরঞ্চ একটু মুখ-চোরা। শুধু একটু খুশীমুখে বললেন, 'ইনি আপনার প্রকৃত ভক্ত পাঠিকা।' দেবী মুখঝামটা দিলেন,

'আর তুমি বুঝি না?' ভদ্রলোক কোনো গতিকে জান বাঁচিয়ে কামরার অন্য কোণের দিকে পাড়ি দিলেন।

নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাবার জন্য আমি যুবতীর সঙ্গে মজুমদারের আলাপ করিয়ে দিলুম। বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটাটি তোলার একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'আপনাকে বহুৎ শুক্রিয়া। 'শবনম' বীবীকে এ কামরায় দাওয়াৎ না করলে আমি তাঁর স্বামীকে পুরোপুরি চিনে নিতে পারতুম না।'

সেই বর্ধমান থেকে দক্ষিণেশ্বর অবধি বেগম খান কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, তাঁর আপন মনের কথা কি কি বলেছিলেন তার পুরো বয়ান কেন, নির্যাস দেওয়াও আমার তাগতের বাইরে। গোড়ার দিকে তো তাঁর কোন কথাই আমার কানে ঢুকছিল না। বেচারী ডাঃ খান যে বেশ কিছুটা অপ্রতিভ হয়েছেন সে তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বিশেষত দেবীর বসার ধরনটা। আমার দু হাঁটুর সঙ্গে তাঁর দু হাঁটু ছুঁইয়ে দিয়ে, আমাকে শব্দার্থে কোণ-ঠাসা করে—আমিই বা করি কী, নড়তে গেলেই যে হাঁটুতে গোত্তা লাগবে—আসন না নিয়ে যদি 'ভদ্রস্থতার' দূরত্ব বজায় রেখে স্কুল-গার্লটির মত ব্রীড়াভরা ব্যবহার করতো তা হলে তো ওদিকে আর কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো না। এ তো আকছারই হয়। গোড়াতেই আমি নিবেদন করি নি, সব লেখকই বরাবর? সক্কলেরই কিছু-না-কিছু ভক্ত, অন্ধ স্তাবক থাকার কথা। তদুপরি এ মেয়ে মুসলমান। বাকি গাড়ি হিন্দু। অবশ্য আমাকে আর ঐ হাফ-হিন্দু মোল্দারকে বাদ দিয়ে। হিন্দুদের ধারণা—এবং সেটা হয়তো ভুল নয়—যে, মুসলমান মেয়েরা মাত্রাধিক লাজুক (নইলে বোরকা পরতে যাবে কেন?) কিন্তু এখানে যে ঠিক তার উল্টোটা!

তা সে যাই হোক, গাড়ির সবাই ভদ্রসন্তান; তাঁরা আমাদের দু'জনকে আল্লার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নিয়ে পড়লেন। বেগম খান শুধু মাঝে মাঝে মজুমদারকে তাঁর বাক্য সমর্থনের জন্য বরাত দিচ্ছিলেন। সেও এতক্ষণে হালে পানি পেয়ে গিয়েছে বলে শুধু যে সায় দিচ্ছিল তাই নয়, মাঝে মাঝে খাসা টুইয়েও দিচ্ছিল। তখন আর বেগমকে পায় কে? 'একে ছিল নাচিয়ে বুড়ি, তায় পেল মৃদঙ্গের তাল!' আমার মনে পড়লো মজুমদার কলেজ আমলে মেয়েদের নিয়ে মস্করা করে কবিতা লিখে রীতিমত নটরিয়াস হয়েছিল। বাঁদরটার খাসলৎ তিরিশটি বচ্ছরেও বদলালো না!

আমি শুধু একটি বার বেগমকে শুধিয়েছিলুম, 'আচ্ছা মিসিস খান—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার নাম শহর্-ইয়ার—আরব্য রজনীর শহর্-ইয়ার।'

'আচ্ছা, বেগম শহর্—'

'না, শুধু শহর্-ইয়ার।'

'আচ্ছা, শহ্‌র্‌-ইয়ার, আপনি কি কখনো সত্যকার বড় লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—যেমন মনে করুন, পরশুরাম—'

'সত্যিকার, মিথ্যেকার জানি নে,—আপনি বড় লেখক।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, 'যাক। আমার কিন্তু সত্যি একবার দেখতে ইচ্ছে করে, কোনো গ্রেট লেখকের সঙ্গে পরিচিত হলে আপনি কি করেন। বোধ হয় কবিগুরু যে বর্ণনা দিয়েছেন,

'অমল কমল চরণ কোমল চুমিনু বেদনা ভরে—'

বেগম খান সঙ্গে সঙ্গে পদপূরণ করে বললে,

'বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবলুম, এই কবিতাটি যে খুব পরিচিত তা নয়, তবু মেয়েটি এর সঙ্গে পরিচিত। এর কাছে কি তবে মুড়ি-মুড়কির একই দর!

এবারে আমি শক্ত কণ্ঠে বললুম, 'দেখুন, আপনি যদি আমার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ না করেন, তবে আমি আর একটি মাত্র কথা বলবো না।'

বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করে বললে, 'আপনার মর্‌জী। ভবিষ্যতে তো সুযোগ পাবো। আমার ভাবনা কি? কলকাতায় আপনার বাসা কোথায়?'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি লক্ষপতি? শান্তিনিকেতনের বাসা ঠেলতে গিয়েই আমি লবেজান! বন্ধুর বাসায় উঠবো।'

সঙ্গে সঙ্গে আসন ত্যাগ করে চলে গেল স্বামীর কাছে। আমিও তন্মুহূর্তেই পা নামিয়ে বাঙ্কে সোজা হয়ে বসলুম। পদ্মাসনব্যূহের দুই হাঁটুতে আমি আর হরগিজ বন্দী হবো না।

একটু পরেই ডাক্তার খানকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমকে মাঝখানে বসিয়ে দুজনা দুদিকে বসল। আমি বললুম, 'ভাল হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। মরার আগে একটা ট্রাঙ্ক কল পাবেন। তখন এসে শেষ ইনজেকশনটি দিয়ে দেবেন।'

ডাক্তার বললেন, 'তওবা, তওবা! আর আমি তো প্র্যাকটিক্যাল ডাক্তারী ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি। আমি তো রিসার্চ নিয়ে পড়ে আছি।'

বেগম ফিসফিস করে ডাক্তারকে বললেন, 'আঃ! যা কইবার তাই কও না!'

ডাক্তার বললেন, 'যদি ইজাজৎ দেন তবে একটা আরজু আছে। শুনলুম, কলকাতায় আপনি এক দোস্তের বাড়িতে উঠবেন। তার চেয়ে এবারে আমাদের একটা চান্‌স্‌ দিলে আমরা সেটা মেহেরবাণী মেনে বড় খুশী হব। আমাদের বাড়িতে প্রচুর জায়গা আছে। যদি হিম্মত দেন তো বলি, আপনার কোনো তকলীফ হবে না।'

আমি অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললুম, 'কিন্তু এ-যাত্রায় হবে না, আমারই

কপাল মন্দ। আসছে বার নিশ্চয়ই।'

বেগম ডাগর চোখ মেলে বললেন, 'আপনার দোস্ত কি ডাক্তার?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। বহুকাল ধরে শয্যাশায়ী।'

বেগম বললেন, 'আমাদের বাড়িতে ঐ আরেকটি মাইনর সুবিধে। যা খুশী খান, যত খুশী খান, কিংবা তিন দিন ধরে কিছুই খেলেন না, হিমে সমস্ত রাত ছাতে চক্কর মারুন, যা খুশী করুন—ডাক্তার তো হাতের কাছে রয়েছে, ভয় কি?'

আমি হেসে বললুম, 'উনি না ডাক্তারী বেবাক ভুলে গিয়েছেন!'

বেগম বললেন, 'কী যেন—নউজুবিল্লা, বলতে নেই—হাতীর দাম লাখ টাকা।'

আমি ভালো করে বুঝিয়ে বললুম যে আমার শয্যাশায়ী বন্ধু আমার জন্য প্রহর গুনছে। তাই সেখানে না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু আসছে বারে অতি অবশ্য, সাত সত্য, তিন কসম ওঁরাই হবেন আমার কলকাতার অন্নদাতা—মেজমান্।

ট্রেন দক্ষিণেশ্বরে থামলো বলে বেঁচে গেলুম। আমার এক চেনা এবং দোস্ত, পাশের ভিমকোতে কাজ করে; বোস বলেছিল স্টেশনে আমাকে দেখতে আসবে। লাফ দিয়ে নামলুম প্ল্যাটফর্মে। মজুমদারও বোসকে চেনেন। তিনিও নামলেন।

কই, রাস্কেলটা আসে নি!

মজুমদার বললেন, 'জানেন আলী সাহেব, মেয়েটি বড়ই সরলা। কিন্তু যে কোনো লোক অতি সহজেই ভুল বুঝে মনে করতে পারে উনি বুঝি পুশিং ফ্লার্ট। এ টাইপ আমি খুব বেশি দেখি নি কিন্তু যা দু'একটি দেখেছি সেও মুসলমান পরিবারে।'

আমি বললুম, 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু আপনি এ মীমাংসায় পেঁছিলেন কোন্ পর্যবেক্ষণের ফলে?'

মজুমদার আমাকে ধাক্কা দিয়ে কামরায় তুলে দিয়ে নিজে পিছনে ঢুকলেন। বললেন, 'পরে হবে।'

এবারে কামরাতে সার্বজনীন আলোচনা হলো হিন্দুসমাজে যে ডিভোর্স বা লগ্নচ্ছেদ প্রবর্তন হয়েছে তাই নিয়ে। মুসলমানদের ভিতর তো গোড়ার থেকেই আছে; কিন্তু প্রশ্ন তার সুবিধে নেয় বাঙলা দেশের কি পরিমাণ মুসলমান নরনারী? অল্পই। তবে হিন্দুদের বেলা? আলোচনাটা জমলো ভালো, কারণ ডাক্তার আর আমি, হিন্দুদের অজানা, মুসলমানদের পারিবারিক ভিত্তি সম্বন্ধে তথ্য সাপ্লাই করলুম, আর হিন্দুরা তাই নিয়ে স্পেকুলেট করলেন।

বেগম সাহেব মুখ খুললেন না। তবে ওস্তাদের মার শেষ রাতে। ট্রেন যখন শেয়ালদা পেঁছিল তখন তিনি মোক্ষম বাণ ছাড়লেন, 'হিন্দুদের মেয়ে-

ইস্কুলে এখনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্‌স্‌ট্‌ বুক ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ। আমার বান্ধবীর মেয়েকে দিন সাতেক আগেও পড়িয়েছি।'

দুই

হিন্দরা বলে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক। বোধ হয় কথাটা সত্য, নইলে শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার ক্যালিবারের লেখককে নিয়ে অতখানি মাতামাতি করবে কেন? এদেশে তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় মুসলমান লেখক নেই, কাজেই আলী, আলীই সই। কথায় আছে, বিপদে পড়লে শয়তান তক্‌ মাছি ধরে ধরে খায়।

উপস্থিত অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাছিই শয়তান খাবে। কথাবার্তায় তো মনে হলো ডাক্তার পরিবার কলকাতার খানদানীদের একটি। অতএব নিশ্চয়ই উত্তম মোগলাই খানাপিনার অনটন হবে না। সুভাষিতের একটি দোহা সামান্য ট্যারচা করলে অর্থ দাঁড়ায় 'পণ্ডিতদের সবই গুণ; দোষের মধ্যে এই যে, ব্যাটারা বড় মূর্খ।' হিন্দুদের বেলাও তাই। ওদের অনেক গুণ; দোষের মধ্যে এই যে, তারা মাংস রাঁধতে জানে না। সেটা মেরামৎ করার জন্য সমস্ত জীবন ধরে—জীবনটা তো ওদের সঙ্গেই কাটালুম—চেষ্টা দিয়েছি। মাতাল যেমন গাঁঠের পয়সা খর্চা করে অন্যকে মদ খেতে শেখায়, পরে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নেশাটি করবে বলে, আমিও তেমনি বিস্তর হিন্দুকে গায়ে পড়ে মোগলাই শেখাবার চেষ্টা করেছি, অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখাবার মেহন্নৎ বরদাস্ত করেছি, পরে তারই মেওয়াটি খাবো বলে, কিন্তু হলে কি হয়, ঐ যে মুসলমানরা বলে হিন্দুরা বড় সংকীর্ণচেতা, আপন ধর্মের গণ্ডীর ভিতর কাউকে 'ভাই-ব্রাদার' বলে নিতে চায় না, রান্নার বেলা অন্তত নিশ্চয়ই তাই। তা সে যাক্‌ গে, এখন যখন শহ্‌র্‌-ইয়ার গঙ্গোদক জুটে গেছে তখন কূপোদকের কি প্রয়োজন।

কিন্তু হায়, নল রাজার ভাজা মাছটির মত আমার মুর্গি-মুসল্লমগুলো হঠাৎ প্যাখনা গজিয়ে ডানা মেলে 'কোক্কোরো' রব ছেড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ট্রেনে কথা ছিল, যেখানেই উঠি না কেন, ডাক্তার-পরিবারে প্রথম একটা ডিনার দিয়ে 'মুখবন্ধ' অবতরণিকা সেরে পরের পরিপাটি ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে উঠেই দেখি আমার নামে টেলিগ্রাম—তদ্দণ্ডেই শান্তিনিকেতন ফিরে যেতে হবে।

সে রাত্রেই আপার-ইন্ডিয়া ধরতে হলো। রেলের মোদ্দার ঠেলেঠুলে একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিলে।

ঘণ্টু বাগচীকে বরাত দিয়ে এলুম সে যেন আমার আকস্মিক নির্ঘণ্ট পরিবর্তনটা শহ্‌র্‌-ইয়ার বানুকে জানিয়ে দেয়। আমার রাঢ়ী, বৈদিক, কুলীন,

মৌলিক মেলা চেলা আছে, কিন্তু মুসলমানকে ট্যাক্‌ল্‌ করতে হলে বারেন্দ্রই প্রশস্ততম। ওরা এখনো বদনা ব্যবহার করে।

বোলপুরে ফিরে হপ্তা তিনেক সাধনার ফলে মুর্গী রোস্টের শোক ভুলে গিয়ে যখন পুনরায় ঝিঙ্গে-পোস্ত, কলাইয়ের ডাল আর টমাটোর টকে মনোনিবেশ করছি এমন সময় শুনি তীব্র মধুর বামা-কণ্ঠ। আমার বাড়িটা এক্কেবারে শ্মশানের গা ঘেঁষে, অর্থাৎ লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে। বামা-কণ্ঠ কেন, কোনো কণ্ঠই সেখানে শোনা যায় না। বারান্দায় বেরিয়েই দেখি, শহ্‌রু-ইয়ার, দূরে ডাক্তার, তারো দূরে প্রাচীন যুগের ইয়া লাশ মোটর গাড়ি।

আমার মুখ দিয়ে কথা ফোটে নি। শহ্‌রু-ইয়ার পুরো-পাক্কা বাঙালী-মুসলমানী কায়দায় মাটিতে বসে, মাথায় ঘোমটা টেনে, দু'হাত দিয়ে আমার দু'পা ছুঁয়ে সালাম করলো। আমি তাকে দোয়া জানালুম, মনে মনে দরুদ পড়লুম।

এবারে দেখি ওর ভিন্ন রূপ। আমি আশংকা করেছিলুম সে কলরব করে নানান অভিযোগ আরম্ভ করবে—খবর না দিয়ে চলে এলুম, এসে একটা চিঠি-পত্র দিলুম না—বাকি আর বলতে হবে না; মেয়েরা ফরিয়াদ আরম্ভ করলে যাদুকরের মত ফাঁকা বাতাস থেকে ফরিয়াদের খরগোশ বের করতে পারে।

শুধু অত্যন্ত নরম গলায় বললে, 'আমরা কোনো প্রকারের খবর না দিয়ে এসে আপনাকে কোনো বিপদে ফেলি নি তো?'

আমি বললুম, 'আমি সত্যই ভারি খুশী হয়েছি যে আপনারা আমাকে আপনজন ভেবে কোনো প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা এখানে চলে এসেছেন বলে।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে পৌঁচেছেন। তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করে তাঁকেও সেই কথা বললুম এবং যোগ করলুম, 'আপনারা জানেন না, এদেশে আমার খুব বেশি আপনজন নেই।'

শহ্‌রু-ইয়ারের চোখ দুটি বোধ হয় সামান্য একটু ছলছল করছিল। বললে, 'আমাদেরও বেশির ভাগ আপনজন পাকিস্তান চলে গিয়েছেন। আমার দাদারা, দিদিরা সবাই। সেদিক দিয়ে আমার কর্তা লাকি।'

আমি কিছু বলার পূর্বেই ডাক্তার প্রায় হাতজোড় করে বললেন, 'আমার একটা গরীবানা আরজ্‌ আছে।'

আমি বললুম, 'কী উৎপাত। আমাকে চিনতে আপনার ক'শতাব্দী লাগবে?'

'তা হলে বলি; আপনার চেলা ঘণ্টুবাবু এসেছিলেন আপনার চলে যাওয়ার খবর দিতে। উনি সত্যি আপনার আপনজন। তাঁকে ইনি নানা রকমের প্রশ্ন শুধোন—এ জায়গা সম্বন্ধে। ঘণ্টুবাবু বললেন, আপনি নাকি বাজার-হাট থেকে অনেক দূরে থাকেন, এবং চাকর-বাকর কামাই দিলে নাকি শুধু টিন-

ফুড খেয়ে চালিয়ে দেন। তাই আমরা এটা-সেটা কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি। যদি—'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য! নদীতে চানে যাবার সময় কলসী ভরে জল নিয়ে যাওয়া আহাম্মুখী, কিন্তু আমার এই সাহারা-নিবাসে জল না নিয়ে আসা ততোধিক আহাম্মুখী। আপনি সমুচা হগ্‌বাজার কিনে এনে থাকলেও অন্তত আমার কোনো আপত্তি নেই। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দি; হাত মুখ ধোবেন।'

আমার লোকটি খুব মন্দ রাঁধে না। সে-বিষয়ে আমার অত্যধিক দুশ্চিন্তা ছিল না।

বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ দেখি শহ্‌র্‌-ইয়ার তালগাছ সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে একা একা চলেছেন রেল লাইনের দিকে। আমি বসার ঘরে ঢুকলুম ডাক্তারের খবর নিতে। তিনি দেখি আমার জর্মন এনসাইক্লোপীডিয়া খুলে একটার পর একটা ছবি দেখে যাচ্ছেন—আরামসে বড় কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে। আমি যেতেই বললেন, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার বেড়াতে বেরিয়েছে; ও একা থাকতে ভালোবাসে আবার, মজার কথা, খানিকক্ষণ পরে সঙ্গী না হলেও চলে না। এই দেখুন না, একশ কুড়ি মাইল ঠেঙিয়ে এল এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, আর আপনার সঙ্গে দু'টি কথা না বলে হুট্ করে বেড়াতে চলে গেল একা একা।'

'তা আপনি সঙ্গে গেলেন না কেন?'

'ওর মুড্ আমি জানি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে বেঁধে নিয়ে যেতো—আমি শত আপত্তি জানালেও। বেড়াক না একটু আপন মনে। আপনার বাড়ির বড় সুবিধে—সিঁড়ি দিয়ে নামা মাত্রই বেড়াবার মাঠ আরম্ভ হয়ে গেল! কলকাতার হাল তো জানেন।' তারপর একটু থেমে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আপনার কাছে অনুরোধ, আপনার ডেলি রুটিন আমাদের আসাতে যেন আপসেট্ না হয়।'

আমি হেসে বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে থাকুন, ডাক্তার, আমার রুটিন বলে কিছু নেই। আমি শুধু বলি, এন্‌জয় ইয়োরসেলভস। আচ্ছা, এখন চলুন না, আমরা ম্যাডামকে খোঁয়াইডাঙার মাঝখানে গিয়ে আবিষ্কার করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এখানে এই বিরাট খোলামেলার মাঝখানে যে কি রকম টপ করে অন্ধকারটি ড্রপ করেন সেটা শহুরেরা অনুমানও করতে পারে না।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বললুম, 'ঐ ওখানে যে গোটা দুই ভিতের মত ঢিপি দেখতে পাচ্ছেন ঐটেই এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। সেখানে উঠলেই ঠাহর হয়ে যাবে বীবী কোথায় কবিত্ব করছেন।'

ডাক্তারটি স্বল্পভাষী। আমি শুধালুম, 'আপনি ডাক্তারির কি নিয়ে কাজ করছেন?'

বললেন, 'এখনো ঠিক হদিস পাচ্ছি নে। ভাবছিলুম, যমজ, বামন এদের স্কেলিটেন নিয়ে।'

আমি বললুম, 'ডক্টর ইয়াংকার যা নিয়ে—'

তিনি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শুধোলেন, 'আপনি জানলেন কি করে?'

আমি বললুম, 'আপনারা দু'জনাই বড় সরল আর কর্তাভজা'। 'কর্তাভজা' ইচ্ছে করেই বললুম। 'কর্তার গুণ আছে কি না চিন্তা পর্যন্ত করেন না। আপনি খুব ভালো করেই জানেন, আমি ডাক্তারির কিছুই জানি নে; অতএব ইয়াংকারকে চেনা আমার পক্ষে আকস্মিক যোগাযোগ বই আর কিছু না। বন্ শহরে আমি যখন পড়তুম তখন তিনি আমার প্রতিবেশী এবং আমার সংস্কৃতের অধ্যাপকের বন্ধু ছিলেন। মোটামুটি ঐ সময়, অর্থাৎ ১৯৩৩/৩৪-এ তিনি পুরো মানুষের এক্সরে নেবার কল আপন হাতে বানান। ও-সব কথা আরেক দিন হবে। এই তো পেঁছে গেছি আমাদের এভারেস্টে, আর ঐ—ঐ যে—দুটো তাল গাছের মাঝখানে বসে আছেন বেগম সাহেবা।'

অতদূরে আমাদের সাধারণ কথাবার্তার কণ্ঠস্বর পেঁছনোর কথা নয়। কিন্তু এই নির্জনতার গভীরতম নৈস্তব্ধ্যে বোধ হয় ধ্বনি ও টেলিপ্যাথির মাঝখানে এক তৃতীয় ট্র্যান্সমিটারহীন বেতার বার্তা বহন করে! শহর-ইয়ার হঠাৎ অকারণে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই আমাদের দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার আলসেশিয়ান 'মাস্টার' তাঁর দিকে ছুট লাগালো।

মাঝপথে দেখা হতেই আমি বললুম, 'আত্মচিন্তার জন্য এ ভূমি প্রশস্ততম।'

বানু বললেন, 'না, আমি 'শবনমের' কথা ভাবছিলুম।'

আমি বললুম, 'দেখুন, ম্যাডাম, আপনাদের আনন্দ দেবার জন্যে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি তাই করবো। ঐ তাল গাছটা যদি চড়তে বলেন তারও চেষ্টা দিয়ে দেখতে পারি কিন্তু একটি জিনিস করতে আমার সাতিশয় বিতৃষ্ণা। আপনারা দু'জনাই আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট; তাই যদি আমি করজোড়ে একটি মেহেরবাণী—'

শহর-ইয়ার যদি বটতলার চার আনা দরের সাক্ষীর পেশা কবুল করতেন, তবে তিনি ও-লাইনের সুলতানা রিজিয়া হতেন নিশ্চয়ই। উকীল আধখানা প্রশ্ন শুধোতে না শুধোতেই বটতলার ঘড়েল সাক্ষী আমেজ করে ফেলে, উকিলের নল কোন্ দিকে নিশানা করেছে। আমাকে বাধা দিয়ে শহর-ইয়ার বললেন, 'আর বলতে হবে না। ট্রেনে বেশ ধমক দিয়ে বলেছিলেন আপনি নিজের রচনা নিয়ে আলোচনা পছন্দ করেন না, এখানে সেটা ভদ্রভাবে বলতে যাচ্ছিলেন—এই তো? আচ্ছা, আমি মেনে নিচ্ছি, যদিও অতিশয় অনিচ্ছায়। শুধু একটা শেষ প্রশ্ন শোধাবো; আপত্তি আছে?'

আমি উৎফুল্ল হয়ে বলল্‌ম, 'চালান গাড়ি ! ফাঁসির খানা খেয়ে নিন।'

'শব্‌নমের সঙ্গে সেই শেষ বিরহের পর আপনাদের আবার কখনো দেখা হয়েছিল ?'

আমি বলল্‌ম, 'এ প্রশ্ন একাধিক পাঠক-পাঠিকা আমাকে বাচনিক, পত্র মারফৎ শ্‌ধিয়েছেন। তাঁর মধ্যে একজন হিন্দ্‌ মহিলা ; পাবনার মেয়ে স্কুলের হেডমিস্‌ট্রেস্‌। অন্যদের আমি এ প্রশ্নের উত্তর দি না। এঁর বেলা ব্যত্যয় করল্‌ম। লিখল্‌ম, "মহাশয়া, আপনি যখন পাবনা সেকেণ্ডারি স্কুলের হেড-মিস্‌ট্রেস্‌ তবে নিশ্চয়ই আপনার স্কুল রাজশাহী ডিভিজনে পড়ে। আমার স্ত্রী সেখানকার স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস। তিনি যখন আবার আপনার স্কুল দেখতে আসবেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে পাকা উত্তর পাবেন।" আপনাকে ঠিক তা বলছি নে। তবে তারই কাছাকাছি : আমার গ্‌হিণী বছরে একাধিকবার প্‌ত্রদ্বয়সহ এখানে আসেন। পথিমধ্যে কলকাতায় কয়েক ঘণ্টা জিরোতে হয়। এবার না হয় আপনাদের ওখানেই উঠতে বলবো।'

শহ্‌র্‌-ইয়ারকে সেই ট্রেনে দেখেছিল্‌ম উল্লাসে লম্ফ দিতে, আর দেখল্‌ম এই। সেবারে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের, এবারে অবিমিশ্রিত উল্লাসের। শ্‌ধোলেন, 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবো তো ?'

আমি বলল্‌ম, 'কী আশ্চর্য ! সেটা আপনাদের দ্‌'জনকার একান্ত নিজস্ব, অল রাইট্‌স্‌ রিজার্ভড কারবার। সেখানে আমিই বা কে, আর ডাক্তার জ্‌ল্‌-ফিকারই বা কে ? কি বলেন ডক্‌ ?'

ডাক্তার বললেন, 'আমার বীবী কি আলোচনা করবেন আর কি করবেন না তার উপর আমাকে আমাদের ইমাম আব্‌ হানিফা সাহেব কোনো হক্‌ দিয়ে থাকলেও—খ্‌ব সম্ভব তিনি দেন নি—আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি হক্‌ চাই নে—আমি চাই শান্তি।

আমি বলল্‌ম, 'আমেন, আমেন ! হায়, এই না-হক্কের উপর গড়া দ্‌নিয়ার সিকি পরিমাণ স্বামী-সমাজ যদি আমাদের ডাক্তারের এই মহাম্‌ল্যবান তত্ত্ব-কথাটি মেনে নিত তবে বাদবাকী তাঁদের সদ্দ্‌ষ্টান্ত অন্‌সরণ করে ডিভোর্স প্রতিষ্ঠানটির উচ্ছেদ সমাপন করতো।'

ইতিমধ্যে আমরা বাড়ি পেঁৗছে গিয়েছি।

শহ্‌র্‌-ইয়ারকে বলল্‌ম, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল্‌ম। আমার কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভালো ভালো রেকর্ড আছে যার বেশির ভাগ 'না কাম, না অর্থ' নাইদার ফর লাভ নর ফর মানি আজ আর পাওয়া যায় না। যখন খ্‌শী বাজাবেন। রাত তিনটেয় বাজালেও আমার আহার-শয্যাসন-ভোজন কোনো কিছ্‌রই ব্যাঘাত হয় না।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'আমি এখ্‌খ্‌নি দেখবো।' হ্‌ট্‌ করে চলে গেল।

আমি বললুম, 'ডাক্তার, আপনার বাঙলাতে বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ থাকে। এটা কি আপনাদের পরিবারেরই বৈশিষ্ট্য, না আপনাদের গোষ্ঠীর, কিংবা আপনারা যে মহল্লায় বাস করেন ?'

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আমি একটি আস্ত অশিক্ষিত প্রাণী। চিকিৎসাশাস্ত্র—আমি বলি স্বাস্থ্যশাস্ত্র, তার মানে হাইজীন নয়—আমাকে এমনই মোহাচ্ছন্ন করেছে যে আমি যেটুকু সামান্য সাহিত্য, ইতিহাস এমন কি গণিত ইস্কুল-কলেজে পড়েছি সে সব ভুলে গিয়েছি। শহুর্-ইয়ারের সঙ্গে একই জিনিস উপভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি একাধিকবার চেষ্টা করেছি তার সব শখের বিষয়ে দিল্-চস্পী নিতে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। সে এক ট্রাজেডি—সে কথা পরে হবে। তা সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই, আপনি যে প্রশ্ন শুধিয়েছেন সেটার উত্তর দিতে হলে যে সব বিষয় জানার দরকার তার একটাও আমি জানি নে। তবে যেটুকু শুনেছি তার থেকে বলতে পারি, জব চার্ণকের আমলের তো কথাই নেই, এমন কি ক্লাইভের সময় এবং তার পরও কোনো ভদ্র মুসলমান এবং হিন্দু ও নবাবের মুর্শিদাবাদ, খানদানী-ঢাকা ছেড়ে এই ভুঁইফোড় আপ্স্টার্ট কলকাতায় আসতে চায় নি। আমার পিতৃপুরুষ আসেন রাজা রামমোহন রায়ের আমলে, বাধ্য হয়ে, কোনো রাজ-নৈতিক কারণে। তাঁরা আপোসে কি ভাষা বলতেন, জানি নে, তবে আমার ঠাকুরদার আমল পর্যন্ত তাঁরা ফার্সী ভিন্ন অন্ন কোনো ভাষাতে লেখেন নি। আমার পিতা 'হুতোমে'র ভাষা বলতে পারতেন, কলকাতার উর্দু ডায়লেকট এবং উত্তর ভারতের বিশুদ্ধ দরবারী উর্দুও, কিন্তু আমার মা ছিলেন খাস শান্তি-পুরের মেয়ে। তিনি উর্দু জানতেন না এবং সেটা শেখবার চেষ্টাও করেন নি। আমাকেও কেউ উর্দু শেখাবার চেষ্টা করে নি। ফলে আমি যে কোন্ বাঙলা বলি সে আমিও জানি নে। খুব সম্ভব ডাইলিয়ুটেড হুতোম। আমার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা আমার ভাষা নিয়ে ঠাট্টা করতো। কিন্তু তাদেরই একজন—খানদানী কলকাত্তাই সোনার বেনে—আমাকে বলেছিল, তার ঠাকুরমা আমারই মত বাঙলা বলেন।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য'! বাঙলা ভাষা কী তাড়াতাড়ি তার ভোল বদলেছে! ভারতচন্দ্র এমন কি আলাল হুতোম দুজনাই আপনার চেয়ে বেশী আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য বেনামী লেখাতে বিদ্যেসাগর মশাই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন হুতোমের চেয়ে কম। কিন্তু তিনিও যা করেছেন সেটা নগণ্য নয়। আজ যদি প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বিদ্যেসাগর কলকাতায় নেমে আড্ডা জমান তবে তাই শুনে বোধ হয় আপনার হিন্দু ক্লাস-ফ্রেণ্ডরা ভিরমি যাবেন। কাজেই আমার পরামর্শ যদি নেন তবে বলবো, আপনার ভাষা বদলাবেন না। কেউ যদি মুখ টিপে হাসে, হাসুক। আমার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতরাও অত্যন্ত সংস্কৃতঘন বাঙলা বলেন—যেমন 'হপ্তা দুত্তিন' না বলে বলেন- 'পক্ষাধিককাল' এবং তাই শুনে হিন্দু মুসলমান উভয়ই কৌতুক অনুভব করে ; তাতে কি যায় আসে ?'

এমন সময় শহ্‌র্‌-ইয়ার চিন্তাকুল ভাল নিয়ে সভাস্থলে উপস্থিত। শুধোলেন, 'আপনার রেকর্ড-সঞ্চয়ন অদ্ভুত। আপনি বাছাই করেছিলেন কি ভাবে ?'

আমি হেসে বললুম, 'কোনো ভাবেই না। আমি বরদায় ছিলুম ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪। এই সময়টার মধ্যে যা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বেরিয়েছে তাই কিনেছি—কোনো প্রকারের বাছবিচার না করে। তার বহু বৎসর পর মোহরদি দু'চারখানা রেকর্ড আমাকে দেয়—ব্যস্। ৪৪-এর পর, আজ পর্যন্ত, কোথাও ভালো করে আসন পেতে বসতে পারি নি। ফলে কলেকশন্‌টা বাড়াতে পারি নি। সে নিয়ে আমার কোনো মনস্তাপ নেই।

"সাধের জিনিস ঘরে এনেই
এনে দেখি লাভ কিছু নেই।
খোঁজার পরে চলে আবার খোঁজা।"

চলুন মাদাম, চলুন মসিয়ো ল্য দক্‌ত্যোর,

দুইটি বস্তু প্রতি মানবেরে টানিতেছে বরাবর।
দানাপানি টানে একদিক থেকে অন্যদিকেতে গোর ॥
দো চীজ্ আদম্‌রা কশদ্ জোর্ জোর্
য়কী আব্ ও দানা দিগর খাক্-ই-গোর

ঐ তো এ-বাড়ির দানা-পানির প্রতীক দিলবর জান্ সশরীরে উপস্থিত। আমি তার রান্নার প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করবো না। আপনি শহ্‌র্‌-ইয়ার বানু যখন এখানে রয়েছেন তখন আহারাদির জিম্মেদারী আপনার।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'আপনার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা ট্যাবু ; তার উল্লেখ না করে বলছি, আপনি খেতে ভালোবাসেন সেকথা আমি জানি, কিন্তু—'

আমি যেন আসমান থেকে পড়ে তাঁর বক্তব্যে বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনিও পেঁচি-টেঁপির মত এই ভুলটা করলেন ? লেখার সঙ্গে জীবনের কতখানি সম্পর্ক ? রবিঠাকুর নিদেন হাজারটি প্রেমের কবিতা লিখেছেন। অতএব, তিনি সমস্তক্ষণ প্রেমে পড়ার জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন ? সেই সুদূর ইয়োরোপে বসে মাইকেল কপোতাক্ষর স্মরণে কি যেন লিখেছেন—'সতত পড় হে নদ আমার স্মরণে' ; ফিরে এসে সামান্যতম চেণ্টা দিয়েছিলেন এক ঘণ্টার তরেও ঐ নদীর পারে যাবার ! এ তো আমি চিন্তা না করেই বলছি। খুঁজলে এমন সব উদাহরণ পাবেন যে আপনার চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। একাধিক কবি লিখছেন, আ মরি আ মরি গোছ প্লাতোনিক, দেহাতীত শিশির-বিন্দুর ন্যায় পূতপবিত্র স্বর্গীয়

প্রেমের কবিতা—ওদিকে, তাঁদেরই একজন, হাইনে, বেরুতেন নিশাভাগে প্যারিসের কুখ্যাত—নেভার মাইন্ড, আপনি ডাক্তারের স্ত্রী, সহজে শক্‌ট্ হবেন না—'

'এবং আমাদের বিয়ে হয়েছে দশটি বছর আগে', বললেন শহ্‌র্-ইয়ার।

তিন

'এ কি! আপনি এখানে!'

বাড়িটার একাধিক বারান্দা, তার একাধিক প্রান্তে একান্তে অন্তরালে বসে থাকা যায়। তারই একটাতে বসে আমি পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। আজ কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী বা সপ্তমী, রাত প্রায় এগারোটা, একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তারই আভাস লেগেছে তালের সারিতে। ঘরের ভিতরে শহ্‌র্-ইয়ার রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাজাচ্ছিল। তার বাজানোর পদ্ধতিটা সত্যই বিদগ্ধ। একটা গান বাজানোর পর অন্তত মিনিট দশেক পর আরেকটা বাজায়। অনেকক্ষণ ধরে তার কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাইনি বলে ভেবেছিলুম সে বুঝি শুতে গেছে। ডাক্তার আমার ঘরে পেয়ে গেছেন ন্যুরনবের্ক মোকদ্দমার একখানা বই—যেটাতে যুদ্ধের সময় নাৎসি ডাক্তারদের অদ্ভুত অদ্ভুত এক্‌সপেরিমেন্টের পরিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই তিনি সেই বই নিয়ে রাতের মত উধাও।

শহ্‌র্-ইয়ার বারান্দার নিভৃত প্রান্তে আমাকে আবিষ্কার করলেন।

আমি বললুম, 'ঠিক সময়ে এসেছেন। একটু পরেই চাঁদ উঠবে আর এই জায়গাটা থেকেই সে দৃশ্যটি সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। ডাক্তারের ঘরে তো এখনো আলো জ্বলছে; ওকে ডেকে আনুন না।'

শহ্‌র্-ইয়ার চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'শুনুন, আপনার সঙ্গে সোজাসুজি পরিষ্কার কথা হয়ে যাওয়াই ভালো। আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কি আমার সঙ্গ পেলে আপনার অস্বস্তি বোধ হয়?'

ঠিক ধরেছে! আমার বোঝা উচিত ছিল শহ্‌র্-ইয়ারের বুদ্ধি এবং স্পর্শ-কাতরতা দুইই তীক্ষ্ন। কিন্তু আমি এর উত্তর দেব কি?

আমি বললুম, 'না। কিন্তু তিনি যদি সেটা পছন্দ না করেন তবে আমি দুঃখিত হব।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনি তো জ্ঞানী লোক; আপনি তো বুঝলেন যে, তাঁর কোনো আপত্তি থাকলে তিনি আমাকে আপনার এখানে নিয়ে আসবেন কেন?'

আমি বললুম, 'আমাদের এই বাঙলা দেশে মুসলমান মেয়েরা সবে মাত্র অন্দর

মহল থেকে বেরিয়েছেন। এ'রা পরপুরুষের সঙ্গে কি ভাবে মেলা-মেশা করবেন, কতখানি কাছে আসতে পারবেন এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, থাকার কথাও নয়। ইয়োরোপে এ বাবদে মোটামুটি একটা কোড্ তৈরী হয়ে গিয়েছে, কয়েক পুরুষের মেলা-মেশা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। এই দেখুন না, কন্টিনেন্টের একটা মজার কোড্। নাচের মজলিসে কোনো বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হলো, কিন্তু পরিচয়টা তাঁর স্বামী করিয়ে দেন নি। এস্থলে আমি যদি মহিলাটির সহিত ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি তবে লোকে আমাকে আর যা বলে বলুক 'ছোট লোক' বলবে না। পক্ষান্তরে স্বয়ং স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন, এবং তারো বাড়া, যদি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েদাইয়ে—এবং তারপর যদি স্বামীর অজানতে আমি মহিলার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করি তবে সমাজ আমাকে বলবে 'ছোটলোক', 'নেমকহারাম'। ভাবখানা এই, ভদ্রলোক তোমাকে বিশ্বাস করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, আপন স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, আর তুমি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করলে! আবার—'

আমার 'লেকচার' আর শেষ হল না। ইতিমধ্যে শুনি শহর্-ইয়ার খিল খিল করে হাসতে আরম্ভ করেছেন। হাসি আর কিছুতেই থামে না। ইয়োরোপীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার এই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এতখানি হাসবার কি থাকতে পারে, আম ঠিক বুঝতে পারলুম না।

হাসি পুরো থামার পূর্বেই শহর্-ইয়ার বলতে লাগলেন, এবং বলার মাঝে মাঝেও চাপা হাসি কলকলিয়ে উঠলো—'আপনি কি বেবাক ভুলে গেলেন, ট্রেনে আমি নিজে, স্বেচ্ছায়, গায়ে পড়ে, ইংরিজিতে যাকে বলে উইদাউট এনি প্রোভোকেশন আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলুম?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য! আমি এমনি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলুম। আমি কি আর আপনি আমি ডাক্তারের কথা ভাবছিলুম?'

শহর্-ইয়ার তবু হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, খুব ভালো করেই বুঝেছি। ইয়োরোপের উদাহরণ যে এদেশে খাটে না সে আমি ভালো করেই জানি। ইয়োরোপের কেন, বাঙালী হিন্দুর উদাহরণও আমাদের বেলা সর্বক্ষেত্রে খাটে না, সেও তো জানা কথা। জানেন, এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি।'

'যে সাহিত্য মানুষ পড়ে সেটা যে তার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এ তো জানা কথা। বাঙলা সাহিত্য গড়ে তুলেছে হিন্দুরা। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ। সৈয়দ আলাওল বা নজরুল ইস্লাম তো এমন কোনো জোরালো ভিন্ন আদর্শ দিয়ে যান নি যার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই হিন্দুর গড়া বাঙলা সাহিত্যে বিবাহিতা নারীর আদর্শ কি, সে তো সবাই জানে। সে

সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী এবং সর্বোপরি সে পতিব্রতা। ওদিকে দেখুন আপনার স্ত্রী আপনার সহধর্মিণী নাও হতে পারেন, তিনি যদি খৃষ্টান হন। এবং এই 'পতিব্রতা'র আদর্শটা আমাদের, মুসলমানদের ভিতর তো ঠিক সে রকম নয়। কোনো সন্দেহ নেই, স্ত্রী সেবা করবে, ভালোবাসবে তার স্বামীকে, তার সুখ-দুঃখের ভাগী হবে, তার আদেশ মেনে চলবে—কিন্তু, এখানে একটা বিরাট কিন্তু আসে—স্ত্রী তার সর্বসত্তা সর্বব্যক্তিত্ব সর্বঅস্তিত্ব স্বামীতে লীন করে দিয়ে 'পতিব্রতা' হবে এ কনসেপশন তো আমাদের ভিতর নেই। খুব একটা বাইরের মামুলী উদাহরণ নিন। আমার আব্বাজানের নাম মুহম্মদআল্লা বখ্শ খান—তাঁর পূর্বপুরুষ পাঠান হন আর নাই হন, তাঁরা সাতপুরুষ 'খান' উপাধি ব্যবহার করেছেন। আমার আম্মা আবার চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে—তাই তিনি শেষ দিন পর্যন্ত নামসই করেছেন মিহ্রুন্নিসা চৌধুরী। তিনি মাত্র কয়েক বছর হলো ওপারে গেছেন। শেষের দিকে সবাই যখন হালফ্যাশান মাফিক তাঁকে বেগম খান, মিসেস খান বলে সম্বোধন করছে তিনি তখনো সই করছেন, মিহ্রুন্নিসা চৌধুরী।'

আমি শুধালুম, 'সমস্যাটা ঠিক কোন্খানে আমি বুঝতে পারছি নে। অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান মেয়ের বিশেষ সমস্যাটা কোন্খানে ?'

শহর্-ইয়ার বড় মধুরে হাসল। বললে, 'আমার মগজটা বড্ডই ঘোলাটে আর হৃদয়—সেটা যেন ফেটে ফেটে বেরুতে চায়, তাই না আপনাদের বাঙাল মেয়ে বলেছে,

> ইচ্ছা করে কলিজাডারে
> গামছা দিয়া বান্ধি—

শুনুন। হিন্দু মেয়েরা অন্দর থেকে বেরিয়েছেন কবে ? বছর তিরিশের বেশী হবে না। অথচ স্বরাজ লাভের ফলে এবং অর্থনৈতিক অবনতি বশতঃ কিংবা আকাশে বাতাসে এক অভিনব সর্বব্যাপী স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্ট হওয়ার দরুন এই দশ-পনরো বৎসরেই মুসলমান মেয়েরা দ্রুত হিন্দুদের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। গত ত্রিশ বৎসর ধরে হিন্দু মেয়েরা এই যে তাদের আংশিক স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা জানা-অজানার চেষ্টা করছে সে স্বাধীনতা ঠিক কি ভাবে কাজে লাগাবে, তার কোড্স্ কি, তার নর্ম্ কি। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত নিন। কন্টিনেন্টে কোনো মেয়ে যদি বিয়ের উদ্দেশ্য কিংবা অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই হোক তার পরিচিতের সংখ্যা বাড়াতে চায় তবে সে তার বান্ধবী—নিদেন ল্যান্ডলেডির সঙ্গে নাচের হলে যায়। পুরুষরা এসে বাও করে নাচবার জন্য নিমন্ত্রণ জানায়—তার জন্য কোনো ফর্মাল ইন্ট্রোডাকশন দরকার নেই—এবং এই করে করে মেয়েরা যত খুশী তাদের পরিচিতের সংখ্যা

বাড়াতে পারে। এদেশে এখনো সমস্তটা চান্স্। বান্ধবীর মাধ্যমে, আপিসের সহকর্মিণীদের মাধ্যমে যে আলাপ-পরিচয় হয় সেটাকে 'উটকো' মেথড—অর্থাৎ চান্স্ বলা যেতে পারে।

আমার বক্তব্য, হিন্দু মেয়েরা যে উদ্দেশে চলেছে সেটা মুসলমানদের ঠিক স্যুট করবে না।

একটা কথা তো ঠিক, স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্ নো স্ত্রী-স্বাধীনতা সাড়ে পনরো আনা মেয়ে বিয়ে করে মা হতে চায়। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে, আপনি স্বাধীন স্বেচ্ছায় হিন্দু মেয়ে বর বাছাই করে নিয়ে হবে—কি হবে?—পতিব্রতা।

মুসলমান মেয়েও ঠিক ঐ একই পন্থায় আপন স্বামী বেছে নেবে কিন্তু সে হিন্দু মেয়ের মত পতিব্রতা হওয়ার আদর্শ বরণ করে নিতে পারবে না। দোহাই আল্লার, তার অর্থ এই নয় যে সে অসতী হবে—তওবা, তওবা!—তার অর্থ, আবার বলছি, সে তার সর্বসত্তা স্বামীতে বিলীন করে দিতে পারবে না।

আপনি ভাববেন না, আমি কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সে-কথা বলছি—আমি শুধু পার্থক্যটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।'

আমি বললুম, 'পতিব্রতা-ফতিব্রতার আদর্শ আজকাল হিন্দু রমণীরা কি আর খুব বেশী বিশ্বাস করে? আর 'আজকাল'ই বলছি কেন? ইংরেজী সভ্যতা-কৃষ্টির সংস্পর্শে এসে তারা সতীদাহ বন্ধ করলো, বিধবা-বিবাহ আইন পাস করালো, তারপর সিভিল মেরিজ যার ভিতর তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে, হালে হিন্দুশাস্ত্র মত বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের ভিতরও তালাকের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়েছে।'

শহর্-ইয়ার বানু দেখলুম অনেক চিন্তা করে রেখেছেন। বললেন, 'সতীদাহ বন্ধ করাটা হিন্দুকে মেনে নিতে হয়েছে, নইলে সাজা পেতে হয়। কিন্তু যেখানে বাছাই করার স্বাধীনতা রয়েছে সেখানে হিন্দু নারী কোন্‌টা বরণ করেছে? এ যাবৎ কটা বিধবা বিবাহ হয়েছে—'

আমি বললুম, 'মুসলমান মেয়েদের ভিতরই বা কটা হয়? কিংবা ধরুন তালাক। এদেশের মুসলমান ভদ্রসমাজে কি আরবিস্তানের আধার আধারও তালাক হয়?'

শহর্-ইয়ার বললেন, 'আরবিস্তানে তালাক দেয় পুরুষে—মেয়েদের তালাক দেবার অধিকার এতই সীমাবদ্ধ যে সে-অধিকার আদপেই নেই বললে চলে। আমি মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তুলছি—যেমন বিধবা-বিবাহ। প্রশ্ন উঠবে, আরো অধিক সংখ্যক মুসলিম বাল-বিধবা বিয়ে করল না কেন?

আসলে কি জানেন, পরাধীন অবস্থায় মানুষে মানুষে পার্থক্য কমতে থাকে; স্বাধীন অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোয়। অর্থনৈতিক এবং

অন্যান্য নানা কারণে এদেশের মুসলমান রমণী উভয়ই ছিল স্বাধীনতালুপ্ত হারেমবন্ধ (বরঞ্চ আফগানিস্থান, ইরান আরবের মেয়েরা বোরকা পরে রাস্তায় বেরোয়, আত্মীয়স্বজনের মোলাকাৎ করে এমন কি বাজার-হাটেও যায়—এদেশে সে ব্যবস্থাও ছিল না)। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দুইই এক। এই যে আপনার ড্রইংরুম—এর ভিতর ডার্বি ঘোড়া এবং ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াকে ছেড়ে দিলে দুজনাই ছুটবে মোটামুটি একই বেগে। কিন্তু ছেড়ে দিন আপনার বাড়ির সামনের খোলা মাঠে। তখন কোথায় ডার্বি, আর কোথায় ছ্যাকড়া! যার যার ভিতরকার সুপ্ত বৈশিষ্ট্য তখন পরিপূর্ণ মাত্রায় চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হয়।

অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসুক হিন্দু মুসলমান দুই নারীই; তখন দেখতে পাবেন তাদের পার্থক্য কোন্ জায়গায়।

আবার বলছি, কসম আল্লার, আমি আদৌ বলছি না, মুসলমান মেয়ে হিন্দু মেয়ের চেয়ে সুপেরিয়র; আমি বলছি, সে ডিফরেণ্ট।'

এমন সময় দুটো তালগাছের মাঝখান দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ একটা গাছের উপর ঈষৎ হেলান দিয়ে আকাশের পূর্বপ্রান্ত আলোকিত করে দিলেন।

শহর্-ইয়ার বললে, 'আহ্! বড় সুন্দর এ জায়গাটা। অতএব এখন থাক নারী-সমস্যা!'

চুপ করে তাকিয়ে আছি ল'বাবুর বাড়ির পরিত্যক্ত ভিটে ছাড়িয়ে, রেল লাইন পেরিয়ে তালসারির দিকে। বার বার এ দৃশ্য দেখেও আমি তৃপ্ত হই নে, কিন্তু এও সত্য শহর্-ইয়ারের আনন্দ তার এখানে আসা অবধি প্রত্যেক আনন্দ ছাড়িয়ে যায়। চুপ করে আছে বটে কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তার সর্বাঙ্গ থেকে যেন সে-আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

ঘোরঘুট্টি অন্ধকার দূর করতে করতে চাঁদ আর কিছুক্ষণ পরেই তার জ্যোতিঃশক্তির শেষ সীমানায় পৌঁছবেন—এরপর রাতভর যে আলো সেই আলোই থাকবে। আমি শহর্-ইয়ারকে বললুম, 'পূর্ণিমা চাঁদের যেন বড় দেমাক, অন্তত এর তুলনায়। আচ্ছা, একবার ডাক্তারকে ডেকে দেখালে হয় না?'

বললে, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু কি জানেন, উনি নিজেই বলেন, এসব দৃশ্যের সৌন্দর্য তিনি বুঝতে পারেন কিন্তু সেটা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে না। ওদিকে অসম্ভব ভদ্রলোক বলে আমরা যতক্ষণ চাই তিনি আমাদের সঙ্গ দেবেন–এবং বিশ্বাস করবেন না, সানন্দে। এবং তাতে কণামাত্র ভণ্ডামি নেই। ঠিক সেই রকম শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। দরকার হলে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব নিয়ে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। কারণ সমস্ত সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি কঠোর কঠিন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করেছেন। জানেন, একবার একটি অজানা অচেনা তরুণ গাওয়াইয়াকে এক জলসায় গোটাকয়েক

দম্ভী অযথা আক্রমণ করে—ঘরানা ঘরানায় আড়াআড়ি তো এদেশে একটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। কেন জানি নে, উনি গেলেন ক্ষেপে—অবশ্য বাইরে তার কণামাত্র প্রকাশ তিনি হতে দেন নি, কখনো দেন না, একমাত্র আমিই শুধু বুঝতে পেরেছিলুম—এবং তারপর সেকি তর্কযুদ্ধ! শুধু যে সেই তরুণের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান সপ্রমাণ করে দিলেন তাই নয়, তার বিরুদ্ধপক্ষের মহারথীদের সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে নিরপেক্ষ পাঁচজনের মনে গভীর সন্দেহ জাগিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অথচ তিনি আমাকে বহুবার বলেছেন, সঙ্গীত তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে না! কী জানি, হয়তো ডাক্তারি শেখার পূর্বে রসগ্রহণ করার ব্লটিং পেপারখানা করকরে শুকনোই ছিল; এখন সেটা চিকিৎসা-জ্ঞানে জবজব।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'কি জানি! আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসাটাও বোধ হয় ঐ ধরনের! তবে কিনা, বিয়ের দশ বছর পরে, এই ত্রিশ বছর বয়সে এটা নিয়ে চিন্তা করা বেকার!'

হঠাৎ উঠে বললেন, 'এবারে শুতে যাই। যে ঘরখানা আমায় দিয়েছেন তার জানলা দিয়ে মেটার্নেল আনকল দিঃ মুনের সঙ্গে মনে মনে রসালাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু তার পূর্বে একখানা শেষ রেকর্ড বাজাবো; বলুন, কি বাজাবো?'

আমি চিন্তা না করেই বললুম, "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ-কুসুম চয়নে।" '

চার

পরের দিন ওরা চলে যাওয়ার সময় আমাকে দিয়ে যে শুধু কলকাতা আসার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল তাই নয়, শহর্-ইয়ার পাকা মহকুমা মোক্তারের মত ক্রস্ এগজামিনেশন করে করে একেবারে তারিখ এমন কি কোন্ ট্রেন ধরতে হবে সেটা পর্যন্ত ঠিক করে দিয়ে গেল। একাধিকবার বললো, 'এখানে তো দেখে গেলুম, আপনি কিভাবে থাকেন, আমাদের ওখানে সেভাবেই ব্যবস্থা করবো। আপনার খুব অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না।'

তিন দিন পরেই চিঠিঃ

১২ গোলাম সিদ্দিক রোড,
কলকাতা

"সালাম পর আরজ এই,

আপনার ওখানে কিভাবে আমার সময়টা কাটল সেটা আপনি নিজেই দেখেছেন।

আমরা আলোচনা করছিলুম, মুসলমান মেয়েদের নিয়ে, যারা অন্দরমহল

থেকে বেরিয়ে আসছে ; বলুন তো, আপনার ওখানে গিয়ে আমি যে-আনন্দ ও বৈভব—গনীমৎ শব্দটা আরও ভালো—পেলুম, কটা মুসলমান মেয়ের ভাগ্যে সেটা জোটে ? আমরা যে কী গরীব সে তো আপনি জানেন না, কারণ আপনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন আপনার হিন্দু আত্মজনদের সঙ্গে।

স্বাধীনতা বড় সম্পদ। আমরা, মুসলমান মেয়েরাও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হচ্ছি কিন্তু সে-স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করার সুযোগ পাচ্ছি কই ? মনে হয়, আমি যেন একাকিনী কোনো নির্জন দ্বীপে বাস করছি ; প্যাঁটরায় লক্ষ টাকা কিন্তু কিনব কি ? লোকালয়ে এই লক্ষ টাকা দিয়ে যে কত কিছু করা যায় সেটা না জানা থাকলে ব্যঙ্গটা অতখানি নিষ্ঠুর মনে হতো না। এই লক্ষ টাকা বিলিয়ে দিয়েও আমি আনন্দ পেতুম। কিন্তু দেব কাকে ?

আপনার ডাক্তার লেবরেটরিতে গেছেন সকাল সাতটায় ; তাঁকে ফের পাবো রাত আটটায়—কপাল যদি মন্দ না হয় !

আপনি আমার বহুৎ বহুৎ আদাব তসলিমাৎ জানবেন।

খাকসার

শহর্-ইয়ার"।

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিখানা পড়লুম। এই প্রথম নয়, আগেও ভেবেছি, এ-মেয়ের অভাব কোন্‌খানটায় ? স্বামী আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত বলে সে তার যথেষ্ট সঙ্গ পায় না—এইটেই দুঃখ ? উহুঁ, তা নয়। এ মেয়ে গতানুগতিক অর্থে শিক্ষিতা নয় ; এ মেয়ে বিদগ্ধা এবং এর কল্পনাশক্তি আছে। দিন-যামিনীর অষ্টপ্রহরের প্রত্যেকটি প্রহর নিঙড়ে নিঙড়ে তার থেকে কি করে আনন্দ-রস বের করতে হয় সে সেটা খুব ভালো করেই জানে। তাকে তাস মেলে 'পেশেনস্' খেলে দিন কাটাতে হবে না। এ মেয়ে গোপালভাঁড়, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। গোপাল ঢেউ গুনে পয়সা কামিয়েছিল। এ মেয়ে ঢেউ গুনে আনন্দের ভাণ্ডার ভরে তুলবে। এবং বাড়ি ফিরে তাই দিয়ে হরিলুট লাগাবে।

আচমকা খেয়াল গেল, কই, আমার কলকাতা যাওয়ার কথা তো কিছু লিখলো না ? যাক্ গে—তার জন্য এখনো সময় আছে।

কোন্ এক পোড়ার বিশ্ববিদ্যালয় 'তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব' প্রবর্তন করতে চায়। আমাকে অনুরোধ করেছে প্ল্যানটা করে দিতে। সাধারণ অবস্থায় এসব বুনো হাঁস খেদাতে আমি তো রাজীই হই না, উল্টে কয়েকটি সরল প্রাঞ্জল বাক্যে এমন সব আপত্তি উত্থাপন করি যে তারা প্ল্যানটার আঁতুড়ঘরে তার গলায় নুন ঠেসে দেয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে-পথ বন্ধ। পোশাকি সরকারী চিঠির এক কোণে আমার বন্ধু—সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্‌সেলর—ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে ফরাসীতে লিখেছেন, 'বাপের সুপুত্তুরের মত প্ল্যানটি পাঠিয়ো, নইলে

এ-শহরের যে-সব পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে তাদের প্রত্যেককে তোমার বর্তমান ঠিকানাটি জানিয়ে দেব—উইদ মাই বেস্‌ট্ কমপ্লিমেণ্টস্।'

প্ল্যানটা তৈরী করা তো সোজা—কিন্তু সেমেণ্ট কই, লোহা কোথায় ? অর্থাৎ এই পবিত্র আর্যভূমিতে যাবনিক ধর্মগুলোর মেটিরিয়েল পাই কোথায় ?

তারই যোগাড়-যন্ত্রের দুর্ভাবনায় দিনগুলো কোন্ পথে যে চলে গেল খেয়ালই করিনি। অবশেষে একদা রাত্রে দ্বিপ্রহরে ত্রিশটি পাতার শেষ পাতাটি টাইপ করে ঘুমুতে গেলুম।

'মাস্টার' বড় ঘেউ ঘেউ করছে,—চতুর্দিকে প্রতি রাত্রে চুরি হচ্ছে সে খবর বাবুর্চী আমায় দিয়েছিল—কিন্তু এ চোরটা তো একেবারেই রামছাগল। দু'দুটো আলসেশিয়ান আমার বাড়িতে। এ দেশটাই মোস্ট ইন্‌কমপিটেণ্ট, চোরগুলো পর্যন্ত নিষ্কর্মা—দিনের বেলা একটু খবরাখবর নিলেই তো বুঝতে পারতো ভদ্র চোরের পক্ষেই এ বাড়ি ভাদ্রবধূ।

নাঃ! উঠতেই হলো। 'মাস্টার' ওরকম করছে কেন? বিষাক্ত খাবার দিচ্ছে না কি কেউ?

দরজা খুলে বারান্দার আলো জ্বাললুম।

দু'বার চোখ কচলালুম। গায়ে চিমটি কাটলে অবশ্য ভালো হতো—স্বপ্নটা তাহলে উপে যেত।

ব্যাকরণে যখন সে ভুল হয়েই গেল তখন স্বীকার করতেই হয় সামনের ডেকচেয়ারে বসে শহ্‌র্‌-ইয়ার ঠোঙ্গা থেকে শিককাবাব বের করে করে মাস্টারকে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে দেখে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'আপনি আবার উঠলেন কেন!'

আমি বললুম, 'বেশ, শুতে যাচ্ছি। শুধু একটা কথা শুধোই, শ্মশানের কাছে এসে টাঙার পথ যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে আপনি এলেন কি করে? তার পর তো পথ নেই, অন্ধকার—'

'ও। রিকশাওয়ালা খানিকটে পথ এসেছিল। আমি বিদেয় করে দিলুম। ব্যাগটা তো ভারী নয়।'

রবীন্দ্রনাথের মত কবি পরিপক্ক বয়সে তাঁর যত অভিজ্ঞতা, অন্যের হৃদয়ে তাঁর অনুভূতি সঞ্চারণ করার যত দক্ষতা, তাঁর সম্মোহিনী ভাষা অলঙ্কারধ্বনি সর্বস্ব প্রয়োগ করে একটি দীর্ঘ কবিতার মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে, যেন হার মেনে বলছেন, দুটি শব্দ—

বৃথা বাক্য।

যামিনীর তৃতীয় যামে, জীবনেরও তৃতীয় যামে অর্থাৎ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গুরুবদনানিঃসৃত এই আপ্তবাক্যটি পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করলুম। চুপ করে বসে থাকা ভিন্ন গতি কি?

মাস্টারকে খাওয়ানো শেষ হলে বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে, ঘোমটা টেনে আগের চেয়ে আরো বিনয়নম্র সেলাম করলো।

পাশে চেয়ার এনে বসে বললে, 'আজ আর চাঁদ উঠবে না। না?'

আমি বললুম, 'আজ শুক্লা-পঞ্চমী। চন্দ্র অনেকক্ষণ হলো অস্ত গেছে। আচ্ছা আমি শুধু আপনাকে একটি প্রশ্ন শুধবো। এ আসাটা কিভাবে হলো?'

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললে, 'একটি কেন, আপনি যত খুশী আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন; আমি নিশ্চয়ই আমার সাধ্যমত উত্তর দেব। কথা ছিল উনি লেবরেটরি থেকে সন্ধ্যা আটটায় ফিরে আসবেন। আমরা খেয়েদেয়ে সাড়ে ন'টার গাড়ি ধরে এখানে দেড়টায় পৌঁছব। তিনি নিশ্চয়ই কাজে ডুবে গিয়ে সব কথা ভুলে গেছেন, আর এরকম তো মাঝে মাঝে হয়ই। আমি আদপেই দোষ দিচ্ছি নে। যে যে-জিনিস ভালোবাসে তাতে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমি তাঁর জন্য শেষ মুহূর্ত অপেক্ষা করে দুটি খেয়ে স্টেশনে এসে গাড়ি ধরলুম।'

'আমি তো কাল বিকেল পাঁচটার গাড়িতে কলকাতা আসতুমই।'

'এক্‌জেক্‌ট্‌লি। যাতে সেটাতে কোনো নড়চড় না হয় তাই আসা।'

এবারে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে মনে মনে বললুম, 'বৃথা বাক্য।'

বললুম, 'দুটি খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন অল্প অল্প খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। সামান্য কিছু খাবেন?'

'আর ক'ঘণ্টা বাকি? সকালবেলা চা খাবো।'

আমি একটু হেসে বললুম, 'কে বললে মুসলমান মেয়ে, বিশেষ করে আপনি, আপনাদের স্বাধীনতার ফল উপভোগ করতে পারছেন না? কটা হিন্দু মেয়েরই এ রকম সাহস আছে?'

খুশী হয়ে বললে, 'এবং ঠিক সেই কারণেই এইখানে বসে আপনাকে বলেছিলুম, মুসলমান মেয়ে ডিফরেণ্ট, কিন্তু কলকাতায় ফিরে গিয়ে যত চিন্তা করতে লাগলুম, ততই মনে হলো এই যে আমি বারবার ডিফরেণ্ট ডিফরেণ্ট বলছি এটা আমারই কাছে খুব পরিষ্কার নয়, এবং যেটুকু পরিষ্কার সেটুকুও বুদ্ধি দিয়ে বুঝিনি, অনুভব করেছি হৃদয় দিয়ে। বুদ্ধির জিনিস বোঝানো তেমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু অনুভূতির জিনিস অন্যের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারে শুধু আর্টিস্ট—সেও বহু সাধনার পর। কিন্তু এ সব কথা পরে হবে। আপনি ঘুমুতে যাবেন না?'

'আর আপনি?'

'আমি একটা কাজ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তার কিছুটা এইখানে বসে করবো। ওয়েস্ট জর্মনি থেকে একটা খবরের কাগজ এ-দেশের নারীসমাজের অবস্থা জানতে চেয়েছে। কিন্তু বিপদ হলো গিয়ে যে লেখাটেখার অভ্যাস একে তো আমার নেই, তার উপর ইয়োরোপীয় কাগজের জন্য লেখা, ইয়োরোপ গিয়ে

কন্টিনেণ্টাল ডিগ্রী যোগাড় করা, আরো কত কী—এক কথায় ইয়োরোপ ইয়োরোপ সর্বক্ষণ ইয়োরোপ এই মনোবৃত্তিটাই আমাকে পীড়া দেয়। তাই লেখাটা তৈরী করবার জন্য কোনো উৎসাহ পাচ্ছি নে। কিন্তু আর না, আপনি দয়া করে শুতে যান।'

'নিশ্চয়ই যাবো, যদি আপনিও কাজটা আজ রাতের মত মুলতুবী রেখে ঘুমুতে যান।'

'আপনার কোনো আদেশ আমি কখনো অমান্য করেছি?'

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, এ মেয়ে কী ধাতু দিয়ে তৈরী? এক দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আমার পর্দানশীন মা বোনের মত শান্ত, নম্র, বিনয়ী। ট্রেনে একবার ঐ যেটুকু যা হামলা করেছিল—সেটা নিশ্চয়ই ব্যত্যয়। আর এই যে দুপুর রাতে আমার বাড়িতে আসা, সেটা সে পর্যায়ে পড়ে না। এটার মূলে আছে, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা। মেয়েটির মন-হৃদয় যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ সে-বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। এই আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে নিষ্পাপ চরিত্রের সম্মেলন এটা বিরল এবং এর সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসা না-আসা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত নয়। সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা কট্টর পর্দানশীন আমার সম্পর্কে এক ভাবী তাঁর স্বামীর নষ্টাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে রাতদুপুরে থানা-ঘাটে হাঁকডাক ছেড়ে নৌকো যোগাড় করে চলে যান কয়েক মাইল দূরের গোসাঁইদের আখড়ায়। একে তো ছোট সেই শহরের সবাই সে কেলেঙ্কারির কথা জেনে যায়, তদুপরি ঐ আখড়াটির মোহান্তের আবার খুব সুনাম ছিল না। শুধু তাই নয়, বৌদিটি আখড়ায় দু'দিন কাটানোর পর ফের সেই পাটনিকে ডেকে পাঠিয়ে ফিরে এলেন শহরে। দাসীকে দিয়ে জড়ো করালেন পাঁচজন মুরুব্বীকে। ও'রা সবাই এসেছিলেন অত্যন্ত অনিচ্ছায়, কিন্তু জানতেন না এলে আমার বৌদিটি এ'দের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে যা হুলস্থূল লাগাবে তার চেয়ে পঞ্চায়েতে যাওয়াই ভালো—বৌদির পয়েণ্ট অতি পরিষ্কার—'আপনারা বিচার করে দিন্, আমার তালাক পাওয়ার হক্ক আছে কিনা।' মুসলমান হিসাবে এস্থলে কেউ বৌদির আচরণে কোনো খুঁৎ ধরতে পারে না। শেষটায় বৌদি তালাক পেল, নির্মম কাবুলীর মত তার মহর, অর্থাৎ স্ত্রীধনের প্রত্যেক কড়ি আদায় করে মক্কা চলে গিয়ে সেখানে বাকী জীবন কাটালো। এর সব-কিছু সম্ভব হলো কারণ আমাদের অঞ্চলের সবাই জানতো, ঐ বৌদির মত পুণ্যশীলা নারী আমাদের মধ্যে কমই আছেন। এবং তাঁর সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস—আমি যা করছি ঠিকই করছি।

বৌদির উদাহরণটি মনে এল বটে এবং শহ্‌র্‌-ইয়ারের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল আছে বটে, কিন্তু দু'জনার বাতাবরণে আসমান-জমীন ফারাক। আমার সম্পর্কের দাদাটি ছিলেন মাইডিয়ার লোক, কিন্তু একেতে—অর্থাৎ এক-

মাত্র ভাবীতে তাঁর 'জিনিয়াস' সীমাবদ্ধ না রেখে ভূমাতে সুখের সন্ধান করতেন। ডাক্তার জুল্‌ফিকার তাঁর ঠিক বিপরীত। অতিশয় একদারনিষ্ঠ—এমন কি স্ত্রীর খামখেয়ালি পর্যন্ত হাসিমুখে মেনে নিয়ে তাঁকে সঙ্গ দেন। শহর্‌-ইয়ারও তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসেন এবং ভক্তি করেন—সেটা এ যুগে কিছু কম কথা নয়।

তবে ?

তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্নে শুনছিলুম কে যেন অতি মধুর কণ্ঠে গান গাইছে। প্রত্যেকটি স্বর, প্রত্যেকটি শব্দ যেন এক একটি নিটোল শিশিরবিন্দু। আর শিশিরবিন্দুরই মত যেন আপনার থেকে জমে উঠছে; তার পিছনে কোনো সচেতন প্রচেষ্টা নেই। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত মধুর ধ্বনি বছরের পর বছর আপ্রাণ রেওয়াজ করে হয় না—এর সঙ্গে একমাত্র তুলনা করে শুধু বলা যায় এ যেন মাতৃস্তন্যে সহজ দুগ্ধসঞ্চার। সহজে বয় তার স্রোত। সহজে পান করে নবজাত শিশু। যে শুনবে সে-ই পান করবে এ-সঙ্গীত শিশুরই মত অপ্রচেষ্টায়।

ধীরে ধীরে উঠে সঙ্গীত-উৎসের সন্ধানে বেরুলুম। কোথা থেকে আসছে এ-সঙ্গীত? বেহেশ্‌ৎ থেকে না হ'লে খুঁজে পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নাও হতে পারে। মাটিতে পা ফেলতেই বুঝলুম এটা স্বপ্ন নয়। মোটামুটি অনুমান করলুম কোন্ জায়গায় এ-গানের উৎস।

এ বাড়ির দেড়তলায় একটি ছোট্ট কুটুরি আছে। সেখানে দেখি শহর্‌-ইয়ার নড়াচড়া করে কি-সব সাজাচ্ছে। আমাকে দেখেই শুধলো, 'চা খেয়েছেন?'

'না।'

'বসুন এই মোড়াটায়, আমি বানিয়ে দিচ্ছি। কাটু স্টেশনে গেছে, ফেরার পথে হাট করে নিয়ে আসবে—আজকে হাটবার।'

তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি শহর্‌-ইয়ার কুটুরিটি চা বানাবার, এবং সেইখানেই আরামে বসে চা খাবার অতি চমৎকার ব্যবস্থা করেছে। বললে, 'এ ঘরের যা যা প্রয়োজন সেগুলো আমি বাক্সের ভিতর রেখে এসেছি স্টেশনে। কাটু আনতে গেছে। আপনি জানেন না, আমি বেলা-অবেলায় চা খাই। তাই এ-ব্যবস্থা। রান্নাতে আমার কোন শখ নেই। তবে মা ডাকসাইটে রান্নার আর্টিস্ট ছিলেন। হাঁসের বাচ্চা কি আর সাঁতার কাটতে পারে না—তাই যদি নিতান্তই চান—'

একটু থেমে বললে, 'ভয় নেই, ভয় নেই। এ বাড়িটাকে আমরা উইক-এন্ড কটেজ রূপে দেখছি নে। এটা কি রকম জানেন? খুব বড়লোক যে-রকম ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ওটা খরচ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মাসের আমদানিটাই পুরো খরচ হয় না কোনো মাসেই।'

আমি বললুম, 'আমার কি মনে হয় জানেন? আপনি যদি এখানে এসে

আনন্দ পান তবে যত খুশী আসবেন। কিন্তু ভালো হয় ডাক্তারকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিশেষ করে এই কারণে বলছি, ভদ্রলোক যে রকম বেদম খাটছে সেটা তার পক্ষে ভালো নয়। এখানে এলে দেহমন দুইই তাঁর জুড়োয়, আমার তো তাই মনে হয়। ওদিকে আপনারও কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি এখানে আপন মনে ঘুরে বেড়ালে, আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে উনি ভারি খুশী হন। নয় কি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ওঁকে ওঁর কাজ থেকে ছিনিয়ে এখানে আনা বা অন্য কোনখানে, সে আমার শক্তির বাইরে।'

তার পর একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'হয়তো সব-কিছুই আমার আদিখ্যেতা। আমার সমস্যা আর এমন কি নূতন? আমার শ্বশুরমশাইকে আমি দেখি নি, কিন্তু শুনেছি সেই যে সকালবেলা বৈঠকখানায় গিয়ে বসতেন, তার পর ফের অন্দরমহলে ঢুকতেন রাতদুপুরে কিংবা তাঁরও পরে—দুবেলার খাওয়া-দাওয়াই ঐ বৈঠকখানায় ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে। সে হিসেবে তো আমি অনেক ভালো।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আর আপনার শাশুড়ী এ-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন?'

'কি জানি। তখনকার প্যাটার্নটাই ছিল আলাদা। আমার চোখের সামনে ছবিটা যেন পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে না। কারণ আমার বাপের বাড়িতে ছিল অন্য প্যাটার্ন। আম্মাকে আমি অল্প বয়সেই হারাই। আব্বা সমস্ত দিন কাটাতেন নামাজ পড়ে, তসবী, তিলাওত আর দীনিয়াতির কিতাব পড়ে। সংসারের সঙ্গে তাঁর মাত্র এইটুকু যোগ ছিল যে বেশ কড়া নজরে রাখতেন, আমার যত্ন-আত্তি ঠিক মত হচ্ছে কি না। থাক্, এসব কথা এক দিনে ফুরোতে নেই। মেয়েছেলের পুঁজিই বা কতটুকু? ছেলেরা ঘোরাঘুরি করে, কত রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাদের হয়। আপনিই কত না ভ্রমণ করেছেন, কত না অদ্ভুত অদ্ভুত—'

আমি বললুম, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমার বড় ভাইসাহেব তাঁর জীবনে মাত্র একবার কলকাতা আসেন, সেখান থেকে আমাকে দেখবার জন্য এই বোলপুর —ব্যস্! মেজদা বুঝি একবার আগ্রা গিয়ে সেখানে দুটিমাত্র দিন ছিল। দেশ-ভ্রমণের শখ তাঁদের মাইনাস নিল্। অন্য লোকে আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে যা খুশী রোমাণ্টিক ধারণা পোষণ করে করুক, কিন্তু আমি জানি, আমরা তিন ভাই যখন একসঙ্গে বসে আলাপচারী করি তখন কার দৌড় কতখানি। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—ওসবেতে কিচ্ছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।'

'হুঁ,' অনেক-কিছু দেখেছেন বলে এ-সব কথা কইছেন। আচ্ছা, এবারে আমি নাইতে, সাজগোজ করতে চললুম।'

* * *

সমস্ত দিন শহর্-ইয়ার আপন কামরা থেকে বেরুলো না। তবে কি সে নিজের সঙ্গে কোনো রকমের বোঝাপড়া করছে? তা হলে মাঝে মাঝে আবার গান গেয়ে উঠছে কেন? আল্লা জানে তার কিসের অভাব। একাধিকবার সে বলছে সে মুসলমান মেয়ে, বহু যুগ পরে এ-যুগে এসে অন্দরমহল থেকে বেরিয়েছে; তাই তার সমস্যা এক নূতন প্যাটার্নের প্রথমাংশ—ক্রমে ক্রমে বহু মেয়ের চোখের জল আর ঠোঁটের হাসি দিয়ে প্যাটার্ন সম্পূর্ণ হবে। তারপর নব যুগান্তরে সমস্ত প্যাটার্নটা যাবে মুছে, ভাগ্যবিধাতা বসে যাবেন আবার নূতন আলপনা আঁকতে।

কিন্তু আমার কাছে এটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না যে শহর্-ইয়ার মুসলমান।

আইনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দু মেয়ে আর মুসলমান মেয়ের মধ্যে অধিকারে পার্থক্য আছে। এবং সে আইনের ভিত কুরান-হদীসে। হিন্দুধর্মের ব্যবস্থা অন্য রকম—যেমন, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর কোনো ধর্মানুষ্ঠান অবশ্যকতব্য নয়। মুসলমানকে দিনে পাঁচ ওক্ৎ নামাজ পড়তে হয়, খৃষ্টানকে রববারে রববারে গির্জেয় যেতে হয়, ইহুদিকে শনিবারে সিনাগগে, এবং খুদ হিন্দুধর্মে একমাত্র ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যাহ্নিক করতে হয়। সেখানেও আবার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু মুসলমানদের বেলা স্ত্রী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই: পুরুষকে যে-রকম পাঁচ ওক্ৎ নামাজ পড়তে হয়, পুরো রোজার মাস উপোস করতে হয়, স্ত্রীলোককেও তাই। এবং তারই ফলে জানা-অজানাতে মুসলমান মেয়ে অনুভব করে যে স্বয়ং আল্লার সামনে যখন নামাজ রোজার মারফতে পুরুষ স্ত্রীলোককে একইভাবে দাঁড়াতে হয় তখন এই পৃথিবীতেই তার অধিকার কম হবে কেন? অবশ্য কর্মক্ষেত্রে অধিকারভেদ থাকার কথা, কিন্তু মূল নীতি তো অতিশয় অপরিবর্তনীয় সুদৃঢ়।

পক্ষান্তরে ধর্ম যাই বলুক আইন-কানুন যে আদেশই দিক একই দেশে যুগ যুগ ধরে থাকার ফলে সামাজিক প্যাটার্ন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে খুব বেশী ভিন্ন হয় না। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় প্যালেস্টাইনে। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের ভিতর তিন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আদেশ অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষে তিন ভিন্ন প্রকারের অধিকারভেদ—অথচ কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক প্যাটার্ন তিন সমাজেরই মোটামুটি এক। একটি ছোট উদাহরণ মনে পড়লো: হিটলারের ভয়ে যখন ইহুদি নরনারীরা জর্মনি ত্যাগ করে জেরু-জালেমে এল তখন বার্লিনের কোনো কোনো অত্যাধুনিক যুবতী সুদ্ধমাত্র শর্ট শার্ট পরে রাস্তায় বেরুতে আরম্ভ করলো। এই বে-আব্রু বেহায়া বেশ দেখে জেরুজালেমের আদিম ইহুদিরা লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত, এবং নিজেদের সবচেয়ে বেশী কুণ্ঠিত বিড়ম্বিত বোধ করতো প্রতিবেশী খৃষ্টান ও মুসলমানের

সম্মুখে। কারণ তিন সম্প্রদায়েরই একই মান, একই স্ট্যাণ্ডার্ড আব্রু, ইজ্জৎ, হায়া সম্বন্ধে।

মনে মনে ভাবলুম, শহর্-ইয়ার যা-ই বলুক, বাঙলা দেশেও কি তাই নয়? এমন কি আমাদের ইলিয়ট রোডের এংলো-ইণ্ডিয়ানদের আচরণ লণ্ডনের খৃষ্টানদের সঙ্গে যত না মেলে তার চেয়ে বেশী সাদৃশ্য ধরে প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে।

তারপর দুপুরে শহর্-ইয়ারের সঙ্গে দেখা।

খানার টেবিলে বাবুর্চী একটা মাংসের কালিয়া দেখিয়ে বললে, এটা বেগম সায়েবা রেঁধেছেন। খেয়ে দেখি, আশ্চর্য, এক্কেবারে হুবহু কাবুলী রীতিতে তৈরী। কিন্তু রাঁধলো কখন?

শহর্-ইয়ার বোধ হয় একটুখানি মৌজে ছিলেন। বললেন, 'আমার মা এক কাবুলীর কাছ থেকে এটা শেখেন।' তারপর আরম্ভ করলো সেই কাবুলীর ইতিহাস। 'কেন জানি নে সেই খান সায়েবের এ-দেশটা ভারী পছন্দ হয়ে যায়। আব্বা তাঁকে একটু জমি দিলেন। সে মামুলী ধরনের ঘরবাড়ি বেঁধে বিয়ে করলো আমাদেরই এক রায়তের মেয়েকে। তার পর ডালভাত খেয়ে খেয়ে সে তার পাঠানত্ব ভুলে গেল, গাঁয়ের লোকও সেটা গেল ভুলে।

বিয়ের পরের বছর খানের একটি মেয়ে হয়েছিল। তার পনেরো বছর পর খান মেয়ের জন্য একটি বর বাছাই করে তার বীবীকে সুখবরটা দিল। কিন্তু পরের দিন সকালে বীবী খানকে জানালেন, মেয়ে তাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে এ-বর তার পছন্দ হয় নি।

তাজ্জবকী বাৎ! বাঙলা দেশের মুসলমান মেয়ে বিয়ের কথাটি মাত্র উঠলেই লজ্জায় ঘেমে নেয়ে কাঁই হয়ে যায়। তার যে একটা মতামত থাকতে পারে সে নিয়ে তো কেউ কখনো মাথা ঘামায় না। এ আবার কি? খান বউকে অভয় জানিয়ে বললে যে আখেরে সব দুরস্ত হয়ে যাবে এবং বিয়ের ব্যবস্থা করে যেতে লাগলো। হয়েও গেল সব-কিছু ঠিকঠাক। বরপক্ষ এলেন ঢাক ঢোল বাজিয়ে, আতশবাজি পোড়াতে পোড়াতে। তারপর যথারীতি এক উকিল আর দুই সাক্ষী বিয়ের মজলিস থেকে বরের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন অন্দরমহলে—সেখানে কনেকে সাজিয়েগুজিয়ে, লম্বা ঘোমটা সহযোগে তাকে একটি আস্ত পুঁটুলি বানিয়ে চতুর্দিকে বসেছেন তার সখীরা। সখীদের কাজ হচ্ছে, উকিল বিয়ের প্রস্তাব করার পর কনে লজ্জায় 'হাঁ' বলতে দেরি করে বলে তাঁরা তখন কনেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে 'কবুল' বলায়। উকিল প্রস্তাব পেশ করলেন। ভুল বললুম, প্রস্তাব ভালো করে শেষ করার পূর্বেই মেয়ে পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, "না, কবুল নয়"।'

হঠাৎ কাহিনী থামিয়ে আমাকে বললে, 'কই, আপনার কাবুলী-কালিয়া

খাচ্ছেন না যে বড় ?'

আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য রসভঙ্গ করতে পারেন আপনি! বখতিয়ার খিলজীর আমল থেকে অই সুবে বাংলার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন্ মুসলমান বঙ্গনারী এ রকম "কবুল নয়" বলেছে, শুনি ? তারপর কি হলো বলুন।'

'আমি সেখানে ছিলুম না, তবু খানিকটে অনুমান করতে পারি। ঐ কনের মজলিসে একশ'টা বাজ একসঙ্গে পড়লেও বোধ হয় তার চেয়ে বেশী ধুন্দুমার লাগাতে পারতো না। তারই ভিতর যাঁদের একটু মাথা ঠাণ্ডা ছিল তাঁরা কনেকে পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে বোঝাতে আরম্ভ করলেন, হাতে পায়ে ধরলেন তাঁদের মাথায়, তাঁদের গোষ্ঠীর মাথায় যেন কেলেঙ্কারি না চাপায়। কনের মামারা তো পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। আর বাপ, কাবুলি খান সাহেব —সে তার সর্ব পাঠানত্ব হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও একটা সামান্য জিনিসে তখনো তার কিছুটা আটকা পড়েছিল, সেটা তার প্রাচীন দিনের একখানা তলওয়ারে। কুড়ি বছর ধরে সে ঐ তলওয়ারখানা সাফসুৎরো রেখেছে। ঐটে নিয়ে করলো ধাওয়া মেয়েকে খুন করবে বলে।

ওদিকে বাইরে বরপক্ষের কানে খবরটা পেঁৗছে গিয়েছে। একসঙ্গে গর্জে উঠলো সবাই, "এ কী বেইজ্জতি!" আমাদের গাঁয়ের লোক দলে ভারি কিন্তু হলে কি হয়, ওদের সঙ্গে ছিল জনাতিনেক জহাঁবাজ লেঠেল—বরের মুরুব্বীদের ভিতর। আর জানেন তো, চাষাভূষোর বিয়েতে নানা রকমের ঢং তামাশার মেকি লড়াই হয়—ভাবটা যেন বরপক্ষ কনেকে ডাকাতি করে লুটে নিয়ে যাচ্ছে—তাই সঙ্গে এনেছে যার যার লাঠি। ব্যস্! লাগ্ লাগ্ লাগ্। আমাদের গাঁয়ের মোল্লাজী, মসজিদের ইমাম সাহেব, এমন কি বরপক্ষ যে তাদের মোল্লাজী সঙ্গে এনেছিল তিনি পর্যন্ত, সবাই মিলে আল্লা রসুলের দোহাই দিয়ে ওদের ঠেকাবার জন্য প্রায় পায়ে ধরেন আর কি ?

শেষটায় আমার চাচা খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে লড়াই ঠেকালেন। নিজের থেকেই বললেন, বিয়ের জন্য বরপক্ষের যা খরচা-পত্র হয়েছে তিনিই সেটা দিয়ে দেবেন।

কিন্তু বরপক্ষ কনে না নিয়ে শুধু 'হাতে' যদি বাড়ি ফেরে তবে সারা রাস্তা ধরে তাদের শুনতে হবে পাঁচখানা গাঁয়ের টিটকারি। তার ব্যবস্থাও চাচা করে দিলেন। ওদের মোল্লাজীকে আড়ালে নিয়ে আলাপ করে খবর পেলেন আমাদের পাশের গাঁয়ে বরপক্ষের পাল্টাঘর আছে ও তাদের একটি মেয়েকে এই বরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য একটা ইশারাও দিয়েছিল। চাচা বরের বাপ-চাচার সঙ্গে কথা বলে আমাদের মোড়লকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বলে দিলেন সে যেন আমার চাচার হয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়ে। চাচা নামকরা জমিদার আর এরা সাধারণ রায়ৎ—এ যে কত বড় সম্মান আর ইজ্জতের কথা—'

আমি বললুম, 'খুব বুঝতে পেরেছি। আমার আব্বাকে বিয়েশাদীর দোয়া-দরুদ পড়তে আমার জীবনে মাত্র একবার আমি দেখেছি। আমাদের বাড়ির দাসীর যখন বিয়ে হল আমাদের এক কুটুম-বাড়ির চাকরের সঙ্গে, পরের দিন বরের দেমাকটা যদি দেখতেন! তারপর কি হল বলুন।'

'তারপর আর বিশেষ কিছু বলার নেই। সেই রাত্রেই বরপক্ষ পাশের গাঁয়ে গিয়ে বিয়েশাদী সাঙ্গ করে কনে নিয়ে মান-ইজ্জতের সঙ্গে বাড়ি ফিরলো। তবে শুনেছি, আমাদের গাঁ থেকে বেরবার সময় তারা নাকি ভিতরে ভিতরে শাসিয়ে গিয়েছিল যে এ-তল্লাটের মাথা, আমার চাচা, তাদের হাত বন্ধ করে দিলেন কিন্তু সামনের হাটবারের দিন আমাদের গাঁয়ের লোক যেন হুঁশিয়ার হয়ে হাট করতে যায়।'

'আর কনেটা?'

'সে কি আর বেশীক্ষণ চাপা থাকে, কার সঙ্গে সে মজেছে? ছোঁড়াটা অবশ্যি তুলকালাম দেখে গা-ঢাকা দিয়েছিল। তালাশ করে ধরে নিয়ে এসে বর সাজানো হল।'

'তা মেয়েটা ওরকম শেষ মুহূর্তে এরকম নাটুকে কাণ্ড করলো কেন?'

'ওর নাকি কোনো দোষ নেই। সে বেচারী তার মাকে অনেকবার তার অমত বেশ জোর গলায়ই জানিয়েছিল, কিন্তু মা পাঠানকে বার বার বিরক্ত করতে সাহস পায় নি। আশা করেছিল, শেষ পর্যন্ত সব কিছু দুরস্ত হয়ে যাবে।'

আমাদের খাওয়া অনেকক্ষণ সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু উঠি-উঠি করে উঠি নি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম, শহুর্-ইয়ার অন্য কিছু-একটা ভাবছে এবং সেইটে চাপা দেবার জন্য ঘটনাটি বলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'চলুন।'

বসার ঘরে এসে বললে, 'কিন্তু খানের মেয়ের বিয়ে বাবদে আসল কথাটি আপনাকে এখনো বলা হয় নি। মেয়েটির বিয়ে চুকে-বুকে যাওয়ার মাসখানেক পরে খান একদিন তার বউকে বললে যে, সে বড় খুশ যে তার মেয়ের গায়ে পাঠান রক্ত আছে। ঐ রকম ঘটনা পাঠান মুল্লুকে নিত্যি নিত্যি না ঘটলেও ব্যাপারটা একেবারে অজানা নয়।'

আমি বললুম, 'তবেই দেখুন, ইসলাম যে-সব অধিকার আমাদের দিয়েছে আমরা সেগুলো ব্যবহার করি নে। শুনেছি, আরবভূমিতে এখনো নাকি মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়।'

শহুর্-ইয়ার একটু হেসে বললে, 'ঠিক ঐ জিনিসই এখন বাঙলা দেশে অল্প অল্প আরম্ভ হয়েছে। যে-সব মুসলমান মেয়েরা এখন ছেলেদের সঙ্গে কিছুটা অবাধে মেলামেশা করে তারা নিশ্চয়ই কিছুটা হিন্‌ট্ দেওয়ার পর ছেলেরা বিয়ের

প্রস্তাব পাড়ে।'

আমি বললুম, 'ইংরেজীতেও বলে Courtship is the process of a woman allowing herself to be chased by a man till she catches him.'

শহর্-ইয়ারের পছন্দ হল প্রবাদটি। তারপর বললে, 'তবেই দেখুন, যে অধিকার মুসলমান মেয়ের ছিল ইসলামের গোড়াপত্তনের সময় থেকে, সেইটেই সে ব্যবহার করলো ইংরিজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে, অন্দরমহল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর। পাঠান মেয়েরা কিন্তু চিরকাল ধরে এ-হক্কটা দরকার হলেই কাজে লাগিয়েছে। শুনেছি, তারা নাকি অনেক ক্ষেত্রেই বাপ-মার তোয়াক্কা না রেখে আপন পছন্দের ছেলেকে ভালোবাসতে জানে। আপনি তো আপনার লেখা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে আমাকে দেন না, কিন্তু কাবুলে ঐ যে একটি পাঠান মেয়ে আপনাকে ভালোবেসেছিল—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি নির্ভয়ে, প্রাণভরে 'মণিকে' নিয়ে যত খুশী আলোচনা করতে পারেন। এ কাহিনীতে আমি এমনই না-পাস্ ফেল মেরেছি যে ওটার কথা স্মরণে এলে 'মণি'র কাছে মনে মনে বার বার লজ্জা পাই আর মাফ চাই—এত বৎসর পরেও।'

'সে কি? আমি বুঝতে পারলুম না।'

আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বললুম, 'মণির কাহিনী গল্প নয়, হাজার পার্সেণ্ট সত্য। আমি তার সিকির সিকিও ফুটিয়ে তুলতে পারি নি। আমি আমার জীবনে মাত্র একটি বার—ঐ নিষ্পাপ কিশোরী মণির কাছ থেকে—অকুণ্ঠ, সর্বত্যাগী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য প্রণয় পেয়েছি। ও ছিল সত্যই কাবুল পাহাড়ের চূড়োর উপরকার ভার্জিন স্নো—এটা আমার ভাষা নয়, এটা বলেছিলেন মণির মুনিব বলো, জাত ভাই বলো—জানো তো পাঠানরা সাম্যবাদে কি রকম মারাত্মক বিশ্বাসী - সেই রসকষহীন স্টোন-হার্ড-বয়েলড্ ডিপ্লোমেট শেখ মহবুব আলী খান। তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন যে, পেশাওয়ারে তাঁদের পরিবারে পরে এখানে ব্রিটিশ লিগেশনে পাঠান চীফ একাউণ্টেণ্ট থেকে আরম্ভ করে পাঠান অরডারলি পর্যন্ত—আবার সেই প্রাণঘাতী ডিমোক্রেসি—মণির কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে চেয়েছিল, কেউ কেউ বিশুদ্ধ পাঠান-রীতিতে মহবুব আলীর কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে মহবুব আলীর শেষ কথাগুলো, "ওমেদারদের দৃঢ়তম প্রচেষ্টাও যেন মণির মনে কোনো ক্ষণেকের তরে ছায়াটুকু পর্যন্ত ফেলতে পারে নি। যেন ওসবের কোনো অর্থই হয় না, যেন তার বয়েস ষোল নয়—চার। তাই বলছিলুম, ভার্জিন স্নো, যার উপর রত্তিভর ধুলোবালি পড়ে নি। তারপর সে আপনাকে দেখল—একবার দরজা খুলে দেবার সময়, আরেকবার যখন আপনার জন্য

নাশতা নিয়ে এল। সেদিন আপনি এখানে ছিলেন আধ ঘণ্টাটাক। পরদিন আমার স্ত্রী বললেন, মণি যেন জীবনে এই প্রথম জেগে উঠলো। নরনারীর একে অন্যের প্রতি বাছাই-অবাছাই-না-করা আকর্ষণ, বিবাহ, মাতৃত্ব সব যেন ঐ দিন এক লহমায় সে বুঝে গেল।" এ সমস্ত 'কবিত্ব' একজন ধুরন্ধর ডিপ্লোমেটের মুখ থেকে—হৃদয়ের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা যার কাছে আকাশকুসুম, সোনার পাথরবাটি।

মণির সেই প্রেম পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেছিলুম আমি, কিন্তু তার প্রেমের আবেগ, সে প্রেমের ভিতর তার সম্মোহিত অবস্থা, যেন সে নিশির-ডাকে-পাওয়ার মত চোখ বন্ধ করে ভিতরকার প্রেমের প্রদীপালোকে চলেছে দয়িতের অভিসারে কাবুলের শঙ্কাসঙ্কুল গিরিপর্বত লঙ্ঘন করে—এসব পারলুম না আপনাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে। জানেন তো, আমাদের কোনো কমন্ ল্যানগুইজ ছিল না?—তৎসত্ত্বেও আমার হৃদয়ে মণির প্রতিটি হৃদ্স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছিল অব্যবহিত ভাবে।

আমার আফসোস, আফসোস,—হাজার আফসোস—যে আমি মণির প্রেমের নেমক খেয়ে সে নেমকের কিস্মৎ দিতে পারলুম না,—আমার সব সময় মনে হয় আমি যেন নেমকহারাম রয়ে গেলুম। জানেন, মণির এই বেদনা-কাহিনী লেখার পর সেটা আর কখনো পড়ি নি? লেখার সময়ই আমি প্রতি লহমায় হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিলুম, সুর লাগছে না, কিন্তু প্রাণপণ আশা করছিলুম যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের নগণ্য সৃষ্টির চলার পথ তৈরী করে দেন তিনি কোনো এক মিরাক্ল্ অবতীর্ণ করে শেষরক্ষা করে দেবেন। কিন্তু আফসোস, তিনি প্রসন্ন হলেন না।'

শহর্-ইয়ার গভীর দরদ দিয়ে শুনছিল। শেষটায় বললে, 'মাফ করবেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। কিন্তু তবু জানতে ইচ্ছে করে, আপনার এই ধারণাটা জন্মালো কি করে?'

'অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়, দম্ভ। আমি ভেবেছিলুম এ তো জলজ্যান্ত ঘটনা। কোনো-কিছু বাড়াতে কমাতে হবে না। স্মৃতির গভীরে কলম ডোবাবো আর লিখব। এতে তো কোনো মুশকিল নেই। সেই হলো আমার কাল। আপন কল্পনা, সহানুভূতি বাদ পড়ে গেল—এক কথায় আমার হৃদয়রক্তে রাঙা হয়ে রক্তশতদলের মত মণি ফুটে উঠলো না। হয়ে গেল ফোটোগ্রাফ—সেও আবার রদ্দি ফোটোগ্রাফ। ফোকাস ঢিলে, কোথাও ওভার-এক্সপোজড কোথাও বা আণ্ডার। ফ্ল্যাট, কণ্টুর নেই আর ক্যামেরাও বাঁকা করে ধরা ছিল বলে টিলটেড্।'

শহর্-ইয়ার শব্দার্থে তামাম শহরের ইয়ার। ইনি আমার লেখার অকৃত্রিম ইয়ার। ঘন ঘন মাথা নেড়ে নেড়ে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে।

পাঁচ

স্টেশনে আমার পরিচিত দু'চারজনের সঙ্গে দেখা। সবাই এক কামরায় উঠলুম—যদিও আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, শহর-ইয়ারের এ ব্যবস্থাটা আদৌ মনঃপূত হয় নি। তাই আমি আরো বিশেষ করে ওদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম না।

শহর-ইয়ারকে অপূর্ব সুন্দরী বলা চলে না কিন্তু তাঁর সৌন্দর্যে অপূর্বতা আছে। সে সৌন্দর্য তিনি ধারণ করেছেন অতিশয় সহজে, এমন কি অবহেলা-ভরে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। পুরুষানুক্রমে বিত্তশালীজন যে রকম তার বৈভব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে ধনী-দরিদ্রের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে। আমার মনে হচ্ছিল, এঁকে একটুখানি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ইনি সুন্দরী-কুলে জন্ম নিয়েছেন, সুন্দরীদের ভিতর বড় হয়েছেন, তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে ছেলে-বেলায় কেউ আদিখ্যেতা করে নি বলে তিনি এ বিষয়ে এমনই সহজ সরল যে সৌন্দর্যহীনারা তাঁর সৌন্দর্যকে ঈর্ষা করবে না, সুন্দরীরা তাঁকে প্রতিদ্বন্দিনী রূপে দেখবে না। তাঁর সৌন্দর্যের অপূর্বতা কিছুটা তাঁর বর্ণে। বংশানুক্রমে পর্দার আড়ালে বাস করার ফলে তাঁর শান্ত গৌর বর্ণকে 'অসূর্যম্পশ্যা' বর্ণ নাম দেওয়া যেতে পারে। এ বর্ণ সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে অতি অবশ্য কিন্তু সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করবে সে-কথা বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ রঙের প্রতি আমার নাড়ির টান আছে—আমার মা-বোন সকলেরই এই ধরনের রঙ—কেউ একটু বেশী গৌরী কেউ বা কম। তদুপরি শহর-ইয়ার এখন পূর্ণ-যৌবনা—অনুমান করলুম তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে আটাশের কোনো জায়গায় হবে। মাথায় সিঁদুর থাকার কথা নয়, এবং যদিও বেশভূষা হুবহু বিবাহিতা বাঙালী হিন্দু মেয়ের মত তবু কোথায় যেন, কেমন যেন একটা পার্থক্য রয়েছে। আমি কিছুতেই সে-পার্থক্যটা খুঁজে বের করতে পারলুম না। আমার এক অসাধারণ গুণী চিত্রকর বন্ধু আছেন এবং অদ্ভুত তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি। তিনি থাকলে আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন। পর্দানশীন খানদানী মুসলমান গৌরীদের রঙ তিনি লক্ষ্য করে আমার সামনে একদিন ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

পরিচিতেরা দু'এক বার তাঁর দিকে আড়নয়নে তাকিয়েছিলেন—এ মেয়ে যে আর পাঁচটি সুন্দরী থেকে ভিন্ন সেটা হয়তো ওঁদের চোখেও ধরা পড়েছিল। শহর-ইয়ার কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার। কে বলবে, এঁর মা-দিদিমা যুগ যুগ ধরে পর্দার আড়ালে জীবন কাটানোর পর ইনিই প্রথম বেগানা পুরুষদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছেন!

কামরাটা সব চেয়ে বড় সাইজের যা হয়। তিনি কিন্তু আমার পাশে না বসে

আসন নিলেন সুদূরতম প্রান্তে। বেঞ্চির উপর পা তুলে মুড়ে বসে, কিন্তু আমার দিকে মুখোমুখি হয়ে। আমাদের পাঁচজনের ভিতর নানারকম আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো। সকলেই বুদ্ধিজীবী—বিষয়বস্তুর অনটন হওয়ার কথা নয়। শহ্‌র্‌-ইয়ার সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছেন কি না, বুঝতে পারলুম না।

কবে হয়ে গিয়েছে এঁর বিয়ে, কিন্তু বাপের বাড়িতে বিয়ের পূর্বে মেয়েকে যে তালিম দেওয়া হয়—শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সে কি ভাবে বসবে চলবে এবং বিশেষ করে অঙ্গসঞ্চালন নিরোধ করে থাকবে—সেটা মোটেই অনভ্যাসবশতঃ বিস্মৃত হয় নি। সেই যে বোলপুরে যে-ভাবে আসন নিয়েছিল বর্ধমান পর্যন্ত তার সামান্যতম নড়চড় হল না।

বর্ধমানে প্রায় সবাই চায়ের সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নামলেন। এঁরা হিন্দু না, এঁরা অপটিমিস্ট।

শহ্‌র্‌-ইয়ারের পাশে গিয়ে বসে বললুম, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার, এখানে কিন্তু আপনি একমাত্র আমার ইয়ার।'

মুখে স্মিতহাস্য ফুটিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এইখানেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু শুধু এখানে কেন, আপনি তো সর্বত্রই আমার একমাত্র ইয়ার।'

আমি বললুম,

'ঘোড়ায় আমার জুটিবে সওয়ার, ইয়ার পাইবে সাকী।'

'মানে ?'

'আমি আপনার চেয়ে বয়সে ডবল না হলেও তারই কাছাকাছি। আমার পালে ওপার যাবার হাওয়া লাগে-লাগে। তখন আপনি, হে আমার সাকী, নূতন ইয়ার পাবেন।'

রীতিমত বেদনা-ভরা কণ্ঠে বললে, 'ছিঃ, আপনি এসব কথা বলেন কেন? ভাষার উপর আপনার বিধিদত্ত অধিকার আছে। সেটা আপনার হাতে ধারালো তলওয়ার, সাবধানে ব্যবহার না করলে আমার মত সরল জন, যে বিশ্বাস করে আপনার অতি কাছে এসেছে তার বুকের ভিতর তার ফলাটা হঠাৎ ঢুকে গিয়ে খামোকা রক্তবওয়াবে না? আপনার কাছ থেকে আমার বহুৎ আশা, বহু বহু বৎসর আপনার সাহায্য আমি পাবো বলে নিশ্চিত ধরে নিয়েছি।'

'আচ্ছা, শহ্‌র্‌-ইয়ার, আপনি ইস্কুল কলেজ গিয়েছেন, সে সূত্রে নিশ্চয়ই দু'-পাঁচজনের সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। অন্তত কোনো কোনো অধ্যাপকের স্নেহ আপনি অতি অবশ্যই পেয়েছেন, কারণ আমি জানি আপনি পড়াশুনায় অসাধারণ ভালো ছিলেন, আপনার আদব-কায়দা মানুষকে নিশ্চিন্ত মনে মেলামেশার সুযোগ করে দেয়, এবং তদুপরি মুসলমান ছাত্রী এই দশ বছর আগেও এতই বিরল ছিল যে হিন্দু অধ্যাপকরা তাদের বিশেষ আদরের চোখে দেখতেন—হয়তো বা তাতে নূতনের প্রতি খানিকটে কৌতূহলও মেশানো

থাকতো। বিয়ের পরে আপনার স্বামীর ইয়ার-দোস্তের সঙ্গেও আপনার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা না হয়ে যায় না। এদের ভিতর কেউ নেই যার সঙ্গ পেলে, যার সঙ্গে কথা বলে আপনি আনন্দ পান ?'

'না।' ব্যস্, ঐ একটি শব্দ। এত ক্ষুদ্র পরিষ্কার উত্তর আমাকে রীতিমত হকচকিয়ে দিল।

'কিন্তু—' আমার আর কথা বলা হল না। প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, 'এ আমি কি দেখছি! মরীচিকা, মরুতৃষা, মিরাজ ? ভানুমতী, ইন্দ্রজাল ? না, না, এসব কিছুই নয়। আমার চোখ দুটো বিলকুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। ভাই শহ্‌র্-ইয়ার, কলকাতায় নেমেই সোজা চশমার দোকান।'

আমার উত্তেজনার কারণ সরল নয়, অতি কুটিল। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। সরকারী হুকুমে যখন সর্ব রেলওয়ে স্টেশনের মদের 'বার' বন্ধ হয়ে গেল, তখন এই পুণ্যভূমি বর্ধমান স্টেশনের কেলনার হয় ভেবেছিলেন চা, বিয়ার, হুইস্কি একই জিনিস, সব কটাই পৈশাচিক মাদকদ্রব্য, কিংবা চা মদ্য না হলেও উত্তেজক দ্রব্য তো বটে। অতএব কংগ্রেসের অকৃত্রিম সদস্য, হিসেবে কংগ্রেস ধর্মানুযায়ী তাঁরা মদ্য জাতীয় সর্ব উত্তেজক আবর্জনার সঙ্গে চাকেও কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেন। এ তত্ত্বটি আমি সাতিশয় বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি। কেউ যদি সন্দেহ প্রকাশ করে, আমি তা হলে তাকে দেখে নেব—কি কি করবো, এখন বলছি নে, কিন্তু সর্বপ্রথমেই যে আমি তার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনবো সে-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়।

এহেন দৃঢ় প্রত্যয় যখন আমার হৃদয়মনে দড় থানা গড়ে টাইট বসে আছে, তখন যদি বর্ধমান রেল কামরায় কেলনারের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে—মনে রাখবেন, আমরা তাকে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা, কিংবা তার চেয়েও ভালো, বাস্-ট্যাক্সি পারমিটের প্রলোভন দেখাই নি—আবার বলছি আপন খেয়াল-খুশী, মর্জিমোতাবেক, মেহেরবানী মাফিক একখানা ট্রেতে ঢাউস পট চা, রুটি-মমলেট সামনে ধরে সবিনয় বলে, 'মেমসায়েব, আপকী চা' তবে কি আপনার নলেজ বাই ইনফারেন্স্ এই হবে না, যে আপনার চোখ আল্লার গজবে বিলকুল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে ? এ তো মাতালের সিঙ্গল বস্তু ডবল দেখা নয়। এ যে যা নেই তা দেখা, আকাশকুসুম শোঁকা, গাড়ির কামরার মধ্যিখানে রাজার পিসি কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলতে খেলতে ফ্রেম থেকে খুলে আমসত্ত্ব ভাজা খাচ্ছেন তাই দেখা!

'না, না, না। ইয়ার শহ্‌র্-ইয়ার, এ সেই আরব্য রজনীর অন্-নশ্শারের কাল্পনিক ডিনার! আমি এসব 'জিনিস' স্পর্শ করার চেষ্টা করে হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধনেওয়ালার মত সমুখের 'বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমে'র ওয়েটিং লিস্টে নাম লিখিয়ে বাদবাকী জীবন ঝুলে থাকতে চাই নে।'

শহর্-ইয়ার বললেন, আপনার হুঁশিয়ারী অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তবে এ-সম্পর্কে সামান্য একটি কথা আছে। আপনি যখন কাটুকে টাকা দিয়ে বাড়িঘর খবরদারীর কথা বলছিলেন তখন আমি স্টেশনের লোককে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়ে ব্যবস্থাটা করিয়েছিলুম। এবারে খান।'

ওঃ! এ খাওয়াতে ডবল সুখ! আর সবাই জান পানি করে পেয়েছে ভাঁড়ের পানি—না চা? সে একই কথা।

আমি আগের সীটে ফিরে গেলুম না।

এবারে ডাক্তার গাফিলী করেন নি, কিংবা ভুলেও যান নি। তাঁর পিতার আমলের সেই ঢাউস পাল্কী গাড়ির মত মোটর নিয়ে স্টেশনে হাজির। লক্ষ্য করলুম, ডাক্তারদের সামাজিক আচরণ যদিও আর পাঁচজন হিন্দুদেরই মত, তবু বাড়ির বাইরে বিশেষ করে যেটাকে বলা হয় পাব্লিক প্লেস সেখানে স্ত্রীর সামনে এখনো একটু আড়ষ্ট, যেন সবে পরশু দিন তাঁদের শাদী হয়েছে।

প্রথমটায় রাস্তার উপরকার দোকানপাট, দুটো একটা গারাজ দেখে সেগুলোর পিছনে কি বস্তু আছে ঠিক অনুমান করতে পারি নি। মোড় নিয়ে খোলা গেটের ভিতর দিয়ে গাড়ি তখন সংকীর্ণ একটা গলিপানা প্যাসেজের ভিতর দিয়ে ঢুকছে।

গাড়ি থেকে নেমে আগাপাস্তলা তাকিয়ে দেখি বিরাট প্রকাণ্ড প্রাচীন যুগের একটা বাড়ি—বরঞ্চ ফরাসীতে বলা উচিত শাটো। ক্ষীণ আলোকিত আকাশের অনেকখানি ঢেকে রেখেছে বাড়িটা—তার থেকেই অনুমান করলুম সেটার সাইজ। কারণ সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, অপ্রদীপ। শুধু দোতলার বৃহৎ একটা অংশের সারিবাঁধা অনেকগুলো জানলা দিয়ে বেরুচ্ছে যেন আলোর বন্যা। এ যুগেও যে কলকাতায় এ রকম অতিকায় বসত-বাটি আছে সে ধারণা আমার ছিল না। বাড়িটা কিন্তু রাজামহারাজাদের কলকাতার ফ্যান্সি প্যালেস প্যাটার্নে তৈরী করা হয় নি। গাড়িবারান্দায় যে একটি আলো জ্বলছিল তারই আলোকে দেখলুম, অলংকারবর্জিত সাদামাটা—কিন্তু খুবই টেঁকসই দড় মাল-মশলা দিয়ে বাড়িটা তৈরী। পরিষ্কার বোঝা গেল যে যিনি বাড়িটা তৈরী করান তাঁর অসংখ্য ঘরকামরার দরকার ছিল বলে সেটাকে যতদূর সম্ভব বড় আকারের করে তৈরী করিয়েছিলেন এবং সেই সময় এটাও স্থির করেছিলেন যে তাঁর বংশধরগণকে যেন অন্তত দু'শ বছর ধরে অন্য বাড়ি বানাবার প্রয়োজন না হয়।

দারওয়ানসহ জনা পাঁচেক লোক এগিয়ে এল। 'হঠাৎ নবাব'দের উর্দি পরা লোকজনের হাফ মিলিটারি সেলুটাদির আশংকা আমি করি নি। তারাও মুসলমানী কায়দায় অল্প ঝুঁকে সালাম জানালো। কোনো জায়গায় কোনো কৃত্রিমতা নেই। ডাক্তার কথা বলে যাচ্ছেন, ম্যাডাম—মনে হল যেন ক্রমেই গম্ভীর হতে গম্ভীরতর হয়ে যাচ্ছেন। মুসাফিরীর ক্লান্তিও হতে পারে।

বাড়ির বিপুল আকারের তুলনায় দোতলা যাবার সিঁড়ি যতখানি প্রশস্ত হওয়ার কথা ততখানি নয়, যদিও প্রয়োজনের চেয়েও বেশী।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলুম যখন দোতলার একটা অতি দীর্ঘ বারান্দার উপর দিয়ে যেতে যেতে খোলা দরজা দিয়ে ডাইনের দিকে দেখি, একটার পর একটা মাঝারি সাইজের বেডরুম ড্রইংরুম, মাঝে মাঝে ডইনিংরুম—কখনো দিশী ধরনের, কখনো বা বিলিতি স্টাইলের। দু'একটা কামরা মনে হল যেন বাচ্চাদের পড়াশুনোর ঘর। বেডরুমগুলোর কোনোটাতে প্রাচীন দিনের জোড়া পালঙ্ক, কোনোটাতে ছোট ছোট তিনখানা তক্তপোষ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কোনো ঘরে একটি মাত্র জনপ্রাণী নেই, বিছানাপত্র কিন্তু ছিমছাম তৈরী আর প্রায় প্রত্যেকটি কামরায় বিজলী বাতি জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডান দিকে মোড় নেবার সময় আমি আবার লক্ষ্য করেছিলুম বাঁ দিকে এটারই মত একটা দীর্ঘ উইঙ, রাইট এঙ্গেলে এটার সঙ্গে লেগে ইংরিজি এল শেপ তৈরী করেছে। সেটা কিন্তু অন্ধকার।

অবশেষে দীর্ঘ অভিযান শেষ করে আমরা একটা বড় সাইজের ড্রইংরুমে ঢুকলুম। আমাকে বসিয়ে বললেন, 'আমার বন্ধু-বান্ধবরা দেখা করতে এলে এখানেই বসেন; তাঁরাই পছন্দ করে এটা বেছে নিয়েছেন। একটু পরেই আপনার ঘর দেখাচ্ছি—শহর্-ইয়ার সেটা চেক্ আপ করে নিক্। ঘরটা ভাল না লাগলে কাল আপনার খুশীমত যে কোনো একটা পছন্দ করে নেবেন। বাঁ দিকে মাদামের বুদোওয়ার—সমস্তটা দিন তিনি ঐখানেই কাটান। আর এই ডান দিকে আপনার ঘর—অন্তত এ-রাত্তিরটার মত। চলুন, দেখি, কদ্দুর কি হল। শহর্-ইয়ার আবার একটু অতিরিক্ত পিটপিটে, তায় আবার আপনার প্রতি তার হিমালয়ান ভক্তি।'

অ। মাদাম একেবারে ন'সিকে বিলিতি। একটা চেয়ারে বসে তদারকী করছেন—বেয়ারাটা আমার দুটো সুটকেস থেকে জিনিসপত্র, জামাকাপড় বের করে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখছে কি না। আমার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'বসুন, বসুন। আপনার বইপত্র, কাগজকলম পাশের ঘরে আপনার স্টাডিতে। অন্তরঙ্গ বন্ধু—' এবারে মুখে কৌতুকের হাসি, 'কিংবা বান্ধবী দেখা করতে এলে ঐ স্টাডিতে নিরিবিলিতে তাঁকে এনটারটেন করতে পারবেন। আর এই এখানে বাথরুমের দরজা। হাতমুখ ধোবেন, না গোসল করবেন? আমি ছুট লাগাচ্ছি এখন, ডালভাতের তদারকি করতে। বেয়ারা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে—আমি বাসনবর্তন থেকে ফুর্সৎ না পেলে।' ডাক্তারকে শুধোলেন, 'হ্যাঁ গা তুমি খেয়ে দেয়ে পেটটান করে ফেলো নি তো?' ফের আমাকে বললেন, 'লেবরেটরি থেকে ফেরা মাত্রই উনি খাবার টেবিলের দিকে যে স্পীডে ধাওয়া করেন যে দেখে মনে হয়, বহু শত বৎসরের

বিরহ কাটানোর পর মজনু প্রিয়া লাইলীকে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের একটি অতিশয় মহৎ সদ্‌গুণ আছে—যেটি প্রতি যুগে প্রতি দেশে বিবাহিতা রমণী মাত্রই আপন পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবে। হিন্দু হলে বলবে, না জানি কত শত যুগ তপস্যা করে এ-হেন বর পেলুম, আর আমি বলি আমার বহু মুরুব্বীর বহু দিল্‌-এর দোওয়ার ফলে এ-হেন কর্তা পেয়েছি। সেই মহৎ সদ্‌গুণটি কি? খানা-টেবিলের পানে ধাওয়া করে সেখানে যদি দেখেন সের্ফ প্লেন এক ধামা মুড়ি, কিংবা পক্ষান্তরে যদি দেখেন কোর্মা-কালিয়া-মুসল্লম-কাবাব-পোলাও গয়রহ তখন এই সহৃদয় মহাজনের কাছে দুই পক্ষই বরাবর! আর না—আমি চললুম।'

ডাক্তার খাটের বাজুতে বসে লাজুক হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'একেই তো বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন একখানা উয়েল-লুব্রিকেটেড রসনা—ডাক্তার হিসাবে নিতান্ত হিউমেন এনাটমি জানি বলে একখানা রসনাই বললুম, ইতরজন বলবে শতাধিক—তদুপরি আপনার সঙ্গে পরিচয়ের খুশ-কিস্মৎ নেক্‌-নসীব হওয়ার পর থেকে তার উপর ভর করেছে একটা আস্ত সাহিত্যিক জল-জ্যান্ত মামদো। আপনার সাহিত্যিক গুণটা পেলেও না হয় সেটা সয়ে নিতুম। তা নয়। রামকে না পেয়ে পেয়েছে তার খড়ম। এখন আমার ব্রহ্মতালুর উপর শুকনো সুপুরি রেখে অষ্টপ্রহর দমাদম পিটুনি—সেই আপনি, রামচন্দ্রজী, আপনার খড়ম যে বরায়ে মেহেরবানী এনাম দিয়েছিলেন তাই দিয়ে। ওফ্‌!'

আমি বললুম, 'শত যুগের তপস্যা-ফপস্যা জানি নে, ডাক্তার, কিন্তু আপনি যে রত্নটি পেয়েছেন সেটি অতিশয় কপালী লোকেও পায় কি না-পায় সন্দেহ। আর আমার জান্‌-কলিজা-দিল থেকে দোওয়া আসছে, আপনারা যেন একে অন্যের অক্লান্ত কদর দিতে দিতে দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, দরাজের চেয়েও দরাজ জীবন যাপন করেন। আমেন!'

ডাক্তার বললেন, 'আমার সব মুরুব্বীজন ওপারে। এপারে মাত্র একজন—আপনি। আল্লা যেন আপনাকে একশ' বছরের জিন্দেগী দেন। আমেন, আমেন।'

রুচিশ্রী অনাড়ম্বর খানা খাওয়া শেষ হলে পর একটুখানি ইতিউতি করে ডাক্তার বললেন, 'আজকের মত আমাকে মাফ করে দেবেন, স্যর? দিনভর বেদম খাটুনি গিয়েছে। আমার চোখ জড়িয়ে আসছে—ওদিকে আবার এশার নমাজ এখনো পড়া হয় নি।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কাল সকালে দেখা হবে তো? না আপনি লেবরেটরিতে গিয়ে সেখানে ফজরের নমাজ পড়েন? গুড নাইট, ডাক্তার। খুদা-হাফিজ!'

ডাক্তার মাথা নিচু করে বললেন, 'গুড নাইট, স্যর।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি আসাতে আমি যে কী আনন্দ পেয়েছি—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।'

শহর্-ইয়ার উঠে বললেন, 'আমি ঠিক দু'মিনিটের ভিতর ফিরে আসছি।'

ডাক্তার তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। শহর্-ইয়ার সেদিকে কান না দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন।

আমি শোবার ঘরে এসে ধীরে সুস্থে কাপড় ছেড়ে সবে একখানা বই নিয়ে বসেছি এমন সময় ম্যাডাম এসে উপস্থিত। যেন মাফ চেয়ে বললেন, 'ও'র নমাজের ব্যবস্থাটা আমি নিজের হাতে করে দি। ঐ একটি ব্যাপারে, সত্যি বলছি ঐ একটি মাত্র ব্যাপারে উনি সহজে সন্তুষ্ট হন না। আর-সবাই তো বছরের পর বছর একই জায়নমাজে নমাজ সেরে সেটি ভাঁজ করে রেখে দেয়, পরের বারের জন্য ?—উনি বললেন "উহুঁ—কত ধুলোবালি ময়লা জমে তার উপরে।" তাই তাঁর প্লেন লংক্লথের তিনখানা জায়নমাজ আমি পালাক্রমে রোজ রাত্রে কেচে রাখি। উনি অবশ্য বলেছিলেন বেয়ারা কাচুক না। কিন্তু আমি জানি, আমার হাতে কাচা জায়নমাজে তিনি প্রসন্নতর চিত্তে নমাজ পড়েন।'

আমি ঈষৎ বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই এশার নমাজের কথা শুনে। এবারে পুরো মাত্রায়। শুধালুম, 'উনি কি নমাজ-রোজাতে খুব আসক্ত ? তাই তো মনে হচ্ছে।'

শহর্-ইয়ার বললেন, 'আসক্ত ! ঐ দুটি মাত্র ধাতু দিয়েই তো তাঁর জীবন গড়া। নমাজ-রোজা আর রিসার্চ।'

আমি হাসতে হাসতে মাথা দোলাতে দোলাতে বললুম, 'আমি সব জানি, আমার কোনো জিনিস অজানা নেই। আমি পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সল্লল্লাহু ওয়া আলাইহি সসলাম-এর বংশধর, তদুপরি আমি সাতিশয় সম্মানিত পীর খানদানের ছাওয়াল, তদুপরি আমার ঠাকুরদা দাদামশাই দুজনাই ছিলেন জাঁহাবাজ মৌলানা। আমি জানবো না তো কে জানবে ? আপনি ? ডাক্তার ? আবাদন্ ! হরগিজ নহী।' বলে তিনটি আঙুল তুলে ঘন ঘন আন্দোলন করতে করতে বললুম, ট্রিনিটি, ট্রিনিটি—পিতা পরমেশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা। আপনি সেই পবিত্র আত্মা। আপনি সেই পবিত্র আত্মা—রূপকার্থে ও শব্দার্থে। কিংবা, ভদ্রে বেগমসাহেবা, কাছে এসে অস্মদ্দেশীয় গীতাটি স্মরণ করুন। জ্ঞানযোগ—সে ডাক্তারের রিসার্চ। কর্মযোগ—সে তাঁর আরাধনা ক্রিয়া-কর্ম। ভক্তিযোগ—সে আপনার প্রতি তাঁর অবিচল ভালোবাসা। আপনাদের উভয়ের এ জীবনে সুখ আছে এবং অন্য লোকে মোক্ষ-নজাৎ ! অবশ্য দ্বিতীয়টা যেন একশ' বছর পরে আসে। কারণ ফার্সীতে বলে, দের আএদ, দুরুস্ত আএদ—যেটা দের-এ অর্থাৎ দেরিতে আসে সেটাই দুরুস্ত—পরিপাটি—হয়ে আসে।'

আমার উৎসাহের বন্যায় শহ্‌র্‌-ইয়ার ডুবু ডুবু। সাদা-মাটা ভাষায় বললেন, 'আপনার মুখে মধু, কানে মধু—এই যেন চিরকাল আপনার কিস্মতে থাকে। আর আপনার শুভেচ্ছা-দোয়ার জন্য আমার যা কর্তব্য কাল, শুক্রবার, সেটি করবো। আপনার সলামৎ-কল্যাণের জন্য মহল্লার মসজিদে শির্নী পাঠাবো। নমাজান্তে জমায়েৎ ধর্মনিষ্ঠজন আপনার আত্মার জন্য দোয়া করবেন।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, বে-ফায়দা, বে-কার, ইয়ার! বে-ফায়দা, বেকার। আমার মত পাষণ্ড পাপীর জন্য শির্নী পাঠানো তপ্তকটাহে বিন্দুমাত্র বারিসিঞ্চনতুল্য! তা সে যাক্‌—আল্লা মেহেরবান, তাঁর কাছ থেকে শেষ বিচারের দিনে মাফের আশা রাখি। এবারে বলুন তো, নমাজ-রোজার প্রতি আপনার কি রকম টান?'

দুঃখ করে বললেন, 'আমার বদ্‌-নসীব। আল্লা আমাকে সেদিকে মতিগতি দেন নি।'

'কর্তা অনুযোগ করেন না?'

'একদম না। ভদ্রলোক কক্‌খনো কাউকে কোনো জিনিস করতে বলেন না—ভালোও না, মন্দও না। এমন কি তাঁর মডার্ন বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ তাঁর আচারনিষ্ঠতা নিয়ে অল্পস্বল্প স্নেহসিক্ত কৌতুকের ইঙ্গিত করলে তিনি শুধু মিটমিটিয়ে হাসেন। শুধু তাই নয়, মাঝেমধ্যে ধর্ম নিয়ে তাঁদের ভিতর আলোচনা আরম্ভ হলে তিনি সব-কিছু শোনেন মন দিয়ে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে কক্‌খনো সে আলোচনায় যোগ দেওয়াতে পারেন নি। বিশ্বাস করবেন না, আমার সঙ্গে তো সব বিষয়েই কথাবার্তা হয়—আমার সঙ্গে পর্যন্ত তিনি কখনো ঐ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি, আমি সূত্রপাত করলেও না। এই দেখুন, রববারে কাজে বেরন না বলে ফজরের নমাজ পড়ে প্রথম এক ঘণ্টা কুরান পড়েন সুর করে 'কারীদের' মত। তারপর খানতিনেক ইংরিজি বাংলা অনুবাদ আর একখানা আরবী টীকা নিয়ে আরেক ঘণ্টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি শব্দের গভীরে গিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে নোট করে টোকেন। আমি তাঁকে একদিন ঐ অধ্যয়নের দিকটা আমার সঙ্গে করতে অনুরোধ জানিয়েছিলুম। তিনি বললেন, "আমি নিজে এতই অল্প জানি যে তোমাকে কম্‌পিটেন্টলি সাহায্য করার শক্তি আমার মধ্যে নেই। আমি বরং তোমার জন্য একজন ভালো মৌলানা যোগাড় করে দিচ্ছি।" আমি বললুম, থাক। আপনিই তো কবি ওমর খৈয়ামের একটি চতুষ্পদী অনুবাদ করেছেন,

"তব সাথে, প্রিয়ে মরুভূমি গিয়ে
পথ ভুলে তবু মরি,
তোমারে ছাড়িয়া মসজিদে গিয়া
কি হবে মন্ত্র স্মরি!"

আমি বললুম, 'এটা কি ডাক্তারের উচিত হল? পরিপূর্ণ সত্য একমাত্র আল্লার হাতে; আমাদের শুধু চেষ্টা তার কতখানি কাছে আসতে পারি। ডাক্তার কি ভাবছেন, তিনি যে মৌলানা এনে দেবেন কুরান শরীফ সম্বন্ধে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে? আমি ডাক্তার হলে বলতুম, "মোস্ট ওয়েলকাম্!" তার পর একসঙ্গে পড়তে গিয়ে যদি আপনি দেখতেন যে ব্যাপারটা থ্রী-লেগড্ রেস হয়ে যাচ্ছে তখন চিন্তা করতুম, এখন তা হলে কি করা যায়? তার বদলে মৌলানা এনে লাভ? তিনি তো প্রথম ঝাড়া পাঁচটি বৎসর আপনাকে ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করাবেন, এবং তারপর? আপনি, ডাক্তার, আমি—আমরা কুরানে যা খুঁজি, মৌলানা তো সেটা খোঁজেন না। তাই দাঁড়াবে:

তৃষ্ণায় চাহিনু মোরা এক ঘটি জল
মৌলানা এনে দিল আধখানা বেল!

আপনি ডাক্তারের প্রস্তাব না মেনে বেশ করেছেন। কিন্তু ডাক্তারের কথা ওঠাতে মনে পড়লো, বেচারী সমস্ত দিন খেটেছে, আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা বললে তার শরীর-মন জুড়োবে। আপনি যান না।'

শহর্-ইয়ারের সে কী খিলখিল হাসি। হাসতে হাসতে যেন চোখে জল দেখা গেল। বললে, 'ইয়া আল্লা! আপনি আছেন কোন্ ভবে? এশার নমাজ সেরে বালিশের উপর ভালো করে মাথাটি রাখার আগেই তো তাঁর আগের থেকে তৈরী পরিপাটি নিদ্রাটি আরম্ভ হয়ে যায়। যেন যন্ত্রটি হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাজনা—আলাপ না, বিলম্বিত না, আর যন্ত্রটা বাঁধার তো কথাই ওঠে না। আর হপ্তায় ক'দিন আল্লায় মালুম, শুতে গিয়ে দেখি তিনি নমাজ সেরে জায়নমাজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। খাটে ওঠবার আর তর সয় নি। আর সে কী ঘুম, কী ঘুম! অত্যন্ত নিষ্পাপ মানুষ ভিন্ন অন্য লোক বোধ হয় আল্লার কাছ থেকে এ-ইনামটি পায় না।'

আমি শুধালুম, 'এ বাড়ীতে আপনার সঙ্গী-সাথী কেউ আছে?'

অবাক হয়ে বললেন, 'এ বাড়িতে?'

'হঁ্যা।'

বললেন, 'এ বাড়ীতে তো আমরা দুজন থাকি। সঙ্গী-সাথী আসবে কোত্থেকে?'

এবার আমার আশ্চর্য হবার পালা। শুধালুম, 'এই যে গণ্ডায় গণ্ডায় সাজানো-গোছানো ঘর পেরিয়ে এলুম।'

'কেউ থাকে না তো।'

'ঐ যে উইংটা—এল শেপের মত এসে লেগেছে?'

'সেখানেই বা থাকবে কে? ওখানে তো আলোই জ্বালানো হয় না।'

'নিচের তলায়, তেতলায়?'

'সেগুলোও তো অন্ধকার দেখলেন। কেউ থাকে না উপরে, নিচে। থাকি আমরা দুজনে আর যে ক'টি লোক দেখলেন, আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলুম।'

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললুম, 'এই বিরাট বাড়িতে মাত্র দু'জন লোক!'

শহ্‌র্-ইয়ার একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'আপনার ভয় করছে? কিন্তু এটা ভূতুড়ে বাড়ি নয়, রহস্য উপন্যাসের 'অভিশপ্ত পুরী'ও নয়। যিনি এ বাড়ি বানিয়েছিলেন—সে ক'যুগের কথা আমি জানি নে—তাঁর পরিবার, ইষ্টকুটুমগুষ্টি নিয়ে এ বাড়িটাও নাকি যথেষ্ট বড় ছিল না। কিন্তু আমি সত্যি বিশেষ কিছু জানি নে। উনিও যে খুব বেশী কিছু জানেন, তাও তো মনে হয় না! ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন নিঃসঙ্কোচে। এ বংশের, এ বাড়ির কোনো গোপন রহস্য নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'আর উনিই বা বলবেন কি? সেই খুদায় মালুম ক'শ লোকের পরিবার কমতে কমতে মাত্র এক জনাতে এসে ঠেকলো তারই তো ইতিহাস? আমার মনে হয় না, তিনি খুব বেশি কিছু একটা জানেন—আর এ বাবদে তাঁর কোনো কৌতূহলও নেই। তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কত বিরাট বিরাট পরিবার প্রতিদিন 'বল ক্ষীণ' 'আয়ুহীন' হয়ে ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে, অতীতে গেছে, ভবিষ্যতেও যাবে। এতে বৈচিত্র্যই বা কি, আর রোমানসই বা কোথায়? আর, এ তো শুধু একটা পরিবার। কত জাতকে জাত কত নেশনকে নেশন পৃথিবীর উপর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, তারই বা খবর রাখে কে?'

আমি বললুম, 'থাক্ এসব দুঃখের কথা। আমি এখানে রোমানসের সন্ধানে আসি নি সে তো আপনি জানেন। এবারে বেশ মোলায়েম, মধুর, দিল-চস্‌পে কোনো একটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করুন। আপনার নামের মিতা বাগদাদের শহ্‌র্-ইয়ার শহর-জাদী এক হাজার এক রাত্রি গল্প বলেছিলেন। আপনি না হয় হাজারের শেষের এক রাত্রি সেইটে আরম্ভ করুন, বা শেষ করুন।'

শহ্‌র্-ইয়ার বললেন, 'যবে থেকে এখানে এসেছেন, সেই থেকে তো আমি সুযোগ খুঁজছি।'

আমি বললুম, 'মাফ করে দেবেন।'

তিনি বললেন, 'আপনার দোষ কে বললে? বলছিলুম কি, আমারও রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ডের একটি মামুলী সঞ্চয়ন আছে। দু'একখানা শুনবেন?'

'নিশ্চয়ই, একশ বার এবং ধরে নিচ্ছি ডাক্তারের বিধিদত্ত যোগনিদ্রা তাতে ব্যাহত হবে না।'

আশ্চর্য, আমার শোবার ঘরের দেয়ালে শহ্‌র্-ইয়ার বোতাম টিপে একটা ঢাকনা চিৎ করালেন। ভিতরের ক্যাবিনেট বা কুলুঙ্গি থেকে যেন রেল লাইনের উপর দিয়ে স্লাইড্ করে বেরল একটি রেডিয়োগ্রাম। এ না হয় বুঝলুম,

কিন্তু ঘরের পশ্চিম প্রান্তের এস-পার-উস-পার জোড়া দেয়ালে বিল্ট্-ইন্ দেরাজের স্লাইডিং দরজাগুলো যখন এদিক ওদিক সরাতে আরম্ভ করলেন তখন তার 'মামুলী সঞ্চয়ন' দেখে—আমি বাঙাল—জীবনে এই দ্বিতীয় বার হাইকোর্ট দেখলুম। দশবিশ বছর ধরে প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড না কিনলে তো এ রকম বিরাট সঞ্চয়ন হয় না। এবং খাস মার্কিন স্টাইলে সেগুলো কার্ড ইনডেক্সিং পদ্ধতিতে সাজানো। গোটা ছয় কার্ডশেল্ফ্ আমার সামনের টেবিলে রেখে বললেন, 'ক্যাটলগ দেখতে চান তো এই রইল। আমার নিজের দরকার নেই। আমার মুখস্থ আছে। আরেকটা কথা, এ সঞ্চয়নের অনেক out of print রেকর্ড কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরনো রেকর্ড নতুনের দামে কেনা।' তারপর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই লাগালেন, 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুম চয়নে'—এ গানটা যেন আমাদের উভয় পক্ষের সম্মিলিত 'বিস্‌মিল্লা' 'আল্লার নামে আরম্ভ করি'-র মত।

শহর্-ইয়ার দেখলুম গান শোনার সময় চোখ বন্ধ করে পাষাণ-মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন।

এখানেও সেই বোলপুর পদ্ধতি। দুটো গানের মাঝখানে দীর্ঘ অবকাশ দেন।

আমাকে শুধোলেন, 'এবারে আপনার পছন্দ কি?'

আমি আমার কণ্ঠে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা প্রকাশ করে বললুম, 'আমি এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের শপথ নিয়ে বলছি, আপনার আমার রুচি একই। আমার বাড়িতে আপনি বাছাই করে যে-সব গান বাজিয়েছিলেন তার থেকেই আমার এ দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে।'

বললেন, 'মুশকিলে ফেললেন! আমি যখন নিতান্ত নিজের জন্যও বাছাই করি তখনো আমার এক যুগ কেটে যায় একটা রেকর্ড বাছাই করতে।' তারপর রেডিয়োগ্রামের দিকে যেতে যেতে আপন মনে বললেন, 'হুঁঃ! তারও দাওয়াই বের করেছি। কাল আমি শুয়ে থাকবো পাটরাণীর মত আর এই পীরের সন্তানকে বলবো রেকর্ড বাজিয়ে গানের সূত্রপাত করে পাপ সঞ্চয় করুন তিনি।'

এবার বাজালেন, 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি।'

তার মোহভঙ্গ হওয়ার পর যখন আমার কাছে এসে বসলেন তখন আমি তাঁকে শুধালুম, 'আপনার আত্মার খাদ্য কি?'

'আরো বুঝিয়ে বলুন।'

'দেহ ছাড়া আছে মানুষের মন, হৃদয়, আত্মা। আপনার বেলা এঁরা পরিতৃপ্ত হন কি পেলে? যেমন মনে করুন, সাহিত্যচর্চা, নাট্যদর্শন, সঙ্গীতশ্রবণ,—এমন

কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ, বা যেমন আপনার স্বামীর বেলা সৃষ্টিকর্তার আরাধনা, কিংবা—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'এবারে বুঝেছি এবং তারপর উত্তর দিতে আমাকে আদপেই বাছ-বিচার করতে হবে না, একলহমা চিন্তা করতে হবে না। আমার জীবন-রস রবীন্দ্রসঙ্গীত। ঐ একটি মাত্র জিনিস।'

আমি বললুম, 'ব্যস্‌?'

'ব্যস্‌।'

এবারে বাজালেন, 'আমার নয়ন—'

কাছে এলে ফের শুধালুম, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কি?'

বললেন, 'এর অনেক, অনেক পরে আসে যে-সব জিনিস সেগুলোর মধ্যে একাধিক জিনিস আমাকে আনন্দ দেয়, মুগ্ধ করে, সম্মোহিত করে, আত্মবিস্মৃত করে, কিন্তু এরা আমার প্রাণরস নয়।'

'সেগুলো কি?'

'যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরচ্চাটুয্যের বড় গল্প, আপনার শবনম্‌,—'

আমি বললুম, 'থাক্‌, থাক্‌। এ নামগুলো আর কখনো এক নিশ্বাসে করবেন না। লোকে বলবে, আপনার রসবোধ অদ্ভুত, বিজার্‌, গ্রোটেস্ক।'

'বলুক। আমি কুমারস্বামী নই, স্টেলা ক্রামরিশও হতে চাই নে।'

এবারে বাজালেন আরও একটা আমার প্রিয় গান।

ফিরে এসে আমার পায়ের কাছে বসলেন। আমি লম্বা হয়ে শুয়ে উত্তম যন্ত্রে, সমঝদার কর্তৃক সযত্নে বাজানো বে-জখমী রেকর্ড শুনছিলুম—পরম পরিতৃপ্তি ও শান্তিলাভ করে আমি যেন আমার সর্ব দেহ মন কোনো এক মন্দাকিনী ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছি। মৃদুকণ্ঠে বললে, 'আপনার পা টিপে দি?"

আমি সর্পাহতবৎ লাফ দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বসে বললুম, 'এ আবার কি?'

দেখি, তাঁর মুখ থেকে সর্বশেষ রক্তবিন্দু অন্তর্ধান করেছে। আমার দিকে তাকালেন না, দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

আমি তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি, ভুল আমারই, উত্তেজিত হওয়াটা আমার গাইয়া বেকুবী হয়েছে। সেটা ঢাকবার জন্য রেডিয়োগ্রামের কাছে গিয়ে না দেখে-চেয়ে আগের রেকর্ডটার উল্টো পিঠটা বাজাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মেসিনটা এমনই নূতন মডেলের যে কোন্‌ বোতাম টিপলে কি হয়, কোন্‌ স্ক্রুর কি ফানকশন অনুমান না করতে পেরে ভ্যাবাচ্যাকার মত দাঁড়িয়ে রইলুম। শহ্‌র্‌-ইয়ার বুঝতে পেরে কাছে এসে বললেন—আল্লাকে শুকুর্‌, তাঁর গলায় কণামাত্র উত্তাপ বা অভিমান নেই—'এখন আমি বাজাই। কাল আপনাকে দেখিয়ে দেব। তা হলে আপনার ইচ্ছেমত যখন খুশী তখন বাজাতে পারবেন।

তাই এই ঘরটাতেই আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছিলুম।' কথাগুলো শুনে লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা গেল। এ মেয়ের অনেক গুণ প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি কিন্তু সে যে এতখানি দয়ালু আর ক্ষমাশীলা সেটা লক্ষ্য করে যেমন লজ্জা পেলুম তেমনি আনন্দও হল যে এমন সদ্‌গুণ শুধু যে পৃথিবী থেকে অন্তর্ধান করে নি তাই নয়, আমারই এক পরিচিতার ভিতর পরিপূর্ণ মাত্রায় রয়েছে।

রেকর্ড চালু করে দিয়ে এবারে শহর্‌-ইয়ার চেয়ারে বসলেন। আমি ততক্ষণে বিছানায় আবার লম্বা হয়েছি।

বললুম, 'শহর্‌-ইয়ার।'

'জী?'

'আগে যেখানে বসেছিলেন সেইখানেই এসে বসুন।'

'জী' বলে এসে বসলো।

আমি বললুম, 'টিপতে হবে না, হাত বুলিয়ে দিন।' এবারে তাঁর মুখ আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আমি বললুম, 'আমি বড়ই মূর্খ। মনে আছে আপনারা দুজনা যখন বোলপুরে আসেন তখন প্রথম পাঁচ মিনিটের ভিতরই আমি বলেছিলুম, "এদেশে আমার আত্মজন নেই?" তখন লক্ষ্য করেছিলুম, আপনার চোখ ছলছল করেছিল। তারপরও দেখুন দেখি, আমি কত বড় বেকুব।'

শহর্‌-ইয়ার হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'থাক্ না। এই সামান্য জিনিস নিয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি কত বেকুব দেখুন। আচ্ছা, কাল যদি আমার শক্ত ব্যামো হয়, তা হলে আপনিই তো আমার দেহমনের সম্পূর্ণ ভার নেবেন এবং নার্স যা করে তার চেয়েও বেশী করবেন! নয় কি? তবে আজ আমার এত লজ্জা কেন?'

এবারে শহর্‌-ইয়ার শিশিরবিন্দুটির মত ঝলমল করে উঠলো।

উঠে এসে আমার মুখের উপর তাঁর হাত রেখে আদরে ভরা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে বলি নি আর কথা না বলতে। এই আপনার মুখ বন্ধ করলুম। দেখি, কি করে ফের কথা বলেন। আসলে আপনার যাতে এখানে কোনো অসুবিধা না হয় তাই কাটুকে আমি আপনার কি কি দরকার, আপনার ডেলি রুটিন কি এসব অনেক প্রশ্ন শুধিয়েছিলুম। কথায় কথায় সে বললে, আপনি গা টেপাতে ভালোবাসেন তাই। এবার সব ভুলে যান।' হাত মুখ থেকে সরালেন।

বললুম, 'ভুলে গিয়েছি!'

হাসলেন। শুধালেন, 'এবারে কি বাজাব?'

ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'ঐ মরণের সাগর পারে, চুপেচুপে তুমি এলে।'

সঙ্গে সঙ্গে একদম ডেড্ স্টপ। তারপর আমার হাতের কাছে খাটের বাজুতে বসে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অতি ধীরে ধীরে বললেন, 'এই বারে আমার মনের অন্ধকারতম কোণেও আর কোনো সন্দেহ রইল না যে আপনার আমার রুচি এমনই অস্বাভাবিক ধরনের এক যে, আর কেউ জানতে পারলে বলবে, আমি আপনার অন্ধ ভক্ত বলে আমার রুচি আপনার রুচির কার্বন কপি মাত্র। অথচ কী আর বলবো, এ গান আমাকে যে রকম আত্মহারা করে দেয় অন্য কোনো গান সে-রকম পারে না। জানেন, এ গান কিন্তু এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত সমঝদারদের ভিতরও অতি, অতি দৈবে-সৈবে গাওয়া হয়। এবং যে দু'বার শুনেছি সেও একদম বাইরের অজানা অচেনা গাওয়াইয়া গেয়েছে—অর্থাৎ সমঝদারদের চেলাচেলীর কেউ না। আমার তো বিস্ময় বোধ হয়, রেকর্ড কোম্পানি কোন্ সাহসে এ-গানটি বাছাই করলো? দিনু বাবুর চাপের দরুন না কি?

'আর কী অদ্ভুত সাহস দেখিয়েছেন আপনার গুরুদেব এই গানে।

'ভুবন-মোহন স্বপন রূপে'—কি বস্তাপচা সমাস এই 'ভুবনমোহন'-টা। কোনো মেয়ের নাম ভুবনমোহিনী শুনলেই তো আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে জগদম্বা, রক্ষাকালী, ক্ষান্তমণি! না? অথচ এই গানের ঠিক এ জায়গাটায় সমাসটা শুনে নিজের কানটাকে-বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে, এই ঝুলি-ঝাড়া, সাতান্ন ঘাটের জল খাওয়া, হের্কানি'ড, ক্লিশে সমাসটি এত মধু ধরে, তার এত বৈভব, এত গৌরব! সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধ চোখের তারা দুটি যেন আকাশের দিকে ধাওয়া করে—নইলে সমস্ত ভুবন কিভাবে মোহন হল সেটা দেখবে কি করে অনেকখানি উঁচুতে না উঠে, সেখান থেকে নিচের দিকে, ভুবনের দিকে না তাকিয়ে! আর তার পর? ঐ উর্ধ্বলোক থেকে যখন বিশ্বভুবনের মোহনীয়া রূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আস্বাদন করছি তখন অকস্মাৎ কি নিদারুণ গভীর গহ্বরে পতন! শুনি,

বন্ধ ছিলাম এই জীবনের অন্ধকূপে—

আমার চোখের সামনে তখন কী বীভৎস দৃশ্য ভেসে ওঠে, জানেন! আমাদের গ্রামাঞ্চলের লোক এখনো বিশ্বাস করে, কোনো কোনো বিরাট ধনের মালিক তার সমস্ত ধন কোনো এক গভীর অন্ধকার গহ্বরে পুঁতে রেখে যায়, এবং সেটাকে পাহারা দেবার জন্য চুরি-করে-আনা একটি আট বছরের শিশুকে জন্মের মত শেষবার তাকে ভালো করে খাইয়েদাইয়ে, সাজিয়েগুজিয়ে সেই ধনের পাশে বসিয়ে গুহা-গহ্বর বাইরের থেকে সীল করে দেয়। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সেই ক্ষুদ্র বালকটি যেন অন্ধভাবে ধীরে ধীরে

আপন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করছে। তার পর অনুনয়-বিনয়, তার পর রোদন; সর্বশেষে তার ক্ষুদ্র মুষ্টি দিয়ে চতুর্দিকের দেয়ালে আঘাতের পর আঘাত—'

আমি বললুম, 'দয়া করে ক্ষান্ত দিন, আমি আর শুনতে চাই নে।'

বললেন, 'তবে থাক! ঐ যে 'বন্ধ ছিলাম অন্ধকূপে'—আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি তাই নয়? অন্ধকূপের দেয়ালে জীবনভর করে যাচ্ছি মুষ্ট্যাঘাত আর আর্তনাদ, "ওগো খোলো খোলো, আমাকে আলোবাতাসে বেরুতে দাও।"

তারপর 'ভুবনমোহন' রূপ নিয়ে মৃত্যু এসে দেয় নিষ্কৃতি—সে 'শ্যামসমান' মোহনীয়া। এ কী ভ্রান্ত ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে যে মৃত্যু বিকট বীভৎস! সে আসা মাত্রই ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে দেখি, আকাশে 'স্তরে স্তরে সন্ধ্যাদীপের প্রদীপ জ্বালা'—কত না নক্ষত্র স্তরে স্তরে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করছে আমাকে অমর্ত্যলোকের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে, আর পদপ্রান্তে—যে মর্ত্যভূমি থেকে বিদায় নিচ্ছি সেখানে ঝিল্লি-সঙ্গীতের সঙ্গে পুষ্পবনের গন্ধধূপের সৌরভ!

আপনাকে শুধোই, আপনি বয়সে বড়, অনেক-কিছু পড়বার, শোনবার সুযোগ পেয়েছেন—এ রকম আরেকখানা গান কেউ কখনো রচতে পেরেছে?"

আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনি যে-রকম গানটিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, ক'জন বাঙালী পারে সেটা?'

শহর-ইয়ার অনেকক্ষণ ধরে সম্মুখপানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। শেষটায় বললেন, 'ঠিক কোন্ দিক দিয়ে আরম্ভ করবো বুঝতে পারছি নে। আমি যে গানটিকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি তার জন্য আমার হৃদয় ছিল প্রস্তুত। কিন্তু সে প্রস্তুতিটি নির্মিত হল কি প্রকারে? রবীন্দ্রনাথের গানে গানে। ভিলেজ ইডিয়টেরও হৃদয় আছে কিন্তু সেই আকারহীন পিণ্ড সারাজীবন ধরে একই পিণ্ড থেকে যায়। আমার হৃদয় প্রতি নূতন গানের সামনে নূতন আকার ধরেছে, যেন সে শিল্পীর হাতের কাদা। ঐ চিন্ময় গান শুনতে শুনতে আমার হৃদয় যেন ঐ গানেরই মৃন্ময় রূপ ধারণ করে একটি মূর্তিরূপ ধারণ করে। গানটি যেন শিল্পী। গানের প্রতিটি সুর প্রতিটি শব্দ তার আঙুলের চাপ। সুরে সুরে শব্দে শব্দে অর্থাৎ গান-শিল্পীর আঙুলের চাপে চাপে মূর্তিটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তারপর শুনলুম আরেকটি গান। আগের মূর্তিটি তন্মুহূর্তেই আবার শিল্পীর হাতে কাদাতে পরিবর্তিত হয়েছে। সুরে সুরে শব্দে শব্দে আবার সে এক নবীন মৃন্ময় মূর্তিতে পরিণত হল। এভাবে আমার হৃদয় কত শত মূর্তিতে পরিণত হয়েছে কত শত গানে গানে। আর এখন? এখন চেনা গানের দুটি শব্দ শোনা মাত্রই সম্পূর্ণ মূর্তি আপনার থেকেই তার আকার, তার রূপ নিয়ে নেয়। অথবা অন্য তুলনা দিয়ে বলবো, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান যেন ভিন্ন আকারের রঙিন কি পানপাত্র, আর আমার হৃদয় বর্ণহীন

তরল দ্রব্য। ঐ গানের পাত্রে প্রবেশ করে সে নেয় তার আকার, তার রঙ।

আমার সুখ-দুঃখের অনুভূতি, আমার মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের অশ্রুপাত আনন্দোল্লাস আমার সর্বপ্রকারে সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা—সব, সব নির্মাণ করেছে, প্রাণবন্ত করেছে রবীন্দ্রনাথের গান; সেই শত শত গানই শিল্পী—স্রষ্টা!'

আমি চুপ করে, কোনো বাধা না দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করছিলুম। বললুম, 'আমরা হিন্দু আর মুসলমান মেয়ের হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করছিলুম। সেই সুবাদে আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মসঙ্গীতে যে চরম সত্তার কাছে আত্মনিবেদন করেছেন তিনি তো মুসলমান সুফীদের 'অল-হক্' পরম 'সত্য' সত্তাস্বরূপ। এ গানগুলো আরবী বা ফার্সীতে অনুবাদ করলে কারো সাধ্য নেই যে বলতে পারো এগুলো রচেছে এমন এক কবি যে মুসলমান নয়। আপনি মুসলমান। এ গানগুলো শুনে আপনার হৃদয় কি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের চেয়ে বেশী সাড়া দেয়?'

গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বললে, 'ঐখানেই তো ট্র্যাজেডি। কয়েকটি ব্যত্যয় বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ধর্মসঙ্গীতই আমার বুকে তুফান তোলে না। তুললে তো আমার সব সমস্যা ঘুচে যেত। আমার দেহমন সেই চরম সত্তার কাছে নিবেদন করে পরমা শান্তি পেতুম। একেই তো বলে ধর্মানুরাগ। বরঞ্চ দেখুন, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না, আল্লা মানুষের রূপ ধারণ করে অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং তৎসত্ত্বেও যে ধর্মসঙ্গীতটি আমার হৃদয়ের ভিতর দুরন্ত তুফান তোলে, সেটি—

মেরে তো গিরিধর গোপাল
দোসরা তো কোঈ নহী রে—

চরম অসহায় অবস্থায় এ-ভজনটি যে আমি কত সহস্র বার কখনো চিৎকার করে এই নির্জন বাড়িতে গেয়েছি, কখনো গাড়িতে বসে গুনগুনিয়ে, আর সবচেয়ে বেশী জনসমাজে—বস্তুত সেখানেই আমি সবচেয়ে বেশী একা, বর্জিতা, অসহায় শক্তিহীনা বলে নিজেকে অনুভব করি—নিঃশব্দে শুধু হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিয়ে।'

* * *

নিঝুম নীরব সে গৃহ, বিরাট ভবন স্তব্ধ, বাইরের ভুবন তন্দ্রামগ্ন।

হয়তো এস্থলে আমার উচিত ছিল সহানুভূতি প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করা শহ্‌র্‌-ইয়ার কেন নিজেকে 'বর্জিতা' 'অসহায়' বলে মনে করেন। কিন্তু করলুম না।

'সর্বনাশ!' হঠাৎ বলে উঠলেন শহ্‌র্‌-ইয়ার। 'তিনটে বেজে গেছে, আপনি ঘুমুন, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। ছি ছি, আমার একেবারে কোনো

কান্ডজ্ঞানই নেই!'

ছয়

আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সৃষ্টিকর্তা নারী পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়ে গড়েছেন। শহর-ইয়ার ঘুমিয়েছে ক'ঘণ্টা? তিন ঘণ্টা? সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশী নিশ্চয়ই নয়। সাড়ে সাতটায় খাবার ঘরে চা খেতে এসে দেখি, তার চেহারা যেন শিশির-ধোয়া শিউলি ফুলটি। কোনো সন্দেহ নেই, সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রতি বেশী মেহেরবান।

শহর-ইয়ার ডাক্তারের ব্রেকফাস্টের তদারকি করছে, সঙ্গে সঙ্গে তার লাঞ্চের জন্য স্যান্ডউইচ সন্দেশ এটা সেটা ছোট্ট টিফিনবক্সে সাজাচ্ছে এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বাজার-সরকারকে হাটের ফিরিস্তি বলে যাচ্ছে। আমাকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনি দুপুরে, রাত্রে কি খাবেন যদি বলেন তবে এই বেলাই হাটের সঙ্গে সেগুলো এসে যাবে।'

আমি বললুম, 'দোহাই আপনার! আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আপনি তো দেখেছেন, আমি আমার বাড়িতে একেবারে একা। দিনের পর দিন কাঁচা, পাকা—সব বাজারের ফিরিস্তি বানানোর মত একঘেয়ে মেয়েলী কাজ করতে হয় আমাকে। আমি ছুটি চাই।'

কাছে বেরবার পোশাক পরে ডাক্তার এলেন। ভালো ঘুম হয়েছে কি না শুধোলেন, সকালবেলা যে শুধু চা না খেয়ে এটা সেটা খাওয়া উচিত সেটা শোনালেন এবং তারপর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমার কপাল, তাছাড়া আর কি বলবো। এশার নমাজ যেই না শেষ হয় অমনি সুলেমান বাদশার দুই জিন্ আমার দুই চোখের পাতার উপর তাদের আড়াই'শ মন ওজন নিয়ে হয় সওয়ার। আপ্রাণ চেষ্টা করে তখন পাঁচটি মিনিটও জেগে থাকতে পারি নে। সকালবেলা উঠেই বুকে পাপ হিংসার উদয় হল—আপনারা দুজনাতে যে মজলিস জমালেন আমি তার হিস্যেদার হতে পারলুম না বলে।'

আমি বললুম, 'আপনি বিশ্বাস করবেন যে আমি আপনাকে বার বার মিস্ করেছি?'

ডাক্তার বললেন, 'কোথায় না সান্ত্বনা পাবো, শোকটা আমার আরো উথলে উঠছে।'

শহর-ইয়ার সঙ্কোচের সঙ্গেই ডাক্তারকে বললেন, 'তাহলে আজ একটু বেলাবেলি বাড়ি ফিরলেই তো ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য খানিকক্ষণ সময় পাবে।'

ডাক্তার সোৎসাহে বললেন, 'ঠিক বলেছো। আজ তাহলে গাড়ি সাতটার

সময়ই পাঠিয়ে দিয়ো।' আমাকে বললেন, 'গাড়ি আমাকে পৌঁছে দিয়েই ফেরৎ আসবে। আপনি যদি কোথাও যেতে চান তো কোনো অসুবিধে হবে না। এমন কি সাতটার সময় গাড়ি না পাঠাতে পারলেও আমার কোনো হাঙ্গামা হবে না। আমাদের দফতরে একটি হর-ফন্‌-মৌলা, সকল-কাজের-কাজী চাপরাসী আছে—জিনিয়াস লোকটা। এই কলকাতা শহরের একশ' মাইল রেডিয়াসের ভিতরও যদি কুল্লে একখানা ট্যাক্‌সি খালি থাকে তবে সে সেটা পাবেই পাবে—যেন ব্লাড হাউণ্ডের মত সে ট্যাক্‌সির বদ্‌ বো শুঁকতে পায়।'

আমি বললুম, 'আমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিই না; আমার কোনো প্রকারের এন্‌গেজমেণ্ট নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'তাহলে তো আরো ভালো। শহ্‌র্‌-ইয়ার আপনাকে নিয়ে যাবে এখানে সেখানে, সর্বশেষে তার প্যারা প্যারা বইয়ের দোকানে। আর ইতিমধ্যে যদি ইচ্ছে হয়, তবে আমাদের পাঁচ-পুরুষের জমানো আরবী ফার্সী কেতাব ঘাঁটতে পারেন আমাদের লাইব্রেরীতে—একপাশে আছে, আমার কেনা কিছু ইংরেজী আর বাঙলা বই। না, না, না। তওবা! ডাক্তারী বই এখানে থাকবে কেন?'

হঠাৎ যেন নূতন অনুপ্রেরণা পেয়ে বললেন, 'আপনার বাগচী, ভটচায, চাটুয্যে চেলাদের একদিন ডাকুন না এখানে, কলকাত্তাই মোগলাই খানা খেতে? দোস্ত আপনাদেরও? না, তাহলে বোধ হয় ঠিক জমবে না। আলাদা আলাদা করে দাওয়াৎ করলেই ভালো। কি বলেন আপনি?'

আমি নষ্টামির চোখে বললুম, 'তার চেয়ে শহ্‌র্‌-ইয়ার তাঁর বান্ধবীদের স্মরণ করুন। তাঁদের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করে সেই গোলাপজলে শুকনো জানটাকে ভিজিয়ে নেব।'

ডাক্তার যেন সম্মুখে ভূত দেখতে পেয়ে বললেন, 'ওরে বাপরে! ওর মত জেলাস আর পজেসিভ রমণী আপনি ত্রিসংসারে পাবেন না। বরঞ্চ আপনাকে আমাকে দুজনাকে চিরজন্মের মত যমের হাতে ছেড়ে দেবে, তবু তার বান্ধবীর হাতে এক মিনিটের তরেও ছাড়বে না—হোক না সে বান্ধবীর বয়েস নব্বুই।'

টেবিল ছেড়ে উঠে বললেন, 'তাহলে স্যর, খুদা হাফিজ টিল উই মীট এগেন।'

বউয়ের দিকে তাকিয়ে একটু লাজুক হাসি হেসে বুলেট-বেগে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে ম্লান হাসি হেসে শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন, তিনি আজ সাতটায় ফিরবেন? সময়মত ফেরা, না-ফেরা কি ও'র এখ্‌তেয়ারে? সেটা তো সম্পূর্ণ তাঁর কাজের নেশার হাতে। নেশা না কাটা পর্যন্ত কি মাতাল দাঁড়িয়ে উঠে চলতে পারে? আজ যদি সাতটায় কাটে

তো ভালো। আর যদি তার বদলে দশটায় কাটে, তবে সেটা কাটার পর, ঐ মাতালেরই মত আপনার পা ধরে মাফ চাইবেন একশ' বার, হাজার বার। আপনাকে উনি যা শ্রদ্ধা করেন তাতে আপনাকে অবহেলা করা তাঁর স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু নেশা জিনিসটা নেশা। কাজের নেশা, ঘোড়ার নেশা, প্রেমের নেশা।'

একটু ভেবে নিয়ে দুঃখের সুরে বলেন, 'আমার যদি কোনো একটা নেশা থাকতো তাহলে 'এই জীবনের অন্ধকূপের' তলায় দিব্য মাতাল হয়ে পড়ে রইতুম।'

আমি বললুম, 'আপনি না-হক্ পেসিমিস্ট।'

'আমি পেসিমিস্ট নই। আমি ইমোশোনাল—বড্ড বেশী স্পর্শকাতর—মাত্রাধিক অনুভূতিশীল। এবং তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শত শত গানের শত শত মেশিনের ভিতর দিয়ে আমার কলিজাটাকে এস্পার-উস্পার করে কিমা-কিমা বানিয়ে ছেড়েছেন। তবে এখন আর এসব কথা বলবো না। এ প্রসঙ্গের জন্য পুণ্য লগ্ন রাত্রে, গান শোনার মাঝে মাঝে। আর ঐ আমার কর্তাটি যে বললেন, আমি জেলাস, আমি পজেসিভ সেটা উনি চিন্তা না করে বলেছেন—'

আমি বললুম, 'কি বলছেন! উনি মস্করা করেছেন।'

'না, উনি চিন্তা না করেও একদম খাঁটি সত্য কথা বলেছেন। আমি খুব ভালো করেই জানি আমি জেলাস্ :এবং আমার হক্ক্, আমার সম্পদ সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন। তবে হ্যাঁ, আমি লড়নেওয়ালী নই। কেউ হামলা করলে আমি তখন আমার চোখের জলের সঙ্গ খুঁজি।'

আমি বললুম, 'খাঁটি মুসলমান বঙ্গ রমণী! কোথায় গেল মুসলমান পাঠান রমণীর দৃপ্তকণ্ঠের জঙ্গী জবাব, 'না, কবুল না।' ?'

গুনগুন করে গান ধরলো, 'কেন চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম না রে।' সঙ্গে সঙ্গে দিব্য লাঞ্চের টেবিল সাজানো, ব্রেকফাস্টের জিনিস সরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে রাখা, ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘরের তদারকী করা, বাঙলা কথায় পুরো গেরস্থালির কাজ করে যেতে লাগলো—গান-গাওয়াতে কোনো খিরকিচ না লাগিয়ে। বাইরে থেকে যে কেউ সে-গাওয়া শুনে নিঃসন্দেহে ভাবতো, চোখ বন্ধ করে প্রাণমন ঢেলে তন্ময় হয়ে কেউ গানটি গাইছে।

শেষ হলে আমি বললুম, 'আমার মতের মূল্য অনেকেই দেয়, তাই বলছি, আপনি বড় সুন্দর গাইতে পারেন। কিন্তু বাইরে, মজলিসে কোথাও গেয়েছেন বলে শুনি নি, কাগজেও দেখি নি।'

বললো, 'একই বিষয়বস্তু কেউ লেকচাররূপে সভাস্থলে-প্রকাশ করে, অন্যে ঘরের ভিতর পাঁচকথার মাঝখানে বলে। আমার গান—যদি সত্যিই সেটা গানের

স্তরে ওঠে—দ্বিতীয় পর্যায়ের। বাড়িতে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এ গান তার জায়গা খুঁজে নিয়েছে। সভাস্থলে গাইলে নিশ্চয়ই আমার গান আড়ষ্ট শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে একটি গানের মাঝখান থেকে গেয়ে উঠলেন,

'সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে এক পাশে।'

এ গানের ঘরের প্রণয়ীও নেই। নিতান্ত আমার কাজকর্মের নিরালা দিনের, নির্জন অবসরের এক পাশে পড়ে থেকে বেচারী আমাকে সঙ্গ দেয়।'

'নজরুল ইসলামের গানে শখ নেই? আর কিছু না হোক, মুসলমান হিসেবে, অন্তত যেগুলোর যোগ আমাদের ধর্মের সঙ্গে আছে?'

'আছে কিন্তু মুশকিল স্বরলিপি যোগাড় করা। আর যে-ভাবে সচরাচর গাওয়া হয় সেটা আমার পছন্দ নয়। কুক্ষণে তিনি 'বিদ্রোহী' রচেছিলেন। গাওয়াইয়ারা এখন তাঁর শান্ত লিরিকগানেও ঐ বিদ্রোহী সুর লাগান। বিলকুল বেখাপ্পা। এমন কি বিশ্বাস করবেন না, তাঁর 'ঝিঙে ফুলের' মত লক্ষে গোটেক, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরের 'নাজুক' কবিতাটিও আবৃত্তি করা হয় 'মোশন' ঢুকিয়ে, জোশ লাগিয়ে! বদখদ বরবাদ! চলুন, আমার কাজ উপস্থিত এখানে খতম। বাজার আসুক; তখন দোসরা কিস্তি।'

আমি বেরুতে বেরুতে বললুম, 'একটি রেওয়াজ আমি পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি। স্বামী স্ত্রী ভিন্ন অন্য তৃতীয় প্রাণী যে-বাড়িতে নেই, এবং স্বামী লাঞ্চ খেতে বাড়ি আসেন না, সেখানে স্ত্রী লাঞ্চ রাঁধে না। কি খায় সে অবশ্য দেশভেদে খাদ্য ভেদ। জানি নে লাঞ্চের পরিবর্তে আপনি কি খান। বিশ্বাস করুন আমি সেই খেয়েই সন্তুষ্ট হব। সেফ্‌ আমার জন্য আসমান জমীন স্থানচ্যুত করে আগা খানের খাওয়ার মত লাঞ্চ তৈরী করতে হবে না।'

চলতে চলতে বললেন, 'আপনার লোক দিলজান শেখও বলছিল আপনি লাঞ্চের তোয়াক্কা করেন না। ডিনারও নাকি প্রায়ই মীটসেফ্‌ থেকে বের করে রাতদুপুরে খান। কিন্তু এ বাড়িতে আমি বে-চারা, নিরুপায়। ইসলামী অনুশাসন অনুসারে এ বাড়িতে শতাধিক বর্ষ ধরে অলঙ্ঘ্য ঐতিহ্য, প্রভু-ভৃত্য খাবেন একই খানা। চাকররা সরু চাল খেতে পছন্দ করে না এই আর্জী পেশ করায় কর্তা সরু চাল ছেড়ে দিয়ে মোটা ধরেছেন! আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওরা মোড় থেকে মাঝে মধ্যে ফুচকা নিয়ে আসে—জানেন তো কি রকম ধুলোবালির সঙ্গে মিলে মিশে সে-ফুচকার 'মাটির শরীর'। কোনো দিন যদি দৈবাৎ ওঁর চোখের সামনে পড়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে লম্ফ দিয়ে ঠোঙা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চিৎকার, "দে, দে আমায় দে। একা একা খাস নি। গুনাহ্‌

হবে।" শুনুন, মশাই, শরিয়তের অভিনব ব্যাখ্যা ! চাকরকে না দিয়ে মুনিব যদি একা একা খুশ্ খানা খায় তবে সেটা অশোভন (মকরুহ্) বলা হয়েছে, গুনা (পাপ) কি না জানি নে, কিন্তু মুনিবকে বাদ দিয়ে চাকর যদি—এবং সেটা মুনিবেরই পয়সায়—মামুলীই কিছু একটা খায় তবে নাকি সেটা চাকরের গুনাহ্। আবার ফুচকা খেতে খেতে গম্ভীর কণ্ঠে সদুপদেশ বিতরণ: "দ্যাখ্, রাস্তার ফুচকা খাস্ নি। জার্মটার্ম থাকে। অসুখ-বিসুখ করে।" তারপর আবার বিড় বিড় করে বলেন, "বাড়ির ফুচকা কিন্তু অখাদ্য রদ্দি।" এই তো এখানকার হাল। অতএব আপনি খান আর না খান, আমি খাই আর না খাই, দুপুরের রান্না হবে ঠিক ঠিক। কাল সন্ধ্যায় দেখলেন না, ঘরের পর ঘর সাজানো—জনপ্রাণী নেই ? এটাও ঐতিহ্য !'

আমি বললুম, 'আরেকটা কথা। আজ বিকেলে সাড়ে ছ'টায় আপনাকে নিয়ে আমার প্রয়োজন। অবশ্য আপনার যদি ঐ সময় অন্য কোনো কাজ নাথাকে।'

'কি ব্যাপার ? আমার তো ভয় করছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'রত্তিভর ভয়ের কারণ নেই। বঙ্গবালাদের—অবশ্য সবই হিন্দু—'লাজুক' তবিয়ৎ বাবদে আমি ওয়াকিফ্-হাল।'

উনি গান গাইতে গাইতে বিদায় নিলেন,

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।'

দুপুরে খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে শহর্-ইয়ার বললেন, 'ক'বার যে গিয়েছি আপনার বন্ধ দরজার কাছে ! দোরে কান পেতে না দেখেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি আপনি পড়ছেন। তাই দোরে টোকা দি নি।'

আমি বললুম, 'সর্বনাশ করেছেন। আমি জাগ্রত অবস্থায় কিছু-একটা না পড়ে থাকতে পারি নে। আর সর্বক্ষণ পড়ি বলে যে কোনো সময়ে যত ঘণ্টার জন্য চান আমি সে-পড়া মুলতুবী রাখতে পারি। তাই আপনি যে সময় খুশী যত ঘণ্টার তরে খুশী আমার কাছে এসে গল্প করতে পারেন, রেকর্ড বাজাতে পারেন—যা খুশী তাই। ও ! অত প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন কেন ? বিস্তর পড়ি বলে ? হায়, হায়, হায় ! জানেন, মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে যখন কেউ বলে, কিংবা তার মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারি যে, সে ভাবছে, আমি পড়ে পড়ে জ্ঞানসমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ডুব দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন, কসম খেয়ে বলছি, জ্ঞান যৎসামান্য একটু আধটু হয়তো মাঝে-সাঝে বাড়ে, আসলে কিন্তু আমি পড়ি ওটা আমার নেশা, নেশা, নেশা। এক্কেবারে নেশার মত। মাতালকে শুধোবেন, সে বলবে, প্রথম দু'তিন পাত্তর তার দেহমনের জড়তা কাটে, সে সময় মনে ফুর্তিও লাগে কিন্তু তার পর যে সে খেয়ে যায় সেটা

নিতান্তই মেকানিক্যাল। সর্বশেষে সে নিস্তেজ হয়ে আসে, তবু খাওয়া বন্ধ করে না। তাই তো ওটার নাম নেশা। যতক্ষণ মদ তাকে আনন্দ দিচ্ছে ততক্ষণ তো সেটা কাজের জিনিস—খুব বেশী গালাগাল দিতে চাইলে হয়তো বলতে পারেন বিলাসিতা—কিন্তু যখন সেটা আর আনন্দ না দিয়ে তাকে নিস্তেজ থেকে নিস্তেজতর স্তরে নামিয়ে নিয়ে যায় তখন সেটা রীতিমত নিন্দনীয় নেশা। আমার পড়া ঐ ধরনের। আপনার চোখ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। আরেক দিন না হয় আরো গভীরে গিয়ে আপনাকে বোঝাবো। আপনিও যদি না বোঝেন তবে আমার শেষ নোঙর ভাঙলো।

কিন্তু আপনার কর্তার বেলা ব্যাপারটা অন্য রকম। প্রথমতঃ তাঁর বয়েস কম বলে এখনো বহু বৎসর ধরে তাঁকে নানা রকম তথ্য ও তত্ত্ব সঞ্চয় করে জ্ঞানবৈভব বাড়াতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ তারই সাহায্যে তাঁর জীবনদর্শন—জর্মনরা বলে ভেল্টআনশাউউঙ, গড়ে উঠবে। সব জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার আদর্শ এই জীবনদর্শন নির্মাণ করা। কিন্তু আজ এখানেই ফুলস্টপ না, ফুলেস্ট স্টপ!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললেন, 'আচ্ছা। এখনকার মত না হয় বিশ্বাসই করে নিলুম।'

বললুম, 'শাবাশ! এই জন্যই তো আপনাকে এত ভালোবাসি। তর্কাতর্কি অত্যুত্তম প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেটা সময়মত, কিছু সময়ের জন্য, মুলতুবী রাখার মত সহিষ্ণুতা আর বদান্যতা যেন দিলের ভিতর থাকে। গাঁয়ের মেয়েরা অবশ্য কোঁদল মুলতুবী রাখে অন্য কারণে। সংসারের কাজে ফিরে যেতে হবে বলে দুই লড়নেওয়ালী তখন জিহ্বাস্ত্র সংবরণ করে অদৃশ্য কাগজকালিতে টেম্পরারি আর্মিস্টিস সই করে; এবং তার প্রতীক, দুজনা দুই শূন্য ধামা ধপ্‌ করে মাটিতে উবু করে কোঁদলটা 'ধামাচাপা' দিয়ে রেখে যার যার ঘরে চলে যায়। কাজকর্ম শেষ হলে উভয় পক্ষ রণাঙ্গনে ফিরে এসে ধামা দুটো তুলে নিয়ে কোঁদলকে দেয় নিষ্কৃতি। তার পর ফিন্‌ শুরুসে।

কিন্তু, মাদাম, বললে পেত্যয় যাবেন না, এই যে রেজালা নামক সরেস জিনিসটি খাচ্ছি, এটা যে তৈরী করেছে সে মাইকেল এঞ্জেলো—রান্নার কলাসৃষ্টিতে।'

মাদাম আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আপনার বাড়ি সব দিক দিয়ে আমার অনেক বেশী ভালো লাগে। সেখানে আমার দেহমনে এক অপূর্ব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে আসে। ঐ একটি মাত্র জায়গা যেখানে আল্লাকে শুক্‌র্‌ দেবার জন্য তসবী জপতে ইচ্ছে করে।'

আমি বললুম, 'হুঁঃ! দিলজান শেখের রান্না—তাও বোলপুর হাটে যা পাওয়া যায় সেই আড়াইখানা শুকনো পটোল, চিমসে উচ্ছে আর সজনের ডাঁটা, সুপিচ্ছিল কলাইয়ের ডাল, ঝিঙে-পোস্ত তদাভাবে বড়িপোস্ত দিয়ে, কুকুরের

জিভের মত যে রুটিকে টেনে-টেনে খাবার টেবিলের এসপার-ওসপার করা যায় তাই দিয়ে ব্রেকফাস্ট। তারপর শোবার জন্য শক্ত কাঠের তক্তপোষ এবং বাথরুমে কলের জল নেই। এমন কি সেই আদ্যিযুগের গ্রামোফোনটা বাজাতে গেলে দম দিতে দিতে হঠাৎ বেবাক হাতখানা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যায়। রাত্রে, হয় এমনি নিষুতি নিঝঝুম যে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়, নয় শেয়ালের কনসার্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা—নাগাড়ে।'

আবার বলি, 'হুঁ! রমণীর রুচি যে কত বিদকুটে, বদখৎ হতে পারে এই তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ!'

হঠাৎ মুখ তুলে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে দেখি, শহর-ইয়ারের দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে মাফ চাইতে গিয়ে কি যে অসংলগ্ন কথা তোতলাতে তোতলাতে বলেছিলুম সেটা তখনো নিজেই বুঝতে পারি নি এবং এখন স্মরণে আনা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু আল্লার কী আপন হাতে গড়া এই মেয়ে শহর-ইয়ার! আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে তার সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব কব্জায় এনে দু-চারটি কথা দিয়ে আমাকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার মত অবস্থার সৃষ্টি করে দিল। বললে, 'আমার রসিকতাবোধ ইদানীং বড্ড কমে গেছে—কতকগুলো আকস্মিক অপ্রিয় ঘটনা ঘটে যাওয়ায়। এই যা সব এখ্খুনি বললেন, তার সব কটি কথা সত্য, কিন্তু আপনার কাছে মিথ্যা, আমার কাছে আরো মিথ্যা। যদি সত্যই হবে, তবে আমি আপনার বাড়ীতে প্রতিবার আসামাত্রই এত প্রাণভরা আনন্দে আমার দিকে এগিয়ে আসেন কেন, আপনার বুকের ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে আসে না আপনার মহব্বৎ, আপনার প্যার, আপনার হাঁক-ডাক, চেল্লা-চেল্লিতে? কই, আপনি যে সব অনটনট অসুবিধার লিস্টি দিলেন তার দুর্ভাবনায় তো ক্ষণতরেও আপনাকে ভ্রুকুঞ্চন করতে দেখি নি। মনে আছে, একদিন রুটি খারাপ ছিল বলে টোস্টগুলো মিইয়ে যায়—কই, আপনি তো একবারও আমাদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন নি বা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন নি। তবে আজ হঠাৎ এসব কেন? দেখুন সিতারা সাহেব—'

এবারে আমি বিস্ময়ের যেন বিজলি শক্ খেয়ে শুধালুম, 'আমার ডাকনামটা আপনাকে বললে কে?'

মোনালিজার মত রহস্যভরা নয়নে তাকিয়ে বললে, 'যদি বলি এটাও ঐ তর্কের মত উপস্থিত ধামাচাপা দিয়ে মুলতবী রাখা যাক্, তবে আপনার আপত্তি আছে?'

আমি বললুম, 'হরগিজ নহী। যে কোনো একদিন বললেই হলো।'

এতক্ষণ খাচ্ছিল বলে শহর-ইয়ার কোনো গান ধরতে পারে নি। সে-কর্ম সমাধান হতেই সিতারা (তারা) তাকে টুইয়ে দিল ঐ কর্মে ফিরে যেতে।

শুরু করলো,

নিবিড় ঘন আঁধারে
জ্বলিছে ধ্রুবতারা
মন রে মোর পাথারে
হোস নে দিশেহারা !

অনেকক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে গাইল। বুঝলুম, এটি তার বিশেষ প্রিয় গান।

আমি বললুম, 'ভুলবেন না অখণ্ড সৌভাগ্যবতী শহ্‌র্‌-ইয়ার, এই গানের মূল মন্ত্রটি—'শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা'। আর কাজের কথা শুনুন—অবশ্য গানের মূল মন্ত্রটি সর্ব কাজের চেয়েও মহান—আজ সাড়ে ছ'টার সময় আপনার সঙ্গে আমার রাঁদেভু—কয়েক মিনিট আগে এলেই ভালো এবং বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে আসবেন, প্লীজ। পটের বীবী সাজতে পারেন, নাও পারেন। সাজবার সময়কার মুড্‌মাফিক। আচ্ছা, গাড়িটা পাওয়া যাবে তো ?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু বলুন তো, আমায় কোথায় নিয়ে যাবেন ?'

'এমনই সাদামাটা সর্ব রোমান্‌স্‌ বিবর্জিত স্থলে যে সেটা সত্যি বলার মত নয়। কাজেই সর্ব সারপ্রাইজের ভয়-ভরসা বর্জন করে দিন এই বেলাই।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে

গুনগুন করতে করতে চলে গেল।

সাত

'হা।।। জির্‌!' 'হা'টার উচ্চারণ আরবী কায়দায় যতদূর সম্ভব দীর্ঘ এবং জির্‌টি সেই অনুপাতে হ্রস্বের চেয়েও হ্রস্ব।

আমি বললুম, 'এ কি! এ যে একেবারে রাজরাজেশ্বরীর বেশে সেজেছো ?'

সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলো, ' "তোমায় সাজাবো যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে ॥" '

পূর্বেই বলেছি, পুরোপাক্কা বঙ্গ হিন্দু রমণীর বেশ পরলেও শহ্‌র্‌-ইয়ারের সঙ্গে হিন্দু রমণীর কোথায় যেন একটা পার্থক্য থেকে যায়। উহুঁ! মাথায় এক থাবড়া সিঁদুর বসিয়ে দিলেও সে পার্থক্য ঘোচবার নয়। এতদিন তাকে প্রতিবারেই দেখেছি সাদামাটা বেশে ; আজকের এ বেশেও সেই পার্থক্য, বরঞ্চ একটু বেশী।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, 'কেন ? আমার কি সাজতে সাধ

যায় না ?'

আমি বললুম, 'এর চেয়ে অনেক বেশী ঘন ঘন যাওয়া উচিত। সাজসজ্জা করলে সকলেরই যে সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয় তা নয়। এবং কারো কারো বেলা মনে হয় এ যেন ভিন্ন, অচেনা জন। আপনার বেলা দুটোর একটাও নয়। আর সব চেয়ে বড় কথা আপনি আপনার সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে রকম সম্পূর্ণ অচেতন থেকে সেটিকে অবহেলে ধারণ করেন, আপনার সাজসজ্জা প্রসাধনও আপনি ঠিক সেই ভাবে দেহে তুলে নিয়েছেন। মনে হয়, আপনি এই বেশেই নিত্যদিনের গৃহকর্ম করেন, ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সমস্যা সমাধান করেন। যে-কথাগুলো বললুম তার সব কটি আমি শেষ-বিচারের দিনের সৃষ্টিকর্তার সামনে, ডাক পড়া মাত্র, আপনারি মত হা ! ! জির্ বলে কসম খেয়ে বলতে রাজী আছি—অবশ্য যদি এই বেলা এই বেশে আপনি আপনার একটি ছবি তুলিয়ে দেন—কারণ 'তসবিরে জানাঁ' সে সময় 'দর্-বগল' না হলে চলবে না।'

'সে আবার কি ? মনে হচ্ছে ফার্সী। বুঝিয়ে বলুন।'

আমি বললুম, 'সমূহ মুশকিলে আমাকে ফাঁসালেন। দোহাটি শুনেছি গুরুর কাছে—ওস্তাদ বলছিনে না, কারণ তিনি ছিলেন কনৌজের কট্টর গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং জানতেন উৎকৃষ্টতম ফার্সী—আমার বয়েস যখন তেরো-চোদ্দো। তারপর এটি আমি অন্য কারো মুখে শুনি নি, ছাপাতেও দেখি নি। কাজেই আমার পাঠে ছন্দপতন ও যাবতীয় গলদ থাকার প্রভূত সম্ভাবনা। অর্থ হচ্ছে এই, শেষ বিচারের দিন (দর্ কিয়ামৎ) প্রত্যেককেই (হর্ কস্) সে সমস্ত জীবন ধরে যা যা পাপ কর্ম, পুণ্য কর্ম করেছে এবং করে নি তারই একটি পুরো রিপোর্ট (আমলনামা বা শুধু নামা বা নাম) আপন আপন হাতে ধরে (দস্ত্ গীরদ্) দাঁড়াবে। আমিও নিজে (মন্ নীজ) হাজির হব (হাজির মীশওম) বগলদাবায় (দর্ বগল্) প্রিয়ার তসবিরটি (তসবিরে জানাঁ) নিয়ে।

'অর্থাৎ ঐ লোকটি সেই শেষ বিচারের সর্বমান্য পাক-পবিত্র বিচারপতিকে বলবে, 'অন্যেরা আপন আপন কৃতকর্মের পুরো বয়ানের 'আমল-নামা' নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু, হুজুর, আমার কোনো আমল-নামা নেই। তার কারণও সাতিশয় সরল। আমি সমস্ত জীবন ধরে আর-কিছু করি নি—জীবনভর শুধু আমার প্রিয়ার ছবিটি এঁকেছি আর দেখেছি, দেখেছি আর এঁকেছি। সেইটিই আমার কৃতকর্মের 'আমল-নামা'। এই নিন্, হুজুর, দেখে নিন্ !' তাই বলছিলুম, অষ্ট-অলঙ্কার-পরা আপনার এখনকার একটি ছবি আমাকে দিন। নইলে শেষ বিচারের আদালতে জেরার চোটে আমার জেরবার হয়ে যাবে—একসিবিট নাম্বার ওয়ান এণ্ড লাস্ট্ না থাকলে।'

শহর্-ইয়ার বললেন, 'আমার অল্প বয়সে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই মৌলবী-মৌলানারা আসতেন। তখন এরকম কল্পনাতীত, অসম্ভব অসম্ভব

প্রেমের দোহা অনেকগুলো শুনেছি। এসবেতে অতিশয়োক্তি নিশ্চয়ই, তবু কেমন যেন মনে হয়, ঐ যুগে ওরা বোধ হয় আমাদের তুলনায় প্রেমের মূল্য দিত ঢের ঢের বেশী। আচ্ছা, সে তত্ত্ব বাদ দিয়ে আপনার বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ দিই; আপনি আমার ছবি আঁকুন!'

আমি ভীত রুদ্ধ কণ্ঠে বললুম, 'আর হঠাৎ যদি 'শব্নম্' এসে পড়ে ছবিটা দেখে? ও তো আসবে অতি অবশ্যই। ও যাবার সময় যখন বলে গিয়েছিল সে ফিরে আসছে তখন সে আসবে নিশ্চয়, দৃঢ় নিশ্চয়।'

তাচ্ছিল্যভরে শহ্র-ইয়ার বললে, 'এখন এলে আপনি তাকে চিনতেই পারবেন না।'

রীতিমত তাজ্জব বনে বললুম, 'আপনার মুখে এই কথা! আপনার অনুভূতির কলিজাটা না রবিঠাকুরের ফিমা-মেশিনে তুলো-পেঁজা হয়ে গিয়েছে! শব্নমের অনন্ত তারুণ্য তো কখনো পরিবর্তিত হতে পারে না—তাকে তো আমি গড়েছি আমার জিগর কলিজার বিন্দু বিন্দু খুন্ দিয়ে এবং সে নির্মাণ বহু শত যোজন পেরিয়ে এখনো পূর্ণোদ্যমে অগ্রগামী। আচ্ছা, এ যুক্তিটা না হয় বাদই দিন। ধরুন, একশ বছর পরে নিতান্ত দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ, কিংবা কোনো ছোকরা লাইব্রেরি-এসিসটেন্ট 'শব্নম্' সম্বন্ধে লিখিত আমার আর পাঁচখানা নগণ্য পুস্তকের মত এই পুস্তকখানি পড়লো, নিতান্ত অনিচ্ছায়, সুদ্ধমাত্র বইটা ক্যাটালগের কোন্ কোঠে পড়বে সেইটে ঠাহর করার জন্য। একশ বছর পরে পড়ছে বলে কি আপনার ধারণা শব্নম্ তখন একশ বছর বয়সের জরাজীর্ণা বৃদ্ধা হয়ে সে ছোকরার সামনে আবির্ভূত হবে?'

রসভঙ্গ করে ড্রাইভার বিনয়নম্র কণ্ঠে শুধলো, 'সরকার, যাবো কোথায়?'

'সাহেব যেখানে কাজ করেন।'

ককিয়ে উঠে শহ্র্-ইয়ার বললে, 'ঐ রসকসহীন জায়গায় যাবার জন্য আমি এই বেশভূষা সর্বাঙ্গে চড়ালুম! হা আমার কপাল! এ কপাল কি আর কখনো বদলাবে না? আপনার সঙ্গ পেয়েও না?' আরেকটু হলে কেঁদে ফেলতো আর কি!

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললুম, 'আপনি আমাদের ইসলামের কিছুই জানেন না। তাহলে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন একটি হদীস। জ্ঞানসঞ্চয় এবং পুণ্যলাভ দুই-ই হবে। অবশ্য আমি ঘটনাটি শব্দে শব্দে টায় টায় বলতে পারবো না, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনে যে কোনো প্রকারে উনিশ-বিশ হবে না তার জিম্মাদারী আমি নিচ্ছি—যদিও আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ (ওয়াল্লাহু আ'লম্)!'

একদা এক অভিযানান্তে আল্লার পয়গম্বর যখন তাঁর সঙ্গীসাথীসহ তাঁদের বাসভূমি মদীনা শহরে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, দলের এক আরব যুবা বড় অসহিষ্ণু ভাবে তার উটকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সক্কলের আগে

আগে যাবার চেষ্টা করছে। আরবরা বড়ই সাম্যবাদী—এরকম অবস্থায় দলের মুরুব্বীরাই যে দলের পুরোভাগে থাকবেন এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। তৎসত্ত্বেও ঐ যুবাটির অসহিষ্ণুতা হজরতের চোখে পড়ল। তিনি তাঁর পাশের উট-সওয়ারকে শুধোলেন, "ব্যাপার কি? লোকটার অত তাড়া কিসের?" সে বললে, "হে আল্লার প্রেরিত পুরুষ! এ-যুবা অতি সম্প্রতি বিবাহ করেছে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি পেঁছিতে চায়।" হজরৎ বললেন, "আচ্ছা, ওকে আমার কাছে একবার ডেকে নিয়ে এসো তো।" হজরতের আহ্বান শুনে যুবা শ্লাঘা অনুভব করে তাঁর কাছে এল। হজরৎ বললেন, "বৎস, শোনো। তুমি যদি সক্কলের পয়লা পয়লা উট চালিয়ে সক্কলের পয়লা আপন বাড়িতে পেঁছে যাও তবে খুব সম্ভব দেখতে পাবে তোমার নববিবাহিতা বধূ এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানতো না বলে বিরহিণী হয়তো তার আটপৌরে অতিশয় মামুলী বেশ-ভূষা অযত্নে অবহেলায় পরিধান করে বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। সে দৃশ্য তোমার মনঃপূত নাও হতে পারে, তুমি পুলকিত নাও হতে পারো। পক্ষান্তরে তুমি যদি দলের সকলের পিছনে থাকো তবে যে-মুহূর্তে মদিনাবাসী দলের পুরোভাগ দেখতে পাবে তন্মুহূর্তেই শহরের সর্বত্র আনন্দ-দামামা বেজে উঠবে, এবং যেহেতু তুমি দলের সর্বপশ্চাতে আছ তাই বাড়ি পেঁছিতে তোমার সময় লাগবে বেশী—ইতিমধ্যে তোমার বধূ সেই অবসরে উত্তম প্রসাধন করে, উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষা ধারণ করে তোমাকে প্রসন্ন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রফুল্ল বদনে তোমার জন্য অপেক্ষা করার সুযোগ পাবে।" তাই বলি, শহর্-ইয়ার, আপনার সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার, আপনার মধুরতম মৃদুহাস্য কার জন্য? অপরিচিতজনের জন্য, পথগামী জনতার জন্য—সেখানেও মনে রাখবেন রাস্তাঘাটে স্বেচ্ছায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অলঙ্কার প্রদর্শন ইসলামে নিন্দনীয়। অতএব আপনার বেশভূষা নিশ্চয়ই অপরিচিতজনের জন্যে নয়। আপনি যখনই স্বামীর কাছে যাবেন তখন আপনার বেশভূষা হবে রাজরাণীর মত, তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন যেন তিনিও আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ, এবং তিনিও যখন আপনার কাছে আসবেন তখন আসবেন সম্রাটের বেশে এবং আপনার সঙ্গে কথা বলবেন যেন আপনি রাজরাজেশ্বরী।

হঠাৎ গলা নামিয়ে ঘরোয়া সুরে বললুম, 'জানেন, শহর্-ইয়ার, তাই আমার তাজ্জব লাগে যখন দেখি আমাদের মেয়েরা—কি হিন্দু কি মুসলমান—বাড়িতে ট্যানা পরে মেলছের মত স্বামীর চোখের সামনে আনাগোনা করছে, আর যত পাউডার যত অলঙ্কার বাড়ি থেকে বেরবার সময়! যেন ঐ হতভাগা স্বামীটাই এসেছে বানের জলে ভেসে।'

শহর্-ইয়ার চিন্তিত হয়ে শুধোলেন, 'আমি কি বাড়িতে সত্যি মেলছের মত থাকি।'

আমি হেসে বললুম, 'আদপেই না। আপনি জেনে-না-জেনে সৌন্দর্যের

এতই কদর দেন যে আপনার পক্ষে অসুন্দর বেশ পরা অসম্ভব, অসুন্দর আচরণ অসম্ভব, অসুন্দর—'

'ব্যস্‌, ব্যস্‌, হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে সাজতেগুজতে কি রকম যেন শরম শরম লাগে। লোকে কি ভাববে?'

আমি প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বললুম, 'আমার যত রাগ তো ঠিক ঐখানেই। 'লোক' বলতে আপনি কাদের মীন করছেন? চাকর-বাকর এবং যে দু'একটা উটকো লোক যারা বিনু-নোটিশে কাজে-অকাজে বাড়িতে আসে। আমার প্রশ্ন, আপনি তাদের বিয়ে করেছেন, না ডাক্তারকে? তারা কি ভাবলো, আপসে কি বলাবলি করলো তাতে কি যায় আসে? আচ্ছা, এখন তবে এ আলোচনা আজ থাক্‌। আমরা মোকামে পৌঁছে গিয়েছি? আপনি ড্রাইভারকে বলুন না, সে যেন ডাক্তারকে গিয়ে বলে আমি গাড়িতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি।' ড্রাইভার চলে গেলে বললুম, 'এইবারে দেখি, আমার সোনার চাঁদটি কি করেন। শহ্‌র্‌-ইয়ার, আমিও একদা রিসার্চ করেছি এবং কেউ এসে এভাবে উৎপাত করলে বড্ডই বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু আমার আপনার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, সেটা পাঁচ-সাত মিনিটের ভিতরই অন্তর্ধান করে। বিশেষ করে যারা ডিস্টার্ব করলো তারা যদি তার আপন জন হয়—যাদের সঙ্গলাভে সে আনন্দ পায়। দু' পাঁচ মিনিট তাদের সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই রিসার্চের ভানুমতী কেটে যায়।'

জোর পাঁচ মিনিট, দেখি ডাক্তার টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটে আসছেন। শহ্‌র্‌-ইয়ারকে দেখে সামান্য বিস্মিত হলেন বটে কিন্তু তাঁর নিজের ভিতরকার কী এক উত্তেজনা সব-কিছু ছাপিয়ে যেন উপচে পড়ছে। মেশিনগানের চাইতেও দ্রুততর বেগে আমাকে বলে যেতে লাগলেন, 'ওঃ! আমার কিস্মৎটা আজ সত্যই বড় ভালো, বড়ই ভালো। এই দশ মিনিট আগে আমি আপনাদের ফোন করে পেলুম না। মহা বিপদে পড়লুম, করি কি? হয়েছে কি জানেন, আমার এক ভেরি ডিয়ার ফ্রেন্ড বউকে নিয়ে দিল্লী থেকে এসেছে। কাল ভোরের প্লেনে ফের দিল্লী চলে যাবে। আপনাকে সে চেনে, দিল্লীতে আপনার লেক্‌চার শুনেছে, দু'একবার আপনার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তাও বলেছে। আপনার গ্রেট এড্‌মায়ারার। আর তার বউ যখন এসেছে তখন শহ্‌র্‌-ইয়ারকে নিয়ে যেতে হয়, নইলে বড় অভদ্রতা হয়। দিল্লীর খানদানী ঘরের ছেলে—ভাববে কলকাত্তার লোক তমীজ তহজীব কিছুই জানে না। আপনারা এসে আমায় বাঁচালেন। চলুন, চলুন, আর দেরি না। আমি ওকে কথা দিয়েছি, আপনাদের নিয়ে গ্রেট ঈস্টার্নে সাতটা সাড়ে সাতটার ভিতর পৌঁছব! আঃ। বাঁচলুম, আল্লার কী মেহেরবানী।'

আমি বললুম, 'এত নমাজ রোজা করার পর আল্লা আপনাকে মেহেরবানী

দেখাবে না তো দেখাবে কাকে ?' ওদিকে গাড়ির ভিতরকার আলো-অন্ধকারে না দেখেও যেন গাঢ় অন্ধকারেই বিদ্যুল্লেখার মত উজ্জ্বলতম জ্যোতিতে দেখলুম, শহর্-ইয়ারের গ্রেট ঈস্টানে যাবার উৎসাহ ফ্রীজিং পয়েন্টেরও নিচে; আমারও তদ্বৎ। কিন্তু উপায় কি ? ডাক্তারের বাবলিং সফেন উত্তেজনা, তার অবিমিশ্র আনন্দ বরবাদ করতে পারে নিতান্ত পাষণ্ড জন। তদুপরি বেচারী ডাক্তার তো বারো মাস শুধু লেবরেটরি আর বাড়ি, এরই ভিতর মাকু চালায়। করুক না বেচারী একটুখানি ফুর্তি! আমরা দুজনা না হয় সারেঙ্গী তবলার সঙ্গতই দেব।

হোটেলের সব ক'জন রেসেপসনিস্ট ওরকম লম্ফ দিয়ে উঠে ডাক্তারকে অতখানি সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা জানায় কেন—ডাক্তার তো এখানে আসে অতিশয় কালেভদ্রে ? লিফটের দিকে যেতে যেতে অনুমান করলুম, ডাক্তারের বাপ ঠাকুর্দা এঁরা কলকাতার প্রাচীন খানদানী বিত্তশালী লোক; এ হোটেলে আসুন আর নাই আসুন এরকম একটা হোটেল নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে এঁদের আনুকূল্য পেয়েছে।

শহর্-ইয়ার ও আমি দুজনাই চুপ। ডাক্তার কিন্তু সেটা আদৌ লক্ষ্য করে নি। এমনিতে মুখচোরা, লাজুক—এখন,—এখন কেন, যবে থেকে আমাদের সঙ্গে দেখা সেই থেকে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। অনুমান করলুম, দিল্লী-আগত জনের সঙ্গে একদা নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব তার সুগভীর ছিল। নইলে এত উৎসাহ, এত উত্তেজনা!

ভালো, বড় ঘরই পেয়েছেন দিল্লীর মেহমানদ্বয়।

ভদ্রলোকের পরনে অতি দামী কাপড়ের অত্যুত্তম দর্জির হাতে বানানো সুট। শার্ট, টাই একটু যেন বেশী আত্মপ্রকাশ করছে। সুপুরুষ না হলেও ভদ্র চেহারা। আর অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার আরামের ব্যবস্থা করাতে দিল্লীর লোক পাকা, এটিকেট-দুরুস্ত।

ম্যাডামটি কিন্তু কনট সার্কলের খাঁটি চক্রবর্তিনীদের একজন। সর্বপ্রথমই চোখে পড়ে এঁর ব্লাউজটি। সেটির নাম ব্লাউজ দেব, না কাঁচুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলে উল্লেখ করবো ? এই পেট-কাটা ব্লাউজ যে তাঁর শরীরের উত্তমার্ধ আচ্ছাদিত করার জন্য নির্মিত হয় নি সেটা দেখামাত্রই বোঝা যায়। সেটা যেন সে চিৎকার করে প্রচার করছে। আমরা ঘরে ঢোকার সময় তিনি তাঁর শাড়ির ক্ষুদ্রতম অঞ্চলাংশ একবারের তরে তাঁর কাঁধে আলতো ভাবে রেখেছিলেন। আমরা ভালো করে আসন নেবার পূর্বেই সেটি স্থানচ্যুত হয়ে উরুতে স্তূপীকৃত হলো। এর পর সেটি আর প্রমোটেড হয় নি। আমি ভাবলুম, শাড়ি ছেড়ে ইনি রাজপুতানীদের মত ঘাগরা পরলে তো অনেকখানি কাপড়ের সাশ্রয় হয়। কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে দেখতে হয় তাঁর মেক আপ। এরকম চুলের ঢপ

আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি—খুব সম্ভব প্যারিসের ফ্যাশান পত্রিকা দেখে দেখে হেয়ার ড্রেসার তাঁর মাথার উপরকার ঐ তাজমহলটি নির্মাণ করেছে। ঠোঁটে যে রঙ মেখেছেন সেটা লাল তো নিশ্চয়ই নয়, হয়তো ব্রোন্‌জ বলা যেতে পারে। নখের রঙ অলিভ গ্রীন। কিন্তু সংস্কৃত কবিকুলের মত আমি যদি তাঁর দেহ এবং প্রসাধন এস্থলে দফে দফে বর্ণাতে যাই তবে সর্বপ্রথমই আমাকে বৎসরাধিক কাল তাঁর প্রসাধন নির্মাণে যে-সব গূঢ় রহস্যাবৃত রসায়নাদি সাহায্য করেছে তাদের নিয়ে একাগ্রমনে গবেষণা করতে হবে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকগণ অবহেলে থার্মোমিটার দিয়ে শরশয্যায় শায়িত ভীমের টেম্পারেচার অর্জুনকে দিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু এযুগের বর্ণনাতে আমি ব্রা'র নম্বর নিয়ে গুবলেট করলে কেউ তো আমায় ছেড়ে কথা কইবে না।

হোস্টেলের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় একবার সামান্য একটু মোকা পেয়ে শহ্‌র্‌-ইয়ার ফিস ফিস করে আমাকে বলেছিল, 'আপনার জন্যই আজ আমার এই লাঞ্ছনা। এরা ভাববে আমি মারোয়াড়িদের মত আমার গয়নার দেমাক করতে এসেছি।' আমি বললুম, 'কিন্তু ডাক্তার তো আপনার এই অ্যাকসিডেন্টাল গয়না পরা দেখে খুশী হয়েছেন। তাঁর বন্ধুর কাছে বউকে তো আর বিধবার বেশে নিয়ে যেতে পারেন না।'

আমরা কেউ ড্রিঙ্ক করি না শুনে মহফিলের পয়লা রাগিণীটিই সামান্য কসুর-সুরা হয়ে শুরু হলো। দিল্লী নগরীর মনসুর মুহম্মদ সাহেব বিড় বিড় করে যা বললেন তার মোটামুটি অর্থ, বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হলে তেরো'শ বছরের প্রাচীন বিধি-বিধান একটু-আধটু, এদিক-ওদিক উনিশ-বিশ করতে হয়। বেগম মনসুর এক ঢোক শেরি গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ডাক্তার তেরো'শ বছরের পুরনো কায়দায় এখনো নমাজ পড়েন, উপোস করেন; তবু তিনি কোনো আপত্তি জানালেন না। ওদিকে এ বাবদে উদাসীন শহ্‌র্‌-ইয়ারের মুখ দেখি লাল হয়ে উঠেছে।

তারপর বিশেষ কোনো সূত্র ধরে বাক্যালাপ এগলো না। আমরা যাকে বলি আশকথা পাশকথা। কথার ফাঁকে ফাঁকে মালুম হলো, মনসুর সাহেব একদা এই কলকাতার কারমাইকেল হস্টেলে বাসা বেঁধে বছর দুত্তিন পড়াশুনো করেছিলেন এবং সে সময়ে ডাক্তারের সঙ্গে দোস্তী হয়। আমার তাই মনে হচ্ছিল, শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা হতো যদি দুই ইয়ারের 'দোকলা-দোকলি' বসে দুহুঁ দুহুঁ কুহু কুহু করতেন—শহ্‌র্‌-ইয়ার আর আমার তো কথাই নেই, মাদাম মনসুর পর্যন্ত দ্য এ—ওয়ান টু মেনি। অর্থাৎ সাকুল্যে থ্রী টু মেনি।

মনসুর এবং তাঁর বীবী মাঝেমধ্যে যে দু'একটি ইংরিজি কথা কইলেন সেগুলো শুদ্ধ এবং ভাল উচ্চারণে, অথচ কেন যে তাঁরা অধিকাংশ সময়ই উর্দু চালিয়ে যেতে লাগলেন সেটা বুঝতে পারলুম না। ওঁরা তো স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছেন ডাক্তারের যা উর্দু জ্ঞান সেটা দিয়ে বহুৎ ব-তকলীফ্ ব-মুশকিল কাজ চালানো যায় কি না যায় সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, আমার ভাঙা-চোরা উর্দু আমি সভাস্থলে পেশ না করে, যে কটি বাক্য বলেছি সে সবই ইংরিজিতে এবং শহুর-ইয়ার যে উর্দুর প্রতি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে এ পর্যন্ত তার জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলুম তার সঙ্গে বোলপুর থেকে কলকাতা একসঙ্গে আসার সময়। কি মুটে, কি চা-ওলা, কি রেস্তোরাঁ-বয় কারো সঙ্গে সে ভুলেও বিশুদ্ধ বাঙলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষার সাহায্য নেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। এস্থলেও সে ব্যত্যয় করে নি, তবে বাঙলা না বলে বলেছে ইংরিজি—অবশ্য মুখ খুলেছে সামান্য দু'একবার মাত্র। এসব দেখেশুনেও দেবা-দেবী দুজনা যে উর্দু কপচাচ্ছিলেন তার থেকে যে কোনো লোকের মনে সন্দেহ জাগা নিতান্ত খামখেয়ালী নয় যে, এঁরা যেন একান্তই 'উর্দু আনজুমনের' মিশনারিরূপে এই 'বর্বর' বাঙলা দেশে 'বিসুর্দ' উর্দু ফলাতে এসেছেন!

এ-অভিজ্ঞতা আমার একাধিকবার ইতিপূর্বেও হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ তথা দিল্লীবাসিন্দা কলকাতার মুসলমানদের মাঝখানে বসে উর্দু তড়পাবার সময় ভাবখানা করেন যে ওনারাই একমাত্র 'খানদানী মনিষ্যি', খাস বেহেশতে জিব্রাইল গয়রহ দেবদূতরা উর্দুতেই বাৎচিৎ করেন—অবশ্য তাঁরা সকলেই বাল্যকালে মনুষ্যরূপ ধারণ করে নিদেন বছর দশ দিল্লী-লক্ষ্ণৌয়ে উর্দুটা রপ্ত করে যান। উত্তরপ্রদেশ দিল্লীর উর্দুওলাদের এই হম্-বড়াইর জন্য অবশ্য বেশ-কিছুটা দায়ী কলকাতার মুসলমানই। সে-বেচারী হিন্দু-প্রধান কলকাতায়—যেখানে উর্দুসহ আগত মুসলমান কল্কে পায় না—তার জাতভাইকে যতখানি পারে সৌজন্য দেখাতে চায় এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার মনের কোণে আছে উর্দুর প্রতি একটা সপ্রশংস মোহ। কিন্তু তার অর্থ অবশ্য নিশ্চয়ই এ নয় যে, সে তার মাইকেল-কবি-কাজী নিয়ে গর্ব অনুভব করে না। সে-রকম কোনো বাগ-বিতণ্ডা উপস্থিত হলে সে ওঁদের জন্য জোর লড়াই দেয়। তবে লক্ষ্য করেছি, উর্দুওলারা এ রকম তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চান না; তাঁদের ভিতর যাঁরা চালাক তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, বরঞ্চ কলকাত্তাই মুসলমান কিছু কিছু গালিব ইকবাল পড়েছে, এঁরা টেগোরের নাম শুনেছেন—বাদবাকি ব্লাংকো।

দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারের বন্ধু তাঁর উর্দুর ঝাণ্ডা ব্যোমলোকের এমনই উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে হয়েস্ট করতে লাগলেন যে, আমার তো ভয় হলো ওটা না এভারেস্টের চূড়ো ছাড়িয়ে বেহেশ্তের 'লস্ট এণ্ড ফাউণ্ড' দফতরে গিয়ে পৌঁছয়! ডাক্তার নিরীহ মানুষ—হুঁ হুঁ করে যাচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। শহুর-ইয়ারের মুখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম না। আর আমি যে অনারোগ্য, গোরস্তানগমনোৎসাহী কঠিন ব্যাধিতে কাতর তারই নিষ্পেষণে 'নিশ্চুপ'—

সে ব্যামোর নাম 'সুপেরিয়রিটি কমপ্লেক্স্‌।' আমি আমার মাতৃভাষা নিয়ে এমনই শশব্যস্ত যে অন্য ভাষা তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কি না সে চিন্তা আমার পুরু নিকেট খুলিটা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকতে পারে না।

কথায় কথায় মনসুর সাহেব বললেন, উর্দুর প্রচার ও প্রসারের জন্য কলকাতা মাদ্রাসায় ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে তাবৎ কলকাতার মুসলমান ছেলেমেয়ে সেখানে গিয়ে উর্দু শিখতে পারে।

আশ্চর্য! এতক্ষণ যে শহ্‌র্‌-ইয়ার বিলকুল চুপসে বসে আড়াই ফোঁটা নিম্বু-পানি চোষাতে সর্বচৈতন্য নিয়োজিত করে সময় কাটাচ্ছিল সে হঠাৎ বলে বসলো, 'কলকাতা মাদ্রাসা ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের চর্চা করে; কুরান, হদীস, ফিকাহ্ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। সেগুলো এ টু জেড আরবীতে। তাই সেখানে আরবী ভাষা শেখানো হয় এবং নিতান্তই যখন সাহিত্যও ব্যতিরেকে ভাষা শেখানো যায় না তাই কিছুটা আরবী সাহিত্যও শেখায়। ফার্সী শেখায় অতিশয় নগণ্য পরিমাণে এবং গভীর অনিচ্ছায়—তার কারণ ফার্সী সাতশ বছর ধরে এদেশের রাষ্ট্রভাষা ও বিদগ্ধ জনের ভাষা ছিল বলে সেটা চট্‌ করে ঝেড়ে ফেলা যায় না। যে সব কাচ্চাবাচ্চাদের মাতৃভাষা উর্দু, তাদের হয়তো যৎসামান্য উর্দুও শেখায়। কিন্তু মাদ্রাসার একমাত্র ও সর্বপ্রধান কর্ম হচ্ছে ইসলামশাস্ত্র চর্চা, ইসলামিক থিয়োলজি। সে হঠাৎ 'ব্যাপকভাবে'—এবং নিতান্ত মিনিমাম প্রয়োজনের বাড়া যে কোনো ভাবে উর্দু পড়াবার ব্যবস্থা করবে কেন?'

বিস্ময়ে আমি হতচৈতন্য! ঠাকুরদার নাম স্মরণ করতে পারছি নে!

কিন্তু মোক্ষম তাজ্জব মেনেছেন 'মৌলানা' মনসুর।

বাজারে যতখানি গাম্ভীর্য সেদিন বেচা হচ্ছিল তার সাকুল্যে স্টক কিনে, সর্ব মুখে মেখে বললেন, 'উর্দুভাষা ও সাহিত্য এদেশে ইসলামের প্রতিভূ!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'তাই নাকি? তা হলে বিবেচনা করি, প্রত্যেক মুসলিমের যেটা প্রথম কর্তব্য—অর্থাৎ ইসলাম-ধর্ম-তত্ত্ব-শিক্ষা, সে সম্বন্ধে কি উর্দুতে ভূরি ভূরি কেতাবপত্র রয়েছে? কিন্তু আমি তো শুনেছি—অবশ্য আমার সংবাদদাতা ভুল করে থাকতে পারেন—আপনারা কুরান শরীফের উর্দু অনুবাদ ছাপিয়েছেন মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে; তারও ত্রিশ বৎসর পূর্বে হিন্দু গিরিশবাবু বাঙলাতে কুরান অনুবাদ ছাপিয়েছিলেন।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই মনসুর বললেন, 'আরবীর সঙ্গে উর্দুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।'

আমি জানি শহ্‌র্‌-ইয়ার আগের পয়েন্টে আরো অনেক-কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন 'ভিন্ন রণাঙ্গনে' চলে গেলেন তখন শহ্‌র্‌-ইয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। বললেন, 'সে আবার কি করে হলো? আরবী ভাষা হিব্রুর মত সেমেটিক; উর্দু ভাষা বাঙলারই মত আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা।

সম্বন্ধটা নিবিড়তর হলো কি করে ?'

মনসুরের মুখ ক্রমেই লাল হতে আরো লাল হচ্ছে। ডাক্তার নীরব, কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ। মাদাম মনসুর পানপ্রসাদাৎ ইতিমধ্যেই ঈষৎ বে-এখতেয়ার। আমি চুপ। কারণ শহর-ইয়ার তার তলওয়ার চালাচ্ছে পাকা ওস্তাদের মত। তার মুখে রত্তিভর উত্তেজনা নেই।

মনসুর বললেন, 'উর্দু তার শব্দসম্পদ আহরণ করে আরবী থেকে।'

শহর-ইয়ার বললেন, 'So what ? উর্দু কেন, বাঙলার তুলনায়ও ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের ভাষা নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণ আরবী শব্দ এবং ওগুলো যে আরবীর মত সেমেটিক গোষ্ঠীর ভাষা নয় সেও তো জানা কথা। কিন্তু ইন্দোনেশিয়োরা যে রকম ইসলামী ঝাণ্ডা খাড়া করেছে, পেরেছে সে-রকম এদেশের উর্দুওলারা ? আমি তো শুনতে পাই, দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদের স্কুলে স্কুলে উর্দু সরিয়ে হিন্দী শেখানো হচ্ছে। উর্দুওলারা কী লড়াই দিচ্ছেন তার বিরুদ্ধে ? 'আকাশবাণী' স্বরাজের পর থেকে আর উর্দুতে নিউজ বুলেটিন দেয় না, শুনছি শিগগীরই দেবে। তবে সেটা পণ্ডিতজীর চাপে। আপনাদের আন্দোলনের ফলে নয়।'

মনসুর ফেটে যাওয়ার উপক্রম। বললেন, 'আমরা পাকিস্তান নির্মাণ করেছি।'

এই প্রথম শহর-ইয়ারের কণ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গের পরশ লাগলো। বললো, 'তাই নাকি ? আমি তো শুনেছি বাঙলার মুসলমান—যাদের অধিকাংশ এখন পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে, এবং সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী তাদেরই ক্রেডিট বেশী। তা উর্দু যদি এতই ইসলামী ভাষা হবে, তবে পূর্ব পাকিস্তানীরা উর্দুকে তাদের অঞ্চলে রাষ্ট্রভাষা করছে না কেন ? শুনেছি, তাদের মাতৃভাষা বাঙলার জন্য লড়তে গিয়ে কেউ কেউ প্রাণ দেওয়াতে 'শহীদ'রূপে আজও পরিচিত হচ্ছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানেই বা উর্দু কোথায় ? সিন্ধীরা বলে সিন্ধী ভাষা, বেলুচরা বেলুচী, পাঠানরা পশতু—রইল বাকি পাঞ্জাব। তারা তো বলে পাঞ্জাবী, শেখে উর্দু। কিন্তু ইতিমধ্যেই তো সেখানে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে, পাঞ্জাবী কথ্যভাষা, শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম করার জন্য সেটাকে লিখিত রূপ দিয়ে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার ইজ্জৎ দেওয়া। এ-জাতীয় সম্মান পাঞ্জাবী কথ্যভাষা তো আগেও পেয়েছে। গুরু নানকের 'গ্রন্থসাহেব' তো পাঞ্জাবী কথ্যভাষায় রচিত। কিন্তু এসব বিবরণ থাক্—আমি পশ্চিম পাকিস্তান সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নই। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার একটি শেষ নিবেদন আছে। আপনি বললেন, আপনারা, অর্থাৎ উর্দুভাষীরা পাকিস্তান নির্মাণ করেছেন। উত্তম প্রস্তাব। আজকের দিনের পাকিস্তানীরা যে কায়েদ-ই-আজম মরহুম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবকে তাদের 'জাতির পিতা' বলে

সর্বোচ্চ সম্মান দেয়, তাঁর মাতৃভাষা কি উর্দু ছিল ?'

মনসুর চুপ করে রইলেন। তর্ক যে আরও চালাতে পারতেন না তা নয়। কারণ যুক্তির অভাবই যদি তর্কের সমাপ্তি ঘটাবার কারণ হতো, তবে পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই ভাগ এই মুহূর্তেই মুখ বন্ধ করে গোরের নীরবতার আশ্রয় নিত।

ডাক্তার কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় মনসুর বললেন, 'বাঙলা হিন্দু ভাষা—তার প্রভাব বাঙালী মুসলমানকে হিন্দু-মনোবৃত্তির দাস করে দেয়।'

'দাস' কথাটা বোধ হয় শহর্-ইয়ারকে বলদের সামনে লাল পতাকা দেখানোর মত হলো। স্পষ্ট দেখলুম, তার মুখে সামান্যতম কাঠিন্য দেখা গেল। তার পরিমাণ এতই সামান্য যে শুধু আমিই সেটা লক্ষ্য করলুম। কারণ এতদিন ধরে ত'র নয়নে বদনে বহু ভাবের খেলা আমি দেখেছি। বেশীর ভাগ সময় তার মুখ শান্ত। ভদ্র পরিবারের বধূর মত। কিন্তু সামান্যতম রসের সন্ধান পেলেই মুচকি হাসে কিংবা খলখলিয়ে। বিষণ্ণ, চিন্তিত, বিহ্বল আরো বহু ভাবের খেলা তার চোখেমুখে আমি দেখেছি, কিন্তু ঐ ভদ্রবধূর শান্তিমাখা মুখে সব চেয়ে বেশী দেখেছি তার রহস্য-ভরা আঁখি। কঠিনতা কখনো দেখি নি।

বললে, 'বাঙলার শ্রেষ্ঠ ধর্মসঙ্গীত টেগোরের। সেগুলোতে হনুমানজী, রামচন্দ্রজী কেউই নেই। আছেন যিনি, তিনি সুফীদের অল্-হক্, অল-জমীল—ট্রুথ এণ্ড বিউটি। আপনি যখন এদেশে বাঙালী হস্টেলে বাঙালী-মুসলমানদের ভিতর তিন বছর বাস করে বিস্তর বাঙলা শুনেছেন, তখন আশা করতে পারি এসব টেগোর-সং-এর কিছু কিছু সে যুগে আপনার কানে পৌঁচেছিল এবং তার কিঞ্চিৎ রসগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন—বাঙালী বন্ধুবান্ধবদের শুধিয়ে অন্তত মোটামুটি অর্থটা জেনে নিয়েছিলেন।'

যেন গৌরীশঙ্করের চূড়ো থেকে গুরুগম্ভীর ঐশী বাণী নেমে এল :

'না, বাঙলা শেখার কোনো জরুরৎ আমার ছিল না।'

শহর্-ইয়ার হঠাৎ কি রকম যেন বদলে গিয়ে একেবারে ভিন্ন কণ্ঠে বললে, 'সে তো ঠিকই করেছেন। এদেশে কত ইংরেজ বক্স্ওলা দশ-বিশ বছর কাটিয়ে যায়, এক বর্ণ বাঙলা না শিখে। আপনারই বা কী জরুরৎ।'

'বক্স্ওলা' কথাটা আমি স্বরাজলাভের পর আদৌ শুনি নি। ইংরেজ চাকুরে সিভিলিয়ান 'স্নব'রা চা-বাগিচার অশিক্ষিত—এমন কি বর্বর বললেও অত্যুক্তি হয় না—সায়েবদের এই বিদ্রূপসূচক নাম দিয়েছিল—চায়ের পেটি বা 'বক্স্' নিয়ে তাদের কারবার করতে হয় বলে। মনসুর সাহেব হয়তো কথাটা পূর্বে কখনো শোনেন নি তাই অর্থটা ধরতে পারেন নি। জিজ্ঞেস করলেন, 'বক্স্ওলা কি ?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার যেন প্রশ্নটা শ্‌নতেই পায় নি এ রকম ভাব করে মিসিস মনস্‌রের দিকে ঝ্‌ুঁকে দরদভরা কণ্ঠে কি যেন শ্‌ধলো।

তর্ক থেমে গেছে কিন্তু তব্‌ মনস্‌র থামতে চান না। তিনি উদ্‌র্ সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও প্রসাদগ্‌ণ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে চললেন। তার অধিকাংশই খাঁটি সত্য কথা, কিন্তু বলার ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা কর্কশ কর্কশ ইঙ্গিত, 'তোমার বাঙলায় এ রকম আছে?' ঐ গোছ। কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার সেই যে ম্‌খ বন্ধ করেছিল আর একবারের তরেও খ্‌ললো না। এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরাণীরা বলেন, 'তখন আলোচনার কার্পেট রোল্‌ করে তুলে নিয়ে খাড়া করে একপাশে রেখে দেওয়া হলো।' উপস্থিত তারও বাড়া কিছ্‌ যেন চোখের সামনে দেখতে পেল্‌ম। যেই শহ্‌র্‌-ইয়ার সামান্যতম আভাস পেল যে দ্রব্যগ্‌ণেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক মনস্‌র আবার সেই কার্পেটটা গড়গড়িয়ে খ্‌লতে চান, ধ্‌রন্ধরী সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে যেন টাইট হয়ে গিয়ে বসলো সেই রোল করা কার্পেটটার উপর।

আল্লায় মাল্‌ম, মনস্‌র সাহেবের লেকচার কখন শেষ হবে। আমার প্রিয় বান্ধব ডাক্তার সাহেব আবার কারো কথা মাঝখানে কেটে দিয়ে আপন কথা বলতে একেবারেই অসমর্থ। ওদিকে আমি যেন আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে একটা দ্‌র্গন্ধ পেল্‌ম যে ডাক্তারের ইচ্ছে আমাদের সকলকে বাইরে কোনো মোগলাই রেস্তোরাঁতে খাওয়াতে চান এবং এখানে আসবার সময় সেটা বলতে ভুলে গেছেন। সর্বনাশ! তা হলেই হয়েছে! কী করি. কী করি! মনে পড়লো, ইস্কুলের পণ্ডিত মশাই আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'সাহিত্যিক হতে হলে যে কটি গ্‌ণের প্রয়োজন. যেমন ভাষার উপর দখল. কল্পনাশক্তি এবং আরো বহ্‌বিধ কলাকৌশল তার মাত্র একটি তোর আছে—নির্জলা মিথ্যে বলার নির্লজ্জ চতুরতা।' জয় গ্‌র্‌, জয় গ্‌র্‌! তোমার মহিমা অপার। তোমাকে স্মরণ করা মাত্রই অজ্ঞান-তিমির-অন্ধকার দ্‌রীভূত হয়ে গেল: সম্ম্‌খে দেখি দিব্য জ্যোতি, সত্য জ্যোতি।

যেই মনস্‌র সাহেব দিতে গেছেন গেলাসে আরেকটি চুম্‌ক অমনি আমি সবাইকে না শ্‌নিয়ে আবার শ্‌নিয়েও শহ্‌র্‌-ইয়ারকে বলল্‌ম, 'আমি তা হলে উঠি। আপনি বাব্‌র্চিকে বলে এসেছেন তো কি ভাবে আমার পথ্যিটা তৈরী করবে?' তার পর লজ্জায় কাচুমাচু হয়ে মনস্‌র সাহেবকে বলল্‌ম, 'আপনার বন্ধ্‌ ডাক্তার সাহেবের আপন হাতের চিকিৎসার জন্যই আমার মফঃস্বল থেকে শহরে আসা। পাছে অপথ্য কুপথ্য করি তাই আমাকে প্রায় তালাবন্ধ করে রেখেছেন আপন বাড়িতে, হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। আপনার সঙ্গে আবার পরিচয় হওয়ায় বড় আনন্দ হলো, হেঁ হেঁ।' ডাক্তার গোবেচারা ফ্যালফ্যাল করে আমার ম্‌খের দিকে তাকালে। শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার কথা শেষ হওয়ার বহ্‌ প্‌র্বেই আমার

মতলবটা ভালো করেই বুঝে নিয়েছে—আমি নিঃসন্দেহ, সেও এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজছিল, কিন্তু বেচারী মেয়েছেলে হয়েও না পারে অশিক্ষিত পটুত্বের অভিনয় করতে, না পারে নির্জলা মিছে কথা কইতে। এবারে আমি একটা পথ করে দেওয়া মাত্রই সে চেয়ার ছেড়ে এমন ভাবে ঘাড় নাড়ালে যে তার থেকে এও হয় ওও হয়। ডাক্তার বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন বলে মনে হলো না—কারো কোনো ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া তার ধাতেই নেই। এ রকম মহামানব সংসারে বড়ই বিরল।

বিস্তর শেকহ্যান্ড, খুদা হাফিজ, ফী আমানিল্লাহ, বঁ ভওয়াইয়াজ বলার পর শহ্‌র্‌-ইয়ার শুধু মনসুর সাহেবকে দুটি অনুরোধ জানালে, আসছেবার কলকাতায় এলে যেন তাঁদের ওখানে ওঠেন এবং আজ রাত্রের মত যেন ডাক্তারকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন। মাদাম মন্সুরকে শহ্‌র্‌-ইয়ার এ অনুরোধ আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে পেঁছিনো মাত্রই শহ্‌র্‌-ইয়ার গান ধরলো, আর বেশ উচ্চকণ্ঠেই, অবশ্য এ সময় কেউ যদি আদপেই কাছে-পিঠে থাকে তবে সে সে-ব্লকের বেয়ারা—

'হাটের ধুলা সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুরসুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান।'

আট

ড্রাইভার শুধোলে, 'কোথায় যাবো, আম্মা?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললে, 'বেহেশৎ কিংবা দোজখ্—যেটা এ জায়গা থেকে বেশী দূরে।

বেচারী ড্রাইভার বুঝতে পারে নি। আমি বললুম, 'উপস্থিত গঙ্গা-পারে চলো। পরে দেখা যাবে।'

একটা জায়গায় ভিড় সামান্য কম। আমি বললুম, 'শহ্‌র্‌-ইয়ার, এখানে ঐ গাছতলায় একটু বসবেন?'

বললে, 'নিশ্চয়ই বসব, একটুখানি তাজা হাওয়া বুকের ভিতর ভরে নি। গ্রেট ঈস্টার্ন তবু পদে আছে, অন্য হোটেলগুলোতে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। গঙ্গার হাওয়া গঙ্গাজলের চেয়ে ঢের ভালো। তাই হিন্দুরা গঙ্গাস্নানের পরিবর্তে এখন গঙ্গার হাওয়া খেয়ে পাপমুক্ত হয়। এ হাওয়ার বহু গুণ। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আবৃত্তি করলো,

'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধসমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।'

তারপর গান ধরলো, 'হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—'
হঠাৎ গান বন্ধ করে বললো, 'মিস্টার মনসুর কিন্তু লোক খারাপ নয়—কি বলেন আপনি? আসলে কি জানেন, ওঁরা থাকেন এক ভুবনে, আমাদের বাস সম্পূর্ণ অন্য ভুবনে। বিপদ শুধু এই, ওঁরা আমাদের কনভার্ট করতে চান।'

আমি বললুম, 'কনভার্ট করাটা কি দোষের? ঐটেই তো মুসলমানদের স্ট্রং পয়েন্ট। কাইরোর অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিষয় সবাইকে পড়তে হয়। কি করে অমুসলমানকে মুসলমান করা যায়! মনসুর মিশনারীর দোষ বিশ্বসুদ্ধ লোককে উর্দুতে কনভার্ট করার চেষ্টাতে গলদ নয়—গলদ তার পদ্ধতিতে, মেথডে, মড্স্ অপেরান্ডিতে। দম্ভ নিয়ে প্রচার আরম্ভ করলে যাকে কনভার্ট করতে চাও, সে সঙ্গে সঙ্গে ভাববে, আমি যত ভালো উর্দুই শিখি না কেন, এঁর সঙ্গে তো কখনো কাঁধ মেলাতে পারবো না, কারণ উর্দু এঁর মাতৃভাষা। অতএব বাকী জীবন ধরে ওঁর মুখের দম্ভোদ্গীরণ আমাকে সয়েই যেতে হবে। কী দরকার গায়ে পড়ে করুণার পাত্র হওয়ার! তার চেয়ে থাকি আমি আমার বাঙলা নিয়ে। দু-পাঁচটা ভুল সে ভাষাতে করলে কীই বা এমন দুশ্চিন্তা—পাড়া-প্রতিবেশীরাও করে। আমরা সবাই বরাবর। ঐ উর্দুর গোসাঁইও নিশ্চয় দু'-পাঁচটা ভুল করেন তাঁর চোস্ত উর্দুতে—মানুষ তো আর আল্লা নয়—কিন্তু সে ভুল তো আমার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবো কি করে? কিন্তু এসব নিয়ে এখন আর চিন্তা করেন কেন? এ তো অতি সাধারণ, স্থূল দৈনন্দিন ঘটনা। দেখলেন না, আমি আলোচনায় মোটেই যোগ দিলুম না।'

'সে তো স্পষ্ট দেখলুম। এবারে বলুন, কাইরোতে ইসলাম-প্রচার-পদ্ধতি সুচারুরূপে শেখার পর ক'জন অমুসলসানকে মুসলমান করেছেন?'

আমি বললুম, 'প্রথম তো নিজেকেই সামলাই। আমার মত গুনাহ্গার—পাপী মুসলমান এ-সংসারে খুব বেশী নেই। আগে তো একটা মিনিমাম স্ট্যাণ্ডার্ডে পেঁছই, তবে না প্রচারকার্য আরম্ভ করার হক্ক্ জন্মাবে।'

শহর-ইয়ারের চেহারা দেখে মনে হল আমি যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে আমার সঙ্গে একমত করাতে পারি নি। সো ভী আচ্ছা। শেষ বিচারের দিনে তিনি যদি সাক্ষ্য দেন যে আমি খুব খারাপ মুসলমান ছিলুম না—অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে যতটা ভেবেছিলুম তার চেয়ে কম—সেও একটা ভরসার কথা।

বললুম, 'একটু সরে এসে এই গাছটার তলায় ঐ শিকড় দুটোর মাঝখানে বসুন। এখানে বসলে তন্দণ্ডেই মেয়ে মাত্রেরই একটি বিশেষ শক্তিলাভ হয়। নির্ভয়ে নির্বিচারে মিথ্যে কথা বলতে যখন তার আর কোনো বাধাবন্ধ থাকে না। পরের দিন বিকেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে তার লীলাখেলার

এপয়েণ্টমেণ্ট—আজ সন্ধ্যায় এখানে বসলে সে অকুণ্ঠ ভাষায় নির্দ্বন্দ্ব বিবেক নিয়ে গদ্‌গদ হয়ে অন্য জনকে বলতে পারে, 'আই লাফ্‌ ইউ, আই লাফ্‌ ইউ।'

'"লাফ" কেন, "লাভই তো উচ্চারণ। ভাষাটা তো আর জর্মন নয় যে 'ভি' 'এফ' হবে?'

'এটা সর্বাধুনিক, chic উচ্চারণ।'

'না। আমার মনে হয় তা নয়। মেয়েটা "আই লাফ্‌ এট ইউ, আই লাফ এট ইউ"। "এট"-টা উহ্য রেখেছিল, ভদ্রতার খাতিরে।' সঙ্গে সঙ্গে শহ্‌র্‌-ইয়ার হেসে ওঠাতে সাদা দাঁতগুলো ঝিলমিল করে উঠলো কিন্তু মুখের রঙটি অন্দরমহলের বংশানুক্রমিক ধবলের চূড়ান্তে পেঁাছে গেছে বলে কন্ট্রাসটার খোলতাই জুৎসই হল না—মুখের রঙ কালো হলে যে রকম হতো।

শহ্‌র্‌-ইয়ার মুচকি হেসে হেসে বললে, 'আচ্ছা, বলুন তো, একটা মেয়ের যদি দুজন প্রেমিক থাকে, এবং সে-যদি দুজনকেই পরিতৃপ্ত করতে পারে, তাতে সমাজেরই বা কি, আর আপনি শিক্ষিত লোক, আপনারই বা কি মরেল অবজেক্‌সন থাকতে পারে?'

আমি বললুম, 'সমাজের আপত্তি বা আমার মরেল অবজেক্‌শন এগুলো পরের কথা। আসলে কি জানেন, জিনিসটা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে না। মেয়েটাকে সর্বক্ষণ লুকোচুরি খেলতে হয়, সর্বক্ষণ ভয়, দু'জনার একজন কখন না অন্যজনের গন্ধ পেয়ে যায়—বিবাহিতা রমণী উপপতি রাখলে তাকে যে রকম অষ্টপ্রহর আশঙ্কায় আশঙ্কায় কাটাতে হয়। একে তো মেয়েটার স্বাভাবিক সুস্থ জীবন বরবাদ—তদুপরি ব্যাপারটা খুব বেশী দিন গোপন থাকে না, জানাজানি হয়ে যায়। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি মেয়েটা এই দোটানার স্ট্রেন সইতে না পেরে একজনকে বিদায় দেয় তখন তার এবং ছেলেটার বন্ধুমহলে সে 'জিল্‌ট্‌' রূপে মশহুর হয়ে যায়, কারণ, তারা তো আর জানে না যে মেয়েটা দুটো ভিন্ন লোকের সঙ্গে একই সময়ে লীলাখেলা চালাচ্ছিল এবং সে স্ট্রেন সইতে না পেরে একজনকে বিদেয় দিয়েছে। আর আসল তত্ত্ব জানাজানি হয়ে গেলে তো আরো চিত্তির। তখন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পাড়ার নটবররা তার গায়ে পড়ে 'প্রেম' নিবেদন করে। ভাবখানা এই, দুজন যখন ছিলই তখন তিনজনেই বা কি দোষ? আর সর্বশেষে বলি, মেয়েটার পক্ষে ছেলেটাকে বিদায় দেওয়ার 'জিল্‌টিং' কর্মটি কি অতই সহজ! চিন্তা করুন, ছেলেটার মোহ যদি তখনো কেটে না গিয়ে থাকে তবে সে চোখের জল ফেলবে, প্রাচীন দিনের প্রণয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার শপথ কাড়বে! না 'জিল্‌টিং' কর্মটি শুধু 'জিল্‌টেড্‌ হতভাগার পক্ষেই অপমানজনক তাই নয়, যে জিল্‌ট্‌ করে তার পক্ষেও পীড়াদায়ক!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'এ যুগের অবিবাহিতা তরুণী যুবতীদের চেয়ে আমার

বয়স খুব বেশী নয়, তবু এদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তাই জানতে ইচ্ছে করে এদেশে আমাদের অল্প বয়সে শেখা একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ কি ধীরে ধীরে কিংবা দ্রুতবেগে জিলটিং নামক নয়া মালের জন্য জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, কিংবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে?'

আমার চিত্তে কৌতুকরসের সঞ্চার হল। বললুম, 'আমার বয়সটি কি নিতান্তই প্রেমে পড়-পড় তরুণদের বয়স, যে তাদের সঙ্গে আপনার চেয়ে আমার দহরম-মহরম শ'দুই লিটার বেশী! এবং আমি বাস করি মফঃস্বলে!'

'কী জ্বালা! আপনার যে গণ্ডায় গণ্ডায় চ্যাংড়া চেলা রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস পুরুষমানুষ নিজের থেকে নিতান্ত না চাইলে সহজে বুড়ো হয় না। সে কথা থাক্, আমার প্রশ্নটার উত্তর দিন।'

'দেখুন এ-প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক কেউ দিতে পারে না। সবাই শুধু আপন আপন একটা খসড়া গোছ, একচোখা ধারণা প্রকাশ করতে পারে। আমার ধারণাটা প্রকাশ করার পূর্বে একটি অতি হ্রস্ব ভূমিকা দি। এক অতিশয় সহৃদয় বাঙালী সমস্ত জীবন জেলের বড়কর্তা রূপে কাজ করে পেনশন নেওয়ার পর কি একটা ঘটনা উপলক্ষে বলেন, তাঁর জেলে একবার একজন গুণী পণ্ডিত আসেন যাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব, এবং বিশেষ করে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব। দেশ-বিদেশের জেলে তিনি তাঁর অধ্যয়ন-রিসার্চ করেন সাজা-প্রাপ্ত অপরাধীদের নিয়ে এবং তাঁর একটি অতিশয় বিরল গুণ ছিল এই যে, যত হাড়-পাকা, মুখ-চাপা কয়েদীই হোক না কেন, তাঁর বাক্য তাঁর আচরণ, এক কথায় তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে সে তার হৃদয়ের গোপনতম কথা প্রকাশ না করে থাকতে পারতো না। মাসখানেক কাজ করার পর তিনি আমাদের এই বাঙালী জেলারটিকে বলেন, ভারতবর্ষের একাধিক জেলে রিসার্চ করার পরও তিনি এযাবৎ একটিমাত্র জাতক্রিমিনাল, অর্থাৎ যে নিরুদ্বেগে, বিবেক নামক প্রতিবন্ধকের নুইসেন্স সম্বন্ধে অষ্টপ্রহর সম্পূর্ণ অচেতন থেকে ক্রাইমের পর ক্রাইম করে যায়, জাস্ট ফর ইট্‌স্ ওন সেক্—এরকম প্রাণী এদেশে পান নি, তার মানে এদেশে জাত-ক্রিমিনাল নেই। আমারও মনে হয় এদেশে 'জাত-জিলট্' নেই। সুন্ধমাত্র ফুলে ফুলে মধু পান করার জন্য একটার পর একটা পুরুষ জিলট্ করে করে যৌবনটা কাটাচ্ছে এ রকম রমণী এদেশে বোধ হয় বিরল। এই যে আপনি হিন্দু নারীর পতিব্রতা হওয়ার আদর্শের কথা একাধিকবার তুলেছেন, সেই সংস্কারটা এদেশের তরুণীর ভিতর আবির্ভূত হয়—যেই সে প্রথম প্রেমে পড়ে। আর আপনার যে উদাহরণ;—একটি তরুণী দুটো প্রেমিকের সঙ্গে একই সময়ে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাও এদেশে হয় অন্য কারণে। আমার মনে হয়, একটু অনুসন্ধান করলেই ধরা পড়বে, বেচারী মনস্থির করতে পারছে না, দুটোর কোন্‌টাকে বিয়ে করলে সে আখেরে সুখী

হবে, এবং তাই কোনোটাকেই হাতছাড়া করতে পারছে না।

আপনার প্রশ্নের উত্তর খানিকটে তো দিলুম, কিন্তু আমার প্রশ্ন 'জিল্টিং' নামক অতি প্রাচীন অথচ নিত্যনবীন কর্মটির প্রতি আপনার এ কৌতূহল কেন? আমি নির্ভয়ে, নিঃসন্দেহে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি আপনি কখনই 'জিল্টিং' রহস্যের মর্মস্থলে পৌঁছতে পারবেন না। আপনি হিন্দু হলে বলতুম, এ জন্মে না, জন্ম-জন্মান্তরেও না।'

'কেন, আমি কি এতই ইডিয়ট?'

আমি বললুম, 'তওবা,! তওবা!! আপনি ইডিয়েট হতে যাবেন কেন? আপনি অতিশয় বুদ্ধিমতী—এ-কথা আমি কেন, আমার গুরুর গুরুও বলবেন। কিন্তু, কল্যাণী, এ তো বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার বস্তু নয়। এটা সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার, এবং মনে রাখবেন, আপনি আমাকে অতি উত্তমরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে বুঝিয়েছেন আপনার অনুভূতি, আপনার স্পর্শকাতরতা এর সব-কিছু গড়ে উঠেছে, আকার নিয়েছে, আর্দ্রতা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন, আপনি আপনার হৃদয়ের খাদ্য আহরণ করেন ঐ একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে।

কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে জিল্টিং নিয়ে গান কই? জিল্টেড্ হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা কি কস্মিনকালেও তাঁর হয়েছিল? শুধু প্রভাত মুখো কেন, ঠাকুর-বাড়ির প্রাচীনতম বৃদ্ধবৃদ্ধা এবং সে-বাড়ির সঙ্গে বাল্যকাল থেকে সংশ্লিষ্ট জন কেউই তো কখনো সামান্যতম ইঙ্গিত দেন নি যে রবীন্দ্রনাথ কখনো কাউকে ভালোবেসে জিল্টেড্ হয়েছেন। তাঁর প্রেমের গানের মূল সুর মূল বক্তব্য কি? 'আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলুম, তুমিও আমাকে বেসেছিলে। তার পর তুমি হঠাৎ অকালে চলে গেলে। তাই

এখন আমার বেলা নাহি আর
বহিব একাকী বিরহের ভার?

কিংবা

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি।

এটা অবশ্যই তাঁর দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রিয়া অকালে অন্য লোকে চলে গেলেন। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই তিনি রূপ দিয়েছেন শত শত গানে—দু'দশ বছর ধরে নয়, সমস্ত জীবন ধরে—কিন্তু মোতিফ এক্: 'তুমি চলে গেলে; আমি আর কতকাল ধরে তোমার বিরহ-ব্যথা সইব?'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'মাফ করবেন—হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। আমার অনুভূতি আমার ইমোশান যেমন রবীন্দ্রনাথের গান গড়ে দিয়েছে আপনার ক্ষেত্রেও কি তাই নয়? আপনি তো তাঁকে কাছের থেকে দেখেছেন, তাঁর বহু

বহু গান আপনি এবং আপনার সতীর্থরাই সর্বপ্রথম শুনেছেন।'

আমি বললুম, 'গুরু যেন অপরাধ না নেন! আমার অনুভূতি জগৎ নির্মিত হয়েছে অন্য বস্তু দিয়ে। গুরুর কাছ থেকে সিকি পরিমাণও নিয়েছি কিনা সন্দেহ।'

শহর-ইয়ার বিস্মিত হয়ে শুধোলো, 'তবে কোথা থেকে?'

'বৈষ্ণব পদাবলী থেকে।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন বাঙলা দেশের সর্বত্রই যে মোতিফ নিয়ে সব চেয়ে বেশী গান গাওয়া হয় সেটি রাধাকৃষ্ণের। এবং আরো পরিষ্কার হয়, আরো সংকীর্ণ পরিসরে সেটা জাজ্বল্যমান হয় যদি বলি আসলে মোতিফটা শ্রীরাধার বিরহ। সেই বিরহের গান গাওয়া হয়, নিত্য নব রচা হয় বাঙলাদেশের নানা অঞ্চলে নানা সুরে। কথার দিকে শ্রীরাধার বিরহ-যন্ত্রণার সর্বোত্তম অতুলনীয় প্রকাশ এই আমাদের বীরভূমের চণ্ডীদাসে। এঁর পরে আসেন বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ইত্যাদি। মুসলমান কবিও বিস্তর আছেন তবে একমাত্র সৈয়দ মর্তুজা ছাড়া আর কেউ খুব উচ্চস্তরে উঠতে পারেন নি—যদিও তাঁদের সহৃদয়তা, শ্রীরাধার প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও সহানুভূতি হিন্দু কবিদের চেয়ে কণামাত্র কম নয়।

আর সুরের দিক দিয়ে শ্রীরাধার বিরহসঙ্গীতের সর্বোত্তম অতুলনীয় বিকাশ ফুটে উঠেছে কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে, সুরে।

আমি ঐতিহাসিক নই, তাই বলতে পারবো না, কত শত বৎসর ধরে কত হাজার বৈষ্ণব কবি তাঁদের আপন আপন বিরহবেদনার নিদারুণ অভিজ্ঞতা শ্রীরাধার কণ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ রেখে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা নবীন কাব্য রচনা করে, নূতন নূতন নায়ক-নায়িকা নির্মাণ করে, যেমন মনে করুন, নলদময়ন্তী কিংবা লায়লী মজনূন, তাঁদের কণ্ঠ দিয়ে আপন আপন বিরহযন্ত্রণার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। তাবৎ বৈষ্ণব কবিদের বিরহবেদনা শ্রীরাধার বিরহবেদনা, আর যুগ যুগ ধরে শ্রীরাধার কণ্ঠে সঞ্চিত তাবৎ বিরহগাথা সর্ব বৈষ্ণব কবির গৌরব-সম্পদ!

নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে, এমন কি আপন প্রিয়াকে রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্বাসিত করে দুজনারই নিষ্ঠুরতম বিরহজ্বালার অভিজ্ঞতা ব্রজসুন্দরীর কণ্ঠে সমর্পণ—এই যে প্রক্রিয়াটি এর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন। আপনার মনে আছে, বোলপুরে পারুল বনে যেতে যেতে এক সকালে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করে আপনাকে শোনাই—কোনো টীকাটিপ্পনী না করে?—

> সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
> কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
> কোথা তুমি শিখেছিলে এই-প্রেমগান

বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে
বিরহ-তাপিত ?

অবশ্য আমারও ইচ্ছে করে গুরুকে সবিনয় জিজ্ঞেস করতে, তাঁর বেলা, যাঁর 'বিরহ-তাপিত' অশ্রু তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, যাঁর 'মুখ' যাঁর 'আঁখি' হতে

'——এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি——'

করেছিলেন তিনিও, তাঁর প্রতি তিনি তাঁর কাব্যে সুবিচার করেছেন তো ?

ঠিক ঐ একই প্রক্রিয়ায়ই ইয়োরোপের বহু বহু কবি 'ত্রিস্তান আর ইজলদে'র প্রেমগাথায় আপন আপন নিজস্ব প্রেম, বিরহ, মিলন—অবশ্য মিলন অংশ সর্ব কাব্যেই অতি ক্ষুদ্র অংশ পায়—অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু বাঙলা দেশের বিরাট বৈষ্ণবগাথার তুলনায় ত্রিস্তানগাথা সূচ্যগ্র পরিমাণ।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এবারে শুধলো, 'কই, আমি তো ত্রিস্তান ইজলদে কাহিনীর নাম পর্যন্ত শুনি নি।'

বড় বেদনার গাথা। আর ইয়োরোপীয় এজাতীয় যত গাথা আছে তাদের মধ্যে আমি এটাকেই সর্বোচ্চ আসন দি। আপনি যে শোনেন নি সেটাও খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ইয়োরোপের লোক ক্রমেই এ সব গাথার প্রতি উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে 'ফ্রেঞ্চ একাডেমি'—এবং জানেন তো পৃথিবীর আর কোন একাডেমি এর একশ' যোজন কাছে আসতে পারে না—প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তাঁদেরই এক সদস্যের স্কন্ধে গুরুভারটি দেন তিনি যেন ত্রিস্তান সম্বন্ধে যে কটি ব্যালাড পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে কালোপযোগী একখানা নবীন 'ত্রিস্তান' রচনা করেন। সে 'ত্রিস্তান' আমাকে মুগ্ধ করে, এবং তার বাঙলা অনুবাদ আমি আরম্ভ করি কিন্তু শেষ করতে পারি নি।

মূল কথায় ফিরে আসি। এবং যদি অনুমতি দেন, তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই আরম্ভ করি। আপনার খুব খারাপ লাগবে না, কারণ আপনি আমি দুজনাই মুসলমান; ওদিকে রাধাকৃষ্ণের কাব্যরূপ রসস্বরূপ বাদ দিলে তাঁরা হিন্দুদের—বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের—উপাস্য দেব-দেবী এবং শ্রীকৃষ্ণ শুধু বৃন্দাবনের রসরাজ নন, তিনি গীতাকার রূপে বিষ্ণুর অবতার। আমি মানুষ হয়েছি আচারনিষ্ঠ মুসলমান পরিবারে। অথচ যে গানটি আমার আট বৎসর বয়সে মনে অদ্ভুত এক নবীন অনুভূতির সঞ্চার করেছিল সেটি

"—দেখা হইল না রে শ্যাম,
আমার এই নতুন বয়সের কালে—"

এ বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত অংশটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সারি, যদিও আমার অভিজ্ঞতাটার কিঞ্চিৎ—অতি সামান্য—মূল্যও আছে।'

শহর-ইয়ার দৃঢ় অথচ সবিনয় মধুর কণ্ঠে বললেন, 'আপনি দয়া করে কোন বস্তু বাদ দেবেন না। কীর্তন গান রেকর্ডে, বেতার থেকে আমি শুনেছি কিন্তু ওর গভীরে আমি কখনো প্রবেশ করি নি।'

আমি বললুম, 'তার কারণও আমি জানি। জানতে চাইলে পরে বুঝিয়ে বলবো।

হ্যাঁ। আমি পানির দেশের লোক, চতুর্দিকে জল আর জল! সঙ্গে সঙ্গে ভোরে, সন্ধ্যায়, রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনেক পরেও ভাটিয়ালি গীত। নিশ্চয়ই প্রথম শুনেছি মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে। সামান্যতম বোধশক্তি হওয়ার পর থেকেই শুনেছি কান পেতে এবং অতি শীঘ্রই সেটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যে রকম আমার দেশের দানাপানি আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু ঐ 'দেখা হইল না রে শ্যাম'-এর আগেকার কোন গানই আমার মনে নেই।

আমাদের পরিবার আচারনিষ্ঠ, তার ঐতিহ্যে কট্টর প্যুরিটান। গান-বাজনা আমাদের পরিবারে বরাহমাংসবৎ ঘৃণ্য। কিন্তু সে কোন্ নিয়তি আমাকে ঐ গানের দিক আকৃষ্ট করলো জানি নে। আট বছর বয়সে 'নত্তুন বয়সের কালে' দেখা না হওয়ার ট্রাজেডি হৃদয়ঙ্গম করার কথা নয়। তবে আকর্ষণ করলো কি? জানি নে, সত্যি জানি নে।

তার পর বহু গান শুনতে শুনতে পরিচিত হলুম রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে। আমাদের দুজনারই প্রিয় গান 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা'-র 'নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে' যেন অকস্মাৎ আমার মত দীন অকিঞ্চনজন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রবেশাধিকার পেল। আপনারই মত যখন আমার হৃদয়ানুভূতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসগন্ধবৈভবে নির্মিত হচ্ছে তখন হঠাৎ পরিচয় হল চণ্ডীদাসের সঙ্গে। তার তাবৎ গানের সঙ্কলন ঘণ্টা তিনেকের ভিতর পড়ে শেষ করা যায়। আমার লেগেছিল পূর্ণ একটি বৎসর। ইতিমধ্যে জানতে পারলুম চণ্ডীদাসের জন্মস্থল নানুর আমাদের বোলপুর থেকে মাত্র মাইল আষ্টেক দূরে। এক বন্ধুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গেলুম সেখানে পয়দল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, জমিদার অনাদিবাবুর ছোট ভাই শোনালেন কীর্তন গান। তিনি আমাকে ফরমাইশ করতে বললে আমি চণ্ডীদাস থেকে বেছে বেছে আমার আদরের গানগুলো পেশ করলুম। মাত্র কয়েক বছর হল শুনলুম, তিনি গত হয়েছেন, তাঁর সদ্গতি হোক!

তারপর বহুবার শুনেছি সন্ধ্যা আটটা-দশটা থেকে ভোর অবধি কীর্তন গান। তার বর্ণনা আপনাকে আরেকদিন দেব। এদেশ থেকে বহু উত্তম উত্তম প্রথা প্রতিদিন লোপ পাচ্ছে; আমার গভীরতম শোক, দুর্নিবার হাহাকার—যার কোনো সান্ত্বনা নেই যে সমস্ত রাত ধরে কীর্তন গান গাওয়ার প্রথা প্রায়

সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। আমার মতামতের কী মূল্য? তবু যাবার পূর্বে নিবেদন করে যাই ঐটেই ছিল বাঙলার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ঐতিহ্যগত সম্পদ— এর লক্ষ যোজন কাছে আর কোনো সম্পদ কোনো বৈভব আসতে পারে না।

বিবেকানন্দ 'কুমড়ো গড়াগড়ি' কথাটা একাধিকবার ব্যবহার করেছেন— কারণ ছবিটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

কীর্তনের আসরে ছেলে-বুড়ো রাধার বিরহবেদনা শুনে 'কুমড়ো গড়াগড়ি' দেয়। আমি দিই নি কিন্তু দুই চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে গেছে।

গুরু ক্ষমা করবেন, আপনিও অপরাধ নেবেন না, শহ্‌র্‌-ইয়ার, কারণ আপনার অনুভূতি-ভুবন গড়ে তুলেছে আমার গুরুর শতাধিক গান, কিন্তু যদি বলি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বোত্তম সম্মেলনেও আমি কাউকে কাঁদতে দেখি নি, কুমড়ো গড়াগড়ির কথা বাদ দাও।

ব্যস্‌! আমি অন্য আর কোনো তুলনা করবো না, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে। ইতিমধ্যে বলে রাখি, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশ্ববৈভবে অতুলনীয়। যে জর্মন 'লীডার' ইয়োরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত, রবীন্দ্রসঙ্গীত তার চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম, তার বৈচিত্র্য এবং বহুমুখী বিকাশ কাব্যলোকে তাবল্লোক ছাড়িয়ে চলে গেছে বহু ঊর্ধ্বে।

কিন্তু প্রশ্ন, কীর্তন শুনে বালবৃদ্ধ (আমি যখন প্রথম শুনে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নার শব্দ চাপতে চেয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোল) 'কুমড়ো গড়াগড়ি' দেয় কেন? আমি অবশ্যই এখানে আড়াইখানা কীর্তনের রেকর্ড বা বেতারে আধঘণ্টা কীর্তন প্রোগ্রাম শোনার কথা ভাবছি নে—দ্বিতীয়টা তো বহুবিধ যন্ত্রের খচখচানি এবং অংশতঃ সেই কারণে কীর্তনীয়ার অবোধ্য শব্দোচ্চারণ সমস্ত ব্যাপারটাকে সত্যকার কীর্তনের এক হাস্যস্পদ ব্যঙ্গরূপে আধঘণ্টা ধরে মুখ ভ্যাংচায়। আজকের দিনে তাই শতগুণে শ্রেয়ঃ—নিভৃতে নির্জনে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসাদি সশ্রদ্ধ বারংবার পঠন—প্রহরের পর প্রহর ব্যাপী। সে সময়ে গানগুলি যে সুরবর্জিত হয়ে দীনদরিদ্ররূপে হৃদয়ে প্রবেশ করছে সেটা আমার দুর্দৈব কিন্তু তবু সেটাকেও নমস্কার—সেও লক্ষগুণে শ্রেয়, প্রাগুক্ত ঐ অর্ধঘণ্টাব্যাপী নির্মম লাঞ্ছনার চেয়ে। সাহস নেই কলকাতা আকাশবাণীর সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি জনতিনেক কীর্তনীয়া—মূল গায়েন উত্তম হওয়া চাই—এনে একটানা, অবিশ্রান্ত সুদ্ধমাত্র কীর্তন শোনাবার?

বিরক্ত হয়ো না, শহ্‌র্‌-ইয়ার, এ-নিয়ে আমার ক্ষোভ কোনো সান্ত্বনা মানে না, তাই তোমাকে বললুম।

আরেকটা কথা। জানো বোধ হয়, পাঁচমেশালী গানের মজলিসে কারো যদি কীর্তন গাইবার প্রোগ্রাম থাকে—বেশীক্ষণ না, ধরো আধঘণ্টাটাক—তবে সেটা আসে পুরো প্রোগ্রামের একবারে সর্বশেষে। কেন জানো? ঐ উটকো

কীর্তনটাও যদি মোটামুটি রসের পর্যায়ে উঠে যায় তবে তার পর আর কেউ অন্য কোনো গান জমাতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথও কীর্তন সুরের ম্যাজিক জানতেন—কীর্তনের কথার তো কথাই নেই—তাই তিনি এ যুগে যে গান সর্বপ্রথম রেকর্ডে দিলেন সেটি কীর্তন সুরে।

এ সবই বাহ্য। সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, কীর্তনে আছে কি যে শ্রোতা কুমড়ো গড়াগড়ি দেবে?

আছে অবহেলিত, অপমানিত, পদদলিত প্রেম। শ্রীরাধার মুখ দিয়ে সহস্র সহস্র কবি শত শত বৎসর ধরে যা বলিয়েছেন তার সারাংশ দেওয়া কি সহজ, না আমার বাদবাকি জীবনটাতে কুলোবে!

রাধা বেচারী বিবাহিতা কন্যা। ওদিকে কৃষ্ণ অতি শিশুবয়েস থেকেই করেছেন একাধিক অলৌকিক কর্ম—মিরাক্‌ল্‌—বৃন্দাবনের সর্বত্র তাঁর যশ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। বৃন্দাবনে সুন্দরী কুমারী গোপিনীরও অভাব নেই। সেই বালক কৃষ্ণকে ভালোবাসে সর্ব গোপিনী, তাদের মাতা, পিতামহী, বৃন্দাবনের সর্ব নরনারী। যে কোনো কুমারী কৃষ্ণের অনুরাগ পেলে জীবন ধন্য মনে করবে কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে মুগ্ধ করলেন, আকর্ষণ করলেন, সম্মোহিত করলেন, আত্মহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা করলেন বিবাহিতা শ্রীরাধাকে। একদিকে তার আনন্দ-গরবের অন্ত নেই, অন্যদিকে তার শাশুড়ী ননদী করে তুললো তার জীবন বিষময়। অলঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পাগলিনী শ্রীরাধা ছুটে আসতেন কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শোনা মাত্রই। শত দুঃখ শত যন্ত্রণার মাঝখানেও শ্রীরাধা আনন্দে আত্মহারা—আর হবেই বা না কেন? শ্রীকৃষ্ণের মত প্রেমিক এই ভারতবর্ষে জন্মেছে ক'টি!

তার পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্বত্যাগিনী রাধার প্রেম অকাতরে অবহেলা করে—আমি বলি অপমানিত পদদলিত করে চলে গেলেন মথুরায়।

'শহর্‌-ইয়ার, তুমি মথুরা বৃন্দাবন দেখেছ?'

'মোটরে দিল্লী থেকে আগ্রা যাওয়ার সময় দেখেছি। ও দুটো তো খুব কাছাকাছি। দুটোর শেষপ্রান্ত তো প্রায় মিলে গেছে।'

'ঠিক বলেছ। সেই মথুরা থেকে তিনি এক দিনের তরে, এক মিনিটের তরে বৃন্দাবনে আসেন নি শ্রীরাধাকে দেখতে। উল্টে বৃন্দাবনের ঐ অতি পাশের মথুরায়, বলতে গেলে শ্রীরাধার কানের পাশে তিনি ঢাকঢোল বাজিয়ে করতে লাগলেন একটার পর একটা বিয়ে—রুক্মিণী, সত্যভামা, আরো কে কে আমি ভুলে গিয়েছি, মনে রাখবার কোনো সদিচ্ছাও আমার কোনোকালে হয় নি।

বুঝলে শহর্‌-ইয়ার, একেই বলে টায়-টায় 'জিল্টেড্‌' লাভ্‌। তামাম বিশ্বসাহিত্য তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও এই হতভাগিনী 'জিল্টেড্‌' শ্রীরাধার শত যোজন কাছে আসতে এমন রিক্তা হৃতসর্বস্বা তুমি পাবে না।

তাই আকারে, গাম্ভীর্যে, মহিমায় হিমালয়ের মত বিরাট কলেবর বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল সুর—লাইট-মোতিফ—জিল্টেড্ লাভ, পদদলিত প্রেম।

সে সাহিত্যে দুঃখিনী শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা যে কত কবি কত দিক দিয়ে দেখেছেন, কত ভাবে বর্ণনা করেছেন, তার সামান্যতম অংশ কেউ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক ঠিক কি বলেছেন বই না খুলে বলা যায় না তবে যা বলেছেন তার সারাংশ এই, মদ দেখলে নেশা হয় না, শুঁকলেও না, চাখলেও না, এমন কি সর্বাঙ্গে মাখলেও না। মদ গিলতে হয়।

পদাবলীরস আকণ্ঠ গিলতে হয়।'

নয়

আজ রববার। সপ্তাহে মাত্র এই একটি দিন ডাক্তার আর শহ্‌র্-ইয়ার একে অন্যকে নিরবচ্ছিন্নরূপে পায়। এ দিনটায় আমি দ্য থ্রো—ওয়ান টু মেনি—হতে চাই নে। তাই ব্রেকফাস্টে পর্যন্ত গেলুম না। খাই তো কুল্লে দু কাপ চা—সে কর্মটি শুয়ে শুয়ে দিব্য করা যায়। মোগলাই কণ্ঠে বেয়ারাকে চা আনতে হুকুম দিলুম। কিন্তু উল্টা বুঝলি রাম। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে এলেন 'কপোত-কপোতী'। ডাক্তারের মুখে পুরো উদ্বেগ। ঢুকেই নার্ভাস কণ্ঠে দ্রুতগতিতে বলতে লাগলেন, 'আপনার কি হয়েছে? শরীর খারাপ? জ্বর? ব্যথাট্যথা?' শহ্‌র্-ইয়ার খাটের পৈথানে কাঠের বাজু ধরে শুধু তাকিয়ে আছে। তার মুখে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই।

আমি ভালো করে কিছু বলার পূর্বেই ডাক্তার খাটের বাজুতে বসে আমার হাতখানা আপন হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি প্রথম দিনই স্থির করেছিলুম, সুযোগমত আপনার শরীরটা একটু দেখে নেব। এইবেলা সেটা করা যাক। আজ রববার, বেশ আহিস্তা আহিস্তা রফ্‌তা রফ্‌তা।'

আমি দ্রুতগতিতে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, আমার স্বাস্থ্যটা পুরুষ্টু পাঁঠার মত, হজম করতে পারি ভেজালতম তেল, নিদ্রা ভিলেজ ইডিয়টের চেয়েও গভীরতর—ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল রোঁদের পুলিশের চেয়েও। ডাক্তার কোনো প্রকারের আপত্তি না জানিয়ে, প্রশান্ত নিঃশব্দ হাসি মারফৎ প্রসন্নতা প্রকাশ করে আমার দেহটি বদখলে এনে তাঁর ইচ্ছামত উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন, যেন ঘড়েল ক্যাশিয়ার হাজার টাকার নোটের কোনো না কোনো জালের চিহ্ন খুঁজে বের করবেই করবে—কারণ ইতিমধ্যে, স্বামীর আদেশ হওয়ার পূর্বেই শহ্‌র্-ইয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্লাডপ্রেশারের যন্ত্র, স্টিতস্কোপ এবং আরো কিছু আমার অচেনা যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার একাধিকবার বললেন, 'আমি ডাক্তারী ভুলে গিয়েছি

সে কথা তো আপনাকে বলেছি। এটা নিছক, প্রাথমিক আনাড়ি পরীক্ষা। পরে আমার এক বন্ধু এসে পাকা ভাবে দেখে যাবেন।'

আমি বললুম, 'আমি কি হিন্দুসমাজের অরক্ষণীয়া যে আমাকে কাঁচা দেখা পাকা দেখা সব জুলুমই সইতে হবে?'

ডাক্তার খুশী মুখে বললেন, 'ভালোই হল, ঐ কনে-দেখার কথাটা উঠলো। আপনার কাছে আমার একটা সবিনয় আরজ আছে। কিন্তু আপনার যদি কণামাত্র আপত্তি থাকে তবে আপনি দয়া করে অসঙ্কোচে আপনার অসম্মতি জানিয়ে দেবেন। আমি কথা দিচ্ছি, আমি নিরাশ হব না।'

আমি বললুম, 'অত তকল্লুফ করেন কেন? বলুন না খুলে।'

খোঁড়াদের চলার মত ইনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কথা বললেন। 'মানে, অর্থাৎ, ব্যাপারটা হচ্ছে এই; আমার অতি দূরসম্পর্কের একটি ভগ্নী আছে। বাপ-মা নেই—অরক্ষণীয়া বলা যেতে পারে। আপনাদের অঞ্চলে বিয়ের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা কি পদ্ধতিতে হয় আমার জানা নেই। এ অঞ্চলে কিন্তু কনেপক্ষ কখনোই বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় না—সে বড় শরমের কথা। হিন্দুদের মত প্রোফেশনাল ঘটকও আমাদের নেই। তাই চতুর্দিকে আটঘাট বেঁধে কনের মামার ভায়রা-ভাইয়ের ভগ্নীপতি, পারলে তার চেয়েও দূরসম্পর্কের কেউ তার কোনো বন্ধুকে—আত্মীয়কে নয়—বরের ভগ্নীপতির মেসোমশায়ের বেয়াইয়ের কোনো বন্ধুকে যেন ইঙ্গিত দেয় এই বিয়েটা সম্বন্ধে। তার পর স্টেপ বাই স্টেপ সেটা এগোয়। সেগুলো না হয় নাই বললুম। এক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আজ সকালে বরের এক নিকটআত্মীয় এখানে আসছেন—ভদ্রলোক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নন—কথাবার্তা আরেকটুখানি পাকাপাকি করার জন্য। আপনি তো জানেন, এসব দুনিয়াদারী বাবদে আমি একটি আস্ত গাধা। তাই আপনি যদি সেখানে—'

আমি বললুম, 'আমি সানন্দে উপস্থিত থেকে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু বিপদ কি জানেন, আমি এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিমানী। আলোচনার সময় যদি আমার কখনো মনে হয়, বরপক্ষ আমাদের কনেকে যেন নিতান্ত মেহেরবাণী করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন কিংবা—থাক্, অর্থাৎ বাংলা কথায়, কনে কিংবা তার আর্থিক অবস্থা অথবা তার বংশমর্যাদা সম্বন্ধে কোনো প্রকারের সামান্যতম কটাক্ষ যদি বরপক্ষ করে তবে লেগে যাবে ফৌজদারী। আমি খুব ভালো করেই জানি, সেক্ষেত্রে আমার সভাস্থল পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ আলোচনা চালু রাখার জন্যে তো অন্য মুরুব্বীরাও রয়েছেন, কিন্তু আমি পারি না, আমি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি ও আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে যেন ধুঁয়ো বেরুতে থাকে। অতএব বড়ই প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, আলোচনায় আমার যোগদান করাটা কি আপনাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়?'

আমার কথা শুনে দুজনাই এমন হাসি লাগালেন যে তার আর শেষই হয় না। ডাক্তার তাঁর বউকে সঙ্গে সঙ্গে কি যে বলছেন সেটা আমার ঠাহর হল না। পরে শুনলুম বলছেন, 'ঠিক আমার আপন মামুর মত, হুবহু যেন আমার আপন মামু এ কথাগুলো কইলেন! তুমি তাঁকে দেখো নি শহ্‌র্‌-ইয়ার—তিনি চলে যান আমি যখন ম্যাট্রিকে। কী দম্ভ, কী দেমাক ছিল ভদ্রলোকের! কিন্তু ঐ একমাত্র বিয়ের আলাপের সময়। অন্য সময় মাটির মানুষ বললেও কমিয়ে বলা হয়। আর তাঁর দোস্তী ছিল কাদের সঙ্গে, জানো? দুনিয়ার যত মুটেমজুর, গাড়োয়ান বিড়িওলার সঙ্গে। তিনি গত হলে পর আমরা তো বেশ জাঁকজমক করে তাঁর ফাতিহা (শ্রাদ্ধ) করলুম, আর বিশ্বাস করবে না, শহ্‌র্‌-ইয়ার, আরেকটা আলাদা করলো তাঁর টাঙাওলা বিড়িওলা দোস্তরা—দু' পয়সা, চার পয়সা করে চাঁদা তুলে তুলে।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই অত্যন্ত খানদানী ঘরের শরীফ আদমী ছিলেন।'

ডাক্তার বললেন, 'দি বেস্ট না হলেও ওয়ান অব্‌ দি ভেরি বেস্ট্‌ ইন মুর্শিদাবাদ। কিন্তু আপনি আঁচলেন কি করে।'

উচ্চতম স্তরের লোক ভিন্ন অন্য কেউ নিম্নতম স্তরের সঙ্গে মেশবার হিম্মৎ কলিজায় ধরে না।'

ডাক্তার বললেন, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আপনি, স্যার, কি এখনো ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস করেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক তার উল্টো। আমি বিংশ শতাব্দীও পেরিয়ে গিয়েছি। যে-কোনো প্রকারেই হোক মেয়েকে বিয়ে দিতেই হবে এই মান্ধাতার আমলের কুসংস্কার আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা পরে হবে। ওনরা আসবেন কখন?'

'দেরি নেই, এনি মিনিট।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি জেনে নিই। কনের মা'র মহর (স্ত্রীধন) কত ছিল?'

ডাক্তার ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'তাই-তো। ওদের আবার ফোন নেই যে শুধবো।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বললে, 'দশ হাজার।'

'সঙ্গে সেকুরিটি হিসেবে জমি-জমা, কলকাতার কোনো স্থাবর সম্পত্তি?'

'না।'

'মুহম্মদী চার শর্ত ছাড়া অন্য কোনো শর্ত ছিল যেটা বর ভাঙলে মেয়ে তালাক চাইতে পারবে।'

'না।'

'কনের কোনো ভাই-বোন আছে?'

'একটি দিদি ছিল। বিয়ের অল্প দিন পরেই মারা যায়।'

'কাবিন্-নামায় (ম্যারেজ কণ্ট্রাক্টে) ওর স্ত্রীধন (মহ্‌র্) কত ছিল ?'

'হাজার পনরো।'

"ওরা কত গয়না দিয়েছিল ?"

'হাজার তিনেকের।'

'আর আমরা ?'

'ঐ হাজার তিনেক। তবে জেহজের খাটতোশক, ড্রেসিং টেবিল, পেতলের কলসীটলসী নিয়ে হাজার পাঁচেক হবে।'

শহ্‌র্-ইয়ারই সব কটা উত্তর দিলে।

ডাক্তার সত্যই একটা নিষ্কর্মা খোদার খাশী। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু আমাদের কথাবার্তা শোনে আর তাকানোর ভাব থেকে অতি স্পষ্ট বোঝা যায়, এ সব প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য তার মস্তকে আদৌ প্রবেশ করে নি।

শহ্‌র্-ইয়ারকে শুধালুম, 'বরের বাড়ির মেয়েরা হরেদরে কত স্ত্রীধন পেয়েছে এবং বরেরা আপন আপন দুল্‌হিন্‌কে (কনেকে) কত টাকার গয়নাগাঁটি দিয়েছে সেটা বোধ হয় জানেন না এবং আমাদের সুচতুর ডাক্তারও সে খবর গোপনে গোপনে সংগ্রহ করেন নি। না ?'

আমার অনুমান সত্য।

ডাক্তার মেয়েটি কি কি পাশ দিয়েছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে কিনা এসব খবর দিতে আরম্ভ করেছেন। আমি বললুম, 'ওসব জেনে কি হবে ? তার জোরে স্ত্রীধন বাড়াবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বরপক্ষ তাদের অন্যান্য ছেলের বিয়েতে কাবিন্-নামায় কনেপক্ষের প্যাঁচের টাইটে কি কি দিয়েছে সেটা জানতে পারলে, বেটার্ স্টিল ওদের দু'চারখানা কাবিন্-নামার কপি যদি গোপনে গোপনে যোগাড় করে রাখতেন তবে সেগুলো হতো আমার এ্যাটম্ বম্। এখন যা অবস্থা, মনে হচ্ছে, গাধা বন্দুকটি পর্যন্ত হাতে নেই।'

প্রাইজ-ইডিয়ট আর কারে কয় ! ডাক্তার বলে কি না, বরপক্ষকে শুধোলেই তো সব জানা যাবে।

আমার কান্না পাবার উপক্রম। বললুম, 'ওরা জলজ্যান্ত মিথ্যে খবর দেবে। আর আমিও কনেপক্ষের সুবিধের জন্যে যে থাণ্ডারিং মিথ্যে বলবো না, সে প্রতিজ্ঞাও করছি নে।'

শহ্‌র্-ইয়ারকে শুধালুম, আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন ?'

'না।'

'এক্সেলেণ্ট ! কিন্তু আপনি কোথাও পালাবেন না। কোনো খবরের দরকার হলে আপনার কাছে কোনো অছিলায় চলে আসব।'

'আমি ওঁদের জন্যে খাবার-দাবার তৈরী করার তদারকিতে থাকবো।'

বেয়ারা খবর দিল ওঁরা এসেছেন। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে এগিয়ে

গেলেন। আমি পা বাড়াতেই শহর-ইয়ার দুষ্টু মুচকি হাসি হেসে বললে, 'আপনাকে যে কত রূপেই না দেখব! এখন দেখছি ঘটক রূপে। এও এক নব রূপ।' গুনগুন করে গান ধরলো—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে

ডাক্তার মহা সাড়ম্বরে বরপক্ষের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি যে কনেপক্ষের হয়ে এই আলোচনায় যোগ দিতে রাজি হয়েছি তার জন্য তিনি এবং তাঁর পরিবার নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করছেন। কনেপক্ষের দু'জনও তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমার নাম তাঁদের গোষ্ঠীতে অজানা নয়।

ডাক্তার বললেন, 'ইনি আছেন বলে আমার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই যে, আমরা অতি সহজেই সব বিষয়েই একমত হয়ে যেতে পারবো।'

আমি এ-জাতীয় অদৃশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম—অজ্ঞজন যাকে বলে বিবাহের শর্তগুলি স্থির করার জন্য বর ও কনে পক্ষের মধ্যে আলোচনা—শেষবারের মত দেখেছি দেশে। তার পর দু'একটি বিয়ে-শাদীতে আনুষ্ঠানিকভাবে পেট ভরে খেয়ে এসেছি—ব্যস্।

আমি সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার শেষ অদৃশ্য সশস্ত্র সংগ্রামে আমার অদৃশ্য তলওয়ারটাতে শান দিতে লাগলুম।

কিন্তু হা কপাল! সব বেকার, সব বরবাদ, সব ভণ্ডুল।

এজাতীয় আলোচনা সব সময়ই আরম্ভ হয় মহর্ বা স্ত্রীধনের পরিমাণ নিয়ে। কনের দিদির স্ত্রীধন পনেরো হাজার ছিল, তারই স্মরণে গুনগুন করলুম, 'কুড়ি হাজার।'

আমি ছিলুম তৈরী যে তাঁরা মৃদু হাস্য করে অতিশয় ভদ্রতা সহকারে দশ হাজার দিয়ে দর-কষাকষি আরম্ভ করবেন। ইয়া আল্লা! কোথায় কি? দু'জনাই অতি প্রসন্ন বদনে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিলেন! আমি তো সাত হাত পানিমেঁ!

মৃদুকণ্ঠে বললুম, 'আপনারা তো সবই জানেন, কনের বাড়ির হালও জানেন; গয়নাগাঁটি আমরা আর কি দেব! আপনারাই বরঞ্চ একটা আন্দাজ দিন!'

ফের ফাটলো বম্-শেল! দু'জনাই সাততাড়াতাড়ি বললেন, 'এ কি বলছেন, সাহেব। না, না, না। আপনারা যা খুশ্ দিলে দেবেন আমাদের পক্ষে সেইটেই গণিমৎ (বৈভব, সৌভাগ্য)।

তার পর ও'রা নিজের থেকে যা বললেন তা শুনে, বিশেষ করে 'থার্টি ইয়ারস উয়োরের' স্মরণে, আমি আমার কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। ও'রা কনেকে কি গয়নাগাঁটি দেবেন সে প্রশ্ন ইতিউতি করে আমি শুধোবার পূর্বেই তাঁরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'মাফ করবেন, আর আমাদের পক্ষ

থেকে তো বলার কিছুই নেই। আপনারা জানেন দুল্‌হার (বরের) ভাইবোন নেই। কাজেই দুল্‌হিনই শাশুড়ীর সব-কিছু পাবেন এ তো জানা কথা, আর আমরাও সেই কথাই দিচ্ছি। তার দাম—' ভদ্রলোক সঙ্গীকে শুধোলেন, 'কত হবে ভায়া?' সঙ্গী বললেন, 'হালে যাচাই করা হয়েছিল। কুড়ি হাজারের কম না। তিন পুরুষের পুরনো গয়না, নূতন করে গড়াতে হবে।'

'কুড়ি হাজার'—বলে কি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাড়িঘাড়ি বললুম, 'অমন কর্মটি করতে যাবেন না। আল্লার মেহেরবাণীতে ভালোয় ভালোয় আক্‌্‌ৎ-রসুমাৎ (পরিপূর্ণ শাদী) হয়ে যাক তখন না হয় দুল্‌হিনু তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করার করবেন। কি বলেন ডাক্তার? আর আপনারা?'

দুজনেই সানন্দে সায় দিয়ে, একজন বললেন, 'আমার মেয়ে বলছিল, পুরনো ফ্যাশান নাকি আবার হালফ্যাশান হচ্ছে! এখন ভেঙে গড়ালে পরে হয়তো দুল্‌হিনই—' কথাটা তিনি আর শেষ করলেন না।

ইতিমধ্যে নাশ্‌তা আসতে আরম্ভ করেছে। সে আসা আর শেষ হয় না। নাশ্‌তা না বলে এটাকে হক্‌ক-মাফিক ব্যানকুয়েট বলা উচিত। বরপক্ষ ক্রমাগত আমাদের শুনিয়ে একে অন্যকে বলে চলেছেন, 'হবে না কেন? চিরকালই হয়ে আসছে এরকম। এঁয়ার ওয়ালেদের (পিতার) আমলে আমি কতবার খেয়েছি এ রকম। আমার দাদাকে (ঠাকুর্দা) কত শত বার বলতে শুনেছি, এঁয়ার ঠাকুরদ্দার শাদীর দাওয়াৎ! তিন রকমের খানা তাইয়ার হয়েছিল। তিন বাবুর্চীর একজন এসেছিল পাটনা থেকে, অন্যজন দিল্লী থেকে আর তিসরা হায়দ্রাবাদ নিজামের খাস বাবুর্চী-খানা থেকে। আর—' চললো তো চললো—তার যেন শেষ নেই।

নাশ্‌তার বাসন-বর্তন খাওয়াদাওয়ার পর যখন সরিয়ে নেওয়া হল তখন আমি অতিশয় মোলায়েম সুরে বললুম, 'আমার একটি আরজ আছে; যদি অভয় দেন—'

উভয়ে সমস্বরে বললেন, 'আপনি আরজ না, হুকুম্ করুন।'

আমি বললুম, 'আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা বোধ হয় আদালতে টেকে না। কুরান শরীফের কানুন মতাবেক যে কোনো মুসলমান চারিটি বীবী একই সময়ে রাখতে পারে। এখন আমরা যদি কাবিনু-নামায় দুলহার কাছে শর্ত নিই অর্থাৎ আপনারা যদি মেহেরবাণী করে সে শর্ত কবুল করেন যে তিনি দুল্‌হিনের বিনা অনুমতিতে দুসরী শাদী করবেন না, তবে আইনত সেটা বোধ হয় আলট্রা ভাইরেস্। আদালত খুব সম্ভব বলবে, "কুরান শরীফ মুসলিমকে যে হক্‌ক দিয়েছেন, মানুষ একে অন্যের কাছ থেকে শর্ত আদায় করে সে হক্‌ক খর্ব করতে পারে না।" আমি এতক্ষণ ধরে এই সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করছিলুম।'

কন্যাপক্ষ বললেন, 'আমরা খুশীর সঙ্গে সে শর্ত দেব। সে শর্ত আপনাদের

তরফ থেকে নিতে তো কোনো দোষ নেই। তার মূল্য শেষ পর্যন্ত যদি না থাকে তো নেই। এখন নিতে আপত্তি কি?'

সমস্ত বাক্যালাপটা আমার কাছে অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকছিল। কোথায় গেল সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লড়াই? আলোচনার নামে চিৎকার, রাগারাগি, নাশ্‌তো স্পর্শ না করে বরপক্ষের সভাত্যাগ; এমন কি বিয়ের রাত্রেও—উভয় পক্ষ ততদিনে বিয়ের প্রস্তুতির জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছেন—কাবিন্‌-নামা লেখার সময় সামান্য একটা শর্ত নিয়ে বচসা, তারপর মারামারি, সর্বশেষে বিয়ে ভণ্ডুল করে বরপক্ষ বাড়ি যাবার পথে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ-পর্ব সমাধান করে মুখরক্ষা করলো—এ ব্যাপারও মাঝে মাঝে হয়েছে।

আর আজ দেখি ঠিক তার উল্টো! আমি যা শর্ত চাই সেটাতেই তাঁরা রাজী! যেন সমস্ত কলকাতা শহরে আর কোনো বিবাহযোগ্যা কুমারী নেই! এই ত্রিশ বছরে দুনিয়াটা কি আগাপাস্তলা বদলে গেল?

এ অবস্থায় আর খাঁই বাড়ানো চামারের আচরণ হবে। শুধু বললুম, 'আর বাকী যেসব ছোটখাটো শর্ত আছে, যেমন আমাদের মেয়ে যদি—আল্লা না করুক—শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু বাপের বাড়িতে এসে কিছুকাল বা দীর্ঘকাল বাস করে তবে সে শ্বশুরবাড়ি থেকে কত টাকা মাসোহারা পাবে, আপনারা যে স্ত্রীধন দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন তার জিম্মাদার কে কে হবেন, এ সবের জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। বিয়ের পূর্বে আমাদের উকীলের সঙ্গে আপনাদের উকীল বসে এ-সব ফর্মালিটিগুলো দুরস্ত করে নেবেন। আজ আমি এতই খুশী যে বিনা তর্কে বিনা বাধায় বড় বড় শর্তগুলো সম্বন্ধে একমত হতে পেরেছি যে অন্য আর কোনো ছোট শর্ত স্পর্শ করতে চাই নে।'

সবাই সমস্বরে তখন আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন আল্লার কাছে শুক্‌রিয়া জানিয়ে একটি মনাজাত (প্রার্থনা) করি। এসব মোল্লাদের (পুরুৎদের) কাজ,—তারা দু'পয়সা পায়ও—এসব আমাদের (অর্থাৎ 'স্মৃতি-রত্নদের') কাজ নয়। তবু অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা সমাপ্ত করলুম।

দশ

ডাক্তার বললেন, 'আমার খুব ছেলেবেলায় এ বাড়ির দু'তিনজন অতি বৃদ্ধ মুরুব্বীর কোলে বসে তাঁদের আদর পেয়েছি, আর মনে আছে, আমাকে আদর করতে করতে হঠাৎ তাঁরা কেঁদে ফেলতেন। আমি তখন এই বিরাট বাড়ির বিরাট গোষ্ঠীর একমাত্র সন্তান। আপনি যে-সব প্রশ্ন শুধোলেন, এর অধিকাংশের উত্তর এই মুরুব্বীরা নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু আমি তখন এতই

অবোধ শিশু যে আমাকে তাঁরা প্রাচীন দিনের কোনো কাহিনীই বলেন নি।'

একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, 'কিন্তু এই বৃদ্ধেরা একটা গভীর পরিতৃপ্তি সঙ্গে নিয়েই ওপারে গেছেন। ঐ নিতান্ত শিশুবয়সেই আমি ওঁদের নামাজের সময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে, বসে, সজ্দা দিয়ে তাঁদের অনুকরণ করতুম, তাঁদের কোলে বসে মসজিদে যেতুম, আর বাড়িতে শিন্নী বিলোবার সময় সদর দরজায় তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতুম। আমাকে তাঁরা তখন একটা খুব উঁচু কুর্সীতে বসিয়ে জমায়েৎ গরীব-দুঃখী, নায়েব-গোমস্তা সবাইকে বলতেন, ইনিই বাড়ির মালিক; এঁর হুকুমমত চললে আমাদের দোওয়া তোমাদের উপর থাকবে।' আর সবচেয়ে মজার কথা কি জানেন, সৈয়দ সাহেব, আমার আপন ঠাকুদ্দার বড় ভাইসাহেব, যিনি তখন বাড়ি চালাতেন, তিনি প্রায় প্রতিদিন আমার পড়ার ঘরে এসে বলতেন, 'ভাইয়া, শোনো। মির্জাপুর (উনি অবশ্য মীরজাফর-ই বলতেন) অঞ্চলে আজ আরেকটা বাড়ি কেনা হলো। ঠিক আছে তো?' কিংবা ঐ ধরনের ব্যবসায় সংক্রান্ত কিছু-একটা। আজ ঐ ছবিটা যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন হাসি পায়। ঠাকুদ্দা খবরটা দেবার সময় ভাবখানা করতেন, যেন তিনি আমার নায়েব, কিছু একটা করে এসে হুজুরের পাকা সম্মতি চাইছেন! এরকম একাধিক ছবি আমার চোখের সামনে এখনো আবছা-আবছা ভাসে।

ছ'মাসের ভিতর তিন ঠাকুদ্দাকেই গোরস্তানে রেখে এলুম। আমার তখন-কার শিশুমনের অবস্থা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করবো না।

ঐ যে পুরো একটা উইং জুড়ে রোজ সন্ধ্যায় সাজানো-গোছানো ঘরে আলো জ্বলে তাঁরা ঐখানে বাস করতেন, তাঁদের আপন আপন শ্বশুরবাড়ির কিংবা ঐ ধরনের কিছু কিছু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে। বহু বৎসর পরে আমাদের প্রাচীন দিনের নায়েব সাহেব আমাকে বলেন, 'ঐ বুড়া ঠাকুদ্দারা তাঁদের মৃত্যুর বছরখানেক আগে কলকাতার অন্যত্র পুষ্যিদের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেন, ঠাকুদ্দারা নাকি চান নি যে তাঁরা এ বাড়িতে পরবর্তীকালে আমার কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেন।'

আমি শুধালুম, 'এই নায়েব নিশ্চয়ই বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। তিনি আপনাকে প্রাচীন দিনের কোনো কাহিনী বলেন নি? পাড়ার আর পাঁচ বুড়ো?'

'কি করে বোঝাই, ডাক্তার সাহেব, বাপ-মা, আমার আপন ঠাকুদ্দা নিয়ে চারজন ঠাকুদ্দা—আমার আপন ঠাকুদ্দা আর পাঁচজন চাচা মারা যান আমার জন্মের পূর্বে—এঁদের সবাইকে হারিয়ে ছ'বছর বয়েস থেকে আমি একা—এই বিশাল বাড়িতে একা। শুধু নায়েব সাহেবের ক্ষুদ্র পরিবার এবং তাঁর এক বিধবা পুত্রবধূ—ইনিই আমাকে মানুষ করেন আপন ছেলের মত করে। কিন্তু আমার এমনই কিস্মৎ, এঁরাও সবাই চলে গেলেন ওপারে—ততদিনে আমি মেডিকেল

কলেজের ফাইনাল ইয়ারে। বাকি রইলেন, শুধু আমার ঐ মা-টি। তাঁকেও হারালুম এমন এক সময় যে আমি রাত্রে হাউ হাউ করে কেঁদেছি। এই মা আমার আত্মগোপন করে শহ্‌র্‌-ইয়ারকে গোপনে দেখে এসে আমাকে বললেন, 'জুল্‌ফিকার, আমি নিজে দুল্‌হিন দেখে তোর বিয়ে ঠিক করে এসেছি। এই-বারে তুই রাজী হলেই আমি পাকা খবর পাঠাই।' আমি জানতুম, ঐ নিঃসন্তান বৃদ্ধার ঐ একটি মাত্র শেষ শখ। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রক্তসম্পর্ক নেই, সুদূরতম আত্মীয়তাও নেই, অথচ তিনি আমাকে দিনে দিনে মানুষ করে তুলেছেন সামান্যতম প্রতিদানের চিন্তা পর্যন্ত না করে,—ঘোর নেমকহারামী হতো এঁর শেষ আশা পূর্ণ না করলে। আর বিয়ে তো করতেই হবে একদিন —বংশরক্ষা করার জন্য, অন্য কোনো কারণ থাক্‌ আর নাইবা থাক্‌। বিয়ে না করলে আমার পিতৃপুরুষ পরলোক থেকে আমাকে অভিসম্পাত দেবেন, এ-কুসংস্কার আমার নেই ; কিন্তু তাঁরা যতদিন এ-লোকে ছিলেন ততদিন আমিই, একমাত্র আমিই যে তাঁদের শেষ আশা, আমিই তাঁদের বংশরক্ষা করবো—সে-আশা যে এ বাড়ির বাতাসের সঙ্গে গিয়ে মিশে প্রতি মুহূর্তে আমার প্রতিটি-নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাকে প্রাণবায়ু দিচ্ছে। এক মুহূর্ত চিন্তা না করে সম্মতি দিলুম।'

আমি শুধালুম, 'ইতিমধ্যে আপনি প্রেমেট্রেমে পড়েন নি? কলকাতার ডাক্তারি শিক্ষাবিভাগ পাছে আমার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করে তাই সভয়ে বলছি, অন্যদের তুলনায় প্রেমট্রেম করার সুবিধে আপনাদেরই তো বেশী। আর আপনার চেহারা, ধনদৌলত—'

হেসে বললেন, 'প্রেমট্রেম হয় নি, তবে মাঝে মাঝে যে চিত্তচাঞ্চল্য হয় নি একথা অস্বীকার করলে গুনাহ্‌ হবে। তবে কি জানেন, আমি যে মুসলমান সে-বিষয়ে আমি সচেতন এবং তাই নিয়ে আমার গর্ববোধ আছে। ওদিকে হিন্দুরা নিজেদের মুসলমানের চাইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করেন। সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতই—একস্‌ট্রীম এবনরমেল কন্ডিশন না হলে—নিজেকে অন্য জাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অবশ্য এসব বাবদে সম্পূর্ণ উদাসীন মহাজনও কিছু কিছু সব সময়ই পাওয়া যায়। আমার সহপাঠী সহকর্মী প্রায় সবাই হিন্দু, কিছু কিছু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, যে দু'একজন মুসলমান তাঁরা থাকেন হস্টেলে। কয়েকজন হিন্দুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়—এখনো আছে—এবং তাঁরা অত্যন্ত সজ্জন বলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মা-বোনদের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দেন। সেখানে প্রেম করে হিন্দু পরিবারে বিপর্যয় কাণ্ড বাধাবার কোনো বাসনাই আমার ছিল না—তদুপরি কোনো হিন্দু তরুণী যে আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন সেটাও আমার গোচরে আসে নি।'

আমি বললুম, 'অত অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে প্রেম হয় না। তারপর কি

হল, বলুন।'

ডাক্তার বললেন, 'পাক্কা হক্ কথা বলেছেন। আচ্ছা, তবে এখন পুরনো কথায় ফিরে যাই। বিয়ের সম্মতি পেয়ে আমার মা তো আসমানের চাঁদ হাতে পেলেন। বাড়ির লোকজন পাড়াপড়শী সবাইকে বার বার শোনান—যা্ দিন কাল পড়েছে, আপন গর্ভের সন্তান মায়ের মরার সময় মুখে এক ফোঁটা জল দেয় না। আর আমার জুল্‌ফিকার একবার একটা প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলো না, দুলহিন কোথাকার, লেখাপড়ি করেছে কি না, দেখতে কি রকম। বললে, মা, তুমি যখন পছন্দ করেছ, তখন নিশ্চয়ই ভালো হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিলে।

তারপর বুড়ির দিনগুলো কাটলো বিয়ের বাবস্থা করতে।

আমাদের বিয়ের ঠিক সাতদিন আগে তিনি হার্টফেল করে বিদায় নিলেন।'

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থাকার পর বললেন, 'হ্যাঁ, ঐ প্রাচীন যুগের নায়েব সাহেবের কথা হচ্ছিল যিনি যখের মত এ গোষ্ঠীর বিষয়-সম্পত্তি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আগলিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু বলেন নি, কারণ আমার দিক থেকে তিনি কখনো কণামাত্র কৌতূহল দেখতে পান নি। আর তিনিই বা এসব কথা আমার স্মরণে এনে কি আনন্দ পাবেন? ঠাকুন্দাদের বয়েসী নায়েব সাহেব আমার ঠাকুন্দার বাবাকেও তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছেন, তাঁর জন্ম হলে নাকি আকবরী মোহর দিয়ে তিনি তাঁর মুখ দেখেছিলেন। কারণ তাঁর বাপ ছিলেন আমার ঠাকুন্দার ঠাকুন্দার নায়েব। এবং সেই ঠাকুন্দার ঠাকুন্দার আব্বা বানান এই বাড়িটা। তিনি তাঁর ভাই বেরাদর ভাতিজা ভাগিনা, আপন এবং ভাই-ভাতিজাদের শালা-শালাজ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী পুষ্যি, মসজিদের ইমাম সায়েব, মোয়াজ্জিন (যে আজান দেয়), পাশের মকতবের গোটা চারেক মৌলবী—মকতবটা বহুকাল উঠে গেছে—বিষয়-আশয় দেখবার দু'পাঁচজন কর্মচারী, ডজনখানেক মাদ্রাসার গরীব ছাত্র নিয়ে এ বাড়িতে থাকতেন। এইটুকু ভাসা-ভাসা ভাবে শুনেছি।

কিন্তু মোদ্দা কথা এই: ঠাকুন্দাদের গোর দেবার সময় আমার অতীত এবং এ-বাড়ির অতীতকেও আমি যেন আমার অজানতে সঙ্গে সঙ্গে গোর দিলুম। বুদ্ধিসুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীতের প্রতি কৌতূহল, আকর্ষণ দুটোই যেন আরো নিভে যেতে লাগল, বরঞ্চ উল্টে অতীতের প্রতি যেন আমার একটা রোষ জন্মাল। মনে হলো সে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর অবিচার করেছে। আমাকেও তো সে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতো। আমি কি তার যক্ষ যে এ বাড়ি ভূতের মত আগলাবো?

আমার মনে হয়, বুড়ো নায়েব এবং পাড়ার পাঁচবুড়ো আমার চোখেমুখে অতীতের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা দেখতে পেতেন এবং তাই স্বেচ্ছায় ঐ পাঁক

ঘাঁটাতেন না।

আর বলতে গেলে তাঁরা বলবেনই বা কি ? সেই ১৮২৫-এর গমগমে বাড়ি কি করে একজনাতে এসে ঠেকলো। একজন একজন করে সক্কলের বংশলোপ পেল—এ ছাড়া আর কি ? আপনিই বলুন, সে-সব শুনতে কার ইচ্ছে যায় ?

তবে হাঁ, কারো যদি ইচ্ছে যায় পুরো ইতিহাসটা গড়ে তোলবার, তবে সে সেটা করতে পারে—কিন্তু বিস্তর তকলীফ বরদাশ্ত করার পর। নিচের তলায় 'এল্' উইঙের শেষ দুখানা ঘরে আছে, যাকে বলতে পারেন আমাদের পারিবারিক আর্কাইভ অর্থাৎ মহাফেজখানা। ১৭৮০ বা ৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত যেমন যেমন দলীল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, জমা-খরচের হিসেব-নিকেশ, কর্মচারীদের রিপোর্ট, মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ এবং আরো শত রকমের ভিন্ন ভিন্ন কাগজপত্র, টুকিটাকি প্র্যাকটিকাল কারবার-ব্যবসায়ের জন্য বেকার হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো রেখে দেওয়া হয় ঐ দুখানা ঘরে। বেশ যত্নের সঙ্গেই রাখা হয়েছে, এবং পুরুষানুক্রমে নায়েবরাও সেগুলোর যত্ন নেন। শহর্-ইয়ারও মাস তিনেক অন্তর অন্তর সেগুলোর তদারক করে। আমার লজ্জা পাওয়া উচিত, আমার কিন্তু মাষা পরিমাণ দিল্-চস্পী এ-সব কাগজপত্রের প্রতি নেই।'

আমি চুপ করে ভাবলুম এবং ডাক্তারকে মোটেই কোন দোষ দিতে পারলুম না। যে অতীত তাঁর গোষ্ঠীর সব-কিছু নির্মম ভাবে কেড়ে নিয়েছে তাকে আবার যত্নআত্তি করে পুঁথির পাতায় লেখার কি প্রয়োজন ? এবং এর সঙ্গে আরেকটা তত্ত্ব বিজড়িত আছে। পরিবারের অতীত ইতিহাস নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে তাদের বেশীর ভাগই কেমন যেন পূর্ব ইতিহাসের স্মরণে বেশ কিছুটা দম্ভী হয়ে যায়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের ডাক্তার তো ফকীর, সুফীর বিনয় আচরণ ধরেন, সংসারে থেকে, গৃহীরূপে।

একটু প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি দেখিয়ে শুধালুম, 'এই যে শূন্য অন্ধকার একতলা, দোতলার একটা পুরো উইং, তেতলা—এগুলোর একটা ব্যবস্থা করেন না কেন ?'

'কি ব্যবস্থা ? ভাড়া দেওয়া ছাড়া আর গতি কি ? কলকাতায় আমার যে-সব বাড়ি ভাড়ায় খাটছে তার আমদানীই আমাদের দুজনার পক্ষে যথেষ্টেরও ঢের ঢের বেশী। পরিবার যে অনতিবিলম্বে বৃহত্তর হবে তার সম্ভাবনাও তো দেখছি নে।'

এর পর ডাক্তার কি বলেছিলেন সেটা আমি সম্পূর্ণ মিস করলুম, কারণ আমার মনে তখন অদম্য ইচ্ছা যে তাঁকে শুধোই : দশ বছর হলো তাঁদের বিয়ে হয়েছে, এখনো কোনো বংশধর না আসার কারণ কি ? তিনি স্বয়ং ডাক্তার, তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে পারেন, প্রয়োজন হলে বিদেশে

যেতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দমন করলুম। আমি ভীরু; যদি কোনো অপ্রিয় সংবাদ শুনতে হয়।

আবার কান পেতে শুনলুম, বলছেন, 'অতি বিশ্বস্ত আমাদেরই প্রাচীন নায়েব বংশের ছেলে এখন নায়েব আছেন, কর্মচারীরাও বিশ্বস্ত, তবু আমার জান পানি পানি। নায়েবকে আমি সর্ব ডিসিশন নেবার ভার কমপক্ষে সাতান্নবার বলেছি, বিরক্ত হয়ে কাগজ লিখে ডাকে তার বাড়িতে পাঠিয়েছি। কোনো ফল হয় নি। সে কাজ করে যায় তার আব্বার কাছ থেকে ঐতিহ্যগত যে পদ্ধতিতে কাজ শিখেছে। দুদিন অন্তর অন্তর এ-বাড়িতে এসে সভয় নয়নে উঁকিঝুঁকি মারে—হুজুরকে কখন বিরক্ত না করে দুটো ডিশিসন ফাইনেলাইজ করে নেওয়া যায়। এই উঁকিঝুঁকিটা আমাকে বিরক্ত করে আরো বেশী। আমি কি বাঘ, তাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব! যদ্দিন তার বাপ বেঁচেছিলেন, আমি ছিলুম সুখে। সপ্তাহে একদিন এসে দশ মিনিট ধরে গড়গড় করে যা কিছু করেছেন সেগুলো বলে নিয়ে শুধোতেন, "ঠিক আছে তো, মিয়া?" অনেকটা আমার সেই ঠাকুদ্দার রিপোর্ট দেওয়ার মত। অবশ্য প্রায় দুটি বচ্ছর সর্ব আপত্তি, প্রতিবাদ, চিৎকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, বলতে গেলে প্রায় আমার কানে ধরে সব কটা বাড়ি বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন, সব কাজ শিখিয়েছেন। ঐ সব বাড়ি আর তাদের ভাড়াটে আমার জন্য দুনিয়ার দোজখ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এখন যদি একতলা আর তিনতলাটা ভাড়া দি তবে সেটা খাল কেটে ঘরে কুমির আনা নয়, সেটা হবে ক্লাইভ এনে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনা করা। সিরাজ্-উদ্দৌলার মত আমার মুণ্ডুটি যাওয়াও বিচিত্র নয়।

অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা যে একেবারেই ভাবি নি তা নয়, কিন্তু আমার সময় কোথায়?'

এগারো

আল্লাতালা যাকে খুশী তোলেন, যাকে খুশী নামান—এ সত্যটি পাপীতাপী আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

ডাক্তারের ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। তার অবতরণিকায় যে কৃতিত্ব সব-কিছু দুরুস্ত-সহী করেছিলুম তাই নিয়ে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ—এমন কি দম্ভ বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না—অনুভব করছিলুম। অবশ্য বরপক্ষ যদি একটুখানি লড়াই দিত তা হলে তাদের ঘায়েল করে কৃতিত্ব ও আত্মপ্রসাদ হতো পরিতৃপ্তি ভরা। তা ওরা যদি লড়াই না দেয়, তবে আমি তো আর ডন্ কুইসটের মত উইণ্ডমিল আক্রমণ করতে পারি নে!

কিন্তু শুয়ে শুয়ে সব-কিছু বিচার-বিবেচনা করার পরও যে সুখ পাচ্ছিলুম, সেটা অস্বীকার করবো না।

এমন সময় মুচকি মুচকি হেসে শহ্‌র্‌-ইয়ার খাটের পৈথানে দাঁড়াল।

বিজয়ী সেনাপতি যে রকম পদাতিকের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আমিও ঠিক তেমনি শহ্‌র্‌-ইয়ারকে যেন মেহেরবাণী মন্‌জুর করে বললুম, 'বসতে পারেন।'

তারপরই ফাটলো আমার ঢাউস বেলুনটা!

শহ্‌র্‌-ইয়ার হাসিমুখে বললে, 'বলুন তো, আমরা কতবার আলোচনা করেছি—মুসলমান মেয়েদের পর্দার আড়াল থেকে বেরনো নিয়ে। পাল্লায় তুলেছি একদিকে সুবিধেগুলো, অন্যদিকে অসুবিধাগুলো এবং যেহেতু আমরা উভয়ই শেষরাত্তিতক্ ইমানদার সদাগর তাই কখনো আপনি বাটখারার পর বাটখারা চাপিয়ে গেছেন একদিকে আমি আর অন্য পাল্লায় চাপিয়ে গেছি মালের পর মাল। তারপর হয়তো আপনি চাপিয়েছেন মাল আর আমি বাটখারা। তার অর্থ, আমাদের আলোচনার স্বপক্ষে বিপক্ষে যা যা যুক্তি আমরা বের করেছি কেউ কোনোটা লুকিয়ে রাখি নি। নয় কি?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই। এ নিয়ে তো আমরা কেউ কোনো প্রকারের সন্দেহ এযাবৎ প্রকাশ করি নি। আপনার মনে কি কোনো সন্দেহের উদয় হচ্ছে!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার জিভ কেটে বললে, 'উপরে আল্লা; সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমি শুধু এসেছিলুম আরেকটি অতি সদ্য আবিষ্কৃত যুক্তি নিয়ে যেটা মুসলমান মেয়েদের অন্দর-ত্যাগের স্বপক্ষে যায়। আপনি তো সেদিন আমাদের ভাগ্নীর জন্য অবিশ্বাস্য অঙ্কের স্ত্রীধন, প্রচুর গয়না, এমন কি শেষ পর্যন্ত আইনে টেকে কি না টেকে এমন একটি শর্তও ভাগ্নীর সুবিধার জন্য আপনার সুললিত রসনা সঞ্চারণ করে বিস্তর দৌলত জয় করে, রূপকার্থে বলছি, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখলেন। আপনার ডাক্তার সে কেরদানী দেখে অচৈতন্য। পাছে আপনার ন্যাজ মোটা হয় তাই তাঁর সবিস্তর প্রশস্তিগীতি আর গাইবো না। তবে একটি বাক্য আপনাকে শোনাই। তিনি বললেন, "এরকম মধুর, ললিত বিদগ্ধ ভাষা ব্যবহার করে মানুষ যে নিষ্ঠুর কাবুলীওলার মত তার প্রাপ্যের অগুনতি গুণ বেশী চাইতে পারে—এ আমি স্বকর্ণে না শুনলে কক্‌খনো বিশ্বাস করতুম না।" তা সে যাক্। এইবারে আসল তত্ত্বটি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

আমাদের ভাগ্নী তো তার প্রাচীনপন্থী চাচার সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া করে যেতে আরম্ভ করলো কলেজে—অবশ্যই 'কালো তাঁবু' নামক বোরকা সর্বাঙ্গে লেপ্টে নয়। মেয়েটি যে বেহেশ্‌তের হুরীর মত খাপসুরত, তা নয়—তবে সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী আর চলাফেরায়, কথাবার্তা বলায় হায়া-শরম আছে। লেখাপড়ায়

খুব ভালো, প্লেস পাবার সম্ভাবনাও কিছুটা আছে, এবং গোঁড়া চাচাটিকে না জানিয়ে হিন্দু বান্ধবীদের বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল ইসলাম ও অতুলপ্রসাদের গানও বেশ খানিকটে আয়ত্ত করে ফেলল। গলাটি মিষ্টি, তাই গানের ভুলচুক-গুলো ওরই তলায় চাপা পড়ে যায়। চাচাটি অবশ্য এসব কীর্তিকলাপের কিছুই জানেন না, শুধু মাঝে মাঝে দেরিতে বাড়ি ফিরলে একটুআধটু চোটপাট করেন। তাও খুব বেশী না, কারণ তিনি কখনো কলেজে পড়েন নি, তদুপরি কুনো মানুষ—তাই কলেজের কায়দা-কেতা, এমনিতে কখন কলেজ ছুটি হয়, ফানকশন থাকলেই বা কখন, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ বে-খবর।

কিন্তু বাদবাকি দুনিয়াটা তো আর বেখেয়াল নয়। একটি এম. এ. ক্লাসের ছেলে তাকে লক্ষ্য করছিল বছর দুই ধরে। কারণ ভাগ্নীটি যে-বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে গান শিখত ছেলেটি থাকে তার সামনের বাড়িতেই। প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিল ভাগ্নীর মিষ্টি গলাটি শুনে. তারপর সামান্য অনুসন্ধান করে তার সম্বন্ধে বাদবাকি খবর যোগাড় করলো। বিবেচনা করি ছোকরা আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল যখন জানতে পারলো মেয়েটি তারই মত মুসলমান। ইতিমধ্যে সে আবার এম. এ. পাশ করে কোন্ একটা কলেজের লেকচারার হয়ে গিয়েছে। তাকে তখন ঠেকায় কে ?

ভাগ্নীর নামঠিকানা, তার সম্বন্ধে যাবতীয় বৃত্তান্ত তার চাচাতো ভাবীকে বয়ান করে বললে, বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও—অবশ্য সোজাসুজি না. কনেপক্ষের এক দূর আত্মীয়ের কাছে। আলাপচারী বেশ খানিকটে এগিয়ে যাওয়ার পর স্থির হল. অমুক দিন বরপক্ষ থেকে অমুক অমুক মুরুব্বী মহর্ ইত্যাদি স্থির করবার জন্য আমাদের বাড়িতে আসবেন। ইতিমধ্যে অবশ্য ভাগ্নীর চাচা খবর নিয়ে জেনেছেন ছেলেটি সত্যই অত্যুত্তম দুল্হার পর্যায়ে পড়ে।

আমাদের এখানে এসে আলোচনা করার আগের দিন সেই দুই ভদ্র-লোক—যাঁদের সঙ্গে পরে আপনি কথাবার্তা কইলেন—দুল্হার বাপ-মা এবং অতিশয় অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বসে আলোচনা করে জেনে নিলেন, মহর্, গয়নাগাঁটি, ফালতো শর্ত যদি আমরা চাই ইত্যাদি তাবৎ আইটেমে তাঁরা কতখানি মেক্সিমামে উঠতে পারেন। এবং আকছারই এ-সব ক্ষেত্রে যা হয় তার ব্যত্যয়ও হলো না। রাত দুটো না তিনটে অবধি দফে দফে আলোচনা করার সময় বিস্তর মতভেদ, প্রচুর তর্কাতর্কি ততোধিক মনোমালিন্য হলো। দুল্হার চাচার অনেকগুলো ছেলে। তাঁর বক্তব্য—এবং সে-বক্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত—যে, তোমরা যদি আজ দরাজদিলে, মুক্তহস্তে বরপক্ষের দাবীদাওয়া মেনে নাও তবে আমার ছেলেগুলোর বিয়েতেও দুলহীন পক্ষ এই বিয়ের নজির দেখিয়ে এরই অনুপাতে দাবী করে বসবে প্রচণ্ড মহর্, অষ্ট-অলঙ্কারের বদলে অষ্টগণ্ডা এবং খুদায় মালুম আর কি কি। অতএব সর্বাবাদে

ম্যাক্সিমামটা আরো নিচে নামাও, কলকাতায় দুলহিনের অভাব নেই, তাঁরই পরিচিতদের ভিতরে এন্তার ডানা-কাটা হুরীপরী রয়েছে।

সবাই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন; তাঁর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। অর্থনৈতিক চাপেই হোক বা সামাজিক যে কোনো কারণেই হোক, এখন মুসলমান মেয়ের অবস্থা প্রায় হিন্দু মেয়েরই মত। তাদেরই মত এখন বরপক্ষই জোরদার পক্ষ। দুলহার চাচা তাঁর এতগুলো ছেলে নিয়ে তো রীতিমত ম্যারেজ-মার্কেট কর্ণার করবেন—এবং ঐ ধরনের আরো কত কী।

তা সে যা-ই হোক, রাত প্রায় দুটো না তিনটের সময় রফারফি হয়ে দফে দফে ম্যাক্সিমামগুলো পিন্ ডাউন্ করা হলো।

এ সভাতে দুলহার থাকার কথা নয়। সে ছিলও না। কিন্তু সামনের ঘরে তার চাচাতো ভাবীর সঙ্গে বসে আলোচনার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে তার কোনো অসুবিধা হয় নি। সে গুম্ হয়ে বসে রইল।

পরদিন অতি ভোরে ভাবীর মারফৎ সে তার আব্বাকে খবর পাঠালে, দুলহিন্ পক্ষের সব দাবীদাওয়া যেন তাঁদের চাহিদা-মাফিক মেনে নেওয়া হয়। দুলহা পক্ষের দর-কষাকষির দরুন যদি শাদী ভেস্তে যায় তবে সে স্কলারশিপ নিয়ে নাকবরাবর বিলেত চলে যাবে এবং কস্মিনকালেও এদেশে ফিরবে না। পক্ষান্তরে শাদী যদি হয়ে যায় তবে সে চাচাতো ভাইদের পরিবারের পছন্দমত জায়গায় তাদের শাদীর জিম্মাদারী এইবেলাই আপন স্কন্ধে নিচ্ছে।

প্রথমটায় তো লেগে গেল হৈহৈ রৈরৈ। কিন্তু বাপ-মা জানতেন, ছেলেটা ভয়ংকর একগুঁয়ে এবং চাচাও জানতেন তার কথার নড়চড় হয় না। ভাইদের বিয়ে সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করেছে সেটা রাখবেই। অতএব শেষটায় সেই দুই ভদ্রলোককে সর্ববাবদে আকাশে-ছোঁয়া ম্যাক্সিমামের সর্ব এখতেয়ার দেওয়া হল।

অবশ্য আপনার কেরদানি কিছু কম নয়।

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'ব্যস্, ব্যস্ হয়েছে।'

শহ্র্-ইয়ার আমার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'আহা! আপনি কেন বিরক্ত হচ্ছেন? আপনি না থাকলে আপনার ডাক্তার সাহস করে পাঁচ হাজারেরও মহ্র্ চাইতে পারতেন না। আর বরপক্ষ যে সুবোধ বালকদ্বয়ের ন্যায় আপনার সব তলব মেনে নেবে, এ তত্ত্বটা না জেনেই তো আপনি কনের জন্য বেস্ট্ টার্মস গুছিয়ে নিলেন। আচ্ছা, আমি কি বলি আর কি কই সে আপনি বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু শুনে রাখুন; ডাক্তারের ভাগ্নীবাড়িতে আপনার খ্যাতি রটেছে যে আপনি এমনই ত্রিকালজ্ঞ পীরসাহেব যে বরপক্ষের উপর এক ঝলক চোখ বোলাতে না বোলাতেই সাফসুৎরো অতিশয় পরিপাটিরূপে মালুম করে নিয়েছিলেন যে ওঁরা আপনার তলব মাত্র আপনার খেদমতে পেশ করার

জন্য সঙ্গে ফ্লাস্কে করে বাঘের দুধ নিয়ে এসেছিল।'

বললুম, আপ্যায়িত হলুম এবং আজ সন্ধ্যের গাড়িতেই আমি বোলপুর চললুম।'

শহর্-ইয়ার সেদিকে খেয়াল না দিয়ে বললে, 'কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয় নি। আমি কোন্ কথা দিয়ে আমার বয়ান আরম্ভ করেছিলুম মনে আছে?—মুসলমান মেয়ে অন্দরমহল ত্যাগ করলে তার সুবিধে-অসুবিধের কথা। এইবারে দেখুন, ডাক্তার সাহেবের ভাগ্নী যদি জনানা ত্যাগ করে কলেজ যাওয়া আরম্ভ না করতো তবে কি এরকম একটি উৎকৃষ্ট বরের নজরে পড়তো, এবং এরকম সসম্মানে তার বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারতো? ও যদি ম্যাট্রিকের পর চাচার সঙ্গে ফসাদ করে না বেরিয়ে পড়ে অন্দরমহলে বসে বসে দিন কাটাতো তবে কি তার চাচা মাথা খুঁড়েও এ-রকম একটি বর জোটাতে পারতেন?'

আমি বললুম, 'গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সেই কবে যে আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সেটা স্মরণেই আসছে না। এদিকে আবার কলকাতা আর রাঢ়ের মুসলমানদের সঙ্গেও যোগাযোগ হয় নি। তাই জানতে ইচ্ছা করে, আপনাদের ভিতরও মেয়ের জন্য বর যোগাড় করা কি একটা সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে?'

আমাদের আত্মীয়স্বজন তো নেই বললেই হয়; তবু যেটুকু খবর কানে আসে তার থেকে মনে হয়, কলকাতার মুসলমান সমাজের প্যাটার্ন ক্রমেই হিন্দু প্যাটার্নের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমান যুবকও চায়, তার স্ত্রী যেন শিক্ষিতা হয়, গানটান জানলে তো আরো ভালো, এবং সে নিজে যদি লেখা-পড়ার নাম করে থাকে তবে হয়তো মনে মনে এ-আশাও পোষণ করে যে শ্বশুর তাকে বিলেত পাঠাবে। তবে যতদূর জানি, এদের খাঁইগুলো এখনো রূঢ় কর্কশরূপে সমাজে প্রকাশ করা হয় না।'

আমি বললুম, 'সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দু সমাজ ও তার প্যাটার্ন বদলে বদলে আমাদের কাছে চলে আসছে। আমার ছেলেবেলায় হিন্দুর পণপ্রথা যতখানি নির্দয় ছিল আজ তো নিশ্চয়ই ততখানি নয়। আর 'লভ্ ম্যারেজের' সংখ্যা যতই বাড়বে, পণপ্রথা ততই বাতিল হতে থাকবে।'

শহর্-ইয়ার বললে, 'আমার কিন্তু ভারি কৌতূহল হয়, এই যে হিন্দুরা ডিভোর্স, মনোগেমি, বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার এসব আইন চালু করলো তার ফল আখেরে হিন্দু সমাজকে কি ভাবে পরিবর্তন করবে?

'গ্রামাঞ্চলে কিছুই হবে না। মনোগেমি ছাড়া আর দুটো আইন তো মুসলমানদের ছিলই। তবু আমাদের সমাজে ডিভোর্স হতো ক'টা? বাপের সম্পত্তির হিস্যে নিয়ে ক'টা মেয়ে ভাইদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়েছে? আর মনোগেমি আইন না থাকা সত্ত্বেও বাঙলা দেশের ক'টা মুসলমান ভদ্রলোক দুটো বউ পুষেছে? হিন্দুদের বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত হয়েছে প্রায় একশ বছর

আগে। ভদ্র হিন্দু সমাজে তার ফলে প্রতি বৎসর ক'টা বিধবা-বিবাহ হয় ? না, দিদি, এদেশের অদৃশ্য, অলিখিত আইন—মেয়েরা যেন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তা সে মুসলমানই হোক, আর হিন্দুই হোক।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'বোধ হয় আপনার কথাই ঠিক।'

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, 'কিন্তু যা বললুম, তার সঙ্গে আমার আরেকটা কথা যোগ না দিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা সোজা বাঙলায় এই, বলি তো অনেক কথা, কিন্তু যখনই চিন্তা করি তখনই দেখি, আমাদের সমাজ যে কোন্ দিকে চলেছে তার কোনো কিছুই অনুমান করতে পারছি না।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার সর্বশেষ মন্তব্যটি বোধ হয় শুনতে পায় নি ; দেখি, দৃষ্টি যেন দেয়ালের ভিতর দিয়ে দূর-দূরান্তর চলে গিয়েছে। হঠাৎ বললে, 'এদেশের মেয়েরা আপন পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামান্যতম প্রতিবাদ জানাবে কি করে ? তার জন্য তো আপনার ঐ শ্রীরাধাই দায়ী। বৈষ্ণব কবিরাই তো তাঁকে শত শত গানে সহিষ্ণুতার সাক্ষাৎ মূর্তিমতী প্রতিমারূপে নির্মাণ করে তুলেছেন। কৃষ্ণ তাঁর প্রতি যে অবিচার করে চলে গেলেন তাই নিয়ে তাঁর রোদনক্রন্দন হাহাকার আছে শত শত গানে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা বিদ্রোহ, অভিসম্পাত না হয় বাদই দিলুম, আছে কি কোনোখানে ? উল্টে তিনি তো বসে রইলেন গালে হাত দিয়ে ঠাকুরের প্রতীক্ষায়। যদি তিনি কোনোদিন ফিরে আসেন ! এই শ্রীরাধাই তো হলেন আমাদের হিন্দু প্রতিবেশিনীর আদর্শ !'

শহ্‌র্‌-ইয়ার গরম। অবশ্য মাত্রাধিক নয়।

আমি বললুম, 'সুন্দরী, আপনি এখন যা বললেন তার উত্তরে আমাকে একখানা পূর্ণাঙ্গ থীসিস ঝাড়তে হয়। অতিশয় সংক্ষেপে উত্তর দি।

ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবদের অন্ধকার যুগে—জাহিলীয়ায়—অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য রচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সে কাব্যে ইসলামের একেশ্বরবাদ তো নেইই, যা আছে সে-সব জিনিস কেউ বিশ্বাস করলে তাকে আর মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে না, অথচ এসব কাব্য পড়েন শিক্ষিত আরব মাত্রই—তা সে তিনি ধার্মিক মৌলানাই হোন, আর সাদামাটা কাব্য-রসিকই হোন—কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যরূপে, অতি অবশ্যই তার থেকে ধর্মানুপ্রেরণা পাবার জন্য নয়। তাই আমার তাজ্জব লাগে, যখন এদেশের গোঁড়ারা আপত্তি তোলেন কোনো মুসলমান বালক বাঙলা সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য পড়লে। মধ্যযুগের একাধিক মুসলিম কবি বাণী-বন্দনা দিয়ে তাঁদের কাব্য রচনার গোড়াপত্তন করেছেন। অথচ কাব্যের গভীরে

প্রবেশ করলেই দেখা যায়, এঁদের প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের মূল সরল নীতি বাঙলার মাধ্যমে প্রচার করা। আরেকটা উদাহরণ নিন। পরধর্ম বাবদে খৃষ্টান মিশনারিরা যে অত্যধিক সহিষ্ণু এ-কথা তাঁদের পরম শত্রুরাও বলবে না। অথচ এঁদের অধিকাংশই গ্রীক শেখার সময়—ঐ ভাষাটি না শিখে নিউ টেস্টামেণ্ট মূলে পড়ার উপায় নেই—বিস্তর দেবদেবীতে ভর্তি প্রাক-খৃষ্ট গ্রীকসাহিত্য গভীরতম শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েন। হাতের কাছের আর একটা উদাহরণ নিন। ইরাণে ইসলাম আগমনের পূর্বে যেসব রাজা, বীর, প্রেমিক-প্রেমিকার কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল, সেগুলো নিয়ে মুসলমান ফিরদৌসী লিখলেন তাঁর মহাকাব্য 'শাহনামা'—সে কাব্য পড়েন না কোন্ মৌলানা ?

আপনি হয়তো বলবেন, পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গবিশেষ ; অতএব সে সাহিত্য থেকে হিন্দু তার জীবনাদর্শ গ্রহণ করেন। উত্তম প্রস্তাব। আপনি ভাবছেন বাঙলার হিন্দু রমণী শ্রীরাধার কাছ থেকে তার সহিষ্ণুতা শিখেছে। কিন্তু কই, সে তো তারই অনুকরণে আপন স্বামী ত্যাগ করে অন্য পুরুষে হৃদয় দান করে না। এদেশের কোনো মেয়েরই প্রশংসা করতে হলে আমরা সর্বপ্রথমই বলি, আহা, কী সতীলক্ষ্মী মেয়েটি !'

অবশ্য এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব যোগ না করলে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অনেকেই রূপক রূপে গ্রহণ করেন। রাধা মানবাত্মার প্রতীক। কৃষ্ণ পরমাত্মার। কৃষ্ণমিলনের জন্য রাধার হাহাকার আর পরমাত্মার কামনায় মানবাত্মার হাহাকার একই ক্রন্দন।

সূফীদের ভিতরেও ঐ জিনিসটি আছে। আপনি পাঁচজন মৌলানাকে জিজ্ঞেস করলে তার অন্তত চারজন বলবেন, হাফিজ যেখানে মদ্যপানের উল্লেখ করছেন সে মদ্য মদ্য নয়। সে মদ্য আল্লার প্রতি মহব্বৎ—ভগবদ্‌প্রেম। যে সাকী মদ্য বিতরণ করেন তিনি মুর্শীদ অর্থাৎ গুরু। তিনি শিষ্যকে মদ্যপানে আসক্ত করান—গূঢ়ার্থে আল্লার প্রেমে অচৈতন্য হতে, সেই চরম সত্তা পরমাত্মায় আপনা সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন করে দিতে শিক্ষা দেন।

পার্থিব প্রেমকে আধ্যাত্মিক প্রেমের স্তরে নিয়ে যাবার জন্য খৃষ্টান এবং ইহুদি মিস্টিক—রহস্যবাদী—ভক্তও ঐ প্রতীকের শরণাপন্ন হন।

কিন্তু আপনি আমি—আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা কাব্য পড়ি কাব্য-রসের জন্য। আর কোনোদিন যদি আপনার ধর্মানুরাগ নিবিড়তর হয় তবে আপনার ভাবনা কি ? আপনার ঘরেই তো দেখলুম ইমাম গজ্জালীর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' বাঙলা অনুবাদে।'

বারো

পরিপূর্ণ সুখশান্তির উপর অকস্মাৎ কী ভাবে বজ্রপাত হয়—এই আমার বিকটতম অভিজ্ঞতা।

ইতিমধ্যে আমি অভিমন্যুকে হার মানিয়ে, শহ্‌রু-ইয়ার ও ডাক্তার নির্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করে মোকামে ফিরে এসেছি।

আবার সেই খাড়াবড়ি-উচ্ছেতে যখন অধরোষ্ঠ পরিপূর্ণ বিতিক্ত তখন হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলুম, ডাক্তার পরিবার আমাকে যেন 'কট্' করেছে। আমি পর পর দু'খানা চিঠি লিখলুম শহ্‌রু-ইয়ারকে। কোনো উত্তর পেলুম না। এ যে নিদারুণ অবিশ্বাস্য! তখন লিখলুম ডাক্তারকে। অবিশ্বাস্যের তারতম্য হয়? হয়। এ যেন আরো অবিশ্বাস্য! এ যেন সেই প্রাচীন যুগের টেলিফোনে 'নো রিপ্লাই মিস্?'

আমি কি হীন, নীচ! যাক্ গে চুলোয়। বলে যেই বারান্দায় বেড়িয়েছি, দেখি, দূর থেকে মাঠ ঠেঙ্গিয়ে আসছে ডাক্তার। আর তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে যাচ্ছে আমার আলসেশিয়ান 'মাস্টার' তার রিজার্ভ স্পীডও ছেড়ে দিয়ে।

আমি বারান্দা ছেড়ে যেই রোদ্দুরে নামতে যাচ্ছি এমন সময় লক্ষ্য করলুম, দূর থেকে ডাক্তার হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে, আমি যেন অযথা এই কড়া রোদ্দুরে না নামি।

ডাক্তার পৌঁছল। লগেজ দূরের কথা, হাতে একটি এটাচি পর্যন্ত নেই।

এ-বাড়ির কর্তা দিলবরজান—কুক্-শেফ্-মেজরডমো—দুই মিনিটের ভিতর বালতি করে জল সাবান গামছা ধুঁদুল ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখলো। ডাক্তার তার আপন-জন। মনে নেই, কখন কোন্ বারে সে দিলবরের কোন্ এক মাসীকে বাঁচিয়ে দ্যায়!

ডাক্তারের চুল উস্কোখুস্কো। হাত দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। কপালে ঘামের ফোঁটা।

শুধু দেহের দিক দিয়ে, এ ধরনের অপ্রমত্ত, শান্তসমাহিতচিত্ত লোকও যে রাতারাতি হঠাৎ মৃগী রুগীর মত চেহারা ধারণ করতে পারে, এ যেন সুফী-সাধুর অকস্মাৎ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পেয়ে নীরব আর্তনাদ!

আমি এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম যে তাঁকে কুশল প্রশ্নও শুধোতে পারলুম না। কিংবা হয়তো আমার মগ্নচৈতন্য তার অতল থেকে কোনো প্রকারে প্রতিক্রিয়া আমার চৈতন্যলোকে পাঠাতে সম্মত হলো না। আর কুশল প্রশ্ন শুধোবই বা কি? যা দেখছি সে তো জড়ভরতও লক্ষ্য করতো। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আল্লা যেন হঠাৎ আমাকে আদেশ দিলেন। দিলবরজানকে বললুম, 'এখানে না। ওঁকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে চান করিয়ে, তাজা জামাকাপড় পরিয়ে নিয়ে আয়।'

যে ডাক্তার কারো কোনো প্রকারের সাহায্য নিতে সদাই কুণ্ঠিত, বিব্রত—বিদ্রোহী পর্যন্ত বলা চলে—সেই ডাক্তার কলের পুতুলের মত দিলবরের পিছনে পিছনে চলে গেল।

আমি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে শুধালুম—কি করে শুধালুম জানিনে—'শহর্-ইয়ার ?'

যেন পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে উত্তর এল, ভালো আছে। না, ভুল বললুম। শুধু ঘাড় নাড়িয়ে ঐ সংবাদটুকু দিলে।

তাহলে কি হয়েছে ?

এরপর তাকে খাওয়াবার চেষ্টা, শোওয়াবার চেষ্টা, কথা বলাবার চেষ্টা—এসব নিষ্ফল প্রচেষ্টার পীড়াদায়ক বর্ণনা দিয়ে কে কাকে পীড়া দিতে চায় !

কোথা থেকে মানুষ কখন কি অনুপ্রেরণা পায় কে জানে ? দিলবরকে বললুম, 'যাও, রিকশা নিয়ে এসো। আমরা কলকাতা যাচ্ছি। আর ডাক্তারের কোট-পাতলুন আমার সুটকেসেই ভরে দাও।' এ লোকটাকে আবার কাপড় ছাড়ানো—সে তো হবে আলট্রামডার্ন সোসাইটি লেডির রুগ্ন বাচ্চাকে সায়েবী কায়দায় বেকার পাঁচবার কাপড় বদলানো।

আমি অন্ধভাবে বুঝতে পেরেছি, এখানে ডাক্তারকে আটকে রেখে কোনো লাভ নেই। যা হবার হবে কলকাতায়। ডাক্তারের জীবন বলতে বোঝায় তার দুটি শ্বাস-প্রশ্বাস—তার শহর্-ইয়ার আর তার রিসার্চ। এবং যেহেতু শহর্-ইয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আসে নি, অতএব নিশ্চয়ই সে-ই। তার যে ডাক্তার ঘাড় নেড়ে জানালে সে ঠিক আছে—ও, না, সে তো আমার অনুমান।

সঙ্গে নিলুম ইমাম গজ্জালীর কিমিয়া আর হুজবেরীর কশ্ফ্-অল্-মহজুব।

রিকশাতে উঠে ইচ্ছে করেই আরম্ভ করলুম, বকর-বকর। কিন্তু সেটা মোটেই সহজ কর্ম হয় নি। আর সহজ কঠিন যাই হোক, ফল হল সম্পূর্ণ বেকার। এ যেন ধুঁয়োর সঙ্গে কুয়াশার লড়াই। এমন কি তাতে করে ধুঁয়াশাও তৈরী হল না।

ডাক্তার আচারনিষ্ঠ মুসলিম। তাই আরম্ভ করলুম ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যেন কিছুটা আত্মচিন্তা কিছুটা বক্তৃতা। একটা বিশেষ মতলব নিয়ে।

বললুম, 'আপনি তো ইমাম গজ্জালীর ভক্ত। তাঁর জীবনটাও ভারী অদ্ভুত। তিনি ছিলেন বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির—যে আমলে কি না, হয়তো এক চীন ছাড়া অন্য কোথাও ঐ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' জুড়ি ছিল না—আমি অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যাপীঠের সমন্বয়কে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থে ধরছি না। একে তো

সর্বজনমান্য রেক্টর, তদুপরি শাস্ত্রীরূপে তিনি মুসলিম জগতে সর্বপ্রখ্যাত। রাজদত্ত অত্যুত্তম পোশাক পরিধান করে যেতেন রাজদরবারেও।

হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল গেল, এ সব তাবৎ কর্ম অর্থহীন—বর্বরস্য শক্তিক্ষয়—ভ্যানিটি অব্‌ ভ্যানিটিস, অল্‌ ইজ ভ্যানিটি, বাইবেলের ভাষায়। সেই রাত্রেই মাত্র একখানা কম্বল নিয়ে বাগদাদ থেকে অন্তর্ধান। পেঁছিলেন গিয়ে সিরিয়ার দমশকশে—আশ্রয় নিলেন মসজিদে, ছদ্মনামে। সেই মসজিদের ইমাম ছিলেন উচ্চস্তরের পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গে একদিন শাস্ত্রালোচনা হতে হতে সেই পণ্ডিত বললেন, 'এ আবার আপনি কি বলছেন! স্বয়ং ইমাম গজ্জালীর মত সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলেছেন ঠিক তার বিপরীত বাক্যটি!'

গজ্জালী ভাবলেন, আর এ-স্থলে থাকা নয়। কোন্‌ দিন এরা জেনে যাবে আমার প্রকৃত পরিচয়। আর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে আমার ধ্যানধারণার সর্ব অবসর।

সেই রাত্রেই অন্তর্ধান করলেন বয়তুল্‌ মুকদ্দস—জেরুজালেমের দিকে। সেখান থেকে গেলেন ইহুদি, আরব, খৃস্টান তিন কুলের পূর্বপুরুষ হজরত ইব্রাহিমের পুণ্য সমাধি দর্শন করে অশেষ পুণ্যলাভার্থে। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যে রকম পুণ্যতীর্থে দেবতাকে কোনো কিছু প্রিয় খাদ্য বা অন্য-কিছু দান করে, ঠিক সেই রকম ইব্রাহিমের মোকামে মুসলমানরা একটা বা একাধিক শপথ নেয়। ইমাম নিলেন তিনটি। তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, 'এ জীবনে আমি কোনো বিতর্কমূলক বাক্য (কন্‌ট্রভার্সিয়াল) উত্থাপন করবো না।'

এখানে এসে আমি চুপ করে গেলুম। স্বেচ্ছায় এবং অতিশয় কূট উদ্দেশ্য নিয়ে।

জয় হোক ভারতীয় রেলের! শতম্‌ জীব, সহস্রং জীব—ভারতীয় রেলের কর্মকর্তাগণ!

বোলপুর স্টেশন আমাকে দু'খানা ফাস্ট ক্লাস টিকিট বেচলে।

দার্জিলিং মেল পেঁছিল—এই অতি সামান্য নস্যবৎ—দু'ঘণ্টা লেটে, যাকে বলে 'বিলম্বিত গাড়ীয়াঁদের' একটি হয়ে। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস সব ক'টা কামরা যে দার্জিলিং থেকেই প্রতি আউন্‌স্‌ ভর্তি, সে খবর না জেনে—খুব সম্ভব জেনেই—বোলপুর স্টেশন টিকিট বেচেছে। দার্জিলিঙের ক'গণ্ডা মেয়ে-ইস্কুলের ছুটি হয়েছে জানি নে—নীলে নীলে উর্দিপরা মেয়েরা কাঁঠাল-বোঝাই করে ফেলেছে সব ক'টা কামরা।

সে দুঃস্বপ্ন আজ আর আমার নেই—কি করে কোন্‌ কামরায় উঠেছিলুম। খুব সম্ভব ক্যাটল্‌ ট্রাকে, কিংবা হয়তো এঞ্জিনের ফারনেসে। এক দিক দিয়ে ভালোই হল। সে সংকটময় অভিযানে দুজনা দুই কোণে ছিটকে পড়েছি। ডাক্তারের মনটাকে পুনরায় সজীব করার গুরুভার থেকে রেহাই পেলুম বটে,

কিন্তু আমার মনটা ক্রমেই নির্জীব হতে লাগলো।

দিলবরকে বলেছিলুম কলকাতায় ট্রাঙ্ক-কল্ করতে। ডাক্তারদের সেই প্রাচীন দিনের গাড়িটা এত দিনে আমার বড় প্যারা হয়ে গিয়েছিল। সেও স্টেশনে আসে নি। দুঃখের দিনে নির্জীব প্রাণীও প্রিয়জনকে ত্যাগ করে বলেই কবি হাহাকার করেছেন—

তঙ্গ দস্তীমে কৌন্ কিসকা সাথ দেতা হৈ
কি তারিকী মেঁ সায়া ভী জুদা হোতা হৈ ইন্সাঁসে।

দুর্দিনে বলো, কোথা সে সুজন হেথা তব সাথী হয় ?
আঁধার ঘনালে আপন ছায়াটি সেও, হেরো, হয় লয় ॥

অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। যে পুরো সম্পূর্ণ ফাঁকা উইংটি ঠাকুর্দাদের স্মরণে ডাক্তারের আদেশানুযায়ী চিরন্তন দেয়ালি উৎসব করতো সেটিও অন্ধকার। আমি আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। স্পষ্ট বোঝা গেল বেয়ারাই সেটা গোছগাছ করেছে। শহ্‌রু-ইয়ার কোথায় ? কে জানে ? আমি শুধালুম না। ডাক্তার বললেন, তিনি খাবেন না। ট্রেনের ভিড়ে সন্ধ্যায় নামাজ পড়তে পারেন নি। এখন এষার নামাজ পড়ে ঘুমুবেন। কিন্তু শহ্‌রু-ইয়ার কোথায়, যার পরম পরিতৃপ্তি ছিল স্বহস্তে তাঁর নামাজের ব্যবস্থা করে দেবার ?

আমি স্থির করলুম, ডাক্তার যতক্ষণ না নিজের থেকে কথা পাড়ে আমি কিছু শুধোবো না।

বিছানায় শুয়ে বই পড়ছি। এমন সময় আমার প্যারা বেয়ারা—শহ্‌রু-ইয়ারেরও—ঘরে ঢুকলো। অন্য সময় তার মুখে হাসিই লেগে থাকতো, আজ সে যন্ত্রের মত তার নৈমিত্তিক কর্তব্যগুলো করে যেতে লাগলো।

আমি খুব ভালো করেই জানি গৃহস্থের পারিবারিক ব্যাপার কারকুন-কর্মচারী সহচর-সেবকদের শুধোতে নেই, তবু বড় দুঃখে মনে পড়লো শহ্‌রু-ইয়ার দিলবরজানকে আমার আচার-অভ্যাস সম্বন্ধে একদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধিয়েছিল, যাতে করে আমি তাদের কলকাতার বাড়িতে এলে আমার কোনো অসুবিধা না হয়।

তবু দ্বিধাভরা মনে জমীল শেখকে শুধালুম, 'আমাদের ট্রাঙ্ক-কল সময়মত পৌঁছয় নি ?'

'জী হাঁ, সে তো সন্ধ্যা সাতটার সময়ই। আমিই ধরেছিলুম।'

'তবে ?'

প্রশ্নটার তাৎপর্য ঠিক বুঝেছে। বললে, 'মা জী বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তো দুপুরবেলাই গাড়ি নিয়ে তাঁর পীর সাহেবের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, আমি—'

শহ্‌রু-ইয়ারের পীর ! বলে কি ! হাবার মত শুধালুম, 'পীর !'

জমীল ঘাড় ফিরিয়ে যেন অতি অনিচ্ছায় অত্যন্ত আফসোস করে আস্তে আস্তে বললে, 'সেখানেই তো প্রায় সমস্ত দিন কাটান।' তারপর যতদূর সম্ভব আদব-ইনসানিয়ৎ বাঁচিয়ে, 'সালাম হুজুর, গরীবের বেয়াদবী মাফ করবেন' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আল্লার কসম খেয়ে বলছি, জমীল যদি বলতো, শহ্‌র্‌-ইয়ার আত্মহত্যা করেছে তা হলেও আমি এরকম বুড়বক্ বনে যেতুম না! শহ্‌র্‌-ইয়ার পীর ধরেছে! এ যে বাতুলের বাতুলতার চেয়েও অবিশ্বাস্য। সাধারণতম মুসলমান মেয়েরও নামাজ-রোজার প্রতি যেটুকু টান থাকে সেটুকুকেও ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিলেও যেটুকু থাকার সম্ভাবনা তাও তো আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথাবার্তা চাল-চলনে কখনো দেখি নি। সে নিজেই আমাকে একাধিকবার বলেছে, তার দিল্, তার জান্, তার সব কিছুর এমারৎ দাঁড়িয়ে আছে—চৌষট খাম্বার উপর নয় রবীন্দ্রনাথের তিন হাজার গানের তিন হাজার স্তম্ভের উপর। সেখানে গুরুবাদই বা কোথায়, আর পীর সাহেব তো সেই হাজারো স্তম্ভের কোনো একটার পলস্তরা পর্যন্ত নন।

আর এই রমণীর মণি মমতার খনি—সে তো কিছু পাগলা গারদের ইমবে-সাইল নয় যে চায়ের কাপে জল ভরে, পেন্সিলের ডগায় সুতো-বঁড়শি লাগিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করবে! গুরু বুঝি তা হলে চায়ের কাপ্, আর শহ্‌র্‌-ইয়ারের ভক্তি সেই পেন্সিলের বঁড়শি! তাই দিয়ে সে ধরবে ভগবদ্-প্রেম, নজাৎ-মোক্ষ!

তাও বুঝতুম যদি তার বাউলদের দেহতত্ত্ব গীতে, লালন ফকীরের রহস্যবাদ-মারিফতী জনপদসঙ্গীতের প্রতি মমতা থাকতো! এমন কি এই যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত, বাউল-গান—তার প্রতিও শহ্‌র্‌-ইয়ারের বিশেষ কোনো মোহ নেই—সে-কথাও তো সে আমাকে স্পষ্ট বলেছে!

খাটে শুয়ে, বই হাতে নিয়ে পড়ছি, পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি—তার এক বর্ণও মাথায় ঢুকছে না; ভাবছি শুধু শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথা, যাকে আল্লা মেহের-বাণী করে আমার কাছে এনে দিলেন, যে আমার বোনের চেয়েও বোন, প্রিয়ার চেয়েও প্রিয়া!

রাত তখন এগারোটা। শহ্‌র্‌-ইয়ার ঘরে ঢুকলো।

তাকে কি ভাবে দেখব, সে নিয়ে আমার মনে তোলপাড় হচ্ছিল যখন থেকে শুনতে পেয়েছি, সে 'গুরু লাভ' করেছে।

যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে। শুধু পূর্বেকার মত যখন খাটের পৈথানে এসে খাড়া কাঠের টুকরো ধরে দাঁড়ালো তখন স্পষ্ট লক্ষ্য করলুম, চোখ দুটোর উপর যেন অতি হাল্কা স্বচ্ছ দুখানা ফিলমের মত কি রকম যেন কুয়াশা-কুয়াশার মত আবরণ। এ জিনিসটে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কারণ কুয়াশাভাব থাকা সত্ত্বেও তাতে রয়েছে কেমন যেন একটা বিভ্রান্ত দ্যোতি।

পীর-ভক্ত হওয়ার পূর্বে শহর্-ইয়ারের হার্দিক ও দৈহিক সৌন্দর্য একদিনে আমার কাছে স্বপ্রকাশ হয় নি। তার হাসি তার গান, দূরে থেকে দেখা তার আপন মনে মনে একা একা তালসারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে ভ্রমণ, আমার বাড়ির দেড়তলাতে তার আবাস নির্মাণ, মুসলমান রমণীর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তার অভিমান —তার আরো কত শত আহারশয্যাসনভোজন, কত কিছুর ভিতর দিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। দিনে দিনে সে আমার কাছে সুন্দরের চেয়ে সুন্দর, মধুরের চেয়ে মধুর হয়ে বিভাসিত হয়েছে।

আর আজ? আজ থেকে আবার তাকে নূতন করে চিনতে হবে। এ যদি একেবারে নূতন মানুষ হতো তবে তো কোনো ভাবনাই ছিল না। নূতন মানুষের সঙ্গে তো আমাদের জীবনভর পরিচয় হয়। কোনো পুরনো মানুষকে আবার নূতন করে চেনা? সামান্য লেখক হিসেবে বলতে পারি: নূতন লেখা তো দু'দিন অন্তর-অন্তরই লিখতে হয়, কিন্তু কোনো একটা লেখা যদি হারিয়ে যায় এবং সেইটেই আবার নূতন করে লিখতে হয়, তখন যা যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যেতে হয় সে-তত্ত্বটা শুধোন গিয়ে—আমাকে না—খ্যাতনামা লেখকদের।

এর চেয়েও সোজা উদাহরণ দি। আপনি রইলেন পড়ে দেশে। বন্ধু বিলেত থেকে ফিরলেন পাঁচ বছর পরে। তার সঙ্গে ফের বন্ধুত্ব জমাতে গিয়ে খান নি মার?

আশ্চর্য! এখনো শুধোলে না, আমার কোনো অসুবিধা হয় নি তো, খাওয়া-দাওয়া কি রকম হয়েছে—কিছুই না। না, আমি আশ্চর্য হই নি। আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পেরেছি।

আমি স্থির করেছি আমি কোনো ফরিয়াদ করবো না—চিঠির উত্তর দিলে না কেন, আপন হাতে প্রত্যেকটি জিনিস বেছে বেছে—বহুৎ কিছু কলকাতা থেকে সঙ্গে এনে—আমার বাড়ির দেড়তলাতে যে তোমার বাড়ি বানালে সেটা এরকম ছেঁড়া চটিজুতোর মত না বলে না কয়ে হঠাৎ এরকম উৎখাত করে দিলে কেন; না না, কিছু শুধোবো না। আমি ভাবখানা করবো, সে হঠাৎ যেন কোনো এতিমখানা বা নাইট ইস্কুলে এমনই মেতে গিয়েছিল যে আমার তত্ত্বতাবাশ করতে পারে নি। সমস্তটা সহজ ভাবেই গ্রহণ করবো। কিন্তু হায়, সহজ হওয়া কি এতই সহজ? সহজিয়া ধর্মের মূল মন্ত্র 'সহজ হবি, সহজ হবি'—সেটা যদি অতই সহজ হবে তবে বিশ্বসংসারের তাবৎ ধার্মিক অধার্মিক সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ঐ ধর্মই গ্রহণ করলো না কেন?

ওদিকে হৃদয় ভরে আসে অভিমানের বেদনায়।

এ-রমণীর সঙ্গে যদি আমার সম্পর্ক প্রণয়ের হতো তবে তার আজকের অবহেলা আমার হৃদয়ে অন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। প্রেম তো পূর্ণচন্দ্র। তাই তার চন্দ্রগ্রহণও হয়। কিন্তু বন্ধুত্বও শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার মত রাতে রাতে

বাড়ে এবং চতুর্দশীতে এসে থামে। পূর্ণিমাতে পৌঁছয় না। তাই তার গ্রহণ নেই, ক্ষয়ও নেই, কৃষ্ণপক্ষও নেই। তবে আমাদের বন্ধুত্বের উপর এ কিসের করাল ছায়া!

কিন্তু অতশত চিন্তা করার পূর্বেই প্রাচীন দিনের অভ্যাসমত মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কি পড়ছো, আজকাল?' ঐটেই ছিল আমাদের প্রিয় অবতরণিকা —যা দিয়ে 'মুখবন্ধ' নয়, মুখ খোলা হতো।

বললুম, 'বসো।'

কেমন যেন সংকোচের সঙ্গে খাটের বাজুতে বসলো।

এই মেয়েই না একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পদসেবা করতে চেয়েছিল।

তবে কি পীরের মানা—গুরুর বারণ—পরপুরুষস্পর্শ বিষবৎ বর্জনীয়?

নিকুচি, নিকুচি। পীরের গুষ্টি আর গুরুর দঙ্গল!

'অভিমানের বদলেতে নেব তোমার মালা' এ-সব মরমিয়া মাল আমার তরে নয়। আমার হল রাগ। এই নিষ্পাপ শিশুটিকে কে শেখালে এইসব কাল্পনিক পাপ? কে সে পীর? তাকে একবার দেখে নিতে হবে। কিন্তু পীরের নিকুচি যতই করি না কেন, আমার ঠাকুরদা থেকে ঊর্ধ্বতম ক'পুরুষ যে পীর ছিলেন সে তত্ত্ব অদ্যাপিও বিলক্ষণ অবগত আছে তরফ্ পরগণার কিছু কিছু চাষাভূষো, মোল্লামুনশী। এরা বংশানুক্রমে আমাদের পরিবারের শিষ্য। কিন্তু আমার পিতা এবং আমার অগ্রজেরা পীর হতে রাজী হলেন না বলে এদের অধিকাংশই অন্য পীরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু গুরুভক্তি শুধু গুরুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সে-ভক্তি গুরুর বংশধরগণকেও নিষ্কৃতি দেয় না; তাই এদের কয়েকটি পরিবার অন্য পীর বরণ না করে দু'তিন পুরুষ ধরে অবিশ্বাস্য ধৈর্য ধরে বসে আছে, আমার দাদাদের বা আমার বেটা-নাতি যদি সদয় হয়ে কোনো এক দিন এদের বেটা-নাতিদের শাগিদ-(সাকরেদ) রূপে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে-পীর বাঙলাদেশে এসে আমাদের বংশ স্থাপনা করেন তাঁর দর্গাতে এই সব প্রতীক্ষমাণ সাকরেদরা শির্ণী চড়াচ্ছে, ফুল সাজাচ্ছে, মানত মানছে।

মাত্র এই দু'পুরুষ—আমার পিতা আর আমরা তিন ভাই—পীর হতে রাজী হই নি। তাই বলে চোদ্দপুরুষ যে-সব ধ্যানধারণা করেছে, সাকরেদদের দীক্ষা দিয়েছে, ধর্মপথে চালিয়েছে সেটা কি দু'পুরুষেই আমার রক্ত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? হাঁসকে দুপুরুষ খাঁচায় বন্ধ রাখার পর তৃতীয় পুরুষের বাচ্চাদের জলে ছেড়ে দিলে কি তারা সাঁতার না কাটতে পেরে পাথর-বাটির মত জলে ডুবে মরবে!

এই তো মাত্র দু'তিন বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ আমার উপর হামলা করে অনুরোধ—আদেশও বলতে পারেন—করলেন, পৌষমেলা ও সমাবর্তন উৎসবের প্রাক্কালে যে সাম্বৎসরিক উপাসনা করা হয় তাতে আচার্যের

আসন গ্রহণ করতে। আমি সাতিশয় সবিনয় সবিস্তর অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলুম। ও'দের বলি নি কিন্তু আমি মনে মনে জানি এসব কর্ম ক'রে পুরুত-মোল্লারা পেটের অন্ন জোটায়—অবশ্য এ-স্থলে এ'রা আমাকে একটি কানাকড়িও দেবেন না, সে-কথা আমি বিলক্ষণ অবগত ছিলুম। আবার এ তথ্যও তো জানি যে, বিপদে-আপদে কাছেপিঠে নিতান্তই কোনো মোল্লা-মুনশী ছিল না বলে আমার পিতৃ-পুরুষ এ-সব ক্রিয়াকর্ম কালেকস্মিনে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমাধান করেছেন। পূর্বেই বলেছি, তবুও আমি আপত্তি জানিয়েছিলুম। তখন কর্তৃপক্ষ তাঁদের আখেরী মোক্ষম বজ্রবাণ ছেড়ে বললেন, আমারই উপর ভরসা করে তাঁরা অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নি ; এই শেষ মুহূর্তে অন্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার সন্দেহপিচেশ মন অনুমান করলো, অন্য কোনো ডাঙর্ চাঁইকে হয়তো কর্তারা কাবু করে রেখেছিলেন এবং তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে খবর পাঠিয়ে কত্তাদের সমূহ বিপদে ফেলেছেন। বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে ধরে খায়। তাই এসেছেন অধমের কাছে। অবশ্য এনারা শয়তান নন, আম্মো মাছি নই। আমি শুধু রিলেটিভিটি সিম্প্লিফাইড থ্রু প্রভার্ব বোঝাবার জন্য এই প্রবাদটি উদ্ধৃত করলুম।

তখন অবশ্য আমি তিন কবুল পড়ে মুসলমান যে-রকম বিয়ে করে সে-রকম ধারা আমার সম্মতি দিলুম।

এটা, আমার 'পীরত্ব' প্রমাণ করার জন্য শহর্-ইয়ারকে বলবোই বলবো। সে কোন্ দম্ভভরে চিত্তপ্রসাদ অনুভব করছে যে তার পীরই ইহলোক পরলোকের একমাত্র পীর! আমি সপ্রমাণ করে ছাড়বো, বেলাভূমিতে তাঁর পীরই একমাত্র নুড়ি নন, আরো 'বিস্তরে বিস্তর' আছে, এবং আমি তো রীতিমত একটা বোল্ডার—এ্যাব্বড়া পাথরের চাঁই।

অবশ্য সেও ধুরন্ধরী। সে যদি শুধোয়, শান্তিনিকেতনে আচার্যের কর্ম আমি কিভাবে সমাধান করলুম তখন আমি কিচ্ছুটি না বলে সাক্ষী মানবো কলকাতার একখানি অতি প্রখ্যাত দৈনিকের সম্পাদক মহাশয়কে। তিনি সে-উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন।

গতানুগতিক সাধারণ অবস্থায় আমি আত্মচিন্তার জন্য এতখানি ফুরসৎ পেতুম না। ইতিমধ্যে শহর্-ইয়ারের সফেন বুদ্বুদিত চিত্ত কথায় কথায় বক-বকানিতে ফেটে পড়তো। কিংবা তিনখানা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে ফেলত—তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রত্যেকটি অসমাপ্ত রেখে।

এমন কি, এদানির সে কি পড়ছে, আমার সেই প্রথম প্রশ্নের উত্তরও এ-তাবৎ সে দেয় নি।

আমি বললুম, 'জানো, শহর্-ইয়ার, আমার চতুর্দশ পুরুষ কিংবা ততোধিক ছিলেন পীর—সূফী?'

এতক্ষণ অবধি শহ্‌র্‌-ইয়ার ছিল আপন মনের গভীর গহনে আত্মচিন্তায় নিমগ্না। "পীর", "সূফী" এ-দুটি শব্দ তার কানে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো। তার নিষ্প্রভ, কুয়াশা-মাখা চোখ দুটি সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দিনের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফুটলো যেন হোঁচট খেতে খেতে।

শুধলো, 'সে—সে—সে কি? আপনি—আপনি—আপনি তো আমাকে কখনো বলেন নি। কি বললেন?—সূফী?'

আমি তন্মুহূর্তেই বুঝে গেলুম, শহ্‌র্‌-ইয়ারের পীর তাকে সূফীমার্গে দীক্ষিত করেছেন। কিংবা চেষ্টা করেছেন।

আমি কিন্তু অত সহজে ধরা দেব না। তুমি কি আমার কানু যে, বাঁশী শুনেই উদোম হয়ে ছুটবো!

আমি প্রাচীন দিনের চটুলতা আনবার ভান করে বললুম, 'তা, আমি তো কখনো বলি নি—তুমিও শুধোও নি—আমি প্রথম যৌবনে ক'বার প্রেমে পড়েছিলুম, তুমি তো কখনো শুধোও নি—'

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করে মনে মনে কিছুটা তৃপ্তি পেলুম। শহ্‌র্‌-ইয়ারের গুরু তাকে অজগরের মত আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরতে পারেন নি। নইলে অন্য গরু অন্য সূফী সম্বন্ধে সে কণামাত্র কৌতূহল দেখাতো না। বরঞ্চ এ-স্থলে কুরুচিরা মাত্রই অন্য গুরুর কথা উঠলেই তাকে নস্যাৎ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রাচীন দিনের আপ্তবাক্য মনে এল—অন্যের পিতার নিন্দাবাদ না করেও আপন পিতার প্রশংসা করা যায়।

ওদিকে দেখি, শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর এই সর্বপ্রথম দেখলুম, আমার 'রসিকতা' প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার সদাশান্ত ভালের এক প্রান্তে, আঁখিকোণে যেন সামান্যতম অসহিষ্ণুতার ভ্রূকুঞ্চন পরশ লাগিয়ে চলে গেল।

আর দুঃখ হল এই দেখে যে, যে-শহর্‌-ইয়ার আমার ভোঁতা রসিকতাতেও একটুখানি সদয় স্মিতহাস্য করতো—দু'একবার বলেওছে, "এটা কিন্তু জুৎসই হল না"—সে আজ রসিকতার পুকুরে (মানছি, ঘোলা জলের এঁদোপুকুরে) যেন সাক্ষাৎ পরমহংসিনী হয়ে গিয়েছেন!

এ-অভিজ্ঞতা আমার বহুকালের। যে-কোনো-কিছুতেই মানুষ মজে গিয়ে সিরিয়স হলেই সবচেয়ে সর্বপ্রথম তার লোপ পায় রসবোধ। এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ প্রেমের বেলা। রসে টইটম্বুর পাড়ার সুকুমার যখন প্রথম প্রেমে পড়ে—ইংরিজিতে যাকে বলে 'কাফ লভ্‌'—তখন তাকে যদি আপনি কোনো কিছু না জেনেশুনে নিতান্ত হার্মলেসলি শুধোন 'কি হে মুখখানা এত শুকনো কেন?' সে তখন সেই কাঠিয়াওয়াড়ি চাষার মত তেড়ে বলবে, শুখ্‌-শুখ্‌কে

লকড়ি বন্ জাউংগা—তেরা ক্যা শালা।'

ধর্মরাজ্যে আমাদের অখণ্ডসৌভাগ্যবতী খাজিস্তে-বানু মুসম্মৎ বেগম শহর্-ইয়ার—আল্লা তাঁর শান্-শওকৎ লুৎফ্-নজাবৎ হাজার চন্দ্ বাড়িয়ে দিন!—কোন্ গৌরীশংকরের শীর্ষদেশে তথাগতা হয়েছেন সে জানেন তাঁর অধুনালব্ধ পীর সাহেব; আমার কিন্তু এ তত্ত্ব বিলক্ষণ মালুম হচ্ছে, বীবীজান তাঁর স্বামী এস্তেক বাড়ির খানসামা-বাবুরচি এবং আর পাঁচজনের লবেজান করে এনেছেন তো বটেই, আমার সঙ্গে তাঁর যে রসে রসে ভরা রসের মিতালী দিনে দিনে গড়ে উঠেছিল সেই শিশু নীপতরুটি অধুনা অবহেলার খর তপনে বিবর্ণ পাণ্ডুর; আসন্ন কালবৈশাখীতে ধূলিদলিতা এবং শ্রাবণে হবে কর্দমমর্দিতা।

শান্তকণ্ঠে বললুম, 'তুমিই তো আমাকে একাধিকবার বলেছ—এখন মনে হচ্ছে, তাতে হয়তো সামান্য বিষাদের সুর মাখানো ছিল—যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতে তোমার বুকে তুফান তোলে না। অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই শ্লাঘার সঙ্গে নিজেকে ধন্য মেনেছ যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-প্রকৃতির গান তোমার অস্থিমজ্জা তোমার অনিন্দ্যমোহন চিন্ময় ভুবন নির্মাণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সেই ধর্মসঙ্গীত এবারে একটু কান পেতে শোনো তো।

আমাদের পরিবারে একাধিক সাধক সুফীমার্গ অবলম্বন করেছিলেন। এ-পন্থার শেষ পথচারিণী ছিল আমার ছোট বোন সৈয়েদা হবীবুন্নেসা, সে এখন ও-পারে। আমার এক ভাগ্নী ঢাকাতে বাংলার অধ্যাপনা করে। সে তার সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখেছে। আমার এই বোনটি আবার ছিল সিলেটের 'পীরানী'। প্রতি ভোরে তার বাড়ির সামনে জমে যেত মেয়েছেলেদের ভিড়। তারা এসেছে বোনের দোওয়া নিতে কাচ্চাবাচ্চাদের অসুখ সারানোর জন্য, বন্ধ্যারা এসেছে মা হবার জন্য, আরো কত কী! আমার বোন তাবিজ-কবজ পানি-পড়া কিচ্ছুটি দিত না। এক এক জন করে মেয়েরা ঘরে ঢুকতো আর সে শুধু আশীর্বাদ করতো। বহুকাল ধরে, কেন জানি নে, সে শয্যাগ্রহণ করেছিল। শুয়ে শুয়ে গুন গুন করে গান গাইত। সুফীতত্ত্বের মারিফতী গান। এবং নিজেই সুর দিয়ে অনেকগুলো গান রচেছিল। ঢাকা বেতার মাঝে মাঝে সেগুলো শোনায়। তার একটা গীতিসংকলন আমার আব্বা প্রকাশ করেন। কিন্তু সে কথা থাক। আমি বলছিলুম—

শহর্-ইয়ার প্রাচীন দিনের দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললে, 'না। আপনার বোনের কথা বলুন।'

আমি দৃঢ়তর কণ্ঠে বললুম 'না।' আমিও এখন তপ্ত গরম। তুমি যদি শুরু নিয়ে মেতে উঠে আপন-জন, বেগানা-জন সর্বজনকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারো, তবে আমিও তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তারও বেশী অবহেলা করতে পারি।

বললুম 'তুমি প্রশ্ন শুধিয়েছিলে, আমাদের পরিবারের সুফীদের সম্বন্ধে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু বললুম। নইলে কোথায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনমান্য ধর্মসঙ্গীত—আফটার অল, গীতাঞ্জলির ধর্মসঙ্গীতই তো তাঁকে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দেয়—আর কোথায় আমার ছোট বোনের মারিফতী সুফীগীতি।'

আমি কিন্তু তখন মনে মনে বেশ খানিকটে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছি। বীবীকে যে তাঁর আকস্মিক ধর্মনিমগ্নতার কচ্ছপের খোল থেকে (তওবা! তওবা!! কাছিম আমাদের কাছে হারাম—পাপবিদ্ধ অপবিত্র—না হলেও মকরূহ, অর্থাৎ বর্জনীয়) বের করতে পেরেছি সেটাও তো কিছু হেলাফেলার ফেলনা নয়।

যদিও আমি নম্রা শান্তা সুফী-কন্যার অগ্রজ তবু তুর্ক-সিপাহীর মোগলাই কণ্ঠে আদেশ দিলুম, 'ঐ রেকর্ডটা বাজাও তো—

"তাই তোমার আনন্দ আমার'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে" ॥'

শহ্‌র্‌-ইয়ার রেকর্ডটি লাগালো। এতদিন অন্য গানের বেলা মাঝে মাঝে সে যে-রকম গুনগুন করতো, এ-গানে সে সেটা করলে না। ধর্মসঙ্গীত তা'র মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে সেটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারলুম না।

গান শেষ হলে বললুম, 'জানো শহ্‌র্‌-ইয়ার, এ-গানেরই একটি লোকায়ত রূপ আছে:

জ্ঞানের অগম্য তুমি, প্রেমের ভিখারী।
দ্বারে দ্বারে মাগো প্রেম নয়নেতে বারি ॥
কোথায় তোমার ছত্রদণ্ড কোথায় সিংহাসন।
পাতকীর চরণতলে লুটায় আসন ॥'

শহ্‌র্‌-ইয়ার কোনো কিছু বলার পূর্বেই আমি আদেশ দিলুম, 'অনেক রাত হয়েছে; ঘুমুতে যাও।'

আসলে শহ্‌র্‌-ইয়ার এখন ধর্মপথে স্বপনচারিণী। পরিপূর্ণ সুষুপ্ত অবস্থায় কোনো কোনো মুদ্রিতাঁখি নারী-পুরুষ দৃঢ় পদক্ষেপে ভয়-নির্ভয়াতীত অবস্থায় ভ্রমণ করে সংকীর্ণতম আলিসার উপর দিয়ে—কোন্ বিধাতা বা অপদেবতার অদৃশ্য করাঙ্গুলি সংকেতে কে জানে? এই স্বপনচারীর হাল তখন বড়ই নাজুক এবং সংকটময়। অকস্মাৎ কেউ তখন তার নাম ধরে ডেকে উঠলে বা তার গাত্রস্পর্শ করলে সে তার সম্মোহিত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং সেই মুহূর্তেই কোনো একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে [illegible]টেই অসম্ভব নয়।

শহর্-ইয়ার এখন সে ক্ষুরস্য ধারা সূফীরহস্যের কেশ-পরিমাণ সংকীর্ণ পথের উপর দিয়ে এই নব-অভিযানে বেরিয়েছে—অর্ধসম্মোহিত অর্ধসচেতনাবস্থায়—তাকে এখন আকস্মিক তর্ক-মুদ্গর দ্বারা সচকিত জাগরণে ফিরিয়ে আনা কি আদৌ সমীচীন হবে ?—যদ্যপি সেটা আদপেই সম্ভবে।

কিন্তু প্রশ্ন, তাকে জাগাতে যাবো কেন ? নিতান্ত জড়বাদী চার্বাকপন্থী ভিন্ন এ দায়িত্ব নেবে কোন্ সব-জান্তা প্যাকম্বর ! হয়তো সে সত্য পথেই চলেছে। তদুপরি আমার জানা আছে, খৃষ্টান, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, ভক্তিতত্ত্বের, বহু তথাগত মহাত্মা বলে গেছেন, এ-মার্গে পদার্পণ করার প্রথম অবস্থায়—অবতরণিকায়—প্রায় প্রত্যেক সত্য সাধকই অল্পাধিককাল মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটায়। সামান্য মানবীর প্রেমমুগ্ধ দান্তেও নাকি মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় দিক্‌ভ্রান্তের মত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। আর এ-নারী তো মুগ্ধা সবচেয়ে 'সর্বনেশে' প্রেমে।

কিংবা এ-নারী কি এখন দ্বিতীয় মন্‌জিলে—খৃষ্টান মিষ্টিকরা যাকে বলে মেনশন ? এখানে নাকি আসে এ্যারিডিটি—ঊষরতা, অনুর্বরতা। জগদ্বল্লভ নাকি ভক্তকে গোড়ার দিকেই এক ঝলক 'দর্শন দিয়ে মিলিয়ে যান। শ্রীরাধা তাঁর বল্লভ রসরাজের সঙ্গ সুখ কতকাল পেয়েছিলেন সেটা পরবর্তীকালে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর—তিনি নিজেই বলতে পারতেন না। সিলেটের একাধিক গ্রাম্যগীতিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমার মরম তাঁর স্মরণে বলে আমি তাঁকে পেয়েছি ঐটুকু সময়ের তরে বিদ্যুল্লতার পৃথিবীতলে পৌঁছতে যতখানি সময় লাগে।' তারপরই আরম্ভ হয় আকুলি-বিকুলি।

বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন এবং সাধককে একবার ক্ষণতরে 'দর্শন' দিয়ে জগদ্বল্লভের অন্তর্ধান—সম্পূর্ণ একই ঘটনা।

তখন সেই ঊষরকালে সর্ব প্রেমিকই প্রেমিকাই আর 'গৃহবাসিনী' হয়ে থাকতে চায় না, তার তখন 'কোন প্রয়োজন রজত কাঞ্চন,' সে তখন 'গেরুয়া বসন অঙ্গেতে' ধরে তার স্নেহময়ী মাতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করে।

শহর্-ইয়ার যে আত্মজন প্রিয়জনকে অবহেলা করেছে সেটা তো সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় নয়।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের জন্য, ক্যাথলিক নান্-দের জন্য যে রকম সংঘ মনাস্‌ট্রি আছে, মুসলমান রমণীর জন্য সে-রকম কিছু একটা থাকলে এতদিনে হয়তো সে সেখানে আশ্রয় নিয়ে নিত। জীবন কাটাতো ধ্যানধারণায়, উপবাস-কৃচ্ছ্রসাধনে, জনসেবায়—

সেবা ?

আমি যে এতক্ষণ শহর্-ইয়ারের সমর্থনে যুক্তিতর্ক দিয়ে মহলের পর মহল গড়ে তুলছিলুম সেই চিন্ময় এমারৎ এক লহমায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে ধূলিদলিত—মাত্র একটি শব্দের অনধিকার প্রবেশে। 'সেবা' !

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, নবীন সাধকের প্রতি সূফী সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হুজবেরীর প্রত্যাদেশ ঃ—

সাধনার প্রথম বৎসরে মানুষের সেবা করবে,
দ্বিতীয় বৎসরে আল্লার সেবা করবে,
তৃতীয় বৎসরে আত্মদর্শনে নিয়োজিত হবে।

ডাক্তার, আমি, বাড়ির এত যে খেদমৎগার সুবো-শাম শহ্‌র্‌-ইয়ারের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, তাকে সত্যকার মা জেনে আম্মা বলে ডাকে—আমরা কি মানুষ নই ? সাধনার প্রথম বৎসরে তো মানুষের সেবা করারই প্রত্যাদেশ।

একদা শহ্‌র্‌-ইয়ারকে বলেছিলুম, তোমার সর্বাঙ্গসুন্দর বেশভূষা হবে তোমার স্বামীর জন্য। আর আজ যদি তুমি সর্বসুন্দরের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করো, তবে তার সর্বপ্রথম সর্বোত্তম সেবা পাবে তোমার স্বামী।

তেরো

খুব বেশীক্ষণ আত্মচিন্তা করি নি। দেহের ক্লান্তি তো ছিলই, তদুপরি ডাক্তারের বিপাক-বিহ্বলতা, শহ্‌র্‌-ইয়ারের দূরত্ব-দূরত্ব ভাব আমার মনকেও অসাড় করে তুলেছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম অল্পক্ষণের মধ্যেই। হজরত পয়গম্বর বলেছেন—যদিও তাঁর বাক্যটি কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে আমি স্বচক্ষে দেখিনি—'মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ।' কিন্তু মূর্খের নিদ্রা কোন্ পর্যায়ে পড়ে সে-সম্বন্ধে কোনো আপ্তবাক্য আমি এ-তাবৎ শুনি নি, শাস্ত্রেও দেখি নি। আমি মূর্খ। জাগ্রতাবস্থায় আমার পাপাত্মা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে না। তাই বোধ হয় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় তাঁর নামগান শুনিয়ে দেন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে সম্পূর্ণ সচেতন হলুম।

শুনতে পেলুম, বেশ কিছুটা দূরে থেকে অতি মধুর কণ্ঠে জপগীতি ঃ

ইয়া লতীফুল্/ তুফ্‌বি না।
নাহ্‌নু 'বিদক্/কুল্লি না ॥

আরবী ভাষার দোঁহা।

হে সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য আমাদেরকে দাও।
(কারণ) আমরা তোমার পূজারী, আমরা সকলেই।

আমার মনে ধোঁকা লাগল, শহ্‌র্‌-ইয়ার কি এ-দোঁহাটির গভীরে পেঁৗছে পুরোপুরি মর্মার্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে ?

যে আল্লাকে এ-স্থলে আহ্বান করা হচ্ছে তিনি 'লতীফ'। শব্দটি সুন্দর এবং করুণাময় দুই অর্থই ধরে। অর্থাৎ একই শব্দে তাঁকে 'শিবম্' ও সুন্দরম্' বলা হচ্ছে। এখানে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে 'উল্‌তুফ' !

এর একটি অর্থ সরল—'তুমি করুণাময় হও' ('বি' 'না'—আমাদের প্রতি) কিন্তু অন্য অর্থ—'তোমার সৌন্দর্য আমাদের প্রতি বিকিরণ করো' কিংবা/এবং 'আমাদেরকেও সুন্দর করে তোলা।'

আল্লার বহু গুণ বোঝাবার জন্য মানুষ তাঁকে বহু নাম দিয়েছে। কিন্তু সুফীদের কাছে তিনি 'হক্‌ক্‌', অর্থাৎ 'সত্যম্‌'। প্রখ্যাত সুফী মনসুর অল্‌-হল্লাজ 'আনাল্‌ হক্‌ক্‌', অর্থাৎ 'আমিই সত্য' 'আমিই ব্রহ্ম' প্রচার করার দরুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত আছে, যখন তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কর্তিত হয় তখন প্রতি খণ্ড থেকে রব ওঠে 'আনাল্‌ হক্‌ক্‌, আনাল্‌ হক্‌ক্‌!'

শহ্‌র্‌-ইয়ার 'সত্যে'র সন্ধানে বেরিয়েছে, না সুন্দরের সন্ধানে?

তার ললিত কণ্ঠের করুণ জপের ('জিক্‌র্‌') :

'—সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
............আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতম আরম্ভের মঙ্গল-বারতা।'

কিন্তু আপন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্য করলুম শহ্‌র্‌-ইয়ারের কণ্ঠস্বর তাদের শোবার ঘর থেকে আসছে না। তবে কি সে স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করেছে! ইস-লামের আইন-অনুযায়ী সে তো তা পারে না, তার স্বামীও পারে না।

কিন্তু আমিই বা ঘামের ফোঁটায় কুমীর দেখছি কেন?

হয়তো ত্রিযামাযামিনীব্যাপী তার জিক্‌র্‌ স্বামীর নিদ্রাকে ব্যাঘাত করবে বলে সে অন্য কামরায় আশ্রয় নিয়েছে।

অবসন্ন মনে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। রাত্রির কলকাতার আকাশ যেন নির্গুণ ব্রহ্ম। কোনোরকম পরিবর্তন তার হয় না। সদাই একই, কেমন যেন হিমানীর গ্লানি-মাখা পাণ্ডুর ধূসর। শুনেছি, যুদ্ধের সময় নাকি ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে কলকাতার 'মডার্ন' কবিরা জীবনে প্রথম চন্দ্রমা দেখতে পান, এবং ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন।

এটা কাল সকালেই শহ্‌র্‌-ইয়ারকে বলতে হবে। সে আকছারই 'গবিতা' নিয়ে টকঝাল ফোড়ন কাটে—ওদিকে এসব আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েও। একদিন বিষাদমাখা সুরে আমাকে বলেছিল, 'আমি যে এ-সব কবিতাতে রস পাই নে তার জন্য কি আমার দুঃখ হয় না? আমি এরই মধ্যে এত বুড়িয়ে গেলুম কি করে যে নবীনদের সুর আমার প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে না?'

তখন হঠাৎ মনে ব্যথা জাগলো, সে-সব উষা-রসের নিশা তো তার আর নেই।

এ-সব ব্যথার উপশমের জন্য বিধাতা সৃষ্টি করেছেন নিদ্রা।

বেলাতে ঘুম ভাঙল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললুম, 'বাঁচালে, বাবা।' এতক্ষণে নিশ্চয়ই ডাক্তার চলে গেছেন কর্মস্থলে এবং শহর্-ইয়ার গেছেন তাঁর পীরের আস্তানায়। কে যেতে চায় ঐ নিরানন্দ ড্রাইনিংরুমে? আর এই তো প্রথম আমরা তিনজন একসঙ্গে মুখোমুখি হব। কি হবে গিয়ে ঐ আড়ষ্ট মূক সমাজে। আমি তো আর বাগ্দেবী নই যে, মূককে বাচাল করে তুলবো।

কিন্তু শান্তি কোথায়? কৌটিল্য যে বলেছেন, উৎসবে ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে যে সঙ্গ দেয় সেই ব্যক্তিই বান্ধব—তার কি?

ব্যসন মানে অত্যধিক আসক্তিজনিত বিপত্তি। শহর্-ইয়ারের এই অত্যধিক ধর্মাসক্তিও এক প্রকারের ব্যসন। কিন্তু এটাই বা দীর্ঘস্থায়ী হবে কে বলতে পারে? অবশেষে সে হয়তো তার ভারসাম্য ফিরে পাবে এবং সর্বশেষে সে শব্দার্থে ডাক্তারের সহধর্মিণী হবে। ভুল বললুম, এতদিন ধরে ডাক্তার তো ভেবেছে, সে যে ক্রিয়াকর্ম করে যাচ্ছে সেখানেই তার ধর্মজীবনের পরিসমাপ্তি—সেই শুষ্ক আচারানুষ্ঠানের বিশীর্ণ তরুমূলে বরঞ্চ শহর্-ইয়ার তখন সিঞ্চন করবে সুফী সন্তদের প্রেম-উৎস থেকে আহরিত নব মন্দাকিনীধারা। ধর্মবাবদে কৌতূহলী অথচ সেটাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে যে ধ্যানধারণা সাধনা-উপাসনার প্রয়োজন সে-খাতায় সম্পূর্ণ রিক্ত এই যে অধম—সেও উপকৃত হবে।

'গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং' হেঁকে খানা-কামরায় ঢুকলুম।

ডাক্তারকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লতর দেখাচ্ছে। তবে কি এই খোদার-সিধে লোকটা ঐ দুরাশা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, আমি আসার দরুন তার সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে! মূর্খ, মূর্খ, মূর্খ! আমি কি টেলিফোনের 199 যে, 'হোয়েন ইন্ ট্রবল'-এ নম্বর রিং করলেই সর্ব ঝামেলা ফৈসালা হয়ে যাবে, না আমি পীরপ্যাকম্বর-গুরুগোসাঁইয়ের খ্যাঁট?—যদ্যপি শহর্-ইয়ারের নবলব্ধ গরিমা—রোওয়াব্‌টাকে কথঞ্চিৎ ঘায়েল করার জন্য কাল রাত্রে আমি মুখে মুখে হাইজাম্প লঙজাম্প মেরেছি বিস্তর—শহর্-ইয়ারের 'জিক্‌রের সেই লতীফ্' তাঁর 'লুৎফ্' (দাক্ষিণ্য) বর্ষণ করে বর্বরতম আমার এ মদদর্প যেন ক্ষমা করে দেন।

ডাক্তারকে শুধালুম, 'কই, আজ যে এত্তা ল্যাটে? তবে কি যে-সব কঙ্কাল নিয়ে রিসার্চ করছেন তারা সরকারী ধর্মঘট করেছে, না রবিঠাকুরের 'কঙ্কালে'র মত মোলায়েম মোলায়েম গল্প বলার জন্য মহিলা-মহলে'র প্যাটার্নে 'কঙ্কাল-মহল' প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাবৎ কঙ্কাল বেতার থেকে দাওয়াৎ পেয়েছ?'

অনুমান করলুম, ডাক্তার সজ্ঞানে কর্মস্থলে যেতে বিলম্ব করছে। বউকে যতখানি পারে ঠেকিয়ে রাখছে।

ডাক্তার বললেন, 'তা আর বিচিত্র কি? শহর্-ইয়ারই কিছু দিন পূর্বে বলছিল বেতারের হাঁড়িতে যা চাল বাড়ন্ত, আমার কঙ্কালের না ডাক পড়ে?'

শহর্-ইয়ার তখন ডাক্তারের লাঞ্চের জন্য স্যালাডে যে মায়োনেজ দেবে তার জন্য ডিমের কুসুম, সরষের তেল আর নেবু নিয়ে বসেছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বলল্যুম, 'তবেই দেখ, ইয়ার, শুধু যে "গ্রেট মাইন্‌ড্‌জ্ থিন্‌ক এলাইক" তাই নয়, দৈবাৎ কখনো-সখনো কোনো 'নীলমণি-চন্দ্রমায়' তোমার মত গ্রেট মাইন্‌ড্ আর আমার মত স্মল মাইন্‌ড্ও একই রকম চিন্তা করে। আর তুমি যে বেতার তথা কঙ্কালতত্ত্ব ডাক্তারকে বলেছ সেটি আমি একটি ব্যঙ্গচিত্রেও দেখেছি। গত যুদ্ধে হিটলারের যখন তাবৎ সৈন্য খতম, তখন আমাদেরই ডাক্তারের মত এক ডাক্তার বার্লিনের যাদুঘরে গিয়ে একটা কঙ্কালের পাঁজরার উপর স্টিতস্কোপ রেখে পাশের রংরুট আপিসারকে বলছেন, "হ্যাঁ, ফিট্ ফর্ দি আর্মি!"

তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললুম, 'আমি তো শুনেছি, মায়োনেজ তৈরী হয় অলিভ অয়েল আর সিরকা দিয়ে।'

শহর্-ইয়ার আমার দিকে না তাকিয়েই বললে, 'ঠিকই শুনেছেন, কিন্তু অনেকেই তো মায়োনেজের ধক্ বাড়াবার জন্য ফিকে অলিভ অয়েলে ঝাঁজালো মাসটার্ড পাউডার দেয়। ও দুটোতে মিশে তা হলে তো সর্ষে'র তেলেই দাঁড়াবে। আর ইয়োরোপে টক নেবু নেই বলেই তো শুনেছি, তারা ভিনিগার ব্যবহার করে। নেবু অনেক তাজা।'

ইতিমধ্যে জমীল এসে শুধলো, কি খাব?

উদাত্ত কণ্ঠে বললুম, 'ব্রাদার, আমি তো ব্রেকফাস্ট খাই নে। কিন্তু কাল রাত্রের খানাতে ঠিক রুচি ছিল না বলে মেকদারে একটু কমতি পড়ে গিয়েছিল। ...দাও কিছু একটা।' শেষ কথা দুটি বললুম ঈষৎ অবহেলা ভরে।

আমার মৎলব, শহর্-ইয়ারকে ইঙ্গিতে অতি মোলায়েম একটি খোঁচা দেওয়া। ভাবখানা এই, 'তুমি সামনে বসে ভালো করে খাবার জন্য চোটপাট করবে, রসালাপের মধুসিঞ্চন করবে, তবে তো আমার জিভে জল, পেটে জারক রসের ছয়লাপ জাগবে। নইলে আমার কি আর অন্যত্র অন্ন জোটে না?'

এবারে শহর্-ইয়ার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। সে-দৃষ্টিতে আমি যেন দেখতে পেলুম, কেমন যেন একটা বেদনা-ভরা নৈরাশ্য।

তবে কি সে বলতে চায়, সে খেয়ালখুশীতে আমাকে অবহেলা করে নি; আমাকে, তার স্বামীকে সেবা করার মত শক্তি তার আর নেই।

তারপর ধীরে ধীরে জমীলের কাছে গিয়ে বললে, 'আমি খাবার তৈরী করছি, তুমি কমলালেবুর রস ঠিক করো।'

আমার আপসোস হল। কী দরকার ছিল আমার এ-অভিমান দেখাবার। আমি না স্থির করেছিলুম, আমি অভিমান করবো না। আমি, অগা, কি করে জানবো এ-মেয়ের বুকের ভিতর কি তুফান উঠেছে? আমি কি করে বুঝবো

ওর মনের কথা? আপন মা-ই কি সব সময় বুঝতে পারে, তার সন্তানের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব? আমার তরুণ বয়সে দেখেছি, একাধিক সুশিক্ষিতা মাতা পুত্রকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নামতে বাধা দিয়েছেন। হয়তো সন্তানের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ কারাবাসের দুঃখ-যন্ত্রণা মাতাকে ত্রাসাতুর করে তুলেছিল। যাই হোক যাই থাক, মা তো তখন বুঝতে পারে নি, ছেলে বিভীষিকা দেখছে, সে যদি তার আদর্শ ত্যাগ করে কারাগারের বাইরে থেকে যায় তবে সেই মুক্ত পৃথিবী তখন তার পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে বৃহত্তর, বৃহত্তম কারাগার!

শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার কে, যে, আমি তার হৃদয়মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব আপন হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবো? মুসলমান সমাজের ভিতর আমাদের দু'জনার মধ্যে যে সম্পর্ক দিন দিন ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছিল, সে রকম সম্পর্ক আমাদের সমাজে কিছুদিন পূর্বেও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব, এখনো সাতিশয় বিরল। খুদ আরব দেশ, ইরান-তুরান আফগানিস্তান এমন কি এদেশের হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশও তো এ-সব বাবদে বাঙালী মুসলমান সমাজের ঢের ঢের পিছনে। ও-সব দেশে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে হদীস খুঁজতে যাওয়া বিলকুল বেকার। বরঞ্চ শহ্‌র্‌-ইয়ার ও আমার উভয়ের অনুভূতিক্ষেত্রে যিনি আবাল্য রসসিঞ্চন করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে শুধোই। তিনি এই সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করে করে পেঁছেছিলেন কবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' আখ্যানে। সেখানে পত্রলেখা নাম্নী তরুণী কুমারী যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের 'পত্নী নয়, প্রণয়িনীও নয়, কিংকরীও নয়, পুরুষের সহচরী'।

কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার আমার সহচরী কেন, নর্মসহচরীও তো নয়।

তদুপরি সে বিবাহিতা, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা; আমিও একদারনিষ্ঠ।

কবিগুরু তীক্ষ্ণদৃষ্টির খরতর শর কিন্তু আমাদের এই 'নাজুক' বা ডেলিকেট্ সম্পর্কের অন্তত একটি সূক্ষ্মতম কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছে। 'পত্রলেখা যেখানে (চন্দ্রাপীড়ের সান্নিধ্যে) আসিয়া যে অতি অল্প স্থানে আশ্রয় লইয়াছে সেখানে তাহার আসিবার কোনোপ্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে বড় সংকীর্ণ, একটু এদিকে ওদিকে পা দিলেই সংকট।'

পরিস্থিতিতে অবশ্য পার্থক্য আছে। পত্রলেখা ছিলেন চন্দ্রাপীড়ের তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী পরিচারিকা; চন্দ্রাপীড় যুবরাজ। যুবরাজকে তো সাবধানে পা ফেলতে হয় না। কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার ও আমার সম্পর্ক তো 'বরাবরেষু'।

তাই শহ্‌র্‌-ইয়ারের 'স্থানটি তাহার পক্ষে' যেমন 'বড় সংকীর্ণ' আমারও 'একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সংকট'।

তার প্রতি আমার সহানুভূতি, তার প্রতি আমার ভালোবাসা, তার অন্তরের দ্বন্দ্বে তাকে সহায়তা করা—এ সবই যেন 'একটু এদিকে ওদিকে পা না ফেলে'! তা হলেই সংকট।

আমার চিন্তাধারায় বাধা পড়লো। ডাক্তার আসন ছেড়ে উঠে বললে, 'তা হলে আসি; আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম, অর্ধসমাপ্ত ব্রেকফাস্ট টেবিলে রেখে। বললুম, 'আমাকেও একটুখানি বাইরে যেতে হবে। আপনি আমাকে ড্রপ্ করতে পারবেন?'

উভয়েই আশ্চর্য! কারণ আমি এ-বাড়ি থেকে মাত্র একবার বেরিয়েছিলুম —তাও ওদেরই সঙ্গে।

ডাক্তার বললে, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিন্তু আপনি ব্রেকফাস্ট শেষ করুন।'

আমি তাচ্ছিল্য-ভরা কণ্ঠে বললুম, 'ওঃ! ব্রেকফাস্ট! সে বালাই যা আমি কালেকস্মিনে খাই, সে তো বুড়ি ছোঁওয়ার মত।'

এটা নিছক শহর্-ইয়ারকে খুশী করার জন্য। সে যেন না ভাবে যে, সত্য-সত্যই কাল রাত্রে আমি অভুক্ত ছিলুম।

ওষুধ কিছুটা ধরলো, শহর্-ইয়ার আমার দিকে যেন একটুখানি কৃষ্ণনয়নে তাকালো। মেয়েটি সর্বার্থে অতুলনীয়া।

ওরা কিছু শুধোয় নি। আমি নিজের থেকেই বললুম, 'চললুম অভিসারে। আমার সিঁথির সিঁদুরের সন্ধানে।'

ডাক্তার তো বিস্ময়বিহ্বল, সিঁথির সিঁদুর? সে আবার কি?' শহর্-ইয়ারও তদ্বৎ।

একগাল হেসে বললুম, 'আমার পাবলিশার গো, আমার পাবলিশার। উনি আছেন বলেই তো দু'পয়সা পাই, মাছ-মাংস খাই। সিঁথির সিঁদুর না তো কি?' ওদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না করেই বললুম, 'আমার ফিরতে দেরি হবে। আমার পাবলিশার রীতিমত খানদানী মনিষ্যি। সায়েবসুবোদের মত পয়লা নম্বরী হোটেলে লাঞ্চ খান। বিজনেস টক্‌মক্ যা-কিছু সেসব হোটেলের 'বার'-এ—পিন্‌জিন্ (পিংক্ জিন্) গেলাশের থারমোমিটার সাইজের ডাঁটাটি ঘোরাতে ঘোরাতে।···আমার গাড়ির দরকার নেই।'

আমার ইচ্ছা, শহর্-ইয়ারের এদানীংকার প্রোগ্রাম ডিস্টার্ব না করা। মুরশিদমঞ্জিলে যাবার জন্য তার যদি নিত্যিনিত্য পারিবারিক গাড়ির প্রয়োজন হয় তবে তাই হোক্। আমি রাত না করে ফিরবো না।

আমি আশা করেছিলুম, সে বুঝে যাবে এটা আমার কোনো অভিমানজাত প্রত্যাখ্যান নয়। কিছুটা প্রসন্ন নয়নে আমার দিকে মুহূর্তেক তাকাবে।

রহস্যময়ী এ নারী। শুধু বললে, 'আমারও তো গাড়ির দরকার নেই।'

আমার খুশী হওয়ার কথা, কারণ এ-যুগে মায় ড্রাইভার চোপ্পর দিনের জন্য মোটরপ্রাপ্তি যেন চৌরঙ্গীতে সোঁদরবনের কেঁদো বাঘ-সওয়ার গাজী পীরের ইয়ার দক্ষিণ-রায়ের দাক্ষিণ্যপ্রাপ্তি! কিন্তু আমার উল্টে হল গোস্‌শা। ওঃ!

তুমি বুঝি ধরে নিয়েছো, যানাভাবে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে, ঘর্মাক্ত কলেবরে যত বেশী ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে গুরুর পদপ্রান্তে পৌঁছবে সেই অনুপাতে তোমার মুরশিদসেবার পুণ্যধ্বজা মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে আল্লাতালার কুর্সিপানে ধাওয়া করবে! 'তক্‌লীফ বরদাস্ত করাতেই সওয়াব্‌' 'কৃচ্ছ্রসাধনেই পুণ্য'—অর্ধসিদ্ধ বৈরাগ্যবিলাসীদের মুখে এ-জাতীয় জনপদসুলভ নীতিবাক্য শুনে শুনে এক কামিল্‌ সুফী বিরক্তি-ভরে বক্রোক্তি করেছিলেন, 'তবে চড়ো না গে' প্রতি ভোরে হিমালয়ের চূড়ো, সেখানে পড়ো গে' ফজরের নামাজ! বেহেশ্‌তের বেবাক ফেরেস্তা সেই হুদো হুদো পুণ্যের খতেন রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাবেন। আর চূড়ো চড়ার বেপথে যদি টেঁসে যাও তবে তা তো হাজার দফে বেহ্‌তর্‌। তখন তুমি পাবে শহীদের উচ্চাসন। পূর্বকৃত সর্বপাপভার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সরাসরি চলে যাবে বেহেশ্‌তে!'

না গো, শহ্‌র্‌-ইয়ার, তোমার পুণ্যপন্থা আমি অত সহজে নিষ্কণ্টক করে দেব না। দুপুরে বাড়িতে খাবও না। তোমার প্রোগ্রাম-প্ল্যান আমি এতই নর্মাল সহজ করে দেব যে তুমি কৃচ্ছ্রসাধন করার রন্ধ্রটি পর্যন্ত খুঁজে পাবে না। আমি সতী বেহুলার চেয়ে ঢের বেশী চালাক।

উপস্থিত আমি স্রেফ একটি বারের তরে তোমার মুরশিদ্‌-বিরিঞ্চি-বাবার মুখারবিন্দরুচিটির দর্শনলাভ করে যে পুণ্যসঞ্চয় হবে সেইটে মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেব স্বর্গের পোস্টাপিসে—হোথায় সীট রিজার্ভেশনের জন্য ইনসিও-রেন্‌সের পয়লা কিস্তি!

আহা, শহ্‌র্‌-ইয়ার, তুমি দর্শন পেয়ে গেলে, তুমি ভাগ্যবতী:—

> 'অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা যায়।
> মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

এবং ততোধিক বিস্ময় মানতে হয় যে আবাল্য ধর্মশাস্ত্র, এমন কি ধর্মসঙ্গীতও উপেক্ষা করে কোন্‌ মন্ত্রবলে কোন্‌ পুণ্যফলে নিরঙ্কুশ অব্যবহিত পদ্ধতিতে আজ অকস্মাৎ হৃদয়ঙ্গম করে ফেললে,

> 'যদ্যপি আমার গুরু বেশ্যাবাড়ি যায়।
> তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥'

চৌদ্দ

সর্বপ্রকারের বাদ-প্রতিবাদ অখণ্ড উপেক্ষা করে গেলুম শোবার ঘরে। চীনাংশুক-অঙ্গবাসটি স্কন্ধোপরি লম্বমান করে দৃঢ়পদক্ষেপে দৃক্‌পাত না করে সোপান অবরোহণান্তে রাজসিক পদ্ধতিতে আরোহণ করলুম সেই মান্ধাতাতাতবুনাশ্ব সমসাময়িক স্বতশ্চলশকটে।

ডাক্তার সভয় সবিনয় কণ্ঠে অনুরোধ করলেন, 'গাড়িটা রাখুন না সমস্ত দিন আপনার সঙ্গে। আমি ভারি খুশী হব। আর জানেন তো কলকাতায় যান-বাহনের হাল।'

আমি স্থির কণ্ঠে বললুম, 'আপনাকে কোনো বাবদেই "না" বলতে আমার বড় বাধে। কিন্তু ক্ষণতরে বিবেচনা করুন, আমি বেরিয়েছি চতুর্বর্গের দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ অর্থের সন্ধানে; পক্ষান্তরে শহর্-ইয়ার বেরুবেন চতুর্থ বর্গ অর্থাৎ মোক্ষের সন্ধানে। কার সেবাতে এস্থলে নিয়োজিত হবে এই শকট?' তারপর মৃদুহাস্য করে বললুম, 'অপরাধ নেবেন না, শকটটিও মুমূর্ষু তথা মুমুক্ষু—তারওতো ভূত-ভবিষ্যৎ আছে। সেইবা যাবে না কেন রাজেন্দ্রাণী সঙ্গমে দেবদর্শনে?'

ডাক্তার নিম-সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এ গাড়ি আমি অতি অবশ্যই স্ক্রেপ-রূপে বিক্রী করবো না। তাকে তার আপন গারাজচ্যুতও করবো না। এবং নিশ্চয়ই রাখবো নিত্য রানিং অর্ডারে, আপনার ভাষায় স্বতশ্চলাবস্থায়।'

আমি প্রসন্ন বদনে বললুম, 'আর আপনার নাতি সেটি চড়ে 'ভিন্‌টেজ কার' রেসে নামবে।'

বলতে পারবো না, হয়তো আমার দৃষ্টিভ্রম—কিন্তু আমার যেন মনে হল ডাক্তার অন্যদিকে অতি সামান্য মুখ ফেরালেন।

আমি সে-কুহেলি কাটাবার জন্য শুধালুম, 'ডাক্তার, আপনার মনে আছে, গত বর্ষারম্ভে আপনারা যখন শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছিলেন তখন একদিন অপরাহ্নে ওঠে প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়, তারপর মুদ্গরধারে শিলাবৃষ্টিপাত এবং সর্বশেষে রুপালি ঝালরের মত ঝিম্‌ঝিম্ বরষন? শহর্-ইয়ার বৃষ্টিতে ভিজতে বলে একা চলে যায় আদিত্যপুরের দিকে?

আমরা দুজনাতে তখন বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার নিয়ে আলোচনা করি। শেষের দিকে আপনি ইসলাম সম্বন্ধে ভালো ভালো রেফ্‌রেন্‌স্ বইয়ের একটি ফিরিস্তি আমার কাছে চান। সে-নির্ঘণ্ট শেষ করার পূর্বেই শহর্-ইয়ার বাড়ি ফেরে।—তাই তখন দশ খণ্ডে অসমাপ্ত একখানি অতুলনীয় গ্রন্থের কথা আমার আর বলা হয়ে ওঠে নি।

বইখানির—বরঞ্চ বলা উচিত এই "ইসলামবিশ্বকোষ"-এর নাম "আন্নালি দেল্ ইসলাম" অর্থাৎ অ্যানালস্ অব্ ইসলাম, ইতালীয় ভাষায় লেখা। কিন্তু তার পূর্বে এই অজাতশত্রু বিশ্বকোষের একক স্রষ্টার পরিচয় কিছুটা দিই। এঁর নাম প্রিন্‌স্—ডিউকও বলা হয়—লেওনে (অর্থাৎ সিংহ) কাএতানি। ইতালীর তিনটি পরিবারের যদি নাম করতে হয়, যাঁদের সঙ্গে রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আছে তাহলে কাএতানি পরিবারের নাম বাদ যাবে না। কিন্তু এহ বাহ্য।

আসলে এ-পরিবারের যশ প্রতিপত্তি আরম্ভ হয় যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

এ-পরিবারেরই একজন বনিফাতিয়ুস নাম নিয়ে তদানীন্তন খৃষ্ট-জগতের পোপ নির্বাচিত হন। ইনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও কূটনীতিতে চাণক্য! ওদিকে যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী। ডেনমার্কের রাজাকে তিনি পদানত করেন এবং ফ্রান্সের সম্রাটকেও প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। কিন্তু এসব তথ্য বলার কোনো প্রয়োজন নেই—এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে তাঁর সমসাময়িক অমর কবি দান্তে তাঁকে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কাব্যে যীশুখৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য। তত্ত্ব কথা এই যে বনিফাতিয়ুস সে-যুগের সর্বোত্তম দার্শনিক স্পেনের মুসলমান আবু রুশ্দের দর্শন প্রায় সর্বাংশে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। কারণ আবুরুশ্দ্ (ঐ যুগেই তাঁর দর্শন একাদশ খণ্ডে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়—লাতিনে রুশ্দের নাম আভেরএস্) যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করতেন যে মৃত্যুর পর মানবাত্মা অনন্ত স্বর্গভোগ বা অনন্ত নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। তার কারণ অনন্ততা, আনন্ত্যগুণের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লা। মানবাত্মা নয়, এবং অনন্ত স্বর্গ অনন্ত নরকের আনন্ত্যগুণ স্বীকার করলে এরা সকলেই সেই মহান আল্লার (বেদান্তের ভাষায় একমেবাদ্বৈতম্ ব্রহ্মের) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবে—এ-ধারণা কিম্ভূতকিমাকার অশ্বডিম্ব—আটারলি এব্‌সার্ড। তাই আবু রুশ্দের মতে মৃতাত্মারা স্বর্গ-নরক যথোপযুক্ত কাল ভোগ করার পর আল্লাতালা অবশেষে সর্ব আত্মা, স্বর্গ, নরক সব, সব-কিছু নিজের মধ্যে আপনাতে সংহরণ করে নেবেন। তখন তিনি আবার একম্, অদ্বৈতম্।'

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, 'এই মতবাদটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারি নি। একটু সবিস্তার বলুন।'

আমি বললুম, 'নোঃ! আমি দর্শন প্রচার করি নে। আমি শোনাই কাহিনী। একটি করুণ কাহিনী শোনাবার জন্য আমি এস্থলে অতি সংক্ষেপে একটি পটভূমি নির্মাণ করলুম মাত্র। তৎপূর্বে আরো আধ মিলিগ্রাম দর্শনবিলাস করতে হবে। এদিকে আবার খৃষ্টান মাত্রেরই অটল অচল বিশ্বাস পুণ্যাত্মা অনন্ত স্বর্গসুখ এবং পাপাত্মা অনন্ত নরকযন্ত্রণা পাবে। ওদিকে পোপ, খৃষ্টজগতের পিতা, যাঁর পুণ্যাস্যনির্গত প্রতিটি বাক্য শাস্ত্রাতিশাস্ত্র আপ্তবাক্য, সেই সর্বশাস্ত্রবিশারদ পোপ বনিফাতিয়ুস 'ম্লেচ্ছ যবন' দার্শনিক আবুরুশ্দের মতবাদ এমনই আকণ্ঠ গিলে বসে আছেন যে তিনি তাঁর সহকর্মী কার্ডিনালদের সমক্ষে গোপন রাখতেন না যে, তিনি মৃতাত্মার অনন্ত স্বর্গনরক-ভোগাদিতে বিশ্বাস করেন না। তাই পূর্বেই বলেছি, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। খুদ বাইবেলের বিরুদ্ধে এই 'ম্লেচ্ছ' 'যাবনিক' মতবাদ প্রচার করার জন্য পোপকে দণ্ডভোগ করতে হয়েছিল। তারই উল্লেখ করে কবি দান্তে বিলাপ করে তাঁর মহাকাব্যে লিখেছেন, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁর জল্লাদরা যেরকম তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিল

ঠিক সেই রকম 'প্রভু যীশুকে দ্বিতীয় বারের মত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হল।

কিন্তু এক বাহ্য।

যে কাএতানি পরিবারে এই পোপের জন্ম সে-পরিবারে যুগ যুগ ধরে বহু পণ্ডিত, বহু গবেষক জন্ম নিয়েছেন। এ-পরিবারের শেষ পণ্ডিত, আমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক লেওনে কাএতানি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারবো না যে, এই পোপের উপর আরব দার্শনিক আবু রুশদের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর পারিবারিক ও পোপদের প্রচলিত ইতিহাস অধ্যয়ন করার ফলে তিনি আরবী ভাষা ও মুসলিম সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন।

পর পর দু'খানি অত্যুত্তম গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি ইয়োরোপ তথা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ভূখণ্ডে নব "শমসুল-উলেমা" (জ্ঞান-ভাস্কর) রূপে আন্তরিক অভ্যর্থনা ও অকুণ্ঠ প্রশস্তি লাভ করলেন। তখন তিনি স্থির করলেন, এ-সব উটকো বই না লিখে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন নিয়োজিত করবেন ইসলামের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করাতে। বিদ্বজ্জন সোল্লাসে হর্ষধ্বনি তথা সাধুবাদ প্রকাশ করলেন।'

ইতিমধ্যে লক্ষ্য করলুম, মেডিকেল কলেজ আর বেশী দূরে নয়। বললুম, 'এবার আমি আমার মোদ্দা কথাতে চলে এসেছি।

রাজপরিবারের অংশবিশেষ, অসাধারণ সুপুরুষ, সংগীতচিত্রভাস্কর্য ইত্যাদির সক্রিয় সমঝদার কাএতানি প্রেমাবদ্ধ হলেন এক পরমা সুন্দরী, সর্বগুণান্বিতা রোমান রমণীর সঙ্গে। সৌভাগ্যক্রমে প্রেমটি হল উভয়ত ও গভীরতম।

বিবাহ হয়ে গেল। তাবৎ ইতালী এক কণ্ঠে বললে, তাদের দেশের নীলাম্বুজের ন্যায় গভীর নীলাকাশের সঙ্গে চক্রবালবিস্তৃত ইন্দ্রধনুর এহেন পূর্ণাঙ্গ আলিঙ্গন ইতিপূর্বে তাদের এবং সর্ববিশ্বপূজ্য 'রোমেও জুলিয়েতের' প্রেম-ভূমিতেও হয় নি।

তারপর আমাদের লেওনে—"নরসিংহ"—ডুব দিলেন তাঁর ইসলামের ইতিহাস—তাঁর "আন্নালি" বা "অ্যানালস্—" গ্রন্থে।

বউ এসে বললেন, "ওগো, শুনছো, কাল সন্ধ্যায় আমাদেরই তসকানীনি আসছেন সঙ্গীত পরিচালনা করতে। ঐ দেখো টিকিট পাঠিয়েছেন। অন্য লোকে হন্যে হয়ে ধন্না দিচ্ছে শুধুমাত্র ওঁর দর্শন পাবার জন্য।"

লেওনের মুখ বিবর্ণ। অপরাধীর মত বললেন, "কিন্তু আমার 'আন্নালি'—এ-অধ্যায়টা শেষ না করে—আচ্ছা, কাল দেখব।"

কিন্তু 'কাল'ও সেই 'দেখবো'টা দেখা হয়ে উঠলো না। লেওনে ডুব মেরেছেন 'আন্নালি'র গভীর অরণ্যে।

তারপর এলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ টেনর গাওয়াইয়া কারুজো। ফল তদ্বৎ।

মাঝে মাঝে বলতেন, "তা তুমি, ডার্লিং (দিলেত্তো), দিনোর সঙ্গে যাও

না কেন? সে তো সর্বসঙ্গীতে আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সমঝদার। আমার আন্নালি—"

বউ ঠোঁট চেপে বললেন, "দিনো তার 'প্যতীত্ আমির' (প্রিয়া বান্ধবী-র) সঙ্গে যাচ্ছে।"

আকাশপানে হানি যুগল ভুরু লেওনে অবাক হয়ে শুধোলেন, "সে কি? দিনোর তো সুন্দরী বউ রয়েছে। এই হালেই বিয়ে করেছে। এর-ই মধ্যে 'প্যতীত আমি'?"

যা শুনেছি, তারই স্মরণে যতটুকু মনে আসছে তাই বলছি, বউ নাকি ঠোঁট দুটি আরো কঠিন ভাবে চেপে চলে যাচ্ছিল—

লেওনে তোৎলাতে তোৎলাতে—তিনি ছিলেন লক্ষ্মীট্যারার মত অতিশয় যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্মী-তোৎলা—বললেন, 'কিন্তু, কিন্তু, ডার্লিং, আমার আন্নালি, আ—'

আন্নালি, অন্নালি—আবার সেই আন্নালি।

প্রেমিক, রসিক, ললিতকলার বিদগ্ধ সমঝদার লেওনে এখন হয়ে গিয়েছেন শুদ্ধমাত্র পণ্ডিত। পণ্ডিতেরও বউ থাকে। কিন্তু এ-স্থলে লেওনের একটি 'প্যতীত্ আমি' তাঁর হৃদয়াসন জুড়ে বসে গেছেন। আন্নালি।

লেওনে যে তাঁর বউকে সর্বহৃদয় দিয়ে ভালোবেসে তার পদপ্রান্তে তাঁর সর্বাত্মা নিবেদন করেছেন এ-তত্ত্ব তাইবেরিয়ো রোমবাসী জেনে গিয়েছে। বস্তুতঃ লোডিকিলার রোমান নটবররা তখন ফিস্‌ফিস্ গুজগুজ করতে আরম্ভ করেছে, লেওনেটা একটা স্ত্রৈণ, ভেড়ুয়া ভাত্তুয়া (পূর্ববঙ্গের ভাষায় বউয়ের দেওয়া 'ভাত' না পেলে যে ক্লীবের দিন গোজরান হয় না) আস্ত একটা নপুংসক।

এদিকে লেওনে তাঁর সর্বসত্তা স্ত্রীর কাছে নিবেদন করে নিশ্চিন্ত। তাঁর দেবী যে তাঁর আন্নালিকে তার সপত্নী, তার "প্যতীত্ আমি" রূপে কস্মিনকালেও ধরে নিতে পারে সেটা তার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে। কিন্তু ডাক্তার, এই দগ্ধ জগতে কত ঢপবেঢপেরই না সতীন হয়। সেই যে হিংসুটে দ্বিতীয়পক্ষ দেখলো তার স্বামী একটা মড়ার খুলি বেড়ার কঞ্চির উপরে রাখছে, সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসা করে ফেললে, এটা নিশ্চয়ই তার মৃতা সপত্নী সীমন্তিনীর সীমন্ত-বহনকারী মস্তকের খুলি! তাই না মিনষের পরাণে এত সোহাগের বান জেগেছে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। তন্মুহূর্তেই—না, বরঞ্চ বলবো—তন্মুহূর্তেরও তিন মিনিট আগে, রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে "ফোরনকে পাঁচ মিনট পেহ্‌লে", সেই খুলিটা ফেলে দিলে বাড়ির পিছনের বিষ্ঠাকুণ্ডে। সে কেচ্ছা থাক, ডাক্তার, এ-বাবদে আমি বিস্তর গবেষণা করেছি—সুবিধে-কুবিধে মত কোনো এক সময়ে সেটা হবে। শুধু একটি আপ্তবাক্য বলি, এ-দেশের হরিপদ কেরানী

যে তার কুঞ্জে জীবনের দশটা-পাঁচটা বেচে দিয়েছে তার জন্য তার বউ খেদ করে না। কিন্তু বাবদ-বাকি ষোল সতেরো ঘণ্টা সেই পদী-বউ হয়ে যায় রাজরাজ্যেশ্বরী পট্টমহিষী রানী পদ্মিনী পদ্মাবতী—শাহ্-ইন্-শাহ্ বাদশা আলাউদ্-দীনও সেখানে ইতর জন।

আমাদের পণ্ডিত লেওনে একটি আস্ত মূর্খ।

এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্যন্ত জানেন না, গভীর, উভয়পাক্ষিক প্রেমের পর, বিয়ে হওয়ার পরও অনেক কিছু করার থাকে। সেগুলো অতি ছোটখাটো জিনিস। কিন্তু ছোট হলেই কি ছোট জিনিস সর্বাবস্থাতেই ছোট, বড় জিনিস বড়? পিপীলিকা অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণী; হাতি বৃহত্তম। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বানানের বেলা? সেখানে পিপীলিকার বানান ঢের বেশী শক্ত—হাতির তুলনায়।

লেওনে মূর্খ। তিনি বুঝতে পারেন নি, এসব ছোটখাটো অনেক ব্যাপার আছে। বউকে কনসার্টে নিয়ে যাওয়া, তার জন্মদিন বা নামকরণ দিন স্মরণে রেখে ভালোমন্দ কিছু-একটা সওগাৎ নিয়ে আসা, বিবাহের বর্ষাবর্তনের দিন হৈ-হুল্লোড় করে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে উত্তমরূপে সমাধান করা—এ-সব কিছুই লেওনের স্মৃতিতে আসে না। আম্নালির গভীর গর্ভে এসব জিনিস ডুবে গিয়ে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ।

হঠাৎ এক সকালে লেওনে ব্রেক্‌ফাস্ট খেতে এসে দেখেন, তাঁর পেলেটের উপর ছোট্ট একটি চিরকুট।

এবং ইতিমধ্যে তাঁর মত আপন-ভোলা লোকও লক্ষ্য করলেন, যে-বউ সদাসর্বদা তাঁর ব্রেক্‌ফাস্ট তৈরী করে দিত, সেও সেখানে নেই।

চিরকুটটি খুলে পড়লেন, "আমি তোমার ভবন পরিত্যাগ করলুম। অপরাধ নিয়ো না।"

ডাক্তার হতভম্ব।

তারপর রাম-গবেটের মত তোৎলাতে তোৎলাতে যা শুধলো তার বিগলিতার্থ, এ-রকম একটি সর্বগুণসম্পন্না মহিলা যিনি তাঁর আপন দয়িতের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন পেয়েছেন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন?

আবার নূতন করে বুঝতে পারলুম, আমাদের এই মাইডিয়ার লার্নেড ডাক্তারটি হয়তো তাঁর চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞানপ্রসাদাৎ মড়াকে জ্যান্ত করতে পারেন, কিন্তু জ্যান্ত লোক যে দৈহিক মৃত্যু ভিন্ন অন্য নানাভাবে মরতে পারে—কএস যেরকম লায়লীকে ভালোবেসে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়ে লোকমুখে প্রচারিত মজনূন (যার স্কন্ধে জিন্=ভূত চেপেছে) উপাধি পান—এ-সবের কোনো এনট্রি তাঁর জীবনের খাতাতে নেই। তাঁর কাছে সব-কিছুই সরল

সিলজিমে প্রকাশ করা যায় ঃ—

ডাক্তার শহ্‌র্‌-ইয়ারকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছেন।

শহ্‌র্‌-ইয়ার ডাক্তারকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছে।

অতএব এঁদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ আসতে পারে না।

কিউ ই ডি!!!

প্রভু যীশু নাকি বলেছেন, শুধু রুটি খেয়েই মানুষ বাঁচে না, ঠিক তেমনি বলা যেতে পারে দাম্পত্যজীবনে শুধু প্রেম দিয়েই পেট ভরে না।

কিন্তু এসব তত্ত্বকথা ডাক্তারকে এখন বলে আর কি লাভ? মেঘে মেঘে যে বেলা হয়ে গিয়েছে।

বললুম, 'ডাক্তার, আমাকে অনেকেই শুধোয়—বিশেষ করে আমার মস্তান চেলারা শুধোয়, কোন্ দেশের রমণী আমাকে সব চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। কী প্রশ্ন? আমি কি দেশে দেশে কান্তা, দেশে দেশে প্রিয়া করে বেড়িয়েছি না কি যে, এর পাকি উত্তর দেব! তবে নিতান্ত 'হাই-কোর্ট' মাত্রই দেখি নি বলে চোখ কান খোলা ছিল। এবং লক্ষ্য করেছি, স্পেন আর ইতালির মেয়েরা হয় তেজী আর স্বামী হ'ক প্রেমিক হ'ক তার উপর যে হক্‌ক বর্তায় সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানটি হয় খুবই টনটনে—ভয়ঙ্কর জেলাস। 'অভিমান' শব্দের ইংরিজি প্রতিশব্দ নেই, ইতালি ভাষায়ও খুব সম্ভব নেই। তবু ইতালির নিম্নশ্রেণীতে হিংসুটে রমণী প্রতি গলিতে গণ্ডায় গণ্ডায়, আর ভদ্রসমাজে অভিমানিনীরা অভিমানের চূড়ান্তে পেঁছে আত্মহত্যাতে বোধ করি জাপানীদেরও হার মানায়। কাএতানির বউ এক অর্থে আত্মহত্যাই করলেন, এবং করলেন একটি জলজ্যান্ত খুন। কিন্তু এহ বাহ্য।

লেওনের মনে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-সম্বন্ধে সবিস্তর সংবাদ কেউই দিতে পারে নি। তবে তাঁর পরবর্তী আচরণ থেকে এ-সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়।

আন্নালির দশাংশের একাংশ তখনো শেষ হয় নি।

তার পর একদিন লেওনে ইতালি থেকে উধাও। কেউ জানে না কোথায় গেছেন।

তার কিছুদিন পরে খবর এল লেওনে তাঁর বিরাট জমিদারী বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে চলে গেছেন দূরের চেয়ে দূর সুদূর ক্যানাডায়। সেখানে সামান্য জমি-জমাসহ একটি কুটির খরিদ করেছেন। বনের ভিতর।

সেখানে দিন কাটান কি করে?

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জলের ধারে, বঁড়শি ফেলে।

কে জানে মাছ ধরা পড়তো কিনা।

আর তাঁর হাজার হাজার বই—অন্তত ত্রিশটি ভাষায়—যার উপর নির্ভর

করে, যে সব ইঁট-সুরকি দিয়ে তিনি তাঁর আন্নালি কুৎবামিনার গড়ে তুলেছিলেন ?

জানি নে। কিন্তু এ-কথা জানি, তিনি ক্যানাডা যাবার সময় একখানা বইও সঙ্গে নিয়ে যান নি।'

ডাক্তার বললেন, সে কি কথা ? তাঁর সমস্ত সাধনা বিসর্জন দিলেন ?'

'তাই তো বললুম, লেওনের বউ তাঁকে ছেড়ে যাবার সময় খুন করে গেলেন, পণ্ডিত লেওনেকে। আর যেহেতুক পণ্ডিত লেওনেই ছিলেন লেওনের চোদ্দ আনা সত্তা তাই বলা যেতে পারে, তিনি লেওনেকেই খুন করলেন।

তিনি যেন যাবার সময় বলে গেলেন, "আন্নালিই যদি তোমার আরাধ্য দেবী হন, তবে আমার স্থান কোথায় ?"

লেওনে যেন উত্তরে বললেন, "তুমিই ছিলে আমার জীবনের আরাধ্যা। আন্নালি নয়। প্রমাণ ? সেই অসমাপ্ত আন্নালি-প্রতিমাকে ভেঙে চুরমার করে চললুম নিরুদ্দেশে।"

এবং আমার মনে হয়, লেওনে যেন পত্নীর উদ্দেশে বলতে চেয়েছিলেন, "তুমি রোমান সমাজের উচ্চশিক্ষিতা রমণী হয়েও বুঝতে পারলে না, আমি কাকে কোন্ জিনিসকে কতখানি মূল্য দিই!"

এ-কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই নয়।

লেওনে কিন্তু তাঁর তাবৎ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করতে পারেন নি বা তাঁর সেদিকে হুঁশ ছিল না। কাজেই দশ-দশ বিরাট ভলুমে বেরুলো তাঁর আন্নালির অতিশয় অসমাপ্ত অংশ। আরবী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা সেটিকে রাজমুকুটের কুহ্-ই-নূরের মত সম্মান দেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা আন্দেশা করতে লাগলেন, লেওনেকে কি করে সেই পাণ্ডববর্জিত ক্যানাডা থেকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় তাঁকে সুস্থ স্বাভাবিক করা যায়—যাতে করে অন্তত তিনি তাঁর আন্নালি সমাপ্ত করে যান।

এক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবদের সাধারণ সম্মেলনের পর পণ্ডিতরা গোপন বৈঠকে বসে স্থির করলেন কয়েকজন সমঝদার গেরেম্ভারী বৃদ্ধ পণ্ডিতকে পাঠাতে হবে, ডেপুটেশন, লেওনের কাছে। এঁদের সবাইকে বিনয়ী লেওনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এঁরা আপন আপন খরচে পৌঁছলেন, পৃথিবীর সেই সুদূর অন্য প্রান্তে ক্যানাডার ভ্যানকুভারে—বিনু নোটিশে। লেওনে সবাইকে তাঁর সরল অনাড়ম্বর কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন।

ডেপুটেশন ডিনারের পর কফি-লিকোর খেতে খেতে অতিশয় যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতে, তাঁদের সমস্ত ধার, সমস্ত ভার, লেওনের স্কন্ধে নামিয়ে কি সব উপদেশ দিয়েছিলেন, কি সব অনুনয়বিনয় করেছিলেন তার কোনো প্রতিবেদন বা রিপোর্ট নেই, তবে আমি কল্পনা-রাজ্যে উড্ডীন হয়ে কিছুটা অনুমান করতে

পারি। কিন্তু আমার অনুমানে কি যায় আসে! এ যে এক বিরাট ট্রাজেডি। এ তো শুধু দুটি নরনারীর ব্যক্তিগত মান-অভিমান বিরহ-মিলন এবং সর্বশেষে অন্তহীন বিচ্ছেদের কাহিনী নয়—যেটা হর-আকছারই হচ্ছে—এখানে যে তার বাড়া রয়েছে, অকস্মাৎ অকালে ঐকটি প্রজ্ঞাপ্রদীপের অন্ধকারে নিলয়। শুধু পণ্ডিতজন না, য়ুরোপের বহু সাধারণ জনও আশা করেছিল, লেওনের আন্নালির জ্যোতিঃ ইসলাম-ইতিহাসের বহু অন্ধকার গুহাগহ্বর প্রদীপ্ত করে তুলবে—কারণ লেওনে লিখতেন অতিশয় সাদামাটা সরল ইতালিয় ভাষা।

ডেপুটেশনের সর্ব বক্তব্য লেওনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে শুনে বললেন, কয়েকদিন চিন্তা করে তিনি ডেপুটেশনকে তাঁর শেষ মীমাংসা জানাবেন।

ডেপুটেশন দেশে ফিরে গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও তাঁরা লেওনের তরফ থেকে কোনো চিঠি পান নি।

লেওনে কাএতানি তাঁর খোলস দেহটি ত্যাগ করে ইহলোক ছাড়েন ক্যানাডাতেই, খৃষ্ট জন্মদিবসে, বড়দিনে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁর জন্ম রোম শহরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। আমার গুরু আমাকে এ-কাহিনীটি বলেন লেওনের মরজগৎ ত্যাগ করার প্রায় এক বৎসর পূর্বে।

যুদ্ধে মিসিং জোওয়ানের মা যেরকম বছরের পর বছর নিস্তব্ধ, সহিষ্ণু প্রতীক্ষা করে, তার দুলাল একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, আমার গুরু আরবী শাস্ত্রে অতুলনীয় পণ্ডিত, স্নেহময়ী মাতার ন্যায় বহু বৎসর ধরে প্রতীক্ষা করতেন লেওনে একদিন আবার তাঁর ক্যানাডার অরণ্যানীর বনবাস ত্যাগ করে ফিরে আসবেন তাঁর মাতৃভূমি ইতালীতে। তার পর অধ্যাপক গুনগুন করে যেন আপন মনে বলতেন, "লেওনের মত এরকম স্পর্শকাতর লোক কি আমৃত্যু বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে থাকবে? নাঃ, হতেই পারে না। সে নিশ্চয়ই মৃত্যুর পূর্বে রোমে ফিরে আসবে। যাতে করে তার হাড্ডিগুলো তার মায়ের হাড্ডিগুলোর পাশে শেষ-শয্যায় শয়ান করা হয়।" কিন্তু আমার গুরুর এ দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি।'

ততক্ষণে ডাক্তার আবার খানিকটে সম্বিতে ফিরে এসে কি যেন শুধোচ্ছে। আমি ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে বললুম, 'ব্যস, আমরা মেডিকেল কলেজে পেঁৗছে গিয়েছি। এবারে আমি পাবলিশার্সদের কাছে যাচ্ছি।'

মনে মনে বললুম, বুদ্ধুটা এখনো যদি না বোঝে আমি কোন্ দিকে নল চালাচ্ছি, তবে ঝকমারি, ঝকমারি, হাজার বার ঝকমারি।

পনরো

প্রকাশকদের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এস্থলে অবান্তর।

তবে এস্থলে এ-বাবদে একটি কথা বলতে হয়। শহ্‌র্‌-ইয়ারদের বিস্তর টাকাকড়ি। আমার অর্থাভাব সে ভালোভাবেই বুঝতো, কিন্তু বুদ্ধিমতী রমণী বলে আরো জানতো আমাকে কোনো প্রকারের সাহায্য করতে চাইলে আমার আত্মাভিমানে লাগবে।

একদিন তাকে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলুম, 'আমি জীবনে সাতবার না আটবার ক'বার চাকরি রিজাইন দিয়েছি বলতে পারবো না। কারো সঙ্গে আমার বনে না। যখন চাকরিতে থাকি, তখন 'সাহিত্য-সৃষ্টি'র কোনো কথাই ওঠে না। মাইনের টাকা তো আসছে। বই লেখার কী প্রয়োজন? চাকরি যখন থাকে না, তখন 'পঞ্চতন্ত্র', 'শব্‌নম্‌' এসব আবোলতাবোল লিখতে হয়।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার তাজ্জব হয়ে শুধিয়েছিল, 'আপনি শুধু টাকার জন্য লেখেন!'

আমি বলেছিলুম, 'এগ্‌জ্যাক্‌ট্‌লি! মোস্ট্‌ সার্টেন্‌লি!'

তারপর বলেছিলুম, 'জানো, শহ্‌র-ইয়ার, এ-বাবদে অন্তহীন সাহিত্যাকাশে আমিই একমাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারকা নই। মহা মহা গ্রহ-উপগ্রহও ঐ একই নভোমণ্ডলে বিরাজ করার সময় বলেছেন, লজ্জাঘৃণাভয় অনায়াসে তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, কথাগুলো আমার ঠিক ঠিক মনে নেই, তবে মোদ্দা কথা এই, "নান্‌ বাট্‌ এ ফুল রাইট্‌স একসেপ্ট ফর মানি" অর্থাৎ "অর্থাগম ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে শুধু গাড়োলরাই।" স্বয়ং ডক্টর জনসন বলেছেন, "আমি লিখি টাকার জন্য!" বুঝলে ইয়ার, 'শহ্‌র-ইয়ার?'

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করে শহ্‌র্‌-ইয়ার শুধিয়েছিল, 'আচ্ছা, কাল যদি আপনি দশ লক্ষ টাকার লটারি জিতে যান তবে কি করবেন?' (আমি জানতুম, ডাক্তারের জমিদারী, কলকাতার গণ্ডা গণ্ডা বাড়ি থেকে প্রতি মাসে ওদের দশ-পনরো হাজার টাকা আমদানি হয়, আর ব্যাঙ্কে আছে দশ-পঁচিশ লাখ)।

আমি সোল্লাসে বললুম, 'দশ লাখ? পাঁচ লাখ পেলেই আমার কাজ হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে কালি কলম কাগজ পুড়িয়ে দিয়ে বলব, বাঁচলুম। এখন থেকে লিখব শুধু প্রেমপত্র, আর, আর চেকের উল্টো দিকে নাম সই।'

শহ্‌র-ইয়ার টাকাকড়ি বাবদে বড়ই অনভিজ্ঞা। শুধলো, 'চেকের উল্টো-পিঠে সই, তার অর্থ কি?' আমি লক্ষ্য করলুম, প্রেমপত্র নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন শুধলো না। আর চেক্‌ফেক্‌ তো তার স্বামীর নায়েব সই করে। সে-সব জিনিস তার জানার কথা নয়।

বললুম, 'চেকের উল্টোপিঠে সই, মানে, সে-টাকা আমি পাবো। আর এ-পিঠে সই, তার মানে টাকাটা আমাকে দিতে হচ্ছে। জানো না, দিশী ছড়া:—

"হরি হে রাজা করো, রাজা করো।
যার ধারি তারে মারো॥
যার ধারি দু'চার আনা,
তারে করো দিন-কানা।
যার ধারি দু'শ চারশ'
তারে করো নির্বংশ॥"

বুঝলে চেকের এ-পিঠে সই করার প্রতি আমার অনীহা কেন?'

এস্থলে বলে রাখাটা প্রয়োজন মনে করি যে, আমার যে ক'টি ইয়েসমেন চেলা আছে, তারা সবাই তখন বলে, "না, স্যর! আপনার দশ লাখ টাকা পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। ভগবান করুন, আপনার যেন চাকরি না জোটে। তাহা হইলে আপনি লেখনী বন্ধ করিবেন না। ফলস্বরূপ বঙ্গসাহিত্য শ্রীবৃদ্ধিশালী হইবেক, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে উচ্চাশ্রমে প্রবেশ করিবেক।"

কিন্তু শহর্-ইয়ার এস্থলে সে-বুলি আওড়ালো না। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। বিলক্ষণ জানে, আমার 'সাহিত্যসৃষ্টি' সাম্প্রতিক যত মূল্যই ধরুক তার দীর্ঘস্থায়ী মূল্য নাও থাকতে পারে।

তা সে যাই হোক, প্রকাশকের কাছে দরিদ্র লেখকের দু'পাঁচ টাকার জন্য ধন্নে দেওয়াটা সে বিতৃষ্ণার সঙ্গে শুনে যেত। তার সহানুভূতি ছিল লেখকের সঙ্গে।

তাই জানতুম সে আমাকে শুধোবে না, আমি টাকা পেলুম কি না।

ড্রাইভার যখন বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীটে পেঁছিল তখন তাকে বললুম, 'তুমি বাড়ি যাও, আমি ট্যাক্সি ধরে ফিরব। মা-জী পীরের বাড়ি যাবেন। গাড়িটার দরকার হবে।'

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "কিন্তুক সায়েব যে বললেন, আমি আপনার জন্য গাড়িটা রাখি।"

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ড্রাইভারও শহর্-ইয়ারের এই গুরু নিয়ে মাতামাতি পছন্দ করে না।

তাই দৃঢ় এবং মোলায়েম কণ্ঠে বললুম, 'না, ভাই, তুমি বাড়ি যাও।'

ড্রাইভারকে শুধিয়েছিলুম, পীরের নাম ঠিকানা কি?

ঘণ্টাখানেক পরে সেই উদ্দেশে রওয়ানা দিলুম।

আমার এক মুসলমান চেলা একদিন আমাকে বলেছিল, সে নাকি তার এক ল্যাটাই-ভক্ত দোস্তের পাল্লায় পড়ে সেই দোস্তের পীর দর্শনে যায়। গিয়ে তাজ্জব মেনে দেখে, গুরু বসে আছেন একটা বিরাট হলের মাঝখানে। আর তাঁকে ঘিরে গোটা আণ্টেক রূপসী ছুঁড়ী দাঁড়িয়ে। তাদের উত্তমাঙ্গে ব্লাউজ-চোলী

নেই। ক্ষণে ক্ষণে শাড়ি খসে পড়ে গিয়ে বক্ষঃস্থল অনাবৃত করে দিচ্ছে। কেউ তখন শাড়ি তোলে, কেউ তোলে না। আর গুরু বলছেন, 'এই দেখো, আমি চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, কিন্তু আমার ঘি গলছে না।'

আমি ভেবেছিলুম, অতখানি না হলেও অনেকটা ঐ রকমেরই হবে। শহর-ইয়ার নিশ্চয়ই কোনো বুজরুক শার্লাটেনের পাল্লায় পড়েছে।

বিরাট গৃহে বসে আছেন পীরসাহেব। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে হতভম্ব।

পীরটি তো আমার প্রাচীন দিনের বন্ধু আমীনুর রশীদ মজুমদার !!

ষোল

আমি স্তম্ভিত।

আমি বেকুবের মত বাক্যহারা। এমন কি পীরসাহেবকে সেলামটা পর্যন্ত করতে ভুলে গিয়েছি। পীর মানি আর নাই মানি, স্বেচ্ছায় পীরের আস্তানায় গিয়ে তাকে সেলামটা পর্যন্ত করলুম না, এতখানি বেয়াদব, বেতমীজ মস্তান আমি নই।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নি। পার্ক সার্কাস আমার চেনা পাড়া। পীরমুর্শিদরা সচরাচর এ-পাড়াতেই আস্তানা গাড়েন। আমার এক পুত্রবৎ সখা মুসলমান ছেলে, কাঁচবাবু যে আমাকে একদিন বলেছিল, ঐ পীরসাহেবের কথা, গিয়ে দেখেছিল পীরসাহেবের চতুর্দিক গোটা আণ্টেক খাপসুরত ডপকী হুরী তাঁর চতুর্দিকে তাঁকে ঘিরে বসে আছে। আর তিনি নাকি ক্ষণে ক্ষণে উদ্বাহু হয়ে বলছেন, 'এই দেখো, এই দেখো, আমার চতুর্দিকে আমি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, কিন্তু আমার ঘি গলছে না, আমার ঘি গলছে না।' কাঁচবাবু নাকি এক্কেবারে বেবাক নির্বাক হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি কিন্তু সেভাবে হতভম্ব হই নি।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় মনে হয়েছিল, একতলাতে বাড়ির মালিক সপরিবার বাস করেন, দোতলাতে পর্দা চিক ঝিলিমিলির প্রাচুর্য থেকে অনুমান করলুম, এখানে পীরসাহেবের শিষ্যারা আলাদা ভাবে থাকেন, আসেন।

তেতলায় যে ঘরে পীরসাহেব বসে আছেন সেটি অনাড়ম্বর। খানচারেক তক্তপোশ মিলিয়ে একটি ফরাশ। পীরসাহেব ছোট্ট একটি তাকিয়াতে হেলান দিয়ে ঐ তক্তপোশেই উপবিষ্ট কয়েকজন শিষ্যকে কি-একখানা চটি বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

তক্তপোশের এ-পারে কয়েকখানি চামড়ামোড়া আরাম-কেদারা।

এ-সবেতে হতভম্ব হবার মত কিছু নেই।

পীরসাহেবের চতুর্দিকে ঘি-গলানেউলী অষ্টরমণী নেই, এমন কি চিত্রে

খৃস্টান সেন্টদের মস্তকের চতুর্দিকে যে 'হেলো' বা 'জ্যোতিঃচক্র' থাকে সেটি পর্যন্ত তাঁর মস্তক ঘিরে নেই।

লৌকিক, অলৌকিক, কুলৌকিক কোনো কিছুই নেই। অত্যন্ত সাদামাটা পরিস্থিতি।

আমি স্তম্ভিত হলুম পীরসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি আন্দেশা করেছিলুম, দেখতে পাবো এক বুজরুক, ভণ্ড, শার্লাটেন। আমারই ভুল, আমারই বোঝা উচিত ছিল, শহ্‌রু-ইয়ার এ-রকম কাঁচা মেয়ে নয় যে বুজরুকি দেখে বানচাল হবে।

আমি অবাক, এই পীরটি আমার সাতিশয় পরিচিত জন।

বছর পঁচিশেক পূর্বে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর খ্যাতনামা পুত্র, পণ্ডিত বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের বাড়িতে—বরদায়; বিনয়তোষ ও আমি তখন বরদাতে সরকারী কর্ম করি। পীর খাঁটি বাঙালী মুসলমান।

শহ্‌রু-ইয়ারকে মনে মনে পুনরায় সানন্দ নমস্কার জানালুম। বাঙালী মাত্রই —কী হিন্দু, কী মুসলমান—হরবকত তাকিয়ে থাকে পশ্চিমবাগে। কন্নৌজের ব্রাহ্মণগুরু, দিল্লীর মুসলমানপীর এঁরা যেন এই 'পাপ' বঙ্গদেশে আসেন পশ্চিমের কোনো-এক 'পুণ্যলোক থেকে। একমাত্র কাবুলে দেখেছি, সেখানকার হাজার ষাটেক হিন্দু পূববাগে তাকায়, কারণ পশ্চিমবাগে তো আর কোনো হিন্দু নেই। তাই প্রতি দু'তিন বৎসর অন্তর তাদের এক গুরু আসেন বৃন্দাবন থেকে। তাদের মন্ত্র নেওয়া প্রাচ্চিত্তির-ফিত্তির করা বছর দুয়েকের জন্য বন্ধ থাকে।

শহ্‌রু-ইয়ারের হৃদয় মন গড়ে দিয়েছেন বাঙালী রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মক্ষেত্রে সে যখন অবতরণ করলো তখন সে বরণ করেছে, বাঙালী পীর। বাঙালী পীরই তো বাঙালী রমণীর অভাব-অপরিপূর্ণতা বুঝতে পারবে সব চাইতে বেশী। শহ্‌রু-ইয়ার পশ্চিমবাগে তাকায় নি।

এই পীরটির নাম— অবশ্য তখনো তিনি পীর হন নি—আমীনুর রশীদ মজুমদার। তিনি গুজরাতে এসেছিলেন মধ্যযুগের পীরদের আস্তানার সন্ধানে। কবীর, দাদু, জমাল কমাল, বুড্ঢন্ এঁদের অনেকেই তাঁদের হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতিমূলক মতবাদ প্রচার করেন গুজরাতে। তদুপরি বরদার অতি কাছেই নর্মদা নদী বয়ে যাচ্ছেন। হিমালয়ে প্রধানত থাকেন সাধু-সন্ন্যাসী। নর্মদার পারে পারে থাকেন পীর-ফকীর সাধু-সন্ন্যাসী দুই সম্প্রদায়। স্বর্গত অরবিন্দ ঘোষ বরদায় অধ্যাপনা করার সময় প্রতি শনি-সোম কাটাতেন নর্মদার পারে পারে উভয়ের সন্ধানে।

এই আমীন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে তখনই বুঝে গিয়েছিলুম যে, বিনয়-তোষ সত্যই একটি সত্যান্বেষীকে বাড়িতে এনেছেন তাঁর চিন্তাধারা তাঁরা

অভিজ্ঞতা জানবার জন্য।

বিনয়তোষের ধর্মপত্নী ছিলেন ভূদেববাবুর আদর্শ ছাড়িয়েও প্রাচীনতরা হিন্দু-গৃহিণী। এদিকে পুজোআচ্চা ব্রত-উপবাসে পান থেকে চুন খসতো না, ওদিকে দরিদ্রনারায়ণ অতিথি সেবার বেলা তিনি বিলকুল নিষ্পরোয়া 'মুচি-মোচরমান' ডোমচাঁড়ালের সেবা করে যেতেন। বিরাট কাঁসার থালায় তিনি আমীনুর রশীদ মিঞার সেবা করলেন।

বিনয়তোষের অনুরোধে তাঁর ওপেল গাড়িতে করে মিঞাকে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি একটি নিম্নবস্তী অশান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন।

আমি একটু আবছা আবছা ভাবে যেন ক্ষীণস্ফুট আত্মচিন্তা করলুম, 'এখানে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না?'

আমীন সাহেবের স্মিতহাস্যটি বড় মধুর এবং কিঞ্চিৎ রহস্যময়। বললেন, 'তেমন কি আর অসুবিধে। এদের অধিকাংশই মুসলমান। কাপড়ের মিলে কাজ করে। মদ খায়, জুয়ো খেলে আর বউকে ঠ্যাঙায়। কিন্তু আমার মত বেকারের প্রতি তাদের স্নেহ আছে প্রচুর। তবে মাঝে মাঝে বড্ড বেশী চিৎকার হৈহুল্লোড়ের দরুন আমার কাজের একটু-আধটু অসুবিধে হয় বৈ কি!'

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে শুধিয়েছিলুম, 'আপনার কাজটা কি?'

রশীদ সাহেব কোনো উত্তর দেন নি। আমি অনুমান করলুম, তিনি যে শুধু নর্মদার পারে পারে তত্ত্বানুসন্ধান করছেন তাই নয়, খুব সম্ভব ধ্যানধারণা, জিকর্-তসবী, যোগাভ্যাস, সুফী-চিত্তবৃত্তি-নিরোধও করে থাকেন

অতিশয় সবিনয় কিন্তু কিন্তু করে নিবেদন করলুম, 'আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন না।'

'কী দরকার! এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। আপনাদের অসুবিধে হবে হয়তো।'

আমি বললুম, 'আমি তো একা থাকি। মাত্র একটি পাচক আছে। তবে সে মাছ-মাংস ছোঁয় না। ফলে আমিও বাড়িতে নিরামিষাশী। আপনার একটু কষ্ট হবে। আর আমার দিন কাটে কলেজে। অপরাহ্ণ আর রাত্রির এক যাম কাটাই আমার পাশী সহকর্মী অধ্যাপক ওয়াড়িয়ার বাড়িতে।'

জানি নে, হয়তো এই নিরামিষের চ্যালেঞ্জ মৎস্যভুক বঙ্গসন্তানকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসে।

কিন্তু আমীন মিঞা যদিও মাঝে মাঝে আমাকে নর্মদার পীর-ফকির সাধু-সন্ন্যাসীদের কাহিনী শোনাতেন তবু তিনি ছিলেন ঘোরতম সংসারী। প্রতি ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে পাচক ইন্দ্ররায়কে নিয়ে বেরুতেন বাজারে। কেনা-কাটা সেরে বাড়ি ফিরে কুটনো কুটতেন, কয়লা ভাঙতেন, উনুন ধরাতেন আর

ইন্দ্ররায়কে হাতেকলমে বাতলাতেন কি প্রকারে ছানার ডালনা, ধোঁকার ঝোল, বাড়ির চচ্চাড় তৈরি করতে হয়।

আমি অত বোকা নই। আমি বুঝে গিয়েছি, তিনি কারো স্কন্ধারোহণ করে মুফতে থাকতে চান না। বরং যদ্যপি আমি সংসার চালানো বাবদে একটা আস্ত অগা, তথাপি লক্ষ্য করলুম, চিরকুমারকে বিবাহ বাবদে উৎসাহিত করে লোকে যে বলে, 'টু ক্যান লিভ্ অ্যাজ চীপলি অ্যাজ ওয়ান'—স্বামীস্ত্রীর যা খরচা অবিবাহিত পুরুষেরও সেই খরচা—সেটা কিছু মিথ্যে প্রলোভনকারী স্তোকবাক্য নয়। দু'জনার খরচাতে তিনজনেরও চলে। তদুপরি তখন ছিল সস্তাকড়ির বাজার।

বড় আনন্দে বড় শান্তিতে কেটেছিল ঐ ছ'টি মাস। কখনো আমীন মিঞার ঘরে, কখনো ৺বিনয়তোষের বারান্দায়, কখনো ওয়াডিয়ার রকে আমাদের চারজনাতে নানাপ্রকারের আলোচনা হতো। সবচেয়ে মজার লাগত, বিনয়তোষ তন্ত্রঘেঁষা, আমীন মিঞা ভক্তিমার্গের সুফী, আর বরদা-আহমদাবাদ, সুরাট-বোম্বাইয়ের তাবজ্জন জানতো, চার্বাকের পর সোহরাব ওয়াডিয়ার মত পাঁড় নাস্তিক কস্মিনকালেও ইহভুবনে অবতীর্ণ হন নি।

তারপর একদিন আমাদের কাউকে, এমন কি তাঁর জান দিলের দোস্তো ইন্দ্ররায়কে ছায়ামাত্র আভাস-ইঙ্গিত না দিয়ে আমীন মিঞা এক গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রে নিরুদ্দেশ। জানতুম, অনুসন্ধান বৃথা, তবু আমরা তিনজনাই মাঝে-মধ্যে সেটা করেছিলুম। কোনো ফল হয় নি।

তার পরিপূর্ণ ত্রিশ বৎসর পর আবার আমাদের চারি চক্ষে মিলন।

পীরও কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন; তবে পীর, পুলিশ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার সংসারের এত শত বিচিত্র জিনিস দেখবার সুবিধে-কুবিধে পান যে তাঁদের অভিজ্ঞতার কেলাইডেস্কোপ যত বিচিত্র প্যাটার্নই তৈরী করুক না কেন এঁরা সংবিৎ হারান না। 'কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে, কোন্‌খানে কী দায় ঠেকাবে?' এই অপ্রত্যাশিতের আশা কবিদের—পীর পুলিশের নয়।

ততক্ষণে আমি সংবিতে ফিরেছি। আদব-মাফিক মাথা ঝুঁকিয়ে ওঁকে একটা সালাম জানিয়েছি। তিনি প্রত্যাভিবাদন জানালেন। যদিও আমার শোনা ছিল, বহু পীর বহু গুরু প্রতিনমস্কার করেন না।

কারণ এত রবাহুত, অনাহুত এমন কি অবাঞ্ছিত জনও পীরের ঘরে সুবোশাম্ আনাগোনা করে যে এক পলিটিশিয়ান ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণীর সাধ্য নেই যে, প্রত্যেককে ব্যক্তিগত 'সালামালিক' জানায়, বা 'শতংজীব' বলে।

আস্তানায় গিয়েছিলুম বেলা প্রায় চারটার সময়। ঐ সময় 'আসরের নামাজ' বা অপরাহ্ণকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। পীরসাহেব আসন ত্যাগ করে অন্য ঘরে

চলে গেলেন—অনুমান করলুম, নামাজ পড়তে। মুরীদান (শিষ্য সম্প্রদায়) পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে রওয়ানা হলেন। আমি 'কি করবো, কি করবো' ভাবছি এমন সময় একজন গেরেমভারী চেলা এসে আমাকে কানে কানে বললেন, 'হুজুর আপনাকে তসলিমাৎ জানিয়েছেন। হুজুরের নামাজ-ঘরে একটুখানি আসবেন কি?' যে সসম্ভ্রম-কণ্ঠে চেলাটি আমাকে দাওয়াৎ-সন্দেশটি জানালেন, তার থেকে অনায়াসে বুঝে গেলুম যে পীরের নামাজ-ঘর হোলি অব্ হোলিজ, সানথটুম-সানকটরুম, হিন্দু-মন্দিরের গর্ভগৃহপ্রায়। সেখানে প্রবেশাধিকার অল্পজনেরই। আর আমি প্রথম ধাক্কাতেই!

নামাজ-ঘরে ঢুকতেই পীর আমাকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর ঘরের এক কোণে পাতা একখানি সিলেটি শেতল-পাটিতে আমাকে বসালেন, নিজেও বসলেন। দু' একটি কুশল প্রশ্ন শুধিয়ে বললেন, 'আপনি একটু নাশ্তো করুন। ততক্ষণে আমি নামাজটি সেরে নি।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে কি করে হয়? আপনি নামাজ সারুন। তারপর একসঙ্গে খাব।'

অভিমানভরা কণ্ঠে পীর আমীন বললেন, 'এই তো আপনার সখার প্রতি ভালোবাসা, আর এই তো আপনার স্মৃতিশক্তি! আমি যে দিনে একবার খাই সেও ভুলে গেছেন?'

আমি বেহদ্ শরম পেলুম। এটা আমার মনে রাখা উচিত ছিল। তাই লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আমার মত মুর্খের মাথায়ও একটি মিথ্যা সদুত্তর জুটে গেল—নিছক আল্লার মেহেরবাণীতেই বলতে হবে। কারণ আসমান-জমীনে কে না জানে, মা সরস্বতী মুর্খকেই (যথা কালিদাস) হরহামেশা দয়া করেন; নইলে চালাকরা নিশ্চয়ই এতদিনে আমার মত কুল্লে বেওয়ারিশ বেকুবের সর্বস্ব গ্রাস করে, আমাদের 'সত্য নাশ' করে আমাদের পিতামহাশয়দের নির্বংশ করতো।

সেই কিস্মৎ-প্রসাদাৎ প্রাপ্ত কদুত্তরটি দিতে গিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললুম, 'তা-তা-তা, সে-সে, সে তখন আপনি—আপনি ছিলেন আমার গরীবখানায়—'

পীরের কপালে যেন হাল্কা মেঘের সামান্য আবছা পড়েছে। তাই দেখে আমি থেমে গেলুম। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আর এখন আমি পীর—না? এখন আমি যত খুশী গাণ্ডেপিণ্ডে গোগ্রাসে যত চাই তত গোস্ত গিলতে পারি—না?'

থেমে গেলেন। আমি আশংকা করেছিলুম, এর পর তিনি আমাকে খোঁটা দিয়ে বলবেন, 'তাই আমি পীর হয়েছি—না? চেলাদের ঘাড় ভেঙে তাদের মগজ দিয়ে মুড়ি-ঘণ্ট খাবো বলে—না?'

না। এ লোকটি যে অতিশয় ভদ্র।

আমি চুপ করে গিয়েছি দেখে বললেন, 'ভাই সৈয়দ সাহেব, আমি জানি, আপনি খাঁটি পীরের নাতি। আপনি কথার মুখে কথায় কথায় ওটা বলে ফেলেছেন।

আমি খুশী হয়ে বললুম, 'আমি যে পীরের নাতি সেটা মেহেরবাণী করে আর তুলবেন না, সেটা দয়া করে ভুলে যান। আপনি তো নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, ধর্মবাবদে আমি একটা আস্ত চিনির বলদ। ওটা দেখেছি, শুঁকেছি, ওর দরদাম নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি, কিন্তু ওটা ককখনো চাখি নি—খেয়ে দেখা তো দূরে।'

তিনি বললেন, 'এসব কথা পরে হবে; কেন আমি এখানে আছি, কেন আমি 'পীর' রূপে এখানে 'দর্শন' দিচ্ছি—'

ইতিমধ্যে সেই গেরেমভারী চেলা একটা বিরাট ট্রে নিয়ে এসে আমার পাশে রেখেছেন। তার উপর অতিশয় সযত্নে সাজানো দুখানি মুড়মুড়ে চেহারা তেকোনা পরোটা, গ্রেট্‌ ঈস্‌টারনের পাঁউরুটির মত ফোলানো টেবো-টেবো বিরাট একটি মম্‌লেট, ডুমো-ডুমো আলু-ভাজা, এবং কাঁচা-লঙ্কার আচার।

আমি আবার পেলুম দারুণ শক্‌। এ সব যা এসেছে এ তো আমার জন্য তৈরী করা শহ্‌র্‌-ইয়ারের ফেভারেট মেনু!

এ তো আমাদে উভয়ের প্রিয় মেনু!

কি করে শহ্‌র্‌-ইয়ার জানলো, আমি এখানে এসেছি?

কিন্তু এ-শক্‌টা সামলাতে না-সামলাতে পেলুম এর চেয়ে মোক্ষমতার দুসরা শক্‌।

পীরসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, শহ্‌র্‌-ইয়ার বানু।' আর কিছু না বলে খাটে উঠে নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন।

সতেরো

আমি মিরাক্‌ল্‌ বা অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় বিশ্বাস করি নে। যে ইরান কর্তাভজাগিরিতে ভারতের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে তারই এক গুণীজন হাফ-মস্করা করে বলেছেন:

'পীরেরা ওড়েন না, ওঁদের চেলারা ওঁদেরকে ওড়ায়।'

'পীরহা নমীপরন্দ্‌, শাগিরদান উনহারা মীপরানদ।'

বিশেষতঃ, এই পীর আমীন সাহেবকে আমি অন্তরঙ্গভাবে একদা চিনেছিলুম। তিনি যে এ-রকম একটা বাজে স্টান্‌ট্‌ মারবেন—খাস করে আমার উপর—যে, তিনি অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ধরে ফেলেছেন, আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের সন্ধানে এসেছি সেটা আমি বিশ্বাস করতে নারাজ। কাজেই সে-কথা পরে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

কিন্তু শহর্-ইয়ার জানলো কি করে যে আমি এখানে এসেছি?

সে নিজে পর্দা মানে না, কিন্তু পীরসাহেব যে তাঁর শিষ্যাদের সম্পর্কে কিছুটা মানেন সেটা দোতলার চিক্, পর্দা থেকে খানিকটে অনুমান করেছিলুম। কিন্তু সেই চিকের আড়াল থেকে শহর্-ইয়ার যে উঁকিঝুঁকি মারবে সে-রকম মেয়ে তো সে নয়। বরঞ্চ আজকের মত মেনে নিলুম, শহর্-ইয়ার অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হয়েছে। আজ বাড়ি ফিরে যদি কথা ওঠে, তবে সেই ইরানী গুণীর হাফ-মস্করাকে ডবল প্রমোশন দিয়ে তাকে বলবো—

'পীরেরা ওড়েন না, কিন্তু ওঁদের চেলাদের, বিশেষ করে 'চেলী'দের কেউ কেউ ওড়েন।'

'পীরহা নমীপরন্দ্, ওয়া লাকিল বা'জী শাগিরদান্ সখুসান জনানা মীপরন্দ্।'

এতে তাজ্জব বনবার মত কী'ই বা আছে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বজয় করেন নি কিন্তু তাঁর শিষ্য বাগ্মীরাজ বিবেকানন্দ করেছিলেন!

একজন নামাজ পড়ছেন, তার অনতিদূরে আরেকজন খাচ্ছে—এটা দৃষ্টিমধুর না হলেও ইসলামে বারণ নয়। হুঁঃ! বারণ হবে কেন? দূর-সম্পর্কের আমার ফুফুকে দেখেছি, বাচ্চার মুখে মাই তুলে দিয়ে তসবী-মালা জপ করতে।

আমি কোনো প্রকারের শব্দ না করে মিনিমামতম পরোটা খাচ্ছি—যদ্যপি শহর্-ইয়ারের আপন হাতে সযত্নে তৈরী (এটা ভুল বললুম, তাকে আমি অযত্নে কখনো কোনো কাজ করতে দেখিনি) খাস্তা, ক্রিস্প্, মুরমুরে পরোটা মর্মরধ্বনিবিবর্জিত কায়দায় খেতে পারাটা একটি মিনি-মিরাক্ল্—এমন সময় আমার চিন্তাম্বরের একপ্রান্তে একটি বিদ্যুল্লেখা খেলে গেল।

ওঃ! তোমার আপন বাড়িতে আমি কি খাই না-খাই সে-বাবদে তুমি আমার যত না দেখ-ভাল করো তার চেয়ে এখানে তোমার হুঁশিয়ারি ঢের বেশী টনটনে! গুরুর বাড়ির ইজ্জৎ; না?

অভিমানভরে হাত-চলা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার বিবেকাম্বরে আরেকটি সৎ বুদ্ধির বিদ্যুল্লতা শাখা-প্রশাখা মেলে দিল:

আমি কী নেমকহারাম! মাত্র অর্ধদিবস, তার চেয়েও কম, হয়তো সম্পূর্ণ অজানায়, সে বাড়িতে ছিল না বলে আমি আমার পরিচিত পরিচর্যা পাই নি। আর সঙ্গে সঙ্গে বেবাক ভুলে গেলুম তার এতদিনের দিল্-ঢালা খেদমৎ, প্রাণ-ভরা সেবা? ছিঃ! এ তো সেই প্রাচীন কাহিনীর নিত্যদিনের পুনরাবৃত্তি! যে-লোক একদা আমাকে হাতী দিয়েছে, ঘোড়া দিয়েছে, সে আজ বেরালটা দিল না বলে তন্মুহূর্তেই নিলাজ নেমকহারামের মত তাবৎ অতীতের অকৃপণ

দান ভুলে গিয়ে 'মার মার, কাট কাট' হুহুঙ্কার ছেড়ে তার পশ্চাতে খাণ্ডার নিয়ে তাড়া করা!

তদুপরি আরেকটা রীতি-রেওয়াজ মনে পড়ল। যদিও আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তবু বিশ্বস্তজনের কাছে শুনেছি, যে পীরের কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে সেখানেই মহিলা-শিষ্যারা আপন হাতে রান্নাবান্না করে, নাশ্‌তা বানিয়ে সমাগত জনের সেবা করেন। এ-রীতি তো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

যে কাজ যারা উত্তমরূপে করতে পারে বিধাতা তাদেরই স্কন্ধে সে কাজ চাপান।

নইলে তিনি শেয়ালের কাঁধে দিতেন সিংহের কেশর, বেরালকে দিতেন হাতীর শুঁড়।

শহ্‌র্‌-ইয়ার যে বস্তু সব-চেয়ে ভালো তৈরী করতে পারে সেইটেই করেছে।

মনে শান্তি পেলুম। পীর মিরাক্‌ল্‌ করতে পারুন আর না-ই পারুন, বহু তৃষিত নরনারী শুষ্ক হৃদয় নিয়ে যেখানে ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে সেখানে আল্লাতালা কিছু-না-কিছু শান্তির সুধাবারি বর্ষণ করবেনই করবেন!

এর সঙ্গে অবশ্য আরেকটি কথা যোগ দিতে হয়। শহ্‌র্‌-ইয়ারকে আমি দিনে দিনে, এতদিনে যে-ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, তারপর তার যে-কানো আচরণ—সে আপাতদৃষ্টিতে যতই অপ্রিয় হোক্‌—গ্রহণ করতে গোপনে গোপনে সে-হৃদয় সব সময়ই তৈরী। চোরাবাজারীর চোরাই মাল নেবার জন্য কালো-বাজারী যে-রকম তৈরী থাকে।

প্রসন্ন মনে আবার হাত চালালুম। পরোটার অন্যপ্রান্ত চুরমুরলুম।

অপরাহ্নের যে-আসরের নামাজ পীর পড়ছিলেন শাস্ত্রাদেশে সেটি হ্রস্ব।

পীরসাহেব পনেরো মিনিটের ভিতর নামাজ শেষ করে উঠলেন। আমি উঠে দাঁড়ালুম। তিনি ঘরের এক কোণ থেকে একটা ভাঁজকরা ডেক চেয়ার টেনে এনে আমার সামনে সেটি পেতে বসলেন।

আমি চুপ করে আছি। যদিও একদা তিনি আমার সখা ছিলেন তবু তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। বাক্যালাপ তিনিই আরম্ভ করবেন।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না; তিনিই বললেন, শহ্‌র্‌-ইয়ারের কথা ভাবছি।

আমার মনে সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরুদয় হলো, তিনি জানলেন কি করে, আমি শহ্‌র্‌-ইয়ারের সন্ধানে এখানে এসেছি? তবু চুপ করে রইলুম।

বললেন, 'আমার কাছে অনেক লোক আসে। মনে আছে আপনার, আমরা যখন একসঙ্গে বরদাতে বাস করতুম তখন একদিন আপনি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন?—

"ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটির তাহার ঘিরিয়া দাঁড়ালো লাখো নরনারী এসে।
কেহ কহে, 'মোর রোগ দূর করি মন্ত্র পড়িয়া দেহো',
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।
কেহ বলে 'তব দৈব ক্ষমতা চক্ষে দেখাও মোরে',
কেহ কয় 'ভবে আছেন বিধাতা বুঝাও প্রমাণ করে'।"

রবীন্দ্রনাথ মহান্ কবি। তিনি মানুষের কামনা-বাসনার সংক্ষিপ্ত একটি ফিরিস্তির ব্যঞ্জনা দিয়ে বাকিটা বিদগ্ধ পাঠকের কল্পনাশক্তির উপর বরাৎ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমাকে তো কল্পনা করতে হয় না। মানুষের সম্ভব অসম্ভব সব অভিলাষই আমাকে শুনতে হয়। বিশ্বাস করবেন কি, সৈয়দ সাহেব, জাল দলিলপত্র তৈরী করে, ভেজাল মোকদ্দমা রুজু করে আমার কাছে স্বেচ্ছায় অকপটে সেই কপটতা কবুল করে অনুরোধ জানায় আমি যদি তার জন্য সামান্য একটু দোওয়া করি তবে সে মোকদ্দমাটা জিতে যায়!'

আমি বিস্ময় মেনে বললুম, 'সে কি?'

ম্লান হাসির ইঙ্গিত দিয়ে পীর বললেন, 'উকীল, বৈদ্য আর পীরের কাছে কোনো কিছু লুকোতে নেই, এই হলো এদের বিশ্বাস। বিশেষ করে পীরের কাছে তো নয়ই। কারণ তিনি নাকি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে মনের গোপন কথা দেখতে পান! এক পীরসাহেব তো কোনো মেয়েছেলেকে সামনে আসতে দিতেন না, কারণ তাঁর "আধ্যাত্মিক" শ্যেনদৃষ্টি নাকি কাপড়জামা ভেদ করে সব কিছু দেখতে পায়!'

আমি বললুম, 'থাক!'

'আপনি তো জানেন, আমি পারতপক্ষে ভালোমন্দের যাচাই করতে যাই নে। তবু শুনুন, সেদিন এক মারওয়াড়ি জৈন এসে উপস্থিত। ওদিকে জৈন কিন্তু এদিকে করুণাময়ের করুণাতে তার অশেষ বিশ্বাস। লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বড় আনন্দ হলো। বড় সরল, অকপট, সজ্জন। ইতিমধ্যে শহর্-ইয়ার তাঁর জন্যে এক জাম-বাটি লস্সী পাঠিয়েছে। আমাদের কথাবার্তা সে বারান্দায় আড়ালে বসে শুনছিল। তার থেকে অনুমান করেছে, ইনি ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না, নইলে হিন্দু অভ্যাগতদের অনুমতি ভিন্ন সে কোনো খাবারের জিনিস ওঁদের সামনে পেশ করে না। আর আপনি তো জানেন, মেয়েটির দেহমনহৃদয় কতখানি সরলতা দিয়ে গড়া। সে মোহমুক্ত বলে প্রায়ই ভুল করে ভাবে ইহসংসারের সবাই বুঝি তারই মত সংস্কারমুক্ত।—শহর্-ইয়ারের কথা কিন্তু পরে হবে। এবারে সেই মারওয়াড়ি সজ্জনের কথা শুনুন। ...লস্সী সামনে আসতেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। আমি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললুম, "না, না, আপনাকে খেতে হবে না। আপনি হয়তো ব্রতত্র

পানাহার করেন না। সেটা তো কিছু মন্দ আচরণ নয়। আমিও তো বাড়ির বাইরে কোথাও খাই নে।” তখন তিনি কি বললেন জানেন? তিনি নিরামিষাশী। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, লস্সী আবার আমিষ হয় কি প্রকারে? তিনি যা বললেন তার অর্থ একটা পশুর রক্তমাংস নিংড়ে যে নির্যাস বেরয় সেটা সব চেয়ে কড়া আমিষ। তিনি খান—না, পান করেন সুন্দু মাত্র ডাবের জল। অন্য কোনো-কিছু খান না। সুন্দুমাত্র ডাবের জল খেয়ে লোকটি গত পঁচিশ বৎসর ধরে বেঁচে আছে!’

আমি বললুম, ‘এ-ধরনের ডায়েটিং হয়, সে তো জানতুম না।’

পীর বললেন, ‘আপনি ভাবছেন, আমি পীর ব’নে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি বলে আমার আর-কিছু জানবার নেই, শেখবার নেই! হাজার দফা ভুল! নিত্য নিত্য শিখছি। তার পর শুনুন বাকিটা। হঠাৎ, বলা নেই, কওয়া নেই, ভদ্রলোক দু’ হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে যা বললেন তার অর্থ, তাঁর ছেলেটা জাহান্নমে গেছে। মদমাংস মেয়েমানুষ নিয়ে অষ্টপ্রহর মেতে আছে। বুঝুন ব্যাপারটা, সৈয়দ সাহেব। যে-লোক মাছমাংস এমন কি দুধ পর্যন্ত না খেয়ে অজাতশত্রু হয়ে জীবনধারণ করতে চায়, তারই একমাত্র পুত্র হয়ে উঠেছে তার সব চেয়ে বড় শত্রু! তার পরিবারের শত্রু, তার বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যের শত্রু, পিতৃপিতামহের আচরিত ধর্মের শত্রু।

সর্বশেষে কাঁদতে কাঁদতে বললে, “আমি নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কোনো পাপ করেছিলুম, তার জন্য আজ আমি এই শাস্তি পাচ্ছি। আপনি আমার ছেলের জন্য দোওয়া করুন।”

বলুন তো, তার সঙ্গে তখন পূর্বজন্ম পরজন্ম আলোচনা করে কী লাভ! আর দোওয়া তো আমি সকলের জন্যই করি, আপনিও করেন, কিন্তু, আমি কি মিরাক্‌ল্ করতে পারি?’

তার পর পীর বেদনাপীড়িত কণ্ঠে বললেন, ‘কেন লোকে বিশ্বাস করে, আমি অলৌকিক কর্ম করতে সক্ষম!’

পীরসাহেব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন বলে আমাকে বাধ্য হয়ে সে-নীরবতা ভঙ্গ করতে হলো। বললুম, ‘আপনাকে এ-সব ব্যাপারে আমার কিছু বলতে যাওয়া গোস্তাকি হবে। অপরাধ নেবেন না। তবু বলি, এ-সব লোক আসে আপনার কাছে ভক্তি-বিশ্বাসসহ। আপনি তাদের জন্য দোওয়া-আশীর্বাদ করলেই তারা পরিতৃপ্ত হয়।’

পীর বললেন, ‘ঠিক। আমি তাই মারওয়াড়িকে বললুম, “আপনি শান্ত হোন।” তারপর তাঁকে এই নামাজের ঘরে এনে দু’জনাতে একাসনে বসে আল্লার কাছে দোওয়া মাঙলুম।’

এর পর পীর একদম চুপ মেরে গেলেন বলে আমাকে বাধ্য হয়ে শুধোতে

হলো, 'তার পর কি হলো ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তার পর দীর্ঘ তিন মাস ধরে সে ভদ্রলোকের আর দর্শন নেই।'

তারপর আমি শহর্-ইয়ারের মুখে খবর পেলুম, ছেলেটি নাকি সৎপথে ফিরে এসেছে, এবং সে-ভদ্রলোক আমাদের পাড়ার জরাজীর্ণ মসজিদটি নিদেন ত্রিশ হাজার টাকা খর্চা করে মেরামত করে দিয়েছেন। ঠিক ঠিক বলতে পারি নে, হয়তো আমি মুসলমান বলেই।

আচ্ছা এবারে বলুন তো, এর মধ্যে আমার কেরামতি—মিরাক্ল্ কি ?'

আমি আর কি বলি! কাকতালীয় হতে পারে, আল্লার অযাচিত অনুগ্রহ হতে পারে। কে জানে কি? আমি চুপ করে নিরুত্তর রইলুম।

পীরসাহেব তখন স্মিতহাস্য করে বললেন, 'শহর্-ইয়ার কিন্তু তখন কি মন্তব্য করেছিল জানেন ?

কিন্তু আমি অতশত নানাবিধ জিনিস আপনাকে বলছি কেন বলুন তো? ঐ সব শত শত হরেক রকমের লোকের মাঝখানে এখানে এল শহর্-ইয়ার। কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করবেন তো, শহর্-ইয়ার তখন কি মন্তব্য করেছিল ?'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে পীরসাহেব বললেন, 'ভক্ত কবীরের কাছে কে কি চেয়েছিল, সে তো জানেন। আমি কবীর সাহেবের পদধূলি হবার মত যোগ্যতাও ধরি নে, তবু আমারই কাছে কারা কি চায়, তার দুই প্রান্তের দু'টি এক্সট্রীম উদাহরণ আপনাকে দিলুম।

আজ পর্যন্ত আমি যে-সব পীরদের আস্তানায় ঘুরেছি, এবং আমার এই ডেরাতে যারা আসে, এদের ভিতর এমন একজনও দেখি নি, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দিল নিয়ে এসেছে। অবশ্য বেশ-কিছু লোক আসেন তথাকথিত 'শাস্ত্রালোচনা' করতে। সেও এক বিলাস, ফ্যাশান। তা হোক্। আল্লা পাক্ কার জন্য কোন্ পথ স্থির করে দিয়েছেন, তার কী জানি আমি!

এরই মাঝখানে এল শহর্-ইয়ার। এক মুহূর্তেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সে কোনো কামনা নিয়ে আসে নি। বিশ্বাস করবেন না, সে আজ পর্যন্ত একবারের মতও আমার সঙ্গে 'শাস্ত্রালোচনা' পর্যন্ত করে নি। এযাবৎ একটি প্রশ্নমাত্রও শুধোয় নি।'

আমি হতভম্ব হয়ে শুধোলুম, 'সে কি ?'

'হ্যাঁ। এটা আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় মনে হতে পারে। সেটার সমাধান হলো, একদিন যখন শুনতে পেলুম, শহর্ ইয়ার কার যেন প্রশ্নের উত্তরে জনান্তিকে বলছে, সে এমন কিছু জিনিয়াস নয় যে উদ্ভট নতুন কোনো প্রশ্ন শুধোবে। সে নাকি অতিশয় সাধারণ মেয়ে। তার মনে অতিশয় সাধারণ

প্রশ্নই জাগে। সেগুলো কেউ না কেউ আমাকে শুধোবেই। আমি উত্তর দেব। ব্যস্, হয়ে গেল। কী দরকার ওঁকে—অর্থাৎ আমাকে—বিরক্ত করে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা হলে সে আপনার শিষ্যা হলো কেন ?

পীরসাহেব একটু চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে বললেন, 'আমার কোনো শিষ্য-শিষ্যা নেই। আমি কখনো মুরশীদরূপে মন্ত্র দিয়ে কাউকে শিষ্য বা শিষ্যারূপে গ্রহণ করি নি !'

আমি হতভম্ব।

ইতিমধ্যে বিস্তর লোক পাশের ঘরে জমায়েৎ হয়েছে।

এবং সান্ধ্য নামাজের আজান শোনা গেল।

পীর এবার এদের সঙ্গে নামাজ পড়বেন। তারপর শাস্ত্রালোচনা তত্ত্বালোচনা হবে হয়তো।

আমি হতভম্ব অবস্থাতেই বিদায় নিলুম।

আঠারো

যা জানতে চেয়েছিলুম তার কিছুই জানা হলো না; কল্পনায় যে ছবি এঁকেছিলুম তার সঙ্গে বাস্তবের ফিঙার প্রিণ্ট একদম মিলল না। উল্টে রহস্যটা আরো ঘনীভূত হলো। কোনো-কিছুর সঙ্গে কোনো কিছুই খাপ খাচ্ছে না।

আমি কলকাতা থেকে আকছারই ট্রেনে করে বোলপুর যাই। একবার বোলপুর স্টেশনে ঢোকার পূর্বে সব-কিছু কেমন যেন গোবলেট্ পাকিয়ে গেল। কই, এতক্ষণে তো অজয় ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়িটা গম গম করে পেরবে, তার পরে বাঁ দিকে পুকুর, ডানদিকে জরাজীর্ণ একটা দোতলা—কই সে-সব গেল কোথায় ? উল্টে মাথার উপর দিয়ে হুশ করে একটা ওভারব্রিজ চলে গেল! এটা আবার রাতারাতি কবে তৈরী হলো! এখন হঠাৎ আমার হুঁশ হলো, এবারে আমি কলকাতা থেকে বোলপুর আসছি না, আসছি ভাগলপুর থেকে। অর্থাৎ আমি স্টেশনে ঢুকছি দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে নয়, উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভেল্কিবাজি। উত্তর হয়ে গেল দক্ষিণ, পুব হয়ে গেল পশ্চিম। বাইরের দুদিকের দৃশ্য ফটাফট্ ফিট করে গেল।

তবে কি আমি শহ্‌র্‌-ইয়ার রহস্যের দিকে এগুচ্ছিলাম উল্টো দিক দিয়ে ? তবে কি আমার অবচেতন মন প্রতীক্ষা করছিল, পীর আমার দিক্-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেবেন আর সঙ্গে সঙ্গে শহ্‌র্‌-ইয়ার রহস্য অর্থাৎ তার আকস্মিক গুরুধর্মের কাছে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ, সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঔদাস্য, ত্রিযামা যামিনী ব্যাপি জপ-জিক্‌র্‌—এসব তার পূর্ববর্তী জীবনের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে ফিট করে যাবে, সর্ব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে ?

বরঞ্চ পীর যে সব দু'টি একটি তথ্য পরিবেশ করলেন সেগুলো যেন চকিতে চকিতে বিজলী আলো হয়ে চোখেতে আরো বেশী ধাঁধা লাগালো।

সিঁড়ি দিয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে নামছি এমন সময় জানা-অজানায় লক্ষ্য করলুম, কালো নরুনপেড়ে শাড়ি-পরা একটি বৃদ্ধা মহিলা নেমে যাচ্ছেন। মনে হলো হিন্দু বিধবা। আকণ্ঠ রহস্যনিমজ্জিত অবস্থায়ও আমার মনে রক্তিভর কৌতুক সঞ্চারিত হয়ে মানসিক মৃদুহাস্য বিকশিত হলো।...কে বলে, এদেশে হিন্দু মুসলমান সুদ্দু ঝগড়া-ফসাদই করে! যান্ না, যে কোনো পীর-মুর্শিদ গুরু-গোসাঁইয়ের আস্তানায়। হিন্দু-মুসলমান তো পাবেনই, তদুপরি পাবেন গণ্ডাখানেক দিশী সাহেব, দু'চারটি খাস বিলিতি গোরা। তবে হ্যাঁ, কবিরাজ ওমর খৈয়াম বলেছেন, সর্ব ধর্মের সর্বোত্তম সম্মেলন পাবে শুঁড়িখানায়। সেখানে সব জাত, সব জাতি, সব ধর্ম সম্মিলিত হয়ে নির্বিচারে একাসনে বসে পরমানন্দে মদিরাপাত্রে চুম্বন দেয়।*

কিন্তু ভুললে চলবে না, সুফী-ফকীর সাধুসন্তরা সাবধান করে দিয়েছেন, এ-স্থলে মদিরা প্রতীক মাত্র, সিম্‌বল্। মদিরা বলতে এস্থলে ভগবদ্‌প্রেম বোঝায়। তাই তো পীর গুরুর আস্তানায় এত শত ছাপান্ন দেশের ইউ-নাইটেড নেশন, এবং তারো বাড়া, ইউনাইটেড রিলিজিয়ন ইউনাইটেড জাতবেজাতের সম্মেলন। এরা এখানে এসে জন্মগত পার্থিব সর্বপার্থক্য অগ্রাহ্য করে গুরুমুরশীদ—যিনি সাকী—তাঁর হাত থেকে ভগবদ্‌প্রেমের পেয়ালা-ভরা শরাব তুলে নেয়।...থাক্ গে এসব আত্মচিন্তা।

ততক্ষণে পেভমেণ্টে নেমে গিয়েছি।

সামনে দেখি একটা বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান মর্দ—কেমন যেন ঈষৎ চেনা-চেনা—একটা কালো মোটর গাড়ির স্প্রিং-ভাঙা দরজাটা নারকোলের সরু দড়ি দিয়ে বাঁধছে।

আমার পাশে ততক্ষণে সেই বৃদ্ধা হিন্দু বিধবাটি এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে সেই জোয়ান (মিলিটারি অর্থে নয়, রূঢ়ার্থে) তাঁর দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল আমার চোখের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই একে অন্যকে চিনে ফেললুম।...বেশ কয়েক বছর পর পুনর্মিলন।

এ তো আমার শ্বশুরবাড়ির দ্যাশের লোক! নাম, ভূতনাথ খান। 'খান'

---

* ইরানের এক গণ্যমান্য সভাকবি নাকি নিকৃষ্টতম শুঁড়িখানায় চাঁড়ালদের সঙ্গে বসে ভাঁড়ে করে মদ্যপান করছিলেন। নগরপাল মারফৎ খবরটা জানতে পেরে বাদশা নাকি অনুযোগ করাতে কবি একটি দোহা রচনা করেন:

"হাজার যোজন নিচেতে নামিয়া আকাশের ঐ তারা
গোষ্পদে হ'ল প্রতিবিম্বিত; তাই হ'ল মানহারা?"

শবনম্, পৃ ১০।

পদবী মুসলমানের হলেও ওটা ওদের সম্পূর্ণ একচেটে নয়। খান হিন্দুসন্তান।

'তুমি এখানে?' অবাক হয়েই শুধোলুম। খানকে আমি চিনি। মহা পাষণ্ড। দেবদ্বিজে ভক্তি নেই, পীর মুর্শিদের তো কথাই ওঠে না।

'আপনি এখানে?' সেও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। কারণ সে বিলক্ষণ জানতো আমি পীরটীরের সন্ধানে কখনো বেরুই না। খান ঝাণ্ডু ছোকরা। তাই পুরো পাক্কা 'তরুণ', 'মডার্ণ' হয়েও প্রাচীন প্রবাদে বিশ্বাস করে, কাগে কাগের মাংস খায় না।

বৃদ্ধাকে কোমরে জড়িয়ে ধরে সে তাঁকে মোটরের পিছনের সীটে বসালো, কোনো প্রকারের প্রতিবাদ না শুনে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে সামনে বসালে। স্টার্ট দিতে দিতে পিছনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, 'ঠাকুমা, এঁকে তুমি কখনো দেখ নি, কিন্তু চিনবে। তোমার ঐ শাজাদপুরের প্রতিবেশী মৌলবী বশীরুদ্দীনের মেয়েকে বিয়ে করেছেন—'

বাকিটা কি বলেছিল আমার কানে আসে নি। বৃদ্ধা তাকে তীক্ষ্ন কণ্ঠে 'চুপ কর—'বলে তাঁর কম্পিত শীর্ণ হস্ত আমার মস্তকে রেখে বার বার আশীর্বাদ করতে লাগলেন। খানের সেই ভিণ্টেজকারের নানাবিধ কর্কশ কানফাটা কোলাহল ভেদ করে যে ক'টি শব্দ আমার কানে এসে পেঁছিল তার একটি বাক্য শুধু বুঝতে পারলুম, "আঃ! তুমি আমার বশীর ভাইসাহেবের মাইয়ারে বিয়া করছো।" বুড়ি একই কথা বার বার আউড়ে যেতে লাগলেন।

আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় হল, বুড়ির কাপড়ের খুঁটে আকব্বরী মোহর বাঁধা ছিল না বলে তিনি সাড়ম্বর জামাইয়ের মুখদর্শন কর্ম সমাধান করতে পারলেন না। বুড়ি পিছনের সীটে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লেন। হায় দিদিমা, তুমি হয়তো এখন মনে মনে চিন্তা করছো, জামাইরে কি খাওয়াইমু!

আমি খানকে শুধালুম, 'তুমি ঐ পীরের আস্তানায় জুটলে কি করে?'

খান তার সেলফ-মেড্ একটা সিগারেট আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললে, 'না, আমার কোনো ইনট্রেস্ট্ নেই। ঠাকুরমাকে আপিসে যাওয়ার সময় ড্রপ্ করে যাই, ফেরার সময় দুই এক পেগ স্যাঁট স্যাঁট করে নামিয়ে, ঠিক মগরীবের নামাজের ওক্তে তাঁকে ফের পিক্ অপ্ করে নি—'

ঠাকুরমা যাতে শুনতে না পান তাই ফিসফিস করে শুধালুম, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আমি তো জানতুম, তোমার ঠাকুরমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। তিনি আবার এই মুসলমান পীরের কাছে এলেন কি করে?'

খান বললে, 'অতি সহজ এর উত্তর। তাঁর নাৎনির মারফৎ। সেই নাৎনির এক ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঠাকুরমার পরিচয় হয়। মেয়েটা মুসলমান।'

'ওরে বাব্বা!'

শিউরে উঠে ভূতনাথ খান বললে, অগ্নিশিখা, মশাই, অগ্নিশিখা।

অগ্নিকুণ্ডও বলতে পারেন। জহরব্রতের অগ্নিকুণ্ড। যেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় লেডি-কিলার ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো নটবরই সে-অগ্নিকুণ্ডের কাছে যাবারও ইজাজৎ পান নি—ঝাঁপ দেওয়া দূরের কথা। লেডি-কিলার হিসেবে আম্মো কম যাই নে, হেঁহেঁ হেঁহেঁ, কিন্তু ঐ মুসলমানীর দিকে এক নজর বুলোতেই—সে তখন পীরসাহেবের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামছিল—হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলুম এ-রমণী ফাঁসুড়ে। তার একটিমাত্র চাউনি যেন অদৃশ্য একখানা রুমালে পরিবর্তিত হয়ে সাঁ করে উড়ে এসে লটবরবাবুর গলাটিতে ফাঁস লাগিয়ে, জস্‌ট্‌ স্ট্রেঙ্গল্‌স্‌ হিম্‌ টু ডেথ, কিংবা বলতে পারেন, তার হী-ম্যান হবার প্ল্যানটি নস্যাৎ করে দেয়! বাপ্‌স্‌।'

রগ্‌রগে বর্ণনাটা শুনে আমার মনে কেমন যেন একটু কৌতূহল হলো। শুধালুম 'নামটা জানো?'

'দাঁড়ান, বলছি, স্যার। আরব্য উপন্যাসের কোন্‌ এক নায়িকা না নায়কের নাম। শহর-জাদী?' শহর-বানু? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শহর-ইয়ার—'

আজ আমার বার বার স্তম্ভিত হবার অর্থাৎ নিশ্চল নির্বাক স্তম্ভে পরিণত হওয়ার পালা।

শুনেছি, একদা নগরের একাংশ সহস্র স্তম্ভের ('খাম্বা'র) উপর নির্মিত হয়েছিল বলে অদ্যকার ক্যাম্বে বন্দরকে গুজরাতিতে 'খাম্বাৎ' বলা হয়, প্রাচীন যুগে 'স্তম্ভপুরী' বলা হত। দিল্লীবাসীর কাছে এ-শব্দতত্ত্ব ফজুল। সেথাকার চৌষট্টিটি স্তম্ভের উপর খাড়া বলে আকবর বাদশার দুধবাপ আজীজ কোকলতাসের কবরকে 'চৌসট্‌ খাম্বা' বলা হয়।

আজ আমি এতবার হেথাহোথা স্তম্ভে পরিণত হয়েছি যে আমার উপর দিয়ে অনায়াসে কলকাতার ওভার-হেড রেলওয়ে নির্মাণ করা যায়!

ইতিমধ্যে ভূতনাথ ফের বকর বকর আরম্ভ করেছে। আমি ফের ফিসফিস করে বললুম, 'চুপ, চুপ। ঠাকুরমা শুনতে পাবেন। তুমি নিতান্ত অর্বাচীন; তাই জানো না, প্রাচীনারা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-একটি মহৎ সদ্‌গুণ রপ্ত করে নেন সেটি হচ্ছে, যে-কথা তাঁরা শুনতে চান না, সেটা তাঁদের কানের কাছে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে শোনালেও শোনেন না, আর যেটি তাঁরা শুনতে চান সেটি তুমি বাঁশবনের কলমর্মরের ভিতর 'রাজার মাথায় শিং গোছ গোপনে গোপনে বললেও তাঁরা দিব্য শুনতে পান। তাই তো তাঁরা দীর্ঘজীবী হন! আফ্‌টার্‌ অল্‌ কানের ভিতর দিয়ে যে-সব কথা মরমে পেঁছে তার চৌদ্দ আনাই তো দুঃসংবাদ। অন্তত এ-যুগে।'

ভূতনাথ নিশ্চয়ই ভূতকালটা সম্বন্ধে ওয়াকিফ্‌-হাল। তদুপরি সে 'বৃথা-মাংস' খায় না, বৃথা তর্ক করে না। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'সর্ব যুগেই, সত্যযুগেও।' পূর্বেই বলেছি, সে একটা আস্ত চার্বাক। আর আমার যন্দুর

জানা, প্রথম চার্বাক এই পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হন সত্য ও ত্রেতাযুগের মধ্যিখানে। ভূতনাথ জাতিস্মর।

ঠাকুমা গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকে রওয়ানা হলেন।

খাইছে!

ঠাকুমা নিশ্চয়ই তাঁর ভাইয়া বশীরুদ্দীনের জন্য যে ভাবে লুচি ভাজতেন সেইভাবে ভাজবার জন্য ভূতনাথের বউকে ফরমান ঝাড়বেন। তার বয়স ত্রিশ হয় কি না হয়। আমাদের পাড়ার চ্যাংড়া হীরু রায় বাজাবে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খানের সামনে বাজনা! তওবা, তওবা!

তা সে যাক্ গে।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ আমাকে তার হাফ প্রাচীনপন্থী বৈঠকখানায় বসিয়ে ব্যাপারটি সংক্ষেপে সারলো:

'আপনি ঠিক বলেছেন, আমার ঠাকুরমা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। এখনো স্বপাকে খান। আমাকে তাঁর হেঁসেলে ঢুকতে দেন না। ইংরিজিতে একটা শব্দ আছে—এমরাল। মরাল নয়, ইমরালও নয়। আমার ঠাকুরমা এলিবারেল। তিনি ধর্মবাবদে লিবারেল নন্, ইলিবিরেলও নন—তিনি এলিবারেল। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে হয়, কারণ ঐ শহ্‌র্‌-ইয়ার বীবীর সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে—অবশ্য সেটা অনেক পরের কথা।

উত্তরবঙ্গের কোন্ হিন্দু সর্ব মুসলমানের সংস্পর্শ বর্জন করে বাস করেছে কবে? তাই তিনিও মুসলমানদের কিছুটা চেনেন। যেমন আপনার মরহুম শ্বশুর সাহেবকে খুব ভালো ভাবেই চিনতেন।

কিন্তু আপন ধর্মচার তিনি করতেন—এখনো করেন—তাঁর মা শাশুড়ী যে-ভাবে করেছেন হুবহু সেইরূপ। অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনো কৌতূহল কখনো ছিল না—এখনো নেই এবং সেখানে পুনরায় আসেন ঐ শহ্‌র্‌-ইয়ার বীবী। এমন কি এই হিন্দুধর্মেই যে—পুজো আচ্চার নানাবিধ পদ্ধতি রয়েছে সে সম্বন্ধে ঠাকুমা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই বলছিলুম তিনি ধর্মবাবদে ছিলেন এলিবারেল। তিনি তো, আর-পাঁচটা ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল হয়ে সেগুলো রিজেক্ট্ করেন নি। সে হলে না হয় বলতুম, তিনি ইলিবিরেল, কট্টর, কনজারভেটিভ। হাওয়ার ধাক্কায় যখন তেতলার আলসে থেকে ফুলের টব নিরীহ পদাতিকের কাঁধে পড়ে তাকে জখম করে তখন কি সে-টব্ চিন্তা করে এই কর্মটি করেছে? সে কি চিন্তা করে জানতে পেরেছে, উক্ত পদাতিক অতিশয় পাপিষ্ঠ ব্যক্তি? অতএব ফুলের টব্-এর এ-কর্মটি এমরাল। ঠিক ঐ ভাবেই আমার ঠাকুরমার যাবতীয় চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি পুজো-আচ্চা সব, সব-কিছু ছিল এলিবারেল। ফুলের টব্-এর মতই তিনি ছিলেন অন্য পাঁচটা ধর্ম

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আনকনশাস,—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক্, তোমার এসব কচকচানি। আমি জানতে চেয়েছিলুম, তোমার নিষ্ঠাবতী হিন্দু ঠাকুমা ঐ মসলা পীরের মোকামে পৌঁছলেন কি করে?'

খান বড় সহিষ্ণু ব্যক্তি। বললে, স্যর, ঐ সময়ই নাট্যমঞ্চে শহুর-ইয়ার বানুর অবতরণ। তাই আমি তার পটভূমি নির্মাণ করছিলুম মাত্র। এইবারে আসল মোদ্দা কথায় পৌঁছে গিয়েছি। শুনুন।

দেশ-বিভাগের পর ঠাকুমাকে প্রায় দৈহিক বল প্রয়োগ করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ছাড়তে চান নি। এ-রকম বিস্তর কেস্ আপনি রেফুজি কলোনিগুলোতে পাবেন।

ঠাকুমার সঙ্গে দেশত্যাগ করে এসেছিল তাঁরই পিতৃকুলের সুদূর সম্পর্কের একটি অরক্ষণীয়া। রান্নাবান্না ধোয়ামোছার পরও আর কিছু করবার নেই বলে সে কলেজ যেত। ঠাকুমা ব্রাহ্মণী, ন্যাচুরলী আত্মীয় পালিতা কন্যাও ব্রাহ্মণী। কিন্তু, মোশয়, সে যে-ক্লাসফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রেমে পড়লো সে এক বদ্দি সন্তান। তাকে বিয়ে করতে চায়।

ঠাকুমা তো শুনে রেগে কাঁই! কী! বদ্যির সঙ্গে বামুন মেয়ের বিয়ে! বরঞ্চ গোহত্যা করা যায়, গোমাংস ভক্ষণ করা যায়, কিন্তুক বামুনের সঙ্গে বদ্যি! বরঞ্চ ছুঁড়িটা ডোমচাঁড়াল, মুচিমোচরমান বিয়ে করুক। কারণ ঠাকুরমার মনঃসিন্দুকে একটি আপ্তবাক্য প্রায় গোপন তত্ত্বরূপে লুক্কায়িত আছে ঃ

"একশ' গোখরোর বিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা একটি বদ্যি তৈরী করেন।"

কিন্তু ঠাকুরমা জানতেন না যে, "একশ' বদ্যির বিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা একটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তৈরী করেন।" আমরা বারেন্দ্র।' ভূতনাথ তার হোমমেড্ সিগরেটে আগুন ধরাবার জন্য ক্ষণতরে চুপ করে গেল।

আমি গুনগুন করে বললুম, 'এবং একশ'টি বারেন্দ্রের বিষ দিয়ে আল্লাতালা তৈরী করেন একটি সৈয়দ।'

খান আস্ত একটা চাণক্য। কিন্তু এ-নীতিটি জানতো না। খানিকক্ষণ এই নবীন তত্ত্বটির গভীর জলে খাবি খেয়ে খেয়ে বললে।'

'তাই বুঝি সৈয়দরা এত বিরল?'

আমি বললুম, 'চোপ্, তুমি যা বলছিলে, তাই বলো।'

খান তাবৎ বাক্য হজম করে নিয়ে বললে, 'এ-হেন সময়ে, যে-নাট্যে ছিলেন সুন্দুমাত্র দুটি প্রাণী, ঠাকুমা এবং অরক্ষণীয়া, সেখানে প্রবেশ করলেন বীরপদভরে পৃথিবী প্রকম্পিতা করে একটি তৃতীয়া প্রাণী।

ভুল বললুম, স্যর, আমার মনে হল যেন আমাদের সরু গলি দিয়ে ঢুকলো

একটি জলন্ত মশাল। অথচ অলিম্পিকের টর্চ-বেয়ারার নেই। সন্দ্মাত্র মশালটাই যেন স্বাবলম্ব হয়ে, গলি পেরিয়ে, আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে, ঠাকুরমার ঘরে ঢ্কলো।

সেই মশাল শহ্র্-ইয়ার। আপনাকে বলি নি, অগ্নিশিখা?'

আমি শ্ধাল্ম, 'কেন এসেছিল?'

'আজ্ঞে—'

এমন সময় ঠাকুমা আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে পাথরের থালা। খান ঠোঁটে আঙ্ল রেখে ইঙ্গিত দিলে, এই আর ও-কাহিনী বলা চলবে না।*

উনিশ

এত দিনে ব্ঝতে পারল্ম, শহ্র্-ইয়ারকে আমি চিনি নি, চেনবার চেষ্টাও করি নি। কোনো মান্ষকে দিনের পর দিন দেখলে, তার সঙ্গে কথা কইলেও তার একটা মাত্র দিক চেনা হয়। কারণ যার যে-রকম প্রব্ত্তি, সে সেই রকম ভাবেই অন্যজনকে গ্রহণ করে। শহ্র্-ইয়ার মদ্য আমার মনের পাত্র যখন প্র্ণ করলো তখন সে শেপ্ নিল আমার মনের গেলাসেরই শেপ্। কিন্তু সেইটেই যে তার একমাত্র শেপ্ নয় সেটা আমি আনমনে ভুলে গিয়েছিল্ম। এমন কি তার স্বামী, ডাক্তার তাকে কি শেপ্-এ নিয়েছে সেটাও আমি ভেবে দেখিনি। এবং সে-ই বা তার গড়া—অবশ্য তার মনের মাধ্রী মিশিয়ে গড়া শহ্র্-ইহারকে যে শেপ্ দিয়েছে সে নিয়ে আমার সঙ্গে 'ডিপ্লোমেটিক ডিস্প্যাচ একশ্চেঞ্জ' করতে যাবে কেন?

এইবারে একটি 'তৃতীয় পক্ষ' পেল্ম যে শহর্-ইয়ারকে দেখেছে, একট্খানি দ্রের থেকে—এবং তাতে করেই পেয়েছিল বেসট্ পারস্পেক্টিভ্—এবং তারই ভাষায়, সেই 'অগ্নিশিখা'কে সাইজ অপ্ করতে গিয়ে একদম বিম্ঢ় হয়ে গিয়েছে। আমিও মনে মনে বলল্ম, অগ্নিশিখা তো তরল দ্রব্য নয় যে তাকে তোমার মনের পেয়ালায় ঢেলে নিয়ে আপন শেপ্ দেবে!

ঠাকুমা চলে যেতেই ভূতনাথ দরজাতে ডবল খিল দিলে।

ছেঁড়া কথার খেই তুলে নিয়ে বললে, 'দ্রৌপদী, মশাই, সাক্ষাৎ দ্রৌপদী।"

---

* এই উপন্যাসের প্র্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমি লিখি যে, প্রসিদ্ধ ইওরোপীয় প্রণয়গাথা "ত্রিস্তান ইজল্দে" বাঙলাতে অন্বাদিত হয় নি। বড়ই আনন্দের সঙ্গে জানাই, পক্ষাধিককাল প্র্বে জনৈক সাতিশয় মেহেরবান পাঠক আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি স্বয়ং ঐ গাথা নিয়ে একটি —কিছ্টা অন্বাদ, কিছ্টা স্বয়ংসৃষ্ট—"ত্রিস্তান" কাহিনী বাঙলায় রচনা করেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বে-এক্তেয়ার মহব্বৎ বশতঃ ঐ প্স্তিকার একখণ্ড আমাকে সওগাৎ করেছেন।

আমি শুধালুম, দ্রৌপদীর সঙ্গে তুলনা করছো কেন ?'

এক গাল হেসে বললে, 'কেন, স্যর, আপনিই তো হালে একখানা গবেষণাপূর্ণ রসরচনা ছেড়েছেন যাতে দেখিয়েছেন, এ-সংসারে একটি প্রাণ, তাও রমণী, কি করে পাঁচ-পাঁচশটা মদ্দাকে তর্কযুদ্ধে চাটনি বানাতে পারে। সেই নারীই তো দ্রোপদী। দুঃশাসন যখন তাঁকে জোর করে কুরুসভাস্থলে টেনে এনে হাজির করলো তখন তিনি যে স্বাধীনা, তাঁকে যে তাঁর অনিচ্ছায় প্রকাশ্য সভাস্থলে টেনে আনা সম্পূর্ণ বে-আইনী, আজকের আদালতী ভাষায় যাকে বলে 'আলট্রা ভাইরীস' তাঁর সেই বক্তব্য যখন তিনি অকাট্য যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে পেশ করতে লাগলেন, ভুল বললুম, পুশ্ করতে লাগলেন, সজোরে কড়া কড়া যুক্তিসহ —তখন কী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব, কী দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠাচারী দ্রোণাচার্য কেউ কি কোনো উত্তর দিতে পেরেছিলেন ?…তার এক হাজার বছর পরে সোক্রাতেস—না ? তারপর এ-তাবৎ ব্রাণ্ডো ! না—?'

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, 'থাক ! তোমার কচকচানি থামাও। শহর্-ইয়ারের কথা কও !'

পূর্বেই বলেছি শ্রীমান ভূতনাথ বৃথা তর্ক করে না। ঘাড় নেড়ে বললে, 'শহর্-ইয়ারের কথাই তাবৎ শহরের ইয়ার—অথবা হওয়া উচিত।

ভেবে দেখুন, ঠাকুমা একা। শহর্-ইয়ার একাই একশ' দ্রৌপদী। ঠাকুমা পারবেন কেন ? শহর্-ইয়ার কি যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন সে আমার জানা নেই, কারণ আমার কলিজাতে পুকুর খোঁড়ার ভয় দেখালেও তখন আমি সে-সভাঙ্গমে যেতে রাজী হতুম না। ঠাকুমা একে মেয়েছেলে তদুপরি বৃদ্ধা। তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু আমি মদ্দা। আমাকে ঐ দ্রৌপদী চিবিয়ে গিলে ফেলত না—যদিস্যাৎ তার মনে ক্ষণতরেও সন্দেহ হতো, আমি ঠাকুমার পক্ষ সমর্থন করতে এসেছি !'

আমি সত্যিই তাজ্জব মানলুম। শহর্-ইয়ারকে তো আমি চিনি, শান্তা, স্নিগ্ধা কল্যাণীয়া রূপে। সে যে তর্কাঙ্গনে রণরঙ্গিনী হয়ে তার রুদ্রাণী রূপ দেখাতে পারে সে কল্পনা তো আমি কখনো করতে পারি নি।…তাই তো বলছিলুম, 'তৃতীয় পক্ষে'র মতামত অবজ্ঞনীয়।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ ঘাড় চুলকে চুলকে বললে, 'পরে আমার কানে কি একটা ঐতিহাসিক যুক্তিও এসেছিল। বেগম্ শহর্-ইয়ার যা বলেছিলেন তার মোদ্দা নির্যাস ছিল ঃ

বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ শ্রমণকে একাসনে বসিয়ে বার বার বলতেন, "ব্রাহ্মণ-শ্রমণ, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ।"

তার বহু শত বৎসর পর, বৌদ্ধধর্ম যখন এদেশ থেকে লোপ পেল, তখন সর্বশেষে, এই শ্রমণরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন। এবং হিন্দু ধর্মানুযায়ী বিবাহাদি

করলেন। তাঁদেরই বর্তমান বংশধর বৈদ্যসম্প্রদায়। অতএব তাঁরা ব্রাহ্মণদেরই মত কুলসম্মান ধারণ করেন। একদা তারা শ্রমণরূপে লোকসেবার জন্য আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করতেন, হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁরা সেই বৈদ্য-বিদ্যাই জীবিকারূপে গ্রহণ করলেন। তারপর—'

আমার কান তারপর ভূতনাথের আর কোনো কথাই গ্রহণ করে নি। কারণ আমার মন তখন বিস্ময়বিমূঢ়। আমি ভালো করেই জানতুম, শহ্‌র্‌-ইয়ার ইহজন্মে কখনো কোনো প্রকারের গবেষণা করে নি।…এমন কি তার স্বামী যে মেডিকাল রিসার্চে আচৈতন্য নিমজ্জিত সেটাও সে বোধ হয় হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। অবশ্য সে এযাবত ইতালির লেওনে কাএতানির স্ত্রীর মত বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি।

তবে কি তাবৎ সমস্যা এভাবে দেখতে হবে যে, কাএতানির স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, আর শহ্‌র্‌-ইয়ার স্বামীকে ত্যাগ না করে ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে!

ভূতনাথ বললে, 'সে বিয়ে তো নির্বিঘ্নে হল। কিন্তু আমার মনে হয়, বীবী শহ্‌র্‌-ইয়ার ঠাকুমাকে কাবু করেছিলেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে। "ব্যক্তিত্ব" বা পার্সনলাটি বললে অল্পই বলা হয়। বরঞ্চ ঐ যে আমি বললুম, "অগ্নিশিখা"—সেই অগ্নিশিখা যেন আগুনের পরশমণি হয়ে ঠাকুরমাকে—'

হঠাৎ ভূতনাথের ভাব পরিবর্তন হল। আপন উৎসাহের আবেগ আতিশয্যের ভাটি গাঙে এতক্ষণ অবধি সে এমনই ভেসে চলেছিল যে শহ্‌র্‌-ইয়ার সম্বন্ধে আমার কৌতূহলটা কেন সে-সম্বন্ধে সে আদৌ সচেতন হয় নি। এখন যেন হঠাৎ তাঁর কানে জল গেল।

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে ঈষৎ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে—অবশ্য পরিপূর্ণ লাল-বাজারী ডবল-ব্যারেল বন্দুকের দু'নাল উঁচিয়ে নয়—জিজ্ঞেস করলে, 'স্যর, আপনি কি ওনাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

বেচারা ভূতনাথ! অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'মাফ করবেন, স্যর, প্লীজ। আপনার সামনে ও'র সম্বন্ধে আমার এটা-ওটা বলাটা বড্ডই বেয়াদবী হয়ে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা! তুমি তো এখনো তার কোনো নিন্দে করো নি। এবং ভবিষ্যতে করবে বলেও তো মনে হয় না। এটাকে তো পরনিন্দা পরচর্চা বলা চলে না।…আর আমি জানতে চেয়েছিলুম বলেই তো তুমি আমাকে এ-সব বললে। আর, এগুলো আমার কাজে লাগবে।'

যেন একটুখানি শঙ্কিত হয়ে খান শুধোলে, 'এনি ট্রবল, স্যর?'

আমি বললুম, 'ইয়েস্। কিন্তু সে-কথা পরে হবে। তুমি যা বলছিলে,

বলে যাও।'

কথঞ্চিৎ শান্তি পেয়ে ভূতনাথ বললে, 'বলার মত তেমন আর বিশেষ-কিছু নেই। পূর্বেই বলেছি, বিয়ে হয়ে গেল। চতুর্দিকে শান্তি। শহুর্-ইয়ার ঠাকুমাকে দেখতে আসেন কি না তাও জানি নে।...ইতিমধ্যে ঠাকুমা যখন নিশ্চিন্দ মনে ওপারে যাবার জন্য যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করছেন তখন তাঁর জীবনসন্ধ্যায় এল একটা দুর্ঘটনা। তাঁর এক পিঠাপিঠো ছোট ভাই বহু বৎসর ধরে হিমালয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, দু'তিন মাস অন্তর অন্তর দিদিকে পোস্ট-কার্ডও লিখতেন।

হঠাৎ একদিন এক চিঠি এল সেই ভাইয়ের এক বন্ধুর কাছ থেকে—তিনিও তাঁর সঙ্গে হিমালয় পর্যটন করতেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, মাস তিনেক ধরে সেই ভাইয়ের সন্ধান নেই।

ঠাকুমার আদেশে আমাকেই যেতে হল হিমালয়ে তাঁর খোঁজে। সে দীর্ঘ নিষ্ফল কাহিনী আপনাকে আর শোনাবো না। তিন মাস পর ঠাকুমার আদেশে কলকাতায় ফিরে এলুম।

এসে দেখি, যা ভেবেছিলুম ঠিক তার উল্টো।

ঠাকুমা শান্ত প্রশান্ত।

আমি অনুসন্ধান করে জানতে পারলুম, ইতিমধ্যে ঐ শহুর্-ইয়ার বীবী নাকি ঠাকুমাকে কোন্ এক পীরের আস্তানায় নিয়ে গিয়েছেন এবং সেখানে তিনি মনের শান্তি পেয়েছেন। সে তো খুব ভালো কথা। দেহমনের শান্তিই তো সর্বপ্রধান কাম্য। কিন্তু আপনি জানেন, আমি এ-সব গুরুপীর কর্তা-ভজাদের একদম পছন্দ করি নে।'

আমি বললুম, 'আমিও করি না।'

ভূতনাথ বললে, 'কিন্তু অনুসন্ধান করে জানলুম, শহুর-ইয়ার নাকি ঠাকুমাকে পীরের আস্তানায় নিয়ে যাবার পূর্বে পাকাপাকিভাবে বলেছে, "পীর সাহেব আপনার ভাইকে হিমালয় থেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে আসবেন না। কিন্তু আমি আশা রাখি, তিনি আপনাকে কিছুটা মনের শান্তি এনে দিতে পারবেন—আল্লার কৃপায়"।'

ভূতনাথ খান খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তাই তো এই মহিলার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা।'

ঝড়

কলকাতা মহানগরীর কোনো কোনো অঞ্চলে মধ্যরাত্রে যে নৈস্তব্ধ্য উপভোগ করা যায় গ্রামাঞ্চলে সেটা অতখানি সহজলভ্য নয়। যদ্যপি কবিরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। জনপদবাসী দুপুর রাত্রে কেমন যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে জানে না। এ-বাড়ি থেকে নিদ্রাহীন বৃদ্ধের কাশির শব্দ, ও-বাড়ি থেকে চোর সম্বন্ধে মাত্রাধিক সচেতন মরাই-ভরা ধানের গেরেমভারী মালিকের গলা-খাঁকারি, চিকিৎসাভাবে কাতর জ্বরাতুর শিশুর নির্জীব গোঙরানো এসব তো আছেই, তার উপর পশুপক্ষীর নানা রকমের শব্দ। তারা যেন মধ্যরাত্রে একাধিক শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত। অথচ বেশ লক্ষ্য করা যায়, এদের ভিতর তখন এক রকমের অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা দেখা দেয়। হঠাৎ মোরগটা ভয় পেয়ে ডেকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠলো, ছাগলটা ম্যা ম্যা করলো, সর্বশেষে পাশের গোয়ালের গাইটা একটুখানি ঘড় ঘড় করলো,—খুব সম্ভব চেক্ অপ্ করে নিলো, অধুনা প্রসবিত তার বাছুরটি পাশ ছেড়ে কোথাও চলে যায় নি তো!

একমাত্র ব্যত্যয় আমার আলসেশিয়ান 'মাস্টার'। সে ঐ ঐকতানে কস্মিনকালেও যোগ দেয় না, যদিও তার কণ্ঠই এ-অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা গ্রাম্ভারী। সোজা বাঙলায়, গম্ভীর অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী! তার কারণ সে তার আচার-আচরণে অনুকরণ করে আমাকে। আমি নীরব থাকলে সেও নিশ্চুপ। আমিও তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি—সর্বোপরি তার ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা। কিন্তু এ-শীলে সে আমাকে রোজই হার মানায়।

হুঁঃ। ঠিক। শহর্-ইয়ারকে আমি একটি আলসেশিয়ান-ছানা সওগাৎ দেব।

হঠাৎ একটা লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'হুজুর, মাফ করবেন। এই তো আমাদের বাড়ি।'

ওঃ হো! তাই তো। আমি এ-বাড়ি ছাড়িয়ে বেখেয়ালে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে যেতুম, কে জানে।

অর্থাৎ এই লোকটিকে মোতায়েন করা হয়েছে, আমি যদি রাত সাড়ে তেরটার সময় বাড়ির সামনে চক্কর খাই তখন সে যেন আমাকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এই লোকটাকে মোতায়েন করল কে? ডাক্তার? তার তো অতখানি কমন্ সেন্স নেই। শহর্-ইয়ার? সে তো পীরের আস্তানা থেকে ফেরে অনেক রাতে।

দীর্ঘ চত্বর পেরিয়ে যখন বাড়িতে ঢুকলুম, তখন দেখি আরো দুটি লোক জেগে বসে আছে। স্পষ্টতঃ আমার-ই জন্য। আমি লজ্জা পেলুম। তিন-তিনটে লোককে এ-রকম গভীর রাত অবধি জাগিয়ে রাখা সত্যই অন্যায়।

এ-পাপ আর বাড়ানো নয়। চুপিসাড়ে আপন ঘরে ঢুকে অতিশয় মোলায়েমসে খাটে শুয়ে পড়বো। আলোটি পর্যন্ত জ্বালাবো না। সুইচের ক্লিক্-এ যদি ডাক্তার, শহর্-ইয়ারের ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর আমার ঘরে হামলা করে!

এক কথায়, মাতাল যে-রকম গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরে।

অতিশয় সন্তর্পণে দরজার হ্যান্ডিলটি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকে আমি অবাক! ঘর আলোয় আলোময়। আমার খাটের পৈথানের কাছে যে কেদারা তার উপর বসে আছে শহর্-ইয়ার!

কিছু বলার পূর্বেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি আমাকে আর কত সাজা দেবেন?'

আমার মুখে কোনো উত্তর জোগালো না। কিসের সাজা? ওকে দেব আমি সাজা! ওর মত আমার আপন জন এ-দেশে আর কে আছে?

এ-স্থলে সাধারণজন যা বলে, তাই বললুম 'বসো!'

কিন্তু শহর্-ইয়ার যেন লড়াইয়ে নেমেছে।

তার চেহারা দেখে কেচ্ছা-সাহিত্যের দুটি লাইন আমার মনে পড়ল:

'রাণীর আকৃতি দেখি বিদরে পরাণ।
নাকের শোওয়াস যেন বৈশাখী তুফান॥'

কিন্তু আমি কোন মতামত প্রকাশ করার পূর্বেই সে বললে, 'আমি খুব ভালো করেই জানি, কলকাতার রাস্তাঘাট আপনি একদম চেনেন না। ওদিকে গাড়ি-ড্রাইভার দিলেন ছেড়ে। এদিকে রাত একটা। তখন কার মনে দুশ্চিন্তা হয় না, বলুন তো!'

এ-সব অভিযোগ সত্ত্বেও আমার হৃদয় বড় প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। কারণ, এতক্ষণে আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কাল রাত্রে, আজ সকালে তার চোখে অর্ধসুপ্ত, আচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন যে ভাবটা ছিল সেটা প্রায় অন্তর্ধান করেছে। সেই প্রাচীন দিনের শহর্-ইয়ারের অনেকখানি—সবখানি না—যেন ফিরে এসেছে। এর কারণটা কি? তখনো বুঝতে পারি নি। পরে পেরেছিলুম। সে-কথা আরো পরে হবে। কিন্তু উপস্থিত তার এই অবস্থা পরিবর্তনের পুরো-পুরি ফায়দাটা ওঠাতে হবে।

আমি গোবেচারি সেজে বললুম, 'তা তো বটেই। আমি যে কলকাতার রাস্তাঘাট চিনি নে সে তো নাসিকে সত্য কথা। এই তো, আজ সন্ধ্যায়ই, আমি ট্যাক্সি ধরে গেলুম ধর্মতলা আর চৌরঙ্গীর ক্রসিং-এ। আমি জানতুম, সেখানে ঠনঠনের কিংবা কালীঘাটের মা-কালীর মন্দির। ও মা! কোথায় কি! সেখানে দেখি টিপু সুলতানের মসজিদ। কি আর করি। ওজু করে দু'রেকাৎ নফল্ নামাজ পড়ে নিলুম। তারপর বেরুলুম দক্ষিণেশ্বর বাগে। সেখানে তো জানতুম, মৌলা আলীর দরগা—'

এতক্ষণে শহ্‌র্‌-ইয়ারের ধৈর্যচ্যুতি হলো।

তবু, প্রাচীন দিনের মত শান্ত কণ্ঠে বললো, 'দেখুন, আপনারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আপনাদের কল্পনাশক্তি সাধারণজনের চেয়ে অনেক বেশী, ভাষা আপনাদের আয়ত্তে, স্টাইল আপনাদের দখলে। সেই ক্ষমতা নিয়ে আপনারা অনেক-কিছু করতে পারেন—লোকে ধন্য ধন্য করে। কিন্তু আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনে আপনি সে-সব শস্ত্র ব্যবহার করেন কেন? সেটা কি উচিত? আমরা কি তার উত্তর দিতে পারি? আমরা—'

প্রাচীন দিনের শহ্‌র্‌-ইয়ার যেন নবীন হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আমি তারই সুযোগ নিয়ে মন্তব্য করলুম, 'বড় খাঁটি কথা বলেছ, শহ্‌র্‌-ইয়ার। এ-কর্ম বড়ই অনুচিত!...আমি তোমারই পক্ষে একটি উদাহরণ দি :—

আমাদের শান্তিনিকেতনে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। তার জন্যে কে দায়ী আমি সঠিক জানি নে। হয় জনৈক অধ্যাপক, নয় ছাত্ররা। তখন শান্তিনিকেতনবাসী জনৈক প্রখ্যাত লেখক ছাত্রদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর কঠিন মন্তব্যপূর্ণ পত্র খবরের কাগজে প্রকাশ করেন।...তুমি এখ্‌খুনি যা বললে, তারই স্বপক্ষে আমি এ-ঘটনাটার উল্লেখ করছি।...তখন ছাত্ররা করে কি? সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিকের শাণিত তরবারির বিরুদ্ধে লড়তে যাবে কে? তারা ফোর্থ-ইয়ার ফিফথ-ইয়ারের ছাত্র। তাদের ভিতর তো কেউ সাহিত্যিক নয়।...সিংহ লড়বে সিংহের সঙ্গে, বাঁদর—'

আমি থেমে গেলুম। কিন্তু শহ্‌র্‌-ইয়ার চুপ করে রইল।

ইতিমধ্যে আমি আস্তে আস্তে আপন মনে বুঝে গিয়েছি, শহ্‌র্‌-ইয়ার কেন আপন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে।

অবশ্য নিঃসন্দেহ, নিশ্বন্দ্ব কোনো-কিছু বলা কঠিন।

সে ভয় করেছিল, তার পীরেতে আমাতে লাগবে লড়াই!

ফলে সে হারাবে পীরকে, নয় আমাকে।

এই দ্বন্দ্বের সামনে পড়ে কাল সন্ধ্যায় সে ডুব মেরেছিল ধ্যানের গভীরে। সেই ধ্যানের পথ সুগম করার জন্য অনেকেই বহুক্ষণ ধরে জপ-জিক্‌র্‌ করেন। শহ্‌র্‌-ইয়ার তাই কাল রাত্রে 'লতীফ' 'সুন্দরের' নাম জপ করেছিল। শুনেছি, বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধক জপ করতে করতে 'দশা' (আরবীতে 'হাল') প্রাপ্ত হন।

এ-নিয়ে তো দিনের পর দিন আলোচনা করা যায়, এবং আমি কিছুটা করেছিও, শহ্‌র্‌-ইয়ারের পীরের সঙ্গে বরদায়। কিন্তু এ-সব করে আমার কি লাভ? আমি চাই শহ্‌র্‌-ইয়ারের মঙ্গল, ডাক্তারের মঙ্গল এবং আমরা তিনজন এতদিন যে-পথ ধরে চলেছি—সুখেদুঃখে হাসিকান্নার ভিতর দিয়ে—সে-পথ দিয়েই যেন চলতে পারি। এরই মধ্যে একজন ছিটকে পড়ে যদি স্বয়ং পরব্রহ্মকেও

পেয়ে যায় তাতে ডাক্তারের কি লাভ, আমারই বা কি লাভ? বুদ্ধদেব বৈরাগ্য আর সন্ন্যাস দিয়ে বিশ্বজয় করেছিলেন; কিন্তু সে ধন কি পিতা তথা রাজা শুদ্ধোধনকে আনন্দ দান করতে পেরেছিল? তিনি তো কামনা করেছিলেন, পুত্র যেন যুবরাজরূপে দিগ্বিজয় করে। এবং গোপা-যশোধরা? তিনিও তো চেয়েছিলেন, একদিন রাজমহিষী হবেন, তাঁর পুত্র যুবরাজ রাহুলের রাজমাতা হবেন।

কিন্তু যে-কথা বলছিলুম:

পীরেতে আমাতে কোনো ঝগড়া-কাজিয়া তো হলই না, বরঞ্চ প্রকাশ পেল, দুজনকার বহুদিনের হৃদ্যতা। শহর্-ইয়ারের যেন একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেল, তার যেন দশ দিশি ভেল নিরন্দবা।

* * *

হঠাৎ না ভেবে-চিন্তেই বলে ফেললুম, 'আচ্ছা, শহর্-ইয়ার, এখন রবীন্দ্র-নাথের ধর্মসঙ্গীত তোমাকে আনন্দ দেয়?' "এখন" শব্দটাতে বেশ জোর দিলুম। 'আগে তো তুমি পছন্দ করতে না।'

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বললে, 'না'।

আমি বললুম, 'সে কি? এখন তুমি যে-পথে চলেছ সেখানে তো তাঁর ধর্মসঙ্গীত তোমাকে অনেক-কিছু দিতে পারে, তোমার একটা অবলম্বন হতে পারে।'

মাথা নিচু করে বললে, 'হলো না। কাল দুপুরেই—আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না—আবার কিছু রেকর্ড বাজালুম। অস্বীকার করছি নে, খুব সুন্দর লাগল। ভাষা, ছন্দ, মিল সবই সুন্দর। এমন কি আল্লাকে নূতন নূতন রূপে দেখা, নূতন নূতন পন্থায় তাঁর কাছে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা সবই বড় সুন্দর। আমার মন যে কতবার নেচে উঠেছিল, সে আর কী বলবো!...কিন্তু, কিন্তু, আমার বুকের ভিতরে কোনো সাড়া জাগলো না।'

আমি বললুম, 'আমার কাছে, কেমন যেন হেঁয়ালির মত ঠেকছে। বুঝিয়ে বলো।'

এবারে একটুখানি মধুরে উচ্চহাস্য করলো—'আপনাকেও বোঝাতে হবে?'

উঠে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের জানলা খুলে দিল।

আহ্। বাইরে কী নিরন্ধ্র নৈস্তব্ধ্য। গ্রামে নয়, কলকাতাতেই এটা সম্ভবে।

বন্ধ জানলা খুলে দিলে বাইরের বাতাস যে রকম কামরাটাকে ঠাণ্ডা করে দেয়, হুবহু সেই রকম বাইরের নিস্তব্ধতা যেন আমাদের তর্কালোচনাটাকে শীতল করে দিল।

শহর্-ইয়ার বললে, 'জানলার কাছে আসুন। আরাম পাবেন।'

আমি শয্যাত্যাগ করে সেই প্রশস্ত জানলার অন্য প্রান্তে দাঁড়ালুম।

শহর্-ইয়ার ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমার দু'হাত তখন জানলার আড়ের উপর। সে তার ডান হাত আমার বাঁ হাতে বুলোতে বুলোতে বলল, 'এই নিচের আঙিনার দিকে তাকান। এখানে ভোর-সাঁজ ভিখিরি-আতুর আসে। তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে এ-বাড়ি পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু এ-আঙিনায় সব চেয়ে বেশী আদরযত্ন কারা পায় জানেন? খঞ্জনি-হাতে বোষ্টমি, একতারা-হাতে বাউল, সারেঙ্গী-হাতে ফকীর। আপনি হয়তো ভাবছেন, এরা সদাই শুধু আধ্যাত্মিক পারলৌকিক, 'এ সংসার নশ্বর', এই সব নিয়েই গীত গায়—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'মোটেই না, এরা বহু ধরনের গীত জানে।'

ভারী খুশী হয়ে বললে, 'ঠিক ধরেছেন। অবশ্য আমি ভালো করে জানতুম, আপনার কাছে এ-তত্ত্ব অজানা নয়। তাই আপনাকে একটুখানি খুঁচিয়ে আমি সুখ পাই। কিন্তু সে-কথা থাক।

আমার বিয়ের রাত্রে, গভীর রাত্রে, এই আঙিনাতেই তারা অনেক মধুর মধুর গান আমাকে ডাক্তারকে শুনিয়ে গিয়েছিল। তারই একটি ছত্র আমার কানে এখনো বাজে ঃ

"শ্যামলীয়াকে দরশন লাগি পরহু কুসুম্বী সাড়ী"

বুঝুন, কী অদ্ভুত কালার্-কনট্রাস্ট-সেন্স্। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামল। তাই শ্রীরাধা তাঁর শ্যামবর্ণের কনট্রাস্ট্ করার জন্য হলদে রঙের—কুসুম্বী রঙের শাড়ি পরে অভিসারে বেরিয়েছেন।

কিন্তু মোদ্দা কথাটা এইবারে আপনাকে বলি।

আমি সেই বিয়ের রাত্রির পর থেকেই এখানে দাঁড়িয়ে শতসহস্র বার এদের গীত—বিশেষ করে ধর্মসংগীত শুনেছি। বরঞ্চ এদের এই সরল, অনাড়ম্বর, সর্ব অলংকার বিবর্জিত ভক্তিগীতি মাঝে মাঝে আমার বুকে সাড়া জাগিয়েছে, এমন কি তুফান তুলেছে,—মনে হঠাৎ-চমক লাগায় নি শুধু। তার কারণ, অন্তত আমার মনে হয়, এদের অভাবের অন্ত নেই, এরা গরীব-দুঃখী অনাথ-আতুর। খুদাতালা ছাড়া এদের অন্য কোনো গতি নেই। তাই এদের গীতে থাকে আন্তরিকতা, ডীপেস্ট সিনসিয়ারিটি।

কিন্তু বিশ্বকবি, আবার বলছি, সর্ববিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ তো এই হতভাগাদের একজন নন। তিনি তো অনাথ আতুর নন। তাঁর ভক্তিগীতিতে ওদের মর্মান্তিকতা, ঐকান্তিকতা, সর্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পণের সুর বাজবে কি করে? তিনি—'

আর আমি থাকতে পারলুম না। বাধা দিয়ে বললুম, 'এ তুমি কী আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলে শহর্-ইয়ার! অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আশ্রয়াভাব—এই গুলোই বুঝি ইহজীবনের পরম দুর্দৈব, চরম বিনষ্টি? রবীন্দ্রনাথের বয়স

চল্লিশ হতে-না-হতেই তাঁর যুবতী স্ত্রীর মৃত্যু হলো, তার পাঁচ বছরের ভিতর গেল তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। তাদের বয়স তখন কত? এগারো, তেরো। অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় অকাল মৃত্যু। তাঁর বাল্য-কৈশোরের কথা তুলতে চাই নে। সেই বা কিছু কম? ছেলেবেলায়ই ওপারে গেলেন তাঁর মা। সেই মায়ের আসন নিলেন তাঁর বৌদি। শুধু তাই নয়, সেই মহীয়সী নারীই কিশোর রবিকে হাতে ধরে নিয়ে এসে প্রবেশ করালেন জহান্-মুশায়েরায়, বিশ্বকবি-সম্মেলনাঙ্গনে।...আজ যদি আমাকে কেউ শুধোয়, রবীন্দ্রনাথ কার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী, তবে নিশ্চয়ই বলবো, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলবো, তার চেয়েও বেশী ঋণী তিনি তাঁর বৌদির কাছে।... সেই বৌদি আত্মহত্যা করলেন একদিন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন কত? বাইশ, তেইশ! এই নারীই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শিকা। তাঁর রুচি, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করেছেন তাঁর জীবনের প্রথম বারো বৎসর ধরে।

অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব সব মানি। কিন্তু আবার শুধোই, এগুলোই কি শেষ কথা? আত্মহত্যা, পর পর আত্মজনবিয়োগ এগুলো কিছুই নয়?

এই যে তুমি বার বার "অনাথ আতুর, অনাথ আতুর" বলছো, এই সমাসটি তুমি কোত্থেকে নিয়েছ, জানো? তোমার জানা-অজান্তে?

সেও রবীন্দ্রনাথের।

"শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন—
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন॥"

এ-গীতে কি রবীন্দ্রনাথ বিধাতার প্রধান মন্ত্রী?—তিনি যেন হুজুরকে বলছেন, "মহারাজ, এই অনাথ আতুর জনকে অবহেলা করবেন না।" তিনি তখন স্বয়ং, নিজে, ঐ অনাথ আতুরদের একজন। অবশ্য তাঁর অন্নবস্ত্র যথেষ্ট ছিল, কিন্তু প্রভু খৃষ্ট কি সর্বাপেক্ষা সার সত্য বলেন নি, মানুষ শুধু রুটি খেয়েই বেঁচে থাকে না। ঈশ্বরের করুণাই (ওয়ার্ড) তাঁর প্রধানতম আশ্রয়।

আর এও তুমি ভালো করে জানো, রবীন্দ্রনাথকে তার অর্ধেক জীবন—১৯০১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। বিশ্বভিখারীদের তিনি ছিলেন ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ন নম্বর ওয়ান। পৃথিবীর হেন প্রান্ত নেই যেখানে তিনি ভিক্ষা করতে যান নি। তাঁর পূর্বে স্বামীজী। এবং দুজনাই ফিরেছিলেন, ঐ গানের "শূন্য ফেরে না যেন" প্রার্থনার নিষ্ফল হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ বেরিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য। তিনি "বিশ্বপ্রেম", "বিশ্বভারতী"—"বিশ্ব" শব্দ দিয়ে একাধিক সমাস নির্মাণ করেছেন; আমি, অধম, তাঁরই সমাস নির্মাণের অনুকরণে তাঁকে খেতাব দিয়েছি "বিশ্বভিক্ষুক"। এ হক্ক

আমার কিছুটা আছে। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধি ঠাকুর। কিন্তু তাঁর বংশপরিচয় "পীরিলি" বা "পীর" + "আলী" দিয়ে। আম্মো "আলী"। আমারও "পীর" বংশ। কিন্তু থাক্, এসব হাল্কা কথা।

তুমি হয়তো বলবে—তুমি কেন, অনেকেই বলবে—এসব সখের ভিখিরি-গিরি। আমি এ-নিয়ে তর্কাতর্কি করতে চাই নে। কারণ স্বয়ং কবিই গেয়েছেন,

"ওরে ভিখারী সাজায়ে
কী রঙ্গ তুমি করিলে,
হাসিতে আকাশ ভরিলে॥"

কিন্তু এহ বাহ্য।

আমি বার বার জোর দিতে চাই তাঁর মাথার উপর দিয়ে যে আত্মহত্যা, যে-সব অকালমৃত্যুর ঝড় বয়ে গেল, তারই উপর। সেখানে তিনি অনাথের চেয়েও অনাথ, আতুরের চেয়ে আতুর।'

শহ্‌র্‌-ইয়ার বড় শান্ত মেয়ে। কোনো আপত্তি জানালো না দেখে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। বললুম, 'আচ্ছা, রাশার সম্রাট জার নিকলাসের নাম শুনেছ?'

'না তো।'

'কিছু এসে যায় না। এইটুকুই যথেষ্ট যে তাঁর কোনো অভাব ছিল না। ইয়োরোপের রাজা-সম্রাটদের ভিতর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বিত্তশালী। দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরই রচিত একটি কবিতার শেষ দুটি লাইন আমার মনে পড়ছে, আবছা আবছা। ভুল করলে অপরাধ নিয়ো না। সত্যেন দত্তের অনুবাদঃ

"কাতরে কাটাই
সারা দিনমান
কাঁদিয়া কাটাই নিশা।
সহি, দহি, ডাকি
ভগবানে আমি
শান্তির নাহি দিশা॥"

এর চেয়ে আন্তরিকতা ভরা, হৃদয়ের গভীরতম গুহা থেকে উচ্ছ্বসিত কাতরতা ভরা আর্তরব তুমি কি চাও?

না হয় রাশার জার-এর কথা থাক্।

কুরান শরীফ এবং এদিক ওদিক নানা কেতাবে রাজা দাউদের—King David-এর কাহিনী নিশ্চয়ই কিছু কিছু পড়েছ? ইনি শুধু প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহই ছিলেন না, তিনি বাইবেল কুরান উভয় কর্তৃক স্বীকৃত পয়গম্বর।

ভগবৎ-বিরহে কাতর এই রাজার Psalms বাইবেলে পড়েছ?

"কতদিন ধরে, এমন করিয়া
ভুলিয়া রহিবে প্রভু ?"

"Why standest thou afar off, O Lord? Why hidest thou thyself in times of trouble?"

আরো শুনবে ?'

শহর্-ইয়ার মাথা না তুলেই বললে, 'আমার একটা কথা আছে—'

আমি বললুম, 'অনেক রাত হয়েছে। কাল সে-সব হবে।'

তারপর ছাড়লুম আমার সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ অগ্নিবাণ :

'তোমারও তো ধনদৌলতের কোনো অভাব নেই। তবে তুমি কেন সকাল সন্ধ্যা ছুটছো পীর সাহেবের বাড়িতে ? ভেবেচিন্তে কাল বুঝিয়ে বলো।'

একুশ

কি একটা স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলুম।

স্বপ্ন কি, তার অর্থ কি, সে ভবিষ্যদ্বাণী করে কি না, এসব বাবদে এখনো মানুষ কিছুই জানে না। অনেক গুণী-জ্ঞানী অবশ্য অনেক-কিছু বলেছেন। আঁরি বের্গসন্ থেকে ফ্রয়েট সাহেব পর্যন্ত। পড়ে বিশেষ কোনো লাভ হয় নি—অন্তত আমার।

তবে এ-বাবদে একটি সাত বছরের ছেলে যা বলেছিল সেটা সব পণ্ডিতকে হার মানায়। অন্তত, স্বপ্ন জিনিসটা কি, সে-সম্বন্ধে তার আপন বর্ণনা। ডাক্তার তাকে শুধিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন দেখে কি না ? পট্ করে উত্তর দিল, 'ও, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিনেমা দেখা ? না ?'

বেশ উত্তর। কিন্তু এখানেই শেষ কথা নয়। আমি এর থেকে একটা তত্ত্বও আবিষ্কার করেছি—কারণ একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ বলেছেন, স্বর্গরাজ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশাধিকার শিশুদের। সেই তত্ত্বটি সূত্ররূপে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় : আজ-কের দিনের বাঙলা ফিল্‌ম্ দেখে যেমন আসছে বছরে বাঙলার ভবিষ্যৎ কি হবে সে-সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, ঠিক তেমনি আজ রাত্রে আমি যা স্বপ্ন দেখলুম, তার থেকে তিন মাস পরে আমার কি হবে, সে-হদীস খোঁজা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।... তার চেয়ে অনেক নিরাপদ, তাস ফেলে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী কার্য করা, কিংবা তার চেয়েও ভালো, অচেনা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় ধাপের সংখ্যা জোড় না বেজোড়, গুনে গুনে সেটা বের করে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করা। জোড় হলে মোলায়েম কায়দায় কাজ হাসিল করার চেষ্টা—বেজোড় হলে লোকটার মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম পেটানোর মত শ্মশান-চিকিৎসায়।

কিন্তু আমি স্বপ্নটা দেখেছিলুম একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে।

সেই বাচ্চাটার মত সিনেমা দেখি নি। আমার ফিল্‌ম্‌টা যেন 'যান্ত্রিক গোলযোগে' (অবশ্য তার অন্য 'প্রোগ্রাম' শেষে মরমিয়া ভণ্ডস্বরে কেউ ক্ষমা চায় নি) কেটে যায়। কিন্তু সিনেমার বাক্‌যন্ত্রটি বিকল হয় নি। সে যেন সাথীহারা বিধবার মত একই রোদন বার বার কেঁদে যাচ্ছিল: 'সবই বৃথা, সবই মিথ্যা, সবই বৃথা, সবই মিথ্যা।'…বোধ হয় ফিল্‌ম্‌টা বাইবেলের কোনো কাহিনী অবলম্বন করে তার রূপ বাণী পেয়েছিল। কারণ, তারই সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজিতে ঠিক ঐ একই সন্তাপ কানে আসছিল, 'ভ্যানিটি অব্‌ ভ্যানিটিজ; অল্‌ ইজ্‌ ভ্যানিটি।' যেন বৌদ্ধদের সেই 'সর্বং শূন্যং, সর্বং ক্ষণিকম্‌।'

এবং সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য! বহু, বহু বৎসর পূর্বে দক্ষিণভারতের 'অরুণাচলে' শোনা একটি সংস্কৃত মন্ত্র কানে আসছিল:

'কর্তুরাজ্ঞয়া
প্রাপ্যতে ফলম্‌।
কর্ম কিং পরং
কর্ম তজ্জড়ম্‌॥'

এর বাঙলা অনুবাদ আমার এমনই সুপরিচিত যে, স্বপ্নশেষে সেটিও আমার স্মৃতিপটে ধরা দিল:

'ঈশ্বরাজ্ঞাধীন কর্ম ফলপ্রসূ হয়।
জড় কর্ম সেই হেতু ঈশ বাচ্য নয়॥'

অর্থাৎ কর্ম জিনিসটাই জড়।…ঐ একই কথা—তুমি যে ভাবছো, তোমার যে 'অহংকার', তুমি কর্ম করছো এবং সেই কর্ম থেকে ফল প্রসবিত হচ্ছে.সেটা সর্বৈব মিথ্যা, সেটা ভ্যানিটি ('অহংকার')।

বলতে পারবো না, কটা ভাষাতে, গদ্যে পদ্যে, পদ্যে গদ্যে মেশানো ভাষায়, কত সুরে এই ফিলার্‌মনিক্‌ অর্কেস্ট্রা চলেছিল।

কিন্তু তখনো স্বপ্ন শেষ হয় নি।

শেষ হলো সেই অরুণাচলমের আরেকটি শ্লোক দিয়ে:

'ঈশ্বরার্পিতং
নেচ্ছয়া কৃতম।
চিত্তশোধকং
মুক্তিসাধকম্‌॥'

পাঁজরে যেন গুত্তা খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলুম।

স্বপ্নলব্ধ প্রত্যাদেশে আমি বিশ্বাস করি নে। কিন্তু এবারে আমার ঘাড়ে হুড়-মুড়িয়ে আস্ত একটা ট্রাকের চল্লিশ মণ ইঁট যে-ভাবে পড়লো তাতে অত্যন্ত বিমূঢ় অবস্থায়ও আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, আমার কর্ম দ্বারা কোনো কিছুরই সমাধান হবে না, শহ্‌র্‌-ইয়ার, ডাক্তার, পীর সাহেব—এদের জট ছাড়ানো আমার

'কর্ম' নয়, আমার 'কর্ম' ঈশ্বর-অর্পিত' নয়।

অতএব এ-পুরী থেকে পলায়নই প্রশস্ততম পন্থা।

*　　　*　　　*

তখনো ফজরের নামাজের আজান পড়ে নি। চন্দ্র অস্তে নেমেছে, কিন্তু তখনো রাত রয়েছে। পূর্ব দিকের অলস নয়নে তখনো রক্তভাতি ফুটে ওঠে নি।

প্রথম একটা চিরকুট লিখলুম। তার পর হাতের কাছে যা পড়ে, নুন ময়লা ধুতি কুর্তা পরে, গরীবের যা রেস্ত তাই পকেটে পুরে চোর এবং অভিসারিকার সম্মিলিত নিঃশব্দ চরণক্ষেপে নিচের তলার সদর দরজার কাছে এসে দেখি, দরজা খোলা। আল্লা মেহেরবান্। তখন দেখি, বৃদ্ধ দারওয়ান শূন্য বদনা দোলাতে দোলাতে দরজা দিয়ে ঢুকছে। পরিষ্কার বোঝা গেল, বৃদ্ধ ফজরের নামাজের পূর্বেকার তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ে।

মনে পড়ল, বহু বহু বৎসর পূর্বে, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের অতি কাছে, 'নূতন বাড়িতে' কয়েক মাসের জন্য আমার আশ্রয় জুটেছিল। তখন অনিদ্রাকাতরতাবশত অনিচ্ছায় শয্যাত্যাগ করে আমলকী গাছের তলায় পাইচারি করতে করতে দেখেছি, শুভ্রতম বস্ত্রে আচ্ছাদিত গুরুদেব পূর্বাস্য হয়ে উপাসনা করছেন। পরে তাঁর তৎকালীন ভৃত্য সাধু'র কাছে শুনেছি, তিনি আগের সন্ধ্যায় তোলা বাসি জলে কী শীত কী গ্রীষ্মে স্নানাদি সমাপন করে উপাসনায় বসতেন। তাঁর সর্বাগ্রজ, তাঁর চেয়ে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথকেও আমি শান্তি-নিকেতনের অন্য প্রান্তে ঐ একই আচার-নিষ্ঠা করতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট ; বড়বাবুর একাশি।

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। কিন্তু এসব প্রাচীন দিনের কাহিনী বলার লোভ সম্বরণ করা বড় কঠিন। অনেকে আবার শুনতেও চায় যে।

*　　　*　　　*

ঘটিদের একটা মহৎ গুণ, তারা অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। যদিও আড়ালে আবডালে বসে তক্কে তক্কে থেকে আপনার হাঁড়ির খবর, পেটের খবর, যে সাদামাটা পোর্টফোলিও নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন, বেরুলেন তার ভিতরকার খবর সব জেনে নেয়। আর বাঙালরা এ-বাবদে বুদ্ধু। বেমক্কা প্রশ্ন করে অন্য পক্ষকে সন্দিহান করে তোলে। ঘটি তথ্খুনি জিভে কানে ক্লরফর্ম ঢেলে, ঠোঁট দুটো স্টিকিং প্ল্যাস্টার দিয়ে সেঁটে নিয়ে চড়চড় করে কেটে পড়ে।

তদুপরি এ-বৃদ্ধ দারওয়ান এ-বাড়ির অনেক কিছুই দেখেছে। বেশীর ভাগই দুঃখের। যে-বাড়ি একদা গমগম করতো, সে এখন কোথায় এসে ঠেকেছে! ভূতুড়ে বাড়ি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। সে জানে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে যে-সব উত্তর শুনতে হয়, তার অধিকাংশই অপ্রিয়।

আমি তার দিকে চিরকুটটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'সাহেব, বেগম-সাহবকো

দেনা।' খ্দা-হাফিজ' 'আভ আয়া' (সেটা হবে মিথ্যে) এ-সব তো বললুমই না বখশিশ্ দিলে তো এক মুহূর্তেই সর্ব কামুফ্লাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

চিরকুটে লেখা ছিল, 'আমি বোলপুর চললুম; সময়মত আবার আসবো।'

'যঃ পলায়তি স জীবতি।' আমি ম্লেচ্ছ, দেব-ভাষা জানি নে। 'স জীবতি' না, হয়ে 'যুবতী' ও হতে পারে। সতীত্ব রক্ষা করতে হলে যুবতীকে পলায়ন করতে হয় বই কি !

* * * * *

প্রথম হাওড়াগামী ট্রামের জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করতে করতে কদম কদম বাড়িয়ে হাওড়াবাগে এগিয়ে চললুম।

ট্রাম এল। উঠলুম। পাঁচ কদম যেতে না যেতেই বুঝলুম, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' আমাদের ছেলেবেলায় ট্রাম গাড়ির কি-সব যেন থাকতো স্প্রিঙং, শক্-এব্জরবার আরো কত কী। গাড়ি এমনই মোলায়েমে যেত যে, মনে হতো ওয়াই এম সি এ'র বিলিয়ার্ড টেবিল পেতে এখানে ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ানশিপ দিব্য খেলা যেতে পারে। বস্তুত তখনকার দিনে এরকম আরামদায়ক নিরাপদ বাহন কলকাতায় আর দ্বিতীয়টি ছিল না। আর আজ ! প্রতি আচমকা ধাক্কাতে মনে ভয় হলো, কাল রাত্রিতে যা খেয়েছি তারা বুঝি সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে গিয়েছিল, এই বুঝি সবাই একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে মোকামে ফেরৎ এসে কণ্ডাকটরের কাছে 'গুহ কমিশনের রিপোর্ট' পেশ করবেন, আমি ভোরবেলাকার বেহেড মাতাল।

০৬'৫০-এ বারাউনি প্যাসেঞ্জার ধরে নির্বিঘ্নে বোলপুর ফিরলুম।

কিন্তু বর্ধমানে চা জুটলো না। বর্ধমানে চা যোগাড় করার ভানুমতী খেল গুণীন্ একমাত্র শহ্র্-ইয়ারই নব নব ইন্দ্রজালে নির্মাণ করে দেখাতে পারেন। সে তো ছিল না।

ট্রেনে মাত্র একটি চিন্তা আমার মনের ভিতর ঘোরপাক খাচ্ছিল।

এই যে আমি কাউকে কিছু না বলে কয়ে সরে পড়লুম, এটাকে ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন 'পলায়ন-মনোবৃত্তি' না কি যেন—বোধ হয় 'এস্কেপিজম'—রাজভাষায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের সংস্কৃত 'পাণ্ডিত্যে'র দ্বিরদরদস্তম্ভের উচ্চাসনে বসে যে তত্ত্ব প্রচার করেন—ইংরেজ 'পণ্ডিত'রা তো বটেনই, এবং তাদেরই নুন-নেমক-খেকোহনুকরণকারী জর্মন ফরাসি 'পণ্ডিতের'ও একাধিক জন—সে তত্ত্বের নির্যাস ঃ 'ভারতীয় সাধু-সন্ত, গুণীজ্ঞানী, দার্শনিক-পণ্ডিত সবাই, সক্কলেই অত্যন্ত স্বার্থপর, সেল্ফিশ্। তারা শুধু আপন আপন মোক্ষ, আপন আপন নির্বাণ-কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত। বিশ্বসংসারের আতুরকাতরজনের জন্য তাদের কণামাত্র শিরঃপীড়া নেই, নো হিউমেন সিমুপেথি, নো পরোপকার প্রবৃত্তি। এই

ভারতীয়দের দর্শন—কী সাংখ্য, কী বেদান্ত, কী যোগ—সর্বত্রই পাবে এক অনুশাসন, "আত্মচিন্তা করো, আপন মোক্ষচিন্তা করো।" মোস্ট্ সেল্ফিশ্ এগোইস্টিক ফিলসফি।'

এসব অর্ধভুক্ত বমননিঃসৃত 'আপ্তবাক্য' যুক্তিতর্কদ্বারা খণ্ডন করা যায় না। ভূতকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে ঘায়েল করা যায় না। সেখানে দরকার—জৈসন কে তৈসন—তেজী সরষে, ঝাঁজালো লঙ্কা পোড়ানো।

সে মুষ্টিযোগ রপ্ত ছিল একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের। এ-স্থলে তিনি প্রয়োগ করলেন ঝাঁজালো লঙ্কা-পোড়া। অর্থাৎ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। অতিশয় সিদ্ধহস্তে। অথচ সে পুণ্যশ্লোক রচনা এমনই সুনিপুণ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তথা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-ভরা যে, আজো, অর্ধশতাব্দাধিক কাল পরও, এখনো কোনো কোনো 'ভরতপ্রেমী' 'হিন্দু সভ্যতা তথা মর্যাদা রক্ষাকরনেওয়ালা বামনাবতার মন্ডলী' বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ বুঝতে না পেরে 'বঙ্কিম মুর্দাবাদ, বঙ্কিম মুর্দাবাদ' জিগির তুলে গগনচুম্বী লম্ফপ্রদানে উদ্যত হন।

বঙ্কিমের সেই 'রামায়ণ সমালোচনার' কথা ভাবছি।

অবশ্য এ-সব ব্যঙ্গ ছাড়াও এদেশের পণ্ডিতগণ দার্শনিক পদ্ধতিতেও ইয়োরোপীয় 'পণ্ডিতদের' মুখ-তোড় উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু হায়, দর্শনশাস্ত্রে আমার আলিফের নামে ঠ্যাঙা। আমি অন্য-দৃষ্টি অন্য দর্শনের আশ্রয় নি।

অপবাদটা ছিল কি? আমরা নাকি বড্ডই স্বার্থপর, নিজের মোক্ষচিন্তা-ভিন্ন অন্য কারো কোনো উপকার বা সেবার কথা আদৌ ভাবি নে।

এস্থলে আমার বক্তব্যটি—তার মূল্য অসাধারণ কিছু একটা হবে না জানি—সামান্য একটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে আরম্ভ করি। এই বাঙলা দেশে সব চেয়ে বেশী কোন্ গ্রন্থখানা পড়া হয়? অতি অবশ্যই মহাভারত। মূল সংস্কৃত, মহাত্মা কালীপ্রসন্নের অনুবাদ, বা রাজশেখরীয়, কিংবা কাশীরামের বাঙলায় রূপান্তরিত মহাভারত কিছু-না-কিছু-একটা পড়ে নি এমন বাঙালী পাওয়া অসম্ভব। এই হিসেবের ভিতর বাঙালী মুসলমানও আসে। প্রমাণস্বরূপ একটি তথ্য নিবেদন করি। দেশ-বিভাগের প্রায় পনেরো বৎসর পর আমি একটি পাকিস্তানবাসিনী মুসলিম ইন্স্পেকট্রেস্ অব্ স্কুলস্কে শুধোই, 'আমাদের দেশে বাচ্চা-বাচ্চাদের ভিতর এখন কোন্ কোন্ বই সব চেয়ে বেশী পড়া হয়?' ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'রামায়ণ-মহাভারত—বরঞ্চ বলা উচিত মহাভারত-রামায়ণ—কারণ মহাভারতই বাচ্চাবাচ্চারা পছন্দ করে বেশী। তবে তারা প্রামাণিক বিরাট মহাভারত পড়ে না। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু পরিবারে এখনো কাশীরাম, কিন্তু বাচ্চারা পড়ে "মহাভারতের গল্প" এই ধরনের সাদা-সোজা চটি বই।' তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, 'অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। আমার বারো বছরের ছেলেটা ইতিমধ্যেই তার মামার মত "পুস্তক-কীট" হয়ে

গিয়েছে। তাকে কালীপ্রসন্ন আর রাজশেখর দুইই দিয়েছিলুম। মাস দুই পরে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, "রাজশেখর বাবুর ভাষাটি বড় সহজ আর সুন্দর। কিন্তু সব-কিছুর বড় ঠাসাঠাসি। কালীপ্রসন্নবাবুটা বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা। আরাম করে ধীরে ধীরে পড়া যায়"।' এর পর মহিলাটি একটু হেসে বললেন, 'জানেন,—বয়স্ক মুসলমানদের কথা বাদ দিন, তাঁরা তো দেশ-বিভাগের পূর্বেই কারিকুলাম-মাফিক রামায়ণ-মহাভারত অন্নদামঙ্গল মনসামঙ্গল এ-সবেরই কিছু কিছু পড়েছিলেন—কিন্তু পার্টিশনের এই পনেরো বৎসর পরও, আমাদের মুসলমান বাচ্চারা "দাতাকর্ণ"-কে চেনে বেশী, কর্ণের অপজিট নাম্বার আরব দেশের দাতাকর্ণ হাতিম তাঈ-কে চেনে কম।'

এই মহাভারতটি যখন বালবৃদ্ধবনিতার এতই সুপ্রিয় সুখপাঠ্য, তখন দেখা যাক্, এ-মহাগ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের শেষ উপদেশ কি—ভুল বললুম, 'উপদেশ' নয়, আপন আত্মবিসর্জনকর্মদ্বারা দৃষ্টান্ত-নির্মাণ, আদর্শ নির্দেশ—সেটি কি ?

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণাধিক প্রিয় চারি ভ্রাতা, মাতা কুন্তীর পরই যে নারী তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা সমাদৃতা, যাঁর শপথ রক্ষার্থে এই শান্তিপ্রিয় যুধিষ্ঠির নৃশংস কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন, সেই নারী, এবং পর পর তাঁর চার ভ্রাতা মহাপ্রস্থানিকপর্বে বর্ণিত হিমালয় অতিক্রম করার সময় একে একে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন পরম স্নেহশীল যুধিষ্ঠির তাঁদের জন্য ক্ষণতরেও শোক করেন নি, কারো প্রতি মুহূর্তেক দৃষ্টিপাত না করে সমাহিতচিত্তে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ-সময় সে-ই কুক্কুর, যে হস্তিনাপুর থেকে এঁদের অনুগামী হয়েছিল, সে-ই শুধু যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে।

এমন সময় ভূমণ্ডল নভোমণ্ডল রথশব্দে নিনাদিত করে দেবরাজ স্বর্গরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে সমুপস্থিত হয়ে বললেন, 'মহারাজ, তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হয়ে স্বর্গারোহণ করো।'

এর পর উভয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। আমার ভাষায় বলি, বিস্তর দর কষাকষি হলো। শেষটায় সমঝাওতা ভী হলো। ঐ যে-রকম দেশ-বিভাগের পূর্বে কংগ্রেস লীগে হয়েছিল। কিন্তু সে তুলনার এখানেই সমাপ্তি। ইতিমধ্যে চতুর্থ পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ করেছেন।

এর পর, পুনরায় আমার নগণ্য ভাষাতেই বলি, বখেড়া লাগল সেই নেড়ি কুত্তাটাকে নিয়ে। যুধিষ্ঠির ফরিয়াদ করে বলছেন, 'এ কুত্তাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে এত দীর্ঘদিন ধরে এসেছে। একে ওখানে ছেড়ে গেলে আমার পক্ষে বড়ই নিষ্ঠুর আচরণ হবে।'

সরল ইন্দ্র মনে মনে ভাবলেন, এ তো মহা ফ্যাসাদ। এই যুধিষ্ঠিরটা তো আপন স্বার্থ কখনো বোঝে নি, এখনও কি আপন কল্যাণ বোঝে না ? প্রকাশ্যে বললেন, 'ধর্মরাজ, আজ তুমি অতুল সম্পদ, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব

লাভ করবে (এই 'স্বরূপত্ব লাভ'টা আমি আজো বুঝতে পারি নি ; মরলোকের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তো স্বর্গলোকে তাঁর স্বরূপত্ব লাভ করবেন স্বর্গের যম-রাজার অস্তিত্বে বিলীন হয়ে—ইন্দ্রের স্বরূপত্ব লাভ করবেন তো তাঁর পুত্র অর্জুন !) । এসব বিদকুটে বয়নাক্কা করো না। আমার-এই অতি পূত, হেভেনলি বেহেশ্‌তের রথে ঐ নেড়ি, ঘেয়ো অতিশয় অপবিত্র কুকুর—আর হাইড্রফবিয়া থাকাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়—কি করে ঢুকতে পারে ?'

* * *

এ-সব তাবৎ কাহিনী সক্কলেরই জানা। আমি শুধু আমার আপন ভাষাতে কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। কেউ যেন অপরাধ না নেন। যুগ যুগ ধরে আসমুদ্র-হিমাচল সবাই আপন আপন ভাষাতে মহাভারত নয়া নয়া করে লিখেছে। আমি যবন। আপ্তবাক্য বেদে আমার শাস্ত্রাধিকার নেই। কিন্তু মহাভারতে অতি অবশ্যই আছে। সাবধান ! বাধা দেবেন না। কমুনাল রায়োট লাগিয়ে আপন হক্ক কেড়ে নেব।

কিন্তু এহ বাহ্য।

ইয়োরোপীয়রা বলে আমরা স্বার্থপর। তবে আমাদের এই যে সর্বপরিচিত সর্বজনসম্মানিত গ্রন্থে যুধিষ্ঠির বলছেন, তাঁর স্বর্গসুখের তরে কোনো লোভ নেই, তিনি মোক্ষলুব্ধ নন, এমন কি স্বর্গে না যেতে পারলে তিনি যে তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, কুন্তী, পাঞ্চালীর সঙ্গসুখও পাবেন না, তাতেও তাঁর ক্ষোভ নেই—কিন্তু, কিন্তু, তিনি—

এই 'ভক্ত শরণাগত' কুকুরটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

* * *

ট্রেনে কলকাতা থেকে আসতে আসতে এই সব কথা ভাবছিলুম। স্বপ্নে যে শুনেছিলুম, যার মোদ্দা ছিল,

'ওরে ভীরু, তোমার উপর নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার ॥'

'তুই কলকাতা ছেড়ে পালা'। না, যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে সেই পন্থা অবলম্বন করবো ?—অবশ্য আমি যুধিষ্ঠির নই বলে, আমার যেটুকু সঙ্গতি আছে সেইটুকু সম্বল করে নিয়ে।

হজরৎ নবী প্রায়ই বলতেন, 'আল্লার উপর নির্ভর (তওয়াক্কুল্) রেখো।' একদা এক বেদুইন শুধলো, 'তবে কি, হুজুর, দিনান্তে উটগুলোকে দড়ি দিয়ে না বেঁধে মরুভূমিতে ছেড়ে দেব—আল্লার উপর নির্ভর করে ?' পয়গম্বর মৃদুহাস্য করে বলেছিলেন, 'না। দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে আল্লার উপর নির্ভর রাখবে।' অর্থাৎ বাঁধার পরও ঝড়ঝঞ্ঝা আসতে পারে, দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে, চোর এসে দড়ি কেটে উট চুরি করে নিয়ে যেতে পারে—ঐ সব অবোধ্য দৈব-

দুর্বিপাকের জন্য আল্লার উপর নির্ভর করতে হয়।

তবে কি আমার কলকাতাতে রয়ে গিয়ে যেটুকু করার সেইটুকু করাই উচিত ছিল—আল্লার উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ 'মা ফলেষু কদাচন' করে?

*　　　　*　　　　*

শুতে যাবার সময় হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আপন মনে একটু হাসলুম।

সেই পাকিস্তানী মহিলাকে শুধিয়েছিলুম, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এই নাপাক কুকুরটা মহাভারতে ঢুকলো কেন?

তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভেবে দেখেছি কথাটা।…আসলে কি জানেন, মহাভারত সব বয়সের লোকের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে—বাচ্চাদের জন্যও।

তারা কুকুর বেরাল ভালোবাসে। তাই তারা কুকুরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়। ঐটেই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগ।'

বাইশ

কলকাতা,

হাজার হাজার আদাব তসলিমাৎ পর পাক জনাবে আরজ এই,

সৈয়দ সাহেব,

আমি ভেবেছিলাম, দু'একদিনের ভিতর আপনাকে সব-কথা খুলে বলার সুযোগ পাব, কিন্তু আপনি হঠাৎ চলে গেলেন। আপনার ডাক্তার বিস্মিত ও ঈষৎ নিরাশ হয়েছেন। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলুম, এই ভালো। আপনার সামনে আমার বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এমন সব আপত্তি, প্রতিসমস্যা তুলতেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার কোনো কিছুই বলা হয়ে উঠতো না। তাই চিঠিই ভালো। কে যেন আপন ডায়েরি লেখার প্রারম্ভেই বলেছেন, মানুষের চেয়ে কাগজ ঢের বেশী সহিষ্ণু।

অবশ্য এ-কথা আবার অতিশয় সত্য যে পত্র লেখার অভ্যাস আমার নেই। ভাষার উপর আমার যেটুকু দখল সেও নগণ্য। তাই যা লিখব তা হবে অগোছালো। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটিও বলি; আমার ভাবনা-চিন্তা সবই এমনই অগোছালো যে অগোছালো ভাষাই আমার অগোছালো মনোভাবকে তার উপযুক্ত প্রকাশ দেবে। তদুপরি আমি জানি, আপনি গোছালো অগোছালো সব রাবিশ সব সারবস্তু মেশানো যে ঘ্যাঁট, তার থেকে সত্য নির্যাসটি বের করতে পারেন।

আপনি হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠছেন। আমি মোদ্দা কথায় আসছি না কেন? সেটাতে আসবার উপায় জানা থাকলে তো অনেক গণ্ডগোলই কেটে যেত।

আপনার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত আমার বুকে তুফান তোলে না, সে কথা আপনাকে আমি বলেছি। এখনও ফের বলছি—আপনার সে-রাত্রের দীর্ঘ ডিফেন্সের পরও। অথচ এস্থলে আমাকে তাঁরই শরণ নিতে হলো।

গানটি আপনি নিশ্চয়ই জানেন :

'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।'

এস্থলে আমি এটা স্বীকার করে নিচ্ছি, যে, কবিগুরুর তুলনায় আমি শোকদুঃখ পেয়েছি অনেক অনেক কম। আপনি সে-রাত্রে তাঁর একটার পর একটা দুর্দৈবের কাহিনী বলার পূর্বে আমি সেদিকে ও-ভাবে কখনো খেয়াল করি নি। আপনার এই সুন্দুমাত্র তথ্যোল্লেখ আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে। আমি ভাবছিলুম, রবীন্দ্রনাথ পর পর এতগুলো শোক পাওয়ার পরও কি জানতে পারলেন না, তাঁর 'কিসের ব্যথা', তাঁর শোকটা কোন্ দিক থেকে আসছে ?

তাই অসংকোচে স্বীকার করছি, আমি এখনো ঠিক ঠিক জানি নে, 'আমার কিসের ব্যথা', আমার অভাব কোন্খানে, যার ফলে বিলাসবৈভবের মাঝখানেও যেন কোনো এক অসম্পূর্ণতার নিপীড়ন আমাকে অশান্ত করে তুলেছিল।

কিন্তু এখানে এসেই আমার বিপত্তি—এতদিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে। এবং সত্য বলতে কি, তার অনেক আগের থেকেই। কিশোরী অবস্থায় যখন প্রথম পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ হয় তখন থেকেই। পুরুষ কথাটার উপর আমি এখানে জোর দিচ্ছি।

আমার বিপত্তি, আমার সমস্যা—পুরুষমানুষ কি কখনো নারীর মন বুঝতে পারে, চিনতে পারে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে ? সাহিত্যজ্ঞ সমালোচক পণ্ডিতরা বলেন, সার্থক সাহিত্যিকের ঐ তো কর্ম, ঐ তো তার সত্যকার সাধনার্জিত সিদ্ধি। জমিদার রবীন্দ্রনাথ গরীব পোস্টমাস্টার, ভিন্‌দেশী কাবুলীওলার বুকের ভিতর প্রবেশ করে তাদের হৃদয়ানুভূতি স্পন্দনে স্পন্দনে আপন স্পন্দন দিয়ে অনুভব করে তাঁর সৃজনীকলায় সেই অনুভূতিটি প্রকাশ করেন। যে কবি, যে সাহিত্যিক আপন নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মরণ করে, অপরের সত্তায় বিলীন হয়ে যত বেশী গ্রহণ করে আপন সৃজনে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই তত বেশী সার্থক কবি, সাহিত্যিক।

এ-তত্ত্বটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস, পুরুষ কবি, পুরুষ সাহিত্যিক কখনো, কস্মিনকালেও নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নি, পারবেও না; তার কারণ কি, কেন পারে না, সে নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি, কিন্তু কোনো সদুত্তর পাই নি।

যদিও কিঞ্চিৎ অবান্তর তবু এই প্রসঙ্গে একটি কথা তুলি। নারী-হৃদয়ের স্পন্দন এবং পুরুষ-হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনের আলোচনা নয়; নারী পুরুষের একে

অন্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার যে চিন্ময় প্রেম সেটাও নয়। আমি নিতান্ত মৃন্ময়, শারীরিক যৌন সম্পর্কের কথা তুলছি। আজকাল সাহিত্যিক, তাঁদের পাঠক সম্প্রদায়, খবরের কাগজে পত্র-লেখকের দল সবাই নির্ভয়ে এ-সব আলোচনা সর্বজনসমক্ষে করে থাকেন। আমার কিন্তু এখনো বাধো বাধো ঠেকে। কত হাজার বৎসরের 'না, না'-র taboo আজ অকস্মাৎ পেরিয়ে যাই কি প্রকারে?

তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা, যাঁর আপ্তবাক্যের শরণ আমি নিচ্ছি, তিনি আপনার গুরুর গুরু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে আপনি বহু বৎসর ধরে বিজড়িত সেই পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল তাঁর একখানা চিঠি। আমার শব্দে শব্দে মনে নেই। তবে মূল তত্ত্বটি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।

কে যেন তাঁকে শুধিয়েছিল, পুরুষ যখন কখনো কোনো রমণীকে দেখে কামাতুর হয় (এখানে দেহাতীত স্বর্গীয় প্লাতনিক প্রেমের কথা হচ্ছে না), তার কামকে উত্তেজিত করে রমণীর কোন্ কোন্ জিনিস?

তার মুখমণ্ডল, তার ওষ্ঠাধর, তার নয়নাগ্নি, তার কুচদ্বয়, তার নিতম্ব, তার উরু।

এইবারে প্রশ্ন, কোনো পুরুষকে দেখে যখন কোনো রমণী কামাতুরা হয় তখন কি দেখে তার কামবহ্নি প্রজ্বলিত হয়?

যে-ভদ্রলোক দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে এ-প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন তাঁর পত্র 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু 'দেশে' প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্রোত্তর থেকে সে-প্রশ্নের মোটামুটি স্বরূপ অনুমান করা যায়।

আবার বলছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ কি উত্তর দিয়েছিলেন সেটি আক্ষরিক, হুবহু আমার মনে নেই। তিনি যা লিখেছিলেন তার মোদ্দা তাৎপর্য ছিল; তিনি যে এ-সম্বন্ধে কোনো চিন্তা করেন নি, তা নয়। কিন্তু কোনো সদুত্তর খুঁজে পান নি।

তারপর ছিল ইংরিজি একটি সেন্টেন্স। যতদূর মনে পড়ছে, তিনি লিখলেন, But why ask me? Ask Rabi. He deals in them. অর্থাৎ বলতে চেয়েছিলেন, তিনি দার্শনিক, এ-সব ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ নন; তবে লাকিলি তাঁর ছোট ভাইটি এ-বাবদে স্পেশালিস্ট; তিনি প্রেম, কাম, নিষ্কাম প্রেম সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিতে পারেন।

কিন্তু সৈয়দ সাহেব, পীর সাহেব, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিও এ-বিষয়ে খুব বেশী ওয়াকিফহাল ছিলেন না। প্রথম যৌবনে তিনি এ-সব নিয়ে কবিতা লিখেছেন, । কিন্তু বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি— যাকে বলে হট্-স্টাফ—সেটাকে তাঁর গানের বিষয়বস্তু করেন নি। বোধ হয় ভেবেছিলেন, তাঁর রচিত হট্-স্টাফ গান আশ্রমের ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীরা দিনের পর দিন শুনবে, এটা কেমন যেন বাঞ্ছনীয় নয়। এবং এগুলো তো আর ওয়াটার-

টাইট কমপার্টমেণ্টে বন্ধ করে খাস কলকাতার বয়স্কদের কন্‌জাম্‌প্‌শনের জন্য চালান দেওয়া যায় না। ওগুলোর বেশ কিছু ভাগ বুমরাঙের মত ফিরে আসবে সেই বোলপুরেই—প্রথম যুগে গ্রামোফান রেকর্ডের "কল্যাণে", পরবর্তী যুগে বেতার তো ঘরে ঘরে।

অযথা বিনয় আমার সয় না। আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত বেশ ভালো করেই চিনি, অবশ্য বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের মত তাঁর গানের "ফুলস্টপ-কমা স্পেশালিস্‌ট্‌" নই। তাই অফ্‌হ্যান্‌ড্‌ বলছি তাঁর শেষের দিকের গানের একটিতে হট্‌-স্টাফের কিঞ্চিৎ পরশ আছে ঃ—

"বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।"

আর বার বার বলছেন, "পিয়ো হে পিয়ো।" সর্বশেষে বলছেন, আমার এই তুলে-ধরা পান-পাত্র চুম্বনের সময় তোমার নিশ্বাস যেন (আমার) নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যায়।

এই যে প্রিয়ার "নবীন উষার পুষ্পসুবাসের" মত নিশ্বাস, একে নিঃশেষে শোষণ করার মত সাব্‌লাইম্‌ কাম আর কী হতে পারে?

কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি, রবীন্দ্রভক্তদের ভিতর এ-গানটি খুব একটা চালু নয়। অথচ দেখুন, সিনেমা এটা নিয়েছে, গ্রামোফোন এটা রেকর্ড করেছে। মাফ করবেন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এইসব তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তদের চেয়ে ব্যবসায়ী সিনেমা, গ্রামোফোন কোম্পানি রবীন্দ্রনাথ ক বহু বহু বার অধিকতর সম্মান দেখিয়েছে, নিজেদের সুরুচির পরিচয় দিয়েছে।

হ্যাঁ, আগে ভাবি নি, এখন হঠাৎ মনে পড়লো আরেকটি গানের কথা। এটি অবশ্য হট্‌-স্টাফ্‌ নয়, কিন্তু আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে।

"ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি॥
আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা—
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয়-মাঝে আনি
আমায় এমন মরণ হানি॥"

আচ্ছা, চিন্তা করুন তো এ-গানটি কোন্‌ সময়ের রচনা? ভাষার পারিপাট্য,

স্বতঃস্ফূর্ত মিলের বাহার, আরো কত না কারুকার্য—যেগুলো চোখে পড়ে না, কারণ প্রকৃত সার্থক কলার ভিতরে তারা নিজেদের এফার্টলেসলি বিলীন করে দিয়েছে—এগুলো তো ঐ গানের পরবর্তী শ্লোকের ভাষায় "আকাশ উজলি" লাগিয়ে বিজুলি আমাকে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে, গানটি কবির পরিপক্ক বয়সের অত্যুৎকৃষ্ট সৃজন। নিশ্চয়ই এ-শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে।

কিন্তু যে গুণী আমাকে এ-গানটি শুনিয়েছিলেন এবং শেখাবারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি "গীতবিতানে" যে মুদ্রিত পাঠ আছে তার থেকে মাত্র একটি শব্দ পরিবর্তন করে গানটি গেয়েছিলেন : ছাপাতে আছে, ঝড়ের দুর্দান্ত বাতাসে কে যেন আর্তরব করছে, তবে 'মুখের আঁচলখানি উড়ে যাচ্ছে।'

গুণী বলেছিলেন, "১৯২০-১৯৩০"-এ মুখের আঁচল উড়ে যাওয়াতে কোন্ মেয়ে এরকম চিল-চ্যাঁচানো চেল্লাচেল্লি পাড়া-জাগানো হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ করবে? তার নাকি "সাজসজ্জা লাজলজ্জা" বেবাক কপ্পূর হয়ে গেল। (এস্থলে বলি, ঐ গুণীটি আপনার ভাষার অনুকরণ করেন।) আর শুধু কি তাই? তাকে "প্রলয় মাঝে আনি/এমন মরণ হানি"—"তুমি দেখলে আমারে!"—'

গুণী বললেন, 'এটা হতেই পারে না। আসলে গানটি কি ছিল জানেন? সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় সে ছিল তখন উলঙ্গ। সে গান ছিল,

"ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার বুকের
বসনখানি"

অর্থাৎ ঝড়ে মুখের "আঁচলখানি" যায় নি, গেছে "বুকের বসনখানি"।

কিন্তু গানটি প্রথমবার গাওয়া মাত্রই যাঁরা সে নিতান্ত ঘরোয়া জলসাতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেমন যেন অস্বস্তি অশ্বস্তি ভাব প্রকাশ করে কেউ বা জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, কেউ বা পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ নূতন গান প্রথমবার সর্বজন-সমক্ষে গাওয়া হয়ে যাওয়ার পরই আপন প্যাঁসনে চশমাটি পরে নিয়ে সক্কলের মুখের দিকে এক নজর চোখ বুলিয়ে নিতেন এবং বুঝে যেতেন, নূতন গানটি শ্রোতাদের হৃদয়-মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এবারে তিনি বুঝে গেলেন, কোনো কিছুতে একটা খটকা বেধেছে—যেটা অবশ্য ছিল বড় বিরল। তাই কাকে যেন শুধোলেন—আমার ঠিক ঠিক মনে নেই—ব্যাপারটা কি? কারণ আজ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গানটি অপূর্ব।

তখন কে যেন একজন সভয়ে বললেন, "ঐ বুকের বসন" কেউ, কেউ মিসআণ্ডারস্টেণ্ড করতে পারে হয়তো।"

রবীন্দ্রনাথ এ-সব রসের আসরে তর্কাতর্কি করতেন না। চুপ করে একটু-খানি ভেবে বললেন, "আচ্ছা দেখছি।"

আশ্রমে রাত্রের খাবার ঘণ্টা পড়ে গেল। সভা ভঙ্গ হলো।

তার পর দিনই টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হলো। তার কিছুদিন পরে ছাপাতে দেখি,—গানটি কোথায় যেন বেরিয়েছিল—"বুকের বসনের" বদলে "মুখের আঁচল" এই বিরূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।"

"গুণী কিছুটা সহানুভূতিমাখা সুরে আপন বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে, "অর্থাৎ সেই নগ্ন নবজাত শিশু গানটির উপর রবীন্দ্রনাথ পরিয়ে দিলেন চোগা-চাপকান—পাঁচজনের পাল্লায় পড়ে।...এ-সম্বন্ধে আমার মতামত তো বললুম, কিন্তু কবি, সুরকার, নব নব রাগরাগিণীর সৃষ্টিকর্তা রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনা করার—নিন্দাবাদ দূরে থাক—আমার কী অধিকার! আমার অতি নগণ্য রসবোধ যা বলে, সেইটেই প্রকাশ করলুম মাত্র।

* * *

কিন্তু প্রিয় সৈয়দ সাহেব, এই যে মুখের আঁচল, বুকের বসন নিয়ে কাহিনীটি ঐ গুণী কীর্তন করেছিলেন সেটা ন'সিকে লিজেণ্ডারি বা—আপনাদের রকের ভাষায় গুলও হতে পারে, কিংবা এর ভিতর সিকি পরিমাণ সত্যও থাকতে পারে। কারণ ঐ গুণী প্রধানত গাইতেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। সেখানে তাঁকে ক্রমাগত ইম্প্রোভাইজ করতে হয়, নব নব রস সৃষ্টি করার জন্য নব নব কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। সেটা পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তাই তো সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওস্তাদদের নিয়ে এত গণ্ডায় গণ্ডায় লিজেণ্ড। হয়তো তিনি সেটা নিছক কল্পনা দিয়ে রঙে রসে জাল বুনেছেন, এবং বার বার একে ওকে সেটা বলে বলে, সেই "রেওয়াজের" ফল স্বরূপ নিজেই এখন সে-কাহিনী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন।

আপনিই না এক দিন বলেছিলেন, "পরিপূর্ণ পাক্কা মিথ্যেবাদী হওয়ার পথে যেতে যেতে যারা উত্তম সুযোগ না পেয়ে দড়কচ্চা মেরে গেল, অর্থাৎ যাদের গ্রোথ্ স্টান্টেড্ হয়ে গেল, তারাই আর্টিস্ট, সাহিত্যিক, কবি, আরো কত কী!

তবে ঐ যে-লিজেণ্ডটির কাহিনী এই মাত্র বললুম, সেটা সত্য না হলেও হওয়া উচিত ছিল,—এবং যাই হোক্, যাই থাক্—কাহিনীটি ক্যারেক্টারিস্টিক এবং টিপিকাল।

কিন্তু আপনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন—আবার ভাবছেন, আপনাকে আমার এ-চিঠি লেখার উদ্দেশ্যটা কি? এখ্খুনি বলছি।

আমার বক্তব্য, কী রবীন্দ্রনাথ, কী কালিদাস, কী বুদ্ধদেব—কেউই রমণী-রহস্য এ-যাবত আদৌ বুঝে উঠতে পারেন নি। সহস্র বৎসরের এই সাধনার ধন পুরুষমানুষ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শুধু খুঁজেছে কিন্তু সন্ধান পায় নি।

প্রশ্নটা তো অতি সরল। যা দিয়ে আমি এ-চিঠি আরম্ভ করেছি। উপস্থিত কঠিনতর সমস্যা, রহস্যগুলো বাদ দিন। সেই যে অতিশয় সাদামাটা প্রশ্ন:

পুরুষের কি দেখে রমণী কামাতুর হয় ? এবং সেটা শুধু নারী পুরুষেই সীমাবদ্ধ নয়। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গেও সেটা সমানভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ অবজেকটিভ্ স্টাডি করারও পূর্ণ সুযোগ রয়েছে।

অথচ কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ! হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করেও পুরুষজাত যখন এর সমাধান বের করতে পারে নি, তখন এই ভেড়ার পাল, এই পুরুষজাত—অপরাধ নেবেন না—বের করবে স্ত্রীচরিত্রের রহস্য, তাদের প্রেমের প্রহেলিকা—যেটা শারীরিক সম্পর্কের বহু বহু উর্ধ্বে—তাদের হৃদয়ের আধা-আলো অন্ধকারের কুহেলিকা !

তাই নিবেদন, এই পুরুষজাতকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ডাক্তার না, পীর না, আপনিও না।

পুরুষজাতটা যে মেয়েদের তুলনায় মূর্খ এবং আপন মঙ্গল কোন্ দিকে সেটা না বুঝে বাঁদরের মত যে-ডালে বসে আছে সেই ডালটাই কাটে কুড়িয়ে-পাওয়া করাত দিয়ে। নইলে এই সাত হাজার বছর ধরে এত যুদ্ধ, এত রক্তপাত ! আমার নিজের বিশ্বাস, স্ত্রীজাতি যদি এ-সংসারের সর্ব গবর্ণমেণ্ট চালাতো, কিংবা এখনো চালায় তবে ও-রকম-ধারা হবে না। আজো যদি ইউনাইটেড নেশনস্ থেকে সব কটা পুরুষকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়ে নারীসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে তারা ন'মাস দশদিনের ভিতর মার্কিন-রুশ-মৈত্রী প্রসব করবে ! আমি আপনার মত দেশবিদেশ ঘুরি নি ; যেটুকু দেখেছি তার মধ্যে সব চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, শিলঙের খাসিয়া সমাজে বাস করে—কারণ সে-সমাজ চালায় মেয়েরা। শুনেছি বর্মার সমাজব্যবস্থাও বড়ই সহজ সরল পদ্ধতিতে গড়া।

আরেকটা কথা ঃ হজরৎ মুহম্মদ নবী ইসলাম স্থাপনা করেন। এবং সে শুভকর্মের প্রারম্ভিক মঙ্গলশঙ্খ কাকে দিয়ে বাজালেন ? কাকে তিনি সর্বপ্রথম এই নবীন ধর্মে দীক্ষিত করলেন ? তিনি তো বীবী খাদিজা—নারী। তার পর আসেন পুরুষ সম্প্রদায়, হজরৎ আলী, আবু বক্‌র্, ওমর ইত্যাদি। তা হলে দেখুন, আপনি মুসলমান, আমি মুসলমান, অন্ততঃ আমাদের স্বীকার করতে হবে যে সর্বজ্ঞ আল্লাতালা—যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং—তিনিই তাঁর শেষ-ধর্ম প্রচারের সময় একটি নারীকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। ফাতিমা জিন্নাহ্ যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হবার জন্য আইয়ুব সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান তখন কলকাতার কোনো কোনো মুসলমান আপত্তি জানিয়ে বলেন, তিনি নারী। আমি তখন বলেছিলুম, পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হওয়ার চেয়ে মুসলিম জাহানে সর্বপ্রথম মুসলমানরূপে দীক্ষিত হওয়ার শ্লাঘাগৌরব অনেক অনেক বেশী—কোনো তুলনাই হয় না। সেই সম্মান যখন একটি নারী তেরশ' বছর পূর্বে পেয়েছে তখন আরেকটি আজ প্রেসিডেণ্ট হতে পারবেন না কেন ?

তখন তাঁরা তর্ক তোলেন, কিন্তু হজরৎ নবী তো পুরুষ।

আমি বলি, তিনি তো আল্লার বাণী—যার নাম ইসলাম—আল্লার কাছে মিশন রূপে পেয়ে বীবী খাদিজাকে সেইটি দিলেন। স্বয়ং নবী তো এ-হিসেবের মধ্যে পড়েন না। (এ-স্থলে আমার মনের একটি ধোঁকা জানাই। উত্তর চাই নে। কারণ পূর্বেই বলেছি, আপনাদের কাউকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এ-চিঠির উত্তর আপনাকে লিখতে হবে না, কারণ সেটি আমি পাবো না।…ব্রাহ্মধর্মের সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম কে? প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন? তবে তাঁকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করলো কে?…কিংবা নিন্ বুদ্ধদেব। তিনি স্বয়ং কি বৌদ্ধ? তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করলো কে? অন্যদের বেলা, যেমন খৃষ্ট, রামমোহনের বেলা অনুমান করতে পারি, স্বয়ং গড্ (য়াহ্বে) বা পরব্রহ্ম খৃষ্টকে খৃষ্টধর্মে, রামমোহনকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন, কিন্তু বুদ্ধের বেলা? তিনি তো ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, এবং বলেছেন তিনি, তাঁরা (দেবতারা) থাকলেও তাঁরা মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপারে অশক্ত। তা হলে?…এবং আজকের দিনের ভাষায় মার্ক্স্ কি মার্কসিস্ট? লেনিন অবশ্যই মার্কসিস্ট, কিন্তু লেনিন কি লেনিনিস্ট?)

কিন্তু একটা কথা পুরুষমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে।

আল্লার হুকুমেই দৃশ্য অদৃশ্য সব-লোকই চলে, কিন্তু মানুষের কৃতিত্বও তো মাঝে মাঝে স্বীকার করতে হয়।

"অদ্যাপিও মধ্যে মধ্যে পুণ্যবান হয়।
নারীরে স্বীকার করি জয় জয় কয়।"

হজরৎ নবী এঁদেরই একজন। বড় বিরল, বড় বিরল, হেন জন যে নারীকে চিনে নিয়ে তার প্রকৃত ন্যায্য স্বীকৃতি দেয়। তাই হজরৎ বলেছিলেন,

"বেহেশ্ৎ মাতার চরণপ্রান্তে।"

এবং নিশ্চয়ই তখন একাধিক দীক্ষিত মুসলমানের অমুসলমান মাতা ছিল। হজরৎ এ-স্থলে কোনো ব্যত্যয় করেছেন বলে তো জানি নে। এবং এ-কথাও জানি হজরৎ শিশুকালেই তাঁর মা'কে হারান।

আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারছি, আপনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করছি, আপনার উদ্দেশে লেখা এই চিঠিই আমার শেষ চিঠি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। পূর্বেই বলেছি, এ-চিঠির উত্তরও আপনাকে লিখতে হবে না।

আপনিই আমাকে একদিন বলেছিলেন, যখন আপনার কোনো পাঠক বহু সমস্যাবিজড়িত, নানাবিধ প্রশ্নসম্বলিত দীর্ঘ পত্র লিখে, দফে দফে তার প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তরসহ দীর্ঘতর উত্তরের প্রত্যাশা করে তখন আপনি মনে মনে স্মিতহাস্য করে বলেন, ভদ্রলোক যা জানতে চেয়েছেন, সেগুলো একটু গুছিয়ে রম্যরচনাকারে "দেশ" বা "আনন্দবাজারে" পাঠিয়ে দিলে তো আমার দিব্য

দু'পয়সা হয়। আর লেখা জিনিসটা নাকি আপনার পেশা। ওটা আপনার নেশা নয়। এবং পেশার জিনিস তো কেউ ফ্রী বিলিয়ে বেড়ায় না। আমি তাই আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু মুফতে চাই নে।

(শহ্‌র্‌-ইয়ারের চিঠি এতখানি পড়ার পর অকস্মাৎ "শংখচূড়ের ডংশনের" মত আমাকে সে-চিঠি স্মরণে এনে দিল, আমি এমনই পাষণ্ড যে, যবে থেকে, পোড়া পেটের দায়ে লেখা জিনিসটাকে পেশারূপে স্বীকার করে নিয়েছি, সেই থেকেই, শহ্‌র্‌-বর্ণিত ঐ কারণবশতই আপন বউকে পর্যন্ত দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখি নি। স্তম্ভিত হয়ে ভাবলুম, সেই যে স্যাকরা যে তার মায়ের গয়নায় ভেজাল দিয়েছিল আমি তার চেয়েও অধম। স্যাকরা তবু ভালো মন্দ যাহোক মা'কে এক-জোড়া কাঁকন তো দিয়েছিল, আমি সেটিও প্রকাশক সম্পাদককে পাঠাচ্ছি! ...এই অনুশোচনার মাঝখানে আমার মনে যে শেষ চিন্তাটির উদয় হলো সেটি এই ঃ এ-হেন নির্মম আচরণে হয়তো আমিই একা নই। নেইবনে হয়তো আমি একাই খাটাশ হয়েও বাঘের সম্মান পাচ্ছি নে। আরো দু'চারটে খাটাশ আছেন। কিন্তু হায়, তাঁরা তো আমাকে পত্র লিখে তাঁদের হাঁড়ির খবর জানাবেন না!)

* * *

আত্মচিন্তা স্বদেহ-'ডংশন' স্থগিত রেখে আবার শহ্‌র-ইয়ারের চিঠিতে ফিরে গেলুম। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করছি, নির্লজ্জের মত স্বীকার করছি, অকস্মাৎ পুরুষবিদ্বেষে রূপান্তরিত এ-রমণীর জাতক্রোধে পরিপূর্ণ এই পত্রখানা আমার খুব একটা মন্দ লাগছিল না।

এর পর ইয়ার লিখছে,—

আদিখেত্তা, না, আদিখ্যেতা? কিন্তু আপনি এই মেয়েলী শব্দটি বুঝবেন। আপনি ভাবছেন, আমি আদিখেত্তা, বা আপনাদের ভাষায় "আধিক্যতা" করছি। কিন্তু আপনি তো অন্তত এইটুকু জানেন—যদিও, অপরাধ নেবেন না, স্ত্রী-চরিত্রে আপনার জ্ঞান এবং অনুভূতি ঠিক ততটুকু, যতটুকু একটা অন্ধ এস্কিমোর আছে, হুগলি নদীর অগভীর বিপদসংকুল ধারায় পাইলট জাহাজ চালাবার—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এ-হাহাকার দৈন্যের মরুভূমিতে আমি একা নই, আমার মত বিস্তর রমণী রয়েছে যাদের জীবন শূন্য। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই—বিশেষ করে হিন্দু রমণী—সেটা জীবনভর এমনই আশ্চর্য সঙ্গোপনে রাখে যে তাদের নিকটতম আত্মজনও তার আভাসমাত্র পায় না। গুরুর গানে আছে তাঁর বেদনার

"ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে।"

আর এই রমণীদের বেলা তাদের বেদনার

"ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে
বেড়ানু বহিয়া সারা আয়ু ধরে।"

ঐ যে আপনার 'ভক্ত' খানের ঠাকুরমা। তিনি যে তাঁর সমস্ত জীবন শূন্যে শূন্যে কাটিয়েছেন তার আভাস কি তার জাদু ভূতনাথ (হোয়াট এ নেম! আমার বিশ্বাস ওর বাপ-মা তার নাম রেখেছিলেন 'আনন্দসুন্দর খান' এবং বড় হয়ে, এ্যাজ এ প্রটেস্ট্, সে অন্য এক্স্ট্রিমে গিয়ে, এফিডেভিট দিয়ে 'ভূতনাথ' নাম নেয়) পর্যন্ত পেয়েছে?

ঐ ঠাকুরমার শূন্যতা এবং আমার শূন্যতা যেন হংসমিথুনের মত আমাদের একে অন্যকে কাছে টেনে নিয়ে আসে। ওদিকে উনি নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী এবং আমিও গরবিনী মুসলমানী। শুনেছি, প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময় একই গাছের-গুঁড়ির উপর ঠাসাঠাসি করে সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, নকুল, গোসাপ নিরাপদ তীরের আশায় ভেসে ভেসে যায়। কেউ তখন কারো শত্রুতা করে না, এমন কি আপন অসহায় ভক্ষ্য প্রাণীকেও তখন আক্রমণ করে না। আর আমাতে ঠাকুমাতে তো পান্না-সোনায় মিল্‌টি মানানসই। আমরা দুজনা বসে আছি একই নৌকায়। একমাত্র রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা বলে, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কটা অহিনকুলের—আজকের দিনের ভাষায় বুর্জুয়া প্রালেতারিয়ার)। আর আমাদের উভয়ের সামনে,

"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার
পার আছে কোন্ দেশে।।...
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে।।
পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়
কী আছে শেষে!"

ঐ তো আমার 'দোষ'। কোনো-কিছু বলতে গেলেই আমার রসনায় এসে আসন নেন রবিঠাকুর, কালিদাসের রসনায় যে-রকম বীণাপানি আসন জমিয়ে মধুচক্র গড়তেন। আর লোকে ভাবে—হয়তো ঠিকই ভাবে—আমার নিজস্ব কোনো ভাব-ভাষা নেই, আমি "চিত্রিতা গর্দভী"—রবিকাব্যের গামলার নীল রঙে আমার ধবলকুষ্ঠের মত সাদা চামড়াটি ছুপিয়ে নিয়ে নবজলধরশ্যাম কলির মেকি কেষ্ট হয়ে গিয়েছি!

কিন্তু আপনি জানেন, আপনাকে অসংখ্য বার বলেছি, আমি রাজা পিগমালিয়োন—এস্থলে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত মর্মরমূর্তি। বরঞ্চ তারো বাড়া। পিগ্মালিয়োন তাঁর গড়া প্রস্তরমূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করতে অক্ষম ছিলেন বলে দেবী আফ্রোদিতে'কে প্রার্থনা করেন, তাঁর সেই মূর্তিটিকে জীবন্ত করে দিতে। দেবীরা—পূর্বের কথা স্মরণ করে দিয়ে আবার বলছি, পুরুষের তুলনায় তাঁরা

চিরন্তনী করুণাময়ী। "ধন্য মা মেরি, তুমি, মা, পূর্ণা করুণাময়ী" সর্বদেবীর সর্বশেষ সর্বাঙ্গসুন্দরী মা-জননী—দেবী আফ্রোদিতে রাজার বর পূর্ণ করে দিলেন। এ-স্থলে দেবীর এমন কী কেরামতী, কী কেরদানী! পক্ষান্তরে দেখুন, আমার এই মূর্তদেহ নির্মাণের জন্য, প্রশংসা হোক, নিন্দা হোক, সেটা পাবেন আমার জনক-জননী। কিন্তু সে-দেহটাকে চিন্ময় করলো কে? গানে গানে, রসে রসে, রামধনুর সপ্তবর্ণের সঙ্গে মিশিয়ে তার ভিতর দিয়ে উড়ে-যাওয়া নন্দনকানন-পারিজাত রঙে রঞ্জিত প্রজাপতির কোমল-পেলব ডানা দুটির বিচিত্র বর্ণে, নবীন উষার পুষ্পসুবাসে, প্রেমে প্রেমে, বিরহে বিরহে, বেদনা বেদনায় কে নিরমিল আমার হৃদয়, আমার স্পর্শকাতরতা, কোণের প্রদীপ যে-রকমজ্যোতিঃসমুদ্রে মিলিয়ে যায় হুবহু সেইরকম সৌন্দর্যসাগরে ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে আমার নিজের সত্তাকে বিলীন করে দেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আকুলতা—এটি নির্মাণ করলো কে? মহাপ্রভুর বর্ণ দেখে কে যেন রচেছিলেন —শব্দে শব্দে মনে নেই—

"চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া গো,
কে মাজিল গোরার দেহখানি!"

ভারী সুন্দর! আকাশের চাঁদ আর পৃথিবীর চন্দন—অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা চন্দ্র আর এই মাটির পৃথিবীর চন্দন দিয়ে, ছন্দসী দ্বারা স্বর্গমর্ত্যের সমন্বয়ে মাজা হল গৌরাঙ্গের দেহখানি! কিন্তু মহাপ্রভুর ভাষাতেই বলি এহ বাহ্য। 'দেহ' তো বাইরের বস্তু।

বার্ণাড শ' রাজা পিগমালিয়োনকে অবশ্যই ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর মূর্তি এলাইজাকে দিলেন সুমিষ্ট ভাষা এবং সুভদ্র বিষয় নিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট সমাজে আলোচনা করার অনবদ্য দক্ষতা।

শ'কে ছাড়িয়ে বহু বহু সম্মুখে এগিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। আমার চিৎময় হৃদ্‌ময় জগৎ নির্মাণ করে তিনি আমাকে যে বৈভব দিয়েছেন, শ'র সৃষ্টি তার শতাংশের একাংশও পায় নি।

আপনাদের ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে আপনার সম্মুখে শেষবারের মত আমার শেষ গুরুদক্ষিণা নিবেদন করে গেলুম।

* * *

কিন্তু মেয়েদের এই শূন্যতা, দীনতা, ফ্রাসট্রেশনের জন্য দায়ী কে?

নারী হয়েও বলবো, তার জন্য সর্বাগ্রে দায়ী রমণীকুল। প্রধানতঃ।

আপনারই গুরু স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের "দেশে" প্রকাশিত রচনাতে একটি সুভাষিত পড়েছিলুম,

"কুঠারমালিনং দৃষ্টবা
সর্বে কম্পান্বিতা দ্রুমাঃ।

বৃদ্ধ দ্রুমো বক্তি, "মা ভৈঃ
ন সন্তি জ্ঞাতয়ো মম" ॥

"কুঠারমালাধারীকে দেখে সমস্ত গাছ যখন কম্পান্বিত তখন বৃদ্ধ একটি গাছ বললে, 'এখনই কিসের ভয় ? এখনো আমাদের (জ্ঞাতি) কোনো গাছ বা বৃক্ষাংশ ওর পিছনে এসে যোগ দেয়নি'।

শহুর্-ইয়ার লিখছে, বড় হক্ কথা। কামারের তৈরী কুড়োলের সুন্দমাত্র লোহার অংশটুকুন দিয়ে কাঠুরে আর কি করতে পারে, যতক্ষণ না কাঠের টুকরো দিয়ে ঐ লোহায় ঢুকিয়ে হ্যাণ্ডিল বানায়। পুরুষজাত ঐ লোহা ; সাহায্য পেল মেয়েদের সহযোগিতার কাঠের হ্যাণ্ডিল। তাই দিয়ে যে-মেয়েরই একটু 'বাড়' হয় তাকে কাটে, আর যেগুলো নিতান্ত নিরীহ চারা গাছ বা যে-সব বছর-বিয়ানীরা গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা বিইয়ে বিইয়ে জীবন্মৃত তাদের রেহাই দেয়।

এই সব অপকর্মে যুগ যুগ ধরে সাহায্য করেছে মেয়েরাই। শুনেছি, সতীদাহের পুণ্যসঞ্চয় করার জন্য বিধবাকে প্ররোচিত করেছে সমাজাগ্রগণ্যা নারীরাই।

এত দিন বলি নি, এই বারে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার বেলা বলি, এই কলকাতার মুসলমান মেয়েরা—দু'চারটি হিন্দুও আছেন—আপনার সঙ্গে আমার অবাধ মেলা-মেশা দেখে ঢিঢিট্টাকার দেয় নি ? বেহায়া বেআব্রু বেপর্দা বেশরম, তওবা তওবা বলে নি ? তবে কি না, আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, "চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া" হয়তো আমার দেহ এমন কি হৃদয়ও মাজা হয়েছে, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক, তজ্জনিত বুদ্ধি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অবহেলা করার মত আমার গণ্ডারচর্মবিনিন্দিত দার্ঢ্য নির্মিত হয়েছে, সুইডেনের প্যোর স্টেনলেস্ স্টীল ও সাউথ আফ্রিকার আন্-কাট্ ডায়মণ্ড মিশিয়ে। আর আছেন, ভূতনাথের ঠাকুমা। যাঁকে বলতে পারেন আমার টাওয়ার অব্ পাওয়ার।

তদুপরি আমার অভিজ্ঞতা বলে, এই সব "আজ-আছে-কাল-নেই" জিভের লিকলিকিন অনেকখানি বিঘ্নসন্তোষমনা পরশ্রীকাতরতা বশতঃ। ইলিয়েট রোডের সায়েব মেমরা বড়দিনে যখন নানাবিধ ফুর্তির সঙ্গে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ধেই ধেই করে নৃত্য করে তখন আমরা—হিন্দু-মুসলমানরা—প্রাণভরে ছ্যা ছ্যা করি বটে, কিন্তু তখন কসম খেতে হলে ধোওয়া তুলসী পাতাটির পার্ট প্লে করা বন্ধ করে স্বীকার করতে হবে, মনের গোপন কোণে হিংসেয় মরি, "হায় ! আমাদের রন্দী বুড়্ঢা সমাজ এ-আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করলো কেন ?" নয় কি ? সত্য বলুন। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনি বিদেশে বিস্তর নেচেছেন, আর এখন, আমাদের মত নিরীহদের মৃদুমন্দ নাচাচ্ছেন। আহা ! গোস্সা করলেন না তো ? শুনেছি, সৈয়দরা বড্ড রাগী হন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা সান্ত্বনার বাণীও পেয়েছি ; ওঁয়াদের রাগ নাকি খড়ের আগুনের মত—

ধপ্‌ করে জ্বলে আর ঝপ্‌ করে যায় নিভে—সঙ্গে সঙ্গে।

অবশ্য একটা জিনিস আমাকে গোড়ার দিকে কিছুটা বেদনা দিয়েছিল—এই সব নগণ্য ক্ষুদে ক্ষুদে, কিন্তু বিষেভর্তি চেরা-জিভ যখন আমার স্বামী, আপনার বন্ধু ডাক্তারের বিরুদ্ধে হিস্‌ হিস্‌ করে বিষ বমন করতো। সেখানে আমি যে নাচার। আমি কি রকম জানেন? আপনার ডাক্তার যখন কোনো রুগীকে ইন্‌জেকশন দেয় তখন আমি সেদিকে তাকাতে পারি নে। আমার বলতে ইচ্ছে করে, না হয় দাও না, বাপু, ইনজেকশনটা আমাকেই।

অবশ্য আল্লার মেহেরবাণী। ডাক্তারের কাছে এ-সব হাম্‌লা পৌঁছয় না। তাঁর রিসার্চ-ক্লরফরম্‌ দিয়ে তিনি তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় অবশ অসাড় করে রেখেছেন।

আপনাকে বলেছি কি সেই গল্পটা? এটি আমি শুনেছি বাচ্চা বয়সে আমাদের বাড়ির এক নিরক্ষরা দাসীর কাছ থেকে। তাই এটা হয়তো লোকমুখে প্রচলিত আঞ্চলিক কাহিনী মাত্র—কেতাব-পত্রে স্থান পায় নি বলে হয়তো আপনার অজানা।

এক বাদশা প্রায়ই রাজধানী থেকে দূরে বনের প্রান্তে একটি নির্জন উদ্যান-ভবনে চলে যেতেন শান্তির জন্য। সেখানে বালক যুবরাজের ক্রীড়াসঙ্গী নর্মসখা-রূপে জুটে যায় এক রাখাল ছেলে। তাদের মধ্যে রাজপুত্র কৃষকপুত্রের ব্যবধান ছিল না।

বাদশা মারা গেলে পর যুববাজ বাদশা হলেন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে যুবরাজ আর সুযোগ পান নি সেই উদ্যানভবনে আসার। যখন এলেন তখন সন্ধান নিলেন তাঁর রাখাল বন্ধুর—স্বয়ং গেলেন তার পর্ণকুটিরে। রাখাল ছেলে পূর্বেরই মত মোড়ামুড়ি দিল। যুবরাজ শুধোলেন, "তোমার বাপকে দেখছি না যে?"

"তিনি তো কবে গত হয়েছেন! আল্লা তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।"

"গোর দিলে কোথায়?"

"ঐ তো হোথায়, খেজুর গাছটার তলায়। বাবা ঐ গাছের রস আর তাড়ি খেতে ভালোবাসতো বলে আমাকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিল তাকে যেন ওরই পায়ের কাছে গোর দি।" (নাগরিক বিদগ্ধ ওমর খৈয়ামও দ্রাক্ষাকুঞ্জে সমাধি দিতে বলেছিলেন, না?)

রাখাল ছেলে জানতো, আগের বাদশা গত হয়েছেন। তাই শুধলো, "আর হুজুর বাদশা'র গোর কোথায় দেওয়া হলো?"

ঈষৎ গর্বভরে নবীন রাজা বললেন, "জানো তো রাজা-বাদশারা বড় নিমক-হারাম হয়, বাপের গোরের উপর কোনো এমারৎ বানায় নাও।...আমি, ভাই, সেরকম নই। বাবার গোরের উপর বিরাট উঁচু সৌধ নির্মাণ করেছি, দেশ-বিদেশ থেকে সর্বোত্তম মার্বেল পাথর যোগাড় করে।...এই বনের বাইরে

গেলেই তার চূড়োটা এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়।"

রাখাল ছেলে বললে, "সে আর দেখি নি? কিন্তু তুমি, ভাই, করেছ কি? শেষবিচার কিয়ামতের দিন. আল্লার হুকুমে ফিরিশ্‌তা ইসরাফিল যখন শিঙে বাজাবেন তখন কত লক্ষ মণ পাথর খুঁড়ে খুঁড়ে ভেঙে ভেঙে উঠতে হবে বেহেশ্‌ৎ বাগে। তাঁর জন্য এ মেহেন্নতী তৈরী করলে কেন?···আর আমার বাবা তার গোরের উপরকার আধ হাত মাটি এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলে হুশ হুশ করে চলে যাবে আল্লার পায়ের কাছে।"

* * *

প্রিয় সৈয়দ সাহেব, আমাকে দিয়েছে জ্যান্ত গোর বিরাট ইঁট-সুরকির এই বাড়িতে। বধূ হয়ে যে-সন্ধ্যায় এ-বাড়িতে প্রথম প্রবেশ করি তখনই আমার শরীরটা কেমন যেন একটা শীতলতার পরশে সির্‌সির্‌ করেছিল, যদিও আমার পরনে তখন অতি পুরু আড়ি-বেল বেনারসী শাড়ি, কিংখাপের জামা আর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আপনার ডাক্তারের ঠাকুমার কাশ্মীরী শাল—যার সাচ্চা জরির ওজনই হবে আধসের।

আপনি এ-বাড়ির অতি অল্প অংশই চেনেন। এ-বাড়ির পুরো পরিক্রমা দিতে হলে ঘণ্টাটাক লাগার কথা। আমাকে কয়েক দিন পর পরই এ-পরিক্রমা লাগাতে হয়। প্রথম প্রথম খুব একটা মন্দ লাগতো না—প্রাচীন দিনের কতশত সম্পদ, টুকিটাকি, নবীন দিনের সঞ্চয়ও কিছু কম যায় না—এস্তেক কার যেন প্রেজেণ্ট দেওয়া একটা টেলিভিসন সেট্‌—যদিও কবে যে এটা কাজে লাগবে, সেটা ভবিষ্যতের গর্ভে! যেন যাদুঘরে এটা-ওটা দেখছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু চিন্তা করুন, যদি আপনাকে যাদুঘরে আহারনিদ্রা দাম্পত্য-জীবন যাপন করতে হয়, তবে কি রকম হাল হয়!

তবু বলি, এও কিছু নয়। সামান্য ইঁট-পাথর, প্রাচীন দিনের সঞ্চয়—এরা প্রাণহীন। এরা আমার মত সজীব প্রাণচঞ্চল জীবকে আর কতখানি সম্মোহিত করবে?

কিন্তু এরা যে সবাই সর্বক্ষণ চিৎকার করে করে আমাকে শোনাচ্ছে,

"ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!! ঐতিহ্য! ঐতিহ্য!!"

সবাই বলছে, সাত পুরুষ ধরে এই খানদানী পরিবারে যা চলে আসছে, সেইটে তোমাকে মেনে চলতে হবে. বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এবং মরার সময়ও তার ভবিষ্যতের জন্য পরিপাটি ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

আর যারা জ্যান্ত? নায়েব, তাঁর পরিবারবর্গ, এ-বাড়ির দারওয়ান ড্রাইভার বাবুর্চি চাকর হালালখোর, পাশের মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিন সক্কলের চেহারাতেই ঐ একটি শব্দ নিঃশব্দে ফুটে উঠছে: ট্র্যাডিশন। বিগলিতার্থ: বেগমসাহেবা যদি খানদানী প্রাচীন পন্থা মেনে চলেন তবে আমরা তাঁর

গোলামের গোলাম, আমরা নামাজের পর পাঁচ বেকৎ আল্লার পদপ্রান্তে লুটিয়ে বলবো, "ইয়া খুদা, এই শহ্‌র্‌-ইয়ার বানু 'জিল্‌ল্‌ল্লা', এই দুনিয়ায় 'আল্লার ছায়া'। তাঁরই সুশীতল ছায়াতে আমাদের জীবন, আমাদের সংসার, আমাদের মৃত্যু, আমাদের মোক্ষ। তুমি তাঁকে শতায়ু করো, সহস্রায়ু করো! আমেন!"

আমি সিনিক্‌ নই। তাদের এ-প্রার্থনায়, তাদের ঐতিহ্যরক্ষার্থ-কামনায় প্রচুর আন্তরিকতা আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই আদিম ইন্‌স্‌টিন্‌ক্‌ট্‌, জীবনসংগ্রামে কোনোগতিকে টিকে থাকবার, কোনোগতিকে বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টা।...আজ যদি কালীঘাটের মন্দির নিশ্চিহ্ন করে পুরুৎ পুজোরীদের আদেশ দেন "চরে খাও গে!" তবে তারা যাবে কোথায়? বর্তমান যুগোপযোগী জীবনসংগ্রামে যুদ্ধ করার মত কোনো ট্রেনিং তো এদের দেওয়া হয় নি। এদের অবস্থা হবে, খাঁচার পাখিকে হঠাৎ ছেড়ে দিলে যা হয়। খাঁচার লোহদুর্গে দীর্ঘ-কাল বাস করে সে আত্মরক্ষার কৌশল ভুলে গিয়েছে, দু'বেলা গেরস্তের তৈরী ছোলা-ফড়িং খেয়ে খেয়ে ভুলে গিয়েছে আপন খাদ্য সংগ্রহ করার ছলা-কলা।

আবার আমার 'লোক-লস্করের' কথায় ফিরে আসি। এদের সবাইকে যদি আমি কাল ডিসমিস করে দি,—সে এক্তেয়ার ডাক্তার আমাকে দিয়েছেন—তবে কি হবে? অধিকাংশই না খেয়ে মরবে। তারা শুধু জানে ট্র্যাডিশন। তাদের জন্ম হয়েছে এ শতাব্দীতে, কিন্তু মৃত্যু হয়ে গিয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই।

আমি একাধিকবার চেষ্টা দিয়েছিলুম এ-বাড়িতে ফ্রেশ্‌ ব্লাড আমদানি করতে। চালাক চতুর দু'একটি ছোকরাকে বয়্‌ হিসেবে নিয়ে এসেছি। জানেন কি হলো? পক্ষাধিক কাল যেতে না যেতেই তারা ভিড়ে গেল প্রাচীনপন্থী দারওয়ান বাবুর্চির সঙ্গে। বুঝে গেল, রুটির ঐ-পিঠেই মাখন মাখানো রয়েছে। সিনেমা যাওয়া পর্যন্ত তারা বন্ধ করে দিল। অক্লেশে হৃদয়ঙ্গম করলুম, দেড়শ' কিংবা তারো বেশী ট্র্যাডিশনের মায়াজাল ছিন্ন করার মত মোহমুদ্গর আমি রাতারাতি—রাতারাতি দূরে থাক, বাকি জীবনভর চেষ্টা করলেও—নির্মাণ করতে পারবো না।

অবশ্য আমার দেবতুল্য স্বামী আমাকে বাসরঘরেই সর্বস্বাধীনতা দিয়ে-ছিলেন, সর্ব বাবদে—সে-কথা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। কিন্তু স্বাধীনতা দিলেই তো সব মুশকিল আসান হয়ে যায় না। স্বাধীনতা পেয়ে খাঁচার পাখিটার কি হয়েছিল? অনাহারে যখন ভিরমি গিয়ে চৈত্রের ফাটাচেরা মাঠে পড়ে আছে, তখন শিকরে পাখি তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গাছের ডালে বসে কুরে কুরে তার জিগর-কলিজা খেল।

* * *

সে-কথা জানে বলেই এ-বাড়ির লোক আমাকে প্রথম দিনই খাঁচাতে পুরতে চেয়েছিল। ওরা সবাই ট্র্যাডিশনের খাঁচাতে। খাঁচার ভিতরকার

নিরাপত্তা, অন্নজল বাইরে কোথায় পাবে? আমাদের এক সমাজতত্ত্ববিদ নাকি বলেছেন, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা না পেলেই নাকি আমাদের পক্ষে ভালো হতো। ওঁর বক্তব্য, ইংরেজ আমলে নাকি আমাদের ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্র-ইন্ধনের দুশ্চিন্তা ছিল অনেক কম।

এই বারে মোদ্দা কথা বলি। সেই রাখাল ছেলের বন্ধুর পিতা বাদশা তাঁর সমাধিসৌধের প্রস্তর ভেঙে ভেঙে উঠতে যত না হিমসিম খাবেন, তার সঙ্গে আমার এই উৎকট সংকটের কোনো তুলনাই হয় না। জ্যান্ত গোরের মানুষ আপন ছটফটানিতে নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাস হয়ে প্রাণবায়ু ত্যাগ করে।

তথাপি আমি ঐ খানদানী পাষাণদুর্গে থাকতে চাই নি। ঠিক মনে নেই, তবে গল্পটি খুব সম্ভব সার্থকা সাহিত্যিকা শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবীর; একটি বালিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি যুবকের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়। অহেতুক যোগাযোগের ফলে তার কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল এক অতি দুর্ধর্ষ কৃষাণরক্তশোষক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। আমার মনে নেই, মেয়েটি হয়তো বা অনিচ্ছায় বিয়ে করেছিল, কিংবা হয়তো বলদৃপ্ত পদে স্বামীগৃহে প্রবেশ করেছিল, কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে এ-জমিদার পুরুষ-ক্রমে যা করেছেন, যেটা দু ছত্রে বলা যায়,

"পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।"

(আবার রবীন্দ্রনাথ! এই মুহম্মদী মামদোর উপর তিনি আর কত বৎসর ভর করে থাকবেন!) সেই পিচেশী রক্তশোষণ সে চিরতরে বন্ধ করবে— আপ্রাণ সংগ্রাম দিয়ে, প্রয়োজন হলে পরমারাধ্য স্বামীকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ দিয়ে, ডিফাই করে।

এবং দিয়েও ছিল সে মোক্ষম লড়াই তাঁর খাণ্ডারনী শাশুড়ীর বিরুদ্ধে— তিনিই ছিলেন এই প্রজা-শোষণ-উচাটনের চক্রবর্তিনী।

সংক্ষেপে সারি। তার বহু বৎসর পরে কি পরিস্থিতি উদ্ভাসিত হলো? সেই পূর্বেরটাই। যথা পূর্বং তথা পরং! যদ্বৎ তদ্বৎ পূর্ববৎ। ইতিমধ্যে শাশুড়ী মারা গিয়েছেন এবং সেই "বিদ্রোহী" তনুদেহধারিণী বধূটি দশাসই গাড়ুগর্দম্ কলেবর ধারণ করে হয়ে গেছেন সে-অঞ্চলের ডাকসাঁইটে রক্তশোষিণী!

ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!! সেই দ' থেকে বাঁচে কটা ডিঙি?

কিংবা রবীন্দ্রনাথের সেই কথিকাটি স্মরণে আনুন;

"বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।'···দেবতা দয়া করে বললেন···'লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।"

সেই ভূতই হলো ট্র্যাডিশন!

তারপর মনে আছে সেই ভূত-ট্র্যাডিশনের পায়ের কাছে "দেশসুদ্ধ সবাইকে" কি খাজনা দিতে হলো ?

"শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করে উত্তর আসে [খাজনা দেবে] 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'।" ।

সৈয়দ সাহেব, আমি ট্র্যাডিশন ভূতের খর্পরে সে-'খাজনা' দিতে রাজী ছিলুম না। তার কারণ এ নয় যে আমি কৃপণ। কিন্তু এ-মূল্য দিলে যে আমার সর্বসত্তা লোপ পাবে, আমার ধর্ম আমার ইমান যাবে।

সুভদ্রা আশাপূর্ণার সেই বধূর মত দিনে দিনে আপন সত্তা হারিয়ে হারিয়ে আমি আমার শ্বশুরবাড়ির অচলায়তনে বিলোপ হতে চাই নি। সেইটেই হতো আমার মহতী বিনষ্টি।...

কিন্তু তবু জানেন, সৈয়দ সাহেব, হাসিকান্না হীরাপান্না রান্নাবান্না নিয়ে আমার দৈনন্দিন জীবন কেটে যাচ্ছিল। আমাদের কাঁচকাঁচা বয়সে একটা মামুলী রসিকতার কথোপকথন ছিল, "কি লো, কি রকম আছিস ?" "কেটে যাচ্ছে, কিন্তু রক্ত পড়ছে না।" আমার বেলা কিন্তু "দিন কাটার" সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড কেটে কেটে রক্ত ঝরে ঝরে ফুসফুসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধনিঃশ্বাস করে তুলছিল। সর্বশেষে একদিন আমাকে ডুবে মরতে হতো, আমার আপন দিল-ঝরা খুনে। আমি কর্তার কাছে শুনেছি, যুদ্ধের সময় বুলেটের সামান্যতম এক অংশ যদি হৃৎপিণ্ডে ঢুকে সেটাকে জখম করতে পারে তবে তারই রক্তক্ষরণের ফলে সমস্ত ফুসফুস ফ্লাড়েড্ হয়ে যায়, এবং বেচারা আপন রক্তে ড্রাউনড হয়ে মারা যায়।

অবশ্য আমার বেলা বুলেটের টুকরো নয়। ঐ ভূতুড়ে বাড়ির ট্র্যাডিশনের একখানা আস্ত চাঁই।...

আপনি অবশ্যই শুধোবেন, অকস্মাৎ তোমার এ-পরিবর্তন এল কি করে ?

পরিবর্তন নয়। জাগরণ। নব জাগরণ।

*　　　　　*

"রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ..."

আমার 'নব জাগরণের' পর আমি এ-কবিতাটি নিয়ে অনেক ভেবেছি। স্পষ্টত এখানে রূপনারাণ রূপকার্থে। অবশ্য এর পিছনে কিছুটা বাস্তবতাও

থাকতে পারে। শুধু পদ্মায় নয়, কবি গঙ্গাতেও নৌকোয় করে সফরে বেরুতেন। হয়তো বজবজ অঞ্চলে কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; হঠাৎ ঘুম ভাঙল ডায়মণ্ডহারবারের একটু আগে যেখানে রূপনারায়ণ নদী গঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে। জেগে উঠলেন রূপনারাণের কূলে, 'কোলে'ও হতে পারত। স্বপ্ন' দেখছিলেন এতক্ষণ। অর্থাৎ তাঁর আশী বৎসরের জীবন স্বপ্নে স্বপ্নে, স্বপ্নের অবাস্তবতায় কাটাবার পর হঠাৎ রূপনারাণের কূলে পরিপূর্ণ বাস্তবের অর্থাৎ 'রূপের' সম্মুখীন হলেন। এক আলঙ্কারিক রূপের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে বলেছেন, ভূষণ না থাকলেও যাকে ভূষিত বলে মনে হয় তাই 'রূপ'। অথাৎ পিওর, নেকেড রিয়ালিটি। তার কোনো ভূষণ নেই।

আর 'নারায়ণ' অর্থ তো জানি; নরনারী যাঁর কাছে আশ্রয় নেয়।

আমি অন্তত এই অর্থেই কবিতাটি নিয়েছি।

তাই আমি জপ করি সেই আল্লার (নারায়ণ) আশ্রয় নিয়ে, তাঁর রূপ-স্বরূপকে স্মরণ করে, যার নাম "লতীফ্" (সুন্দর)। এবং তিনি শিব এবং সত্যও বটেন।

কারণ আমি যখন আমার রূপনারাণের তীরে পৌঁছলুম, রূঢ়তমরূপে আমার নিদ্রাভঙ্গের 'দ্বিজত্বের' সম্মুখীন হলুম তখন শুধু যে আমার পূর্ববর্ণিত

ট্র্যাডিশন! ট্র্যাডিশন!!

ট্র্যাডিশনের পাষাণপ্রাচীর নির্মিত 'অচলায়তন' দেখতে পেলুম, তাই নয়।

আতঙ্ক, বিস্ময়, এমন কি নৈরাশ্যে প্রায় জীবন্মৃতাবস্থায় আমি আরো অনেক অন্ধপ্রাচীর, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চতুর্দিকে যেরকম চার দফে ইলেকট্রিফাইড লোহার কাঁটাজাল থাকে সেগুলোও দেখতে পেলুম।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক বিভীষিকাময়ঃ ভুল আদর্শ, ভুল মর‍্যালিটি, বেকার 'পরোপকার,' মহাশূন্যে দোদুল্যমান আলোকলতার উপর স্তরে স্তরে ফুটে-ওঠা সঙ্গীতের ক্ষণস্থায়ী আকাশকুসুম, কবি বায়রনের ভাষায়

"এ যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘেরিয়া
শ্যামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর জর্জর অতি
দূর হতে মনোলোভা॥"

আর কি সব ভুল দেখেছিলুম তার ফিরিস্তি আপনাকে দিতে গেলে পুরো একখানা "মোহম্মদী পঞ্জিকা" লিখতে হবে। এক কথায় দেহের ভুল, হৃদয়ের ভুল, মনের ভুল—পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভুল। অর্থাৎ কিশোরী অবস্থা থেকেই শুরু করেছি ভুল এবং চলেছি ভুল পথে।

আমি নিরাশাবাদী নই, অতএব ঢেলে সাজাতে হবে নতুন করে। জীবনের

সঙ্গে রিটার্ন ম্যাচের এখনো সময় আছে—প্রস্তুতি করবার।

*　　　*　　　*

কিন্তু পন্থা কি?

শিশু যেমন মায়ের হাতে মার খেয়ে মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি তেমনি "রূপনারাণের কূলে" নয় "রূপনারায়ণের কোলে" আছাড় খেয়ে পড়লুম।

"বিশ্বরূপে"র অতিশয় রূঢ় প্রকাশ এই পৃথিবীতে আমরা যাকে "সৌন্দর্য" বলি, তার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় ছিল। অতি ক্ষুদ্র কীট ও তার জীবন-স্পন্দনে অন্তহীন গ্রহসূর্য তারায় তারায় যে জীবনস্পন্দন আছে তার লক্ষা-ক্ষৌহিণী অংশ যতখানি অন্ধভাবে অনুভব করে, ঠিক ঐ অতি অল্পখানি। সেই-ই প্রচুর! পর্যাপ্তেরও প্রচুরতর অপর্যাপ্ত! আরব্য রজনীর অনু-নশ্‌শার এক-ঝুড়ি ডিম দিয়ে কারবার আরম্ভ করে উজিরবানুকে বিয়ে করবার প্ল্যান কষেছিল। তার হিসেবে রত্তিভর ভুল ছিল না—ভুল ছিল তার হঠকারিতায়। আর আমার হাতে তো কুল্লে সর্বসাকুল্যে মাত্র একটি ডিম। কার্ডিনাল নিউম্যান কি গেয়েছিলেন—স্মৃতিদৌর্বল্যের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি—"আমি তো যাত্রা-শেষের দূরদিগন্তের কাম্যভূমি দেখতে চাই নে; আমাকে, প্রভু; একটি পা ফেলার মত আলো দেখাও।" "আই ডু নট্ উয়োন্ট টু সী দ্য ডিসটেন্ট সীন/ ওয়ান স্টেপ ইনাফ্ ফর মী।" তাই আমি "বিশ্বরূপ লতীফের" সন্ধানে বেরলুম।

এরপর আমার যে সব নব নব অভিজ্ঞতা হলো তার বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নেই, কখনো হবে না, কারণ আমি তাপসী রাবেয়া নই। আমি সব-কিছু ঝাপসা ঝাপসা দেখছি। তাই আপনি আমার চোখ কেমন যেন কুয়াশা-ভরা ফিল্‌মে-ঢাকা দেখেছিলেন।

অতএব অতি সংক্ষেপে সারছি।

প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু চিন্তা করে দেখলুম, আপনি স্বপ্নমগ্ন না হলেও রূপনারাণের তীরে আপনি এখনো পৌঁছননি। প্রার্থনা করি, কখনো যেন না পৌঁছতে হয়।

সবাইকে যে পৌঁছতে হবে এমন কার, কোন্ মাথার দিব্যি? যদি রূপনারাণে পৌঁছতেই হয় তবে যেন পৌঁছেন আপনার গুরুরই মত আশী বছর বয়সে। আমার কপাল মন্দ (মুনিঋষিরা হয়তো বলবেন "ভাগ্যবন্ত" আমি "অখণ্ড-সৌভাগ্যবতী"), আমি যৌবনেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছি। কোনো ইয়োরোপীয় বিলাসরভসে নিমজ্জিত এক ধনীর সন্তান যৌবনে বলেছিলেন "স্যালভেশন, মুক্তি, মোক্ষ? নিশ্চয়ই চাই, প্রভু। কিন্তু not just yet—" অর্থাৎ একটু পরে হলে হয় না, প্রভু? আমার বিলাসবাসনা তেমন কিছু একটা নেই, কিন্তু আমার যে ভয় করে।...আপনার কাছে যাওয়া হলো না।

তখন পেলুম পীর সাহেবকে। আমার বড় আনন্দ, আপনি তাঁকে ভুল বোঝেন নি। তিনি কক্‌খনো আদৌ আমার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চান নি। বরঞ্চ তিনি যেন হলেন এমবারাসট—যেন একটা ধন্দে পড়লেন। বুঝে গেলুম, তাঁর যেন মনে হয়, যৌবনের কাম বাসনা ইত্যাদি খানিকটে পুড়িয়ে নিয়ে তার পর ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নামা প্রশস্ততর।

* * *

আপনি জানেন, যদিও ধর্মেকর্মে আমার আসক্তি ছিল সামান্যই, তবু আমি শ্রীঅরবিন্দের আধা-ধর্ম-আধা-কালচারাল লেখাগুলো সব সময়ই মন দিয়ে পড়েছি। বুঝেছি অবশ্য সিকি পরিমাণ। তাঁর কথা আমার মনে পড়ল সর্বশেষে। কৃপণ যে-রকম তার শেষ মোহরটির কথা স্মরণ করে সব খতম হয়ে যাওয়ার পর।

তাঁর সে-লেখাটির নাম বোধ হয় উত্তরপাড়া ভাষণ।

আলীপুরের বোমার মামলা তখন সবে শেষ হয়েছে। সমস্ত বাঙলা দেশ উদগ্রীব, এবারে শ্রীঅরবিন্দ বাঙলা দেশকে কোন পথে নিয়ে যাবেন। আর বাঙলা দেশের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ।

কী গুরুতর দায়িত্ব! মাত্র একটি লোকের স্কন্ধে!

তখন তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল কথা একটি বাক্যে বলা যেতে পারে,—তিনি আপন ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুদিনের জন্য নির্জনে চিন্তা করতে চান।

আর আমি তো সামান্য প্রাণী। আমার এ-ছাড়া অন্য কোনো গতি আর আছে কি?

আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার স্বামীর অত্যন্ত কষ্ট হবে। এ-রকম ফেরেশতার মত স্বামী কটা মেয়ে পায়! তাই জানি, যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইব তিনি আমাকে বাধা দেবেন না। তিনি নিজে ধার্মিক —তাই বলে যে তিনি আমার ধর্মজীবনের অভিযানে বাধা দেবেন না, তা নয়। আমি যে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে বসে ঝুরে মরবো সেটা তিনি কিছুতেই সইতে পারবেন না।

হায় আল্লাতালা! আমাকে তুমি এ কী নির্দেশ দিলে যার জন্য আমার এই প্রাণপ্রিয় স্বামী, আমার মালিককে ছেড়ে যেতে হচ্ছে! সৈয়দ সাহেব, আমি জানি আর আমার স্বামী জানেন, আমাদের আজও মনে হয়, আমাদের বিয়ে যেন সবেমাত্র কয়েক দিন আগে হয়েছে। আমরা যেন এইমাত্র বাজু-গশ্‌তী (বাঙলায় কি বলে? দ্বিরাগমন?) সেরে স্টীমারের কেবিনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একে অন্যকে চিনে নিচ্ছি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "আমি কী ভাগ্যবান!" লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। মাথায়

ঘোমটা টেনে তাঁর পদস্পর্শ করে বললুম, "আপনি এ কী করলেন? আমি যে এখনই এই কথাটিই বলতে যাচ্ছিলুম।"

তিনি হো হো করে হেসে উঠে বলেছিলেন, "পাগলী!"

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আজ প্রমাণ হতে চললো, আমি পাগলিনী। নইলে আমি আমার এমন মনিব ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি কেন?

কত বলবো? এর যে শেষ নেই।

* * *

আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার নিজের জন্য কষ্ট হয়—আপনি কতখানি বেদনা পাবেন, সে-কথা আমি ভাবছি নে। যাবার বেলা শেষ একটি কথা বলি। যবে থেকে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় (আল্লা সে-দিনটিকে রোশনীময় করুন!) তখন থেকেই লক্ষ্য করেছি, আপনার ভক্ত চেলার সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। হয়তো আপনার চেয়ে কাঁচা লেখকের ভক্তের সংখ্যা আরো বেশী। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম এবং অতিশয় পুলকিত হয়েছিলুম। আপনার "ভক্তা" নেই, আপনার কোনো রমণী উপাসিকা নেই। আমিই তখন হলুম আপনার অদ্বিতীয়া সখী, নর্মসহচরী—যে নামে ডাকতে চান, ডাকুন। এ-হেন গৌরবের আসন ত্যাগ করে যেতে চায় কোন্ মূর্খী! তবু যেতে হবে।

সর্বশেষে আপনাকে, নিতান্ত আপনাকে একটি কথা বলি :

ঐ যে কবিতা—কবিতা বলা ভুল, এ যেন আপ্তবাক্য—"রূপনারাণের কোলে/জেগে উঠিলাম" এর শেষ দুটি লাইনকে আমি অকুণ্ঠ স্বীকার দিতে পারছি নে। লাইন দুটি ;

"সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

এখানে আমি কুষ্টিয়ার লালনফকীরের আপ্তবাক্য মেনে নিয়েছি। তিনি বলেছেন, "এখন আমার দেহ সুস্থ, মন সবল, পঞ্চেন্দ্রিয় সচেতন। এ-অবস্থায় যদি আল্লাকে না পাই তবে কি আমি পাব মৃত্যুর পর?—যখন আমার দেহমন প্রাণহীন, অচল অসাড়?" আমি "সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে" মৃত্যু দিয়ে "সকল দেনা শোধ" করবো না।

আমার যা পাবার সে আমি এই জীবনেই, জীবন্ত অবস্থাতেই পাব।

খুদা হাফিজ্! ফী আমানিল্লা!!

আপনার স্নেহধন্য কনীজ্
শহর্-ইয়ার

হাত থেকে ঝরঝর করে সব কটি পাতা বারান্দার মেঝেতে পড়ে গেল।

এতক্ষণ আমার (এবং শহর্-ইয়ারেরও)। আদরের আলসেশীয়ান কুকুর

"মাস্টার" আমার পাশে শুয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

এখন হঠাৎ বারান্দার পূর্ব প্রান্তে গিয়ে নিচের দু'পায়ের উপর বসে উপরের দু'পা আকাশের দিকে তুলে দিয়ে চিৎকার করে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়তে আরম্ভ করলো। সম্পূর্ণ অহেতুক, অকারণ।

তবে কি মাস্টার বুঝতে পেরেছে, তার আমার প্রিয়বিচ্ছেদ। আল্লাই জানেন সে গোপন রহস্য।

* * *

অবসন্ন মনে মৃত দেহে শয্যা নিলুম। ঘুম আসছে না।

দুপুর রাত্রে হঠাৎ দেখি মাস্টার বিদ্যুৎবেগে নালার দিকে ছুটে চলেছে। হয়ত শেয়ালের গন্ধ পেয়েছে।

তার খানিকক্ষণ পরে ঐ দুপুর রাত্রে কে যেন বারান্দায় উঠল। উঠুক। আমার এমন কিছু নেই যা চুরি যেতে পারে।

হঠাৎ শুনি ডাক্তারের গলা। আমার কামরার ভিতরেই।

এক লম্ফে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলুম। বাতি জ্বাললুম।

এ কী! আমি ভেবেছিলুম ওকে পাবো অর্ধ উন্মত্ত অবস্থায়। দেখি, লোকটার মুখে তিন পোঁচ আনন্দের পলস্তরা।

কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়ে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বললে,

"নাম্বার ওয়ান : আমাদের বসতবাড়ি পরশুদিন পুড়ে ছাই।

নাম্বার টু : আমরা আগামী কাল যাচ্ছি সুইডেনে। আমার রিসার্চের কাজ সেখানেই ভালো হবে।

নাম্বার থ্রী : (কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন) শহর্-ইয়ার অন্তঃসত্ত্বা।

নাম্বার ফোর :—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে কোথায় ?"

"বারান্দায়। মাস্টারকে খাওয়াচ্ছে।"

* * *

বারান্দায় এসে শহর্-ইয়ারকে বললুম, "সুইডেনে তুমি নির্জনতা পাবে।"

তারপর শুধালুম, "আবার দেখা হবে তো ?"

সে তার ডান হাত তুলে—দেখি, আমি তাকে ঢাকা থেকে এনে যে শাঁখার কাঁকন দিয়েছিলুম সেইটে পরেছে—সে-হাত তুলে আস্তে আস্তে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "কী জানি, কী হবে।"

* * *

আমার এক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশয্যায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দুর্বল হাত তুলে বলেন—তখন তাঁর চৈতন্য ছিল কি না জানি নে—"কী জানি, কী হবে।"'